নিশানা

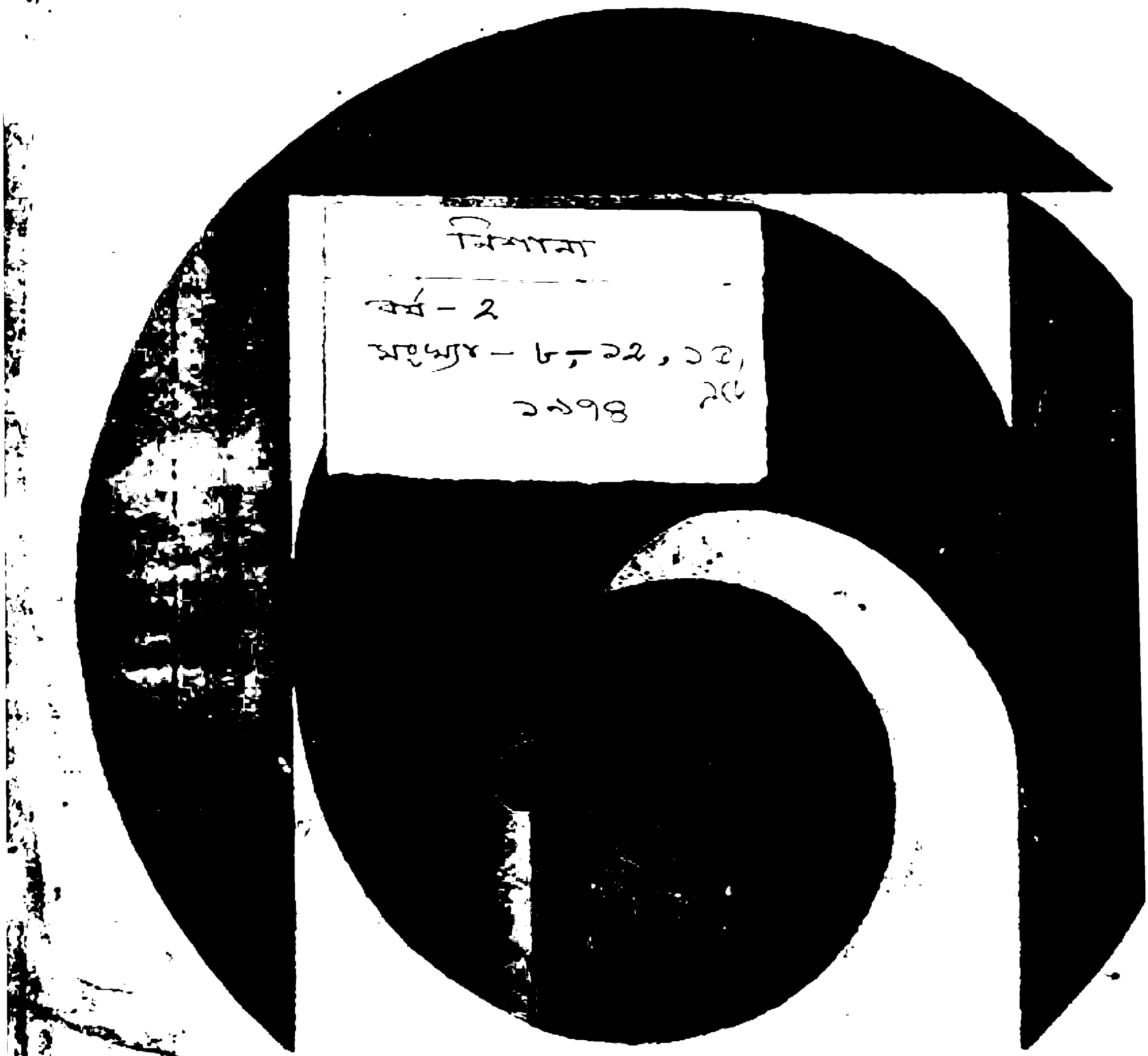

২য় বর্ষ | ৮ম (অষ্টম) সংখ্যা | ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪ | মূল্য ৭৫ প

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

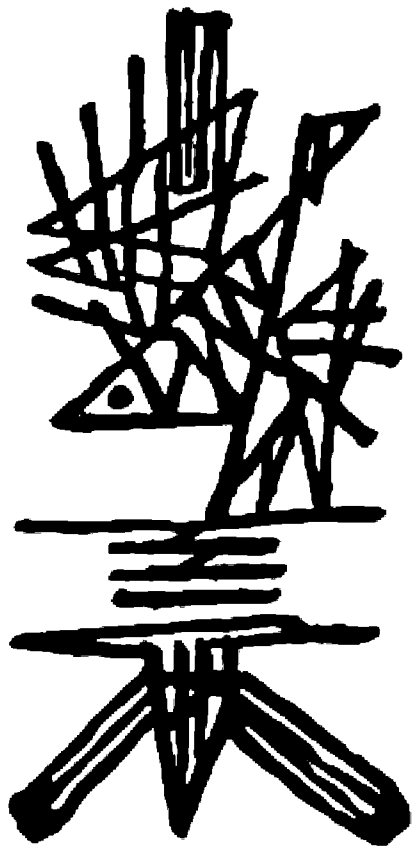

ARTS & PRINTS PVT. LTD.
31 PARK MANSION
CALCUTTA-16

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	বিহার প্রহেলিকা	...	সম্পাদকীয়	...	২২৫
২।	প্রসঙ্গক্রমে	...	শ্রীচাঁদ	...	২২৭
৩।	ত্রিপাক্ষিক চুক্তি	...	রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক	...	২৩০
৪।	জাতীয় শিক্ষক সূর্যসেন	...	ডঃ আশা দাস	...	২৩১
৫।	নানা রঙের দিনগুলি	...	রসময় সূর	...	২৩৩
৬।	স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	...	নিকুঞ্জ সেন	...	২৩৪
৭।	অনুবাদ সাহিত্য	...	অতুলচক্রবর্ত্তী	...	২৩৬
৮।	মূল্যবৃদ্ধি ও আমরা	...	ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত	...	২৩৮
৯।	গ্রন্থ সমালোচনা	...	গুলাগ আর্কিপেলেগো	...	২৪১
১০।	নিশানা (কবিতা)	...	কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	২৪৯
১১।	চিন্তাজগতে শোষণ ও প্রতিকারের উপায়	...	'অনামী'	...	২৪৫
১২।	মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ	...	অংশুমান	...	২৫১

সম্পাদকমণ্ডলী:

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ সুতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী

পড়ুন!

"ক্রীড়াঞ্জলি"

—অধ্যাপক অমলকুমার মিত্র,
প্রখ্যাত ক্রীড়া সাহিত্যিক।
অসংখ্য চিত্রে সুশোভিত সংস্করণ।
মূল্য ৫৲ টাকা।

প্রকাশক : সুকেশী প্রকাশণী,
৯-১০, রামনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা।

'নিশানার' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যগণকে প্রতিমাসে দুটী পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৌলিক ও সংযোজিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হয়ে। বক্তব্য বিষয় স্পষ্ট ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কোন অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্জন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ECONOMIC AFFAIRS

INDIA'S PREMIER ENGLISH ECONOMIC MONTHLY

Now on its 17th year of continuous publication

Editor HIMANSU ROY

Deals with advanced economic theory and topical economic problems. Discussion of India's planned economy is its primary objective. Read throughout the world.

Subscription :

Annual : Inland Rs. 20·00

Foreign US $ 6·00

For further information

Manager

ECONOMIC AFFAIRS

10, Gariff Street, Block-5,

Suite-64 Calcutta-700003

CENTRAL LIBRARY

নিশানা

১লা বৈশাখ, ১৩৮০ : ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

বিহার প্রহেলিকা

গুজরাটের আগুন নিভতে না নিভতে বিহারের দাবানল জ্বলে উঠলো। দুই রাজ্যে মূল সমস্যা অভিন্ন, সমস্যা সমাধানের নির্বাচিত পথ-ও অভিন্ন ; এবং উভয় রাজ্যেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পুরোধা অভিযাত্রী জনপ্রিয় নির্দলীয় ছাত্রছাত্রী এবং তরুণ তরুণী।

দেশব্যাপী ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধি অপ্রতিহত ; অন্ন-বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ; কর্মসংস্থানের অভাবনীয় সংকোচন ; এবং ক্রম-বর্দ্ধমান বেকারের হাহাকার এক দিকে এবং অপর দিকে অন্যায় অত্যাচার চোরাকারবারে নরক গুলজার ; অযোগ্য নষ্ট প্রশাসন এবং নির্লজ্জ আত্মীয়তোষণ প্রভৃতি মিলে একযোগে দরিদ্র জনসাধারণকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

ক্ষমতামাতাল দলের কাছে ক্ষমতা ভোগদখলের চাইতে মহত্তর কোন আদর্শ নেই। ক্ষমতায় আরোহনের কাজে নষ্টামি, ছল-চাতুরী ধোঁকাবাজি খুনোখুনি বা নোংরামি অবলম্বনে দ্বিধা নেই ; বিবেকের দংশন নেই ! গদী দখলেও যেমন, গদী আঁকড়ে থাকতেও তেমনি কোন নীতি-ধর্মের বালাই নেই। দল উপদল কোন্দল এ দুর্নীতির সহজাত বিষ-ফল ! এ বিষ-ফলের বিষক্রিয়ায় সারা ভারত আজ বিষাক্ত।

বিহার অভ্যুত্থানের মোকাবিলা করতে গিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আচরণ অনুধাবন করলে দেখা যায় গুজরাটের শিক্ষা ক্ষমতাসীন দলের পক্ষে কোন কাজেই লাগেনি। জনসাধারণের বুভুক্ষা বুলেটের সাহায্যে এবং দলীয় কোন্দল লাভের বখরা বিতরণের সাহায্যে শুদ্ধ করার নীতিই বিহারেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গুজরাটের মত বিহারেও গণবিস্ফোভের পুরোধা ছাত্র ও তরুণ সমাজ। তাদের মুখ্যদাবী হল—

(১) দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত মন্ত্রীদের আদালতে বিচার চাই ;

(২) বিধান সভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রচলন কর ;

(৩) ন্যায়নিষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন বিধান সভা এবং নব মন্ত্রীসভা গঠন কর ; এই ন্যূনতম দাবী সমূহের একটি-ও অনাদায়ী থাকা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এবং উত্তর উত্তর তীব্রতর আকার ধারণ করবে।...এ আন্দোলনের সামনে প্রথম সরকারী প্রতিক্রিয়া অনেকটা লালকাপড় দৃষ্টে ষাঁড়ের মত। কাঁদনে গ্যাস, লাঠি, ব্যাপকেট বুলেট-এর যথেচ্ছ ব্যবহার করে, মুহু কলেজ বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ করে, গণ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রকে স্তব্ধ করার যাবতীয় বিভীষিকা পন্থা স্বভাবতই ব্যর্থ হল। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার এ বিস্ফোভের জন্য একবাক্যে অধমৃত বিরোধী দলগুলোকে অথবা দায়ী করতে লাগলেন। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী ভাল ভাবেই জানেন, যথা গুজরাট তথা বিহারে, সংগ্রামী ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়, কি শাসক পক্ষ আর কি সাংবিধানিক বিরোধীপক্ষ, উভয়কেই আন্দোলনের সংস্পর্শ থেকে শতহস্ত দূরে রেখেছে।...তাতে কি হবে ? বাস্তব হোক বা কাল্পনিক হোক, একটা শত্রুর প্রতি অঙ্গুলি সংকেত তো করতেই হবে। তদুপরি কংগ্রেসী দিবা দৃষ্টিতে একটা ষ্যাসিবাদের সূচনাও ধরা পড়েছে ! ইন্দিরা-সরকারের দৃষ্টিতে যে-ই কংগ্রেসের সঙ্গে নেই সেই তার শত্রু। সম্প্রতি সংঘের নেতা শ্রীজয়প্রকাশকে নিয়ে-ও এই নীতিরই চূড়ান্ত প্রয়োগ দেখা গেল। শ্রীমতী গান্ধী ও জয়প্রকাশ নারায়ণের মধ্যে কাদা ছোঁড়াছুড়িও বেশ খানিকটা হয়ে গেল। উভয়ে উভয়কে গলা ফাটিয়ে 'নষ্ট' বলতে লাগলেন। অবশেষে বিহার গণ আন্দোলনের পুরোভাগে শ্রীনারায়ণকে দেখা গেল।...শ্রীনারায়ণ কিন্তু বিক্ষোভকারীদেরকে হাত মুখ বেঁধে নিতে বলেন নি। তারপরই নিভৃতে একটা আপোষ রফার ভাব চলে আসছে যেন, কখনও নরম কখনও গরম নিষ্ফল প্রয়াস বিনিময় হচ্ছে। অপরদিকে আপাতত এক ঢিলে দুই পাখি মারার ফন্দিই বিহারে শাসক চক্রের নীতি হিসেবে অবলম্বিত হল। (১) স্বেচ্ছা-ইস্তফার নাটকীয় অভিনয় অনুষ্ঠিত হল—দৃশ্যতঃ প্রকট হল নষ্ট চরিত্র মন্ত্রীদের ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন মন্ত্রী সভা গঠনের শুভেচ্ছা ; সঙ্গে সঙ্গে বলে রাখা হলো, বিধান সভা ভেঙ্গে দেওয়ার কথাই ওঠেনা ! নতুন নির্বাচনের কথা ছাড় ! সেই গুজরাট গণ-বিস্ফোভ মোকাবেলার সুর !

(২) অপর দিকে নষ্টামির নাভিকেন্দ্রকে আশ্বাস দেয়া হল, ভয় নেই, 'পূতচরিত্র' মন্ত্রীদের প্রতি কোন দোষারোপ প্রতিফলন রাখার অভিপ্রায় এই পাইকারী পদত্যাগের নির্দেশের মধ্যে নেই। এ-পদত্যাগ ব্রত উদযাপন স্বেচ্ছায়

সানন্দে, নিছক কেন্দ্র ও রাজ্যের হিত কামনায়, অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিদায়ী শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবিদ্যাকর কবি নেহাৎ রসভঙ্গ করে বেফাঁস করলেন, তিনি "কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের ইচ্ছার প্রতি নতিস্বীকার" করেই মন্ত্রীসভা থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।···ইত্যাদি ইত্যাদি। বেচারা মুখ্যমন্ত্রী জনাব গফুরের অবস্থাটাই হয়ে দাঁড়াল বস্তুতই করুণ! ৪৫ জন মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র পকেটে নিয়ে আদিষ্ট ১৪ জন মন্ত্রীর মন্ত্রীসভা তাঁকে ঘোষণা করতে হল। তার মধ্যে দুজন মন্ত্রী ফেরার হলেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাঁদের খুঁজে পাওয়া গেল না।···জনাব গফুরের পেছনে বুদ্ধিদানের ভার নিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী এল এন মিশ্র স্বয়ং। এক উপদলের বিরুদ্ধে অপর উপদলের ভারসাম্য রক্ষা করে তিনি বিহার এবং পাটনা উভয়কে প্রায় হতবাক করে দিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলনা; জগজীবন-পুত্র সুরেশকুমার এবং আপন ভ্রাতা জগন্নাথ মিশ্রকে নতুন মন্ত্রী সভায় বিভিন্ন কারণে ঠাঁই করে দিয়েই বিপাকে পড়ে গেলেন শ্রীমিশ্র। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম প্রকাশ্য বিবৃতিতে ঘোষণা করলেন পিতার অনুমোদন না নিয়ে পুত্রকে মন্ত্রীসভায় নেয়াতে তাঁর মানহানি হয়েছে। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সভা তাঁকে শান্ত করতে উঠে পড়ে লাগলো। 'নাবালক' সুরেশকুমার মন্ত্রীসভার আসন প্রত্যাখ্যান করলেন। বলাই বাহুল্য মন্ত্রীসভার ঠাস গাঁথুনী শিথিল হয়ে পড়ল। সব চাইতে বড় কথা, বিহারের সমস্যা সরাসরি দিল্লীর সমস্যায় পরিণত হবার উপক্রম। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বৈঠকে প্যাণ্ডোরার বাক্স (Pandoras Box) উন্মুক্ত হল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার একযোগে অহী নকুলের স্থানসঙ্কুলান কঠিন হবে। পরবর্তী পরিস্থিতি সম্বন্ধে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু স্মরণ রাখলেই হবে যে অদন্তষ্ট কংগ্রেস উপদলগুলো বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহার বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার ভয়ও দেখাচ্ছে। গুজরাটের পুনরাবৃত্তিই বলতে হয়। কংগ্রেস এম-এল-এ ও এম পি-রা সর্বত্র পদত্যাগের দাবীতে ঘেরাও হচ্ছেন। গয়া তো Direct Action এর চরম পত্র দিয়েছে।

সে যাই হোক, এরই মধ্যে বিহার মন্ত্রীসভায় নতুন মন্ত্রীর যোগদান এবং অনুসন্ধান জরুরী হয়ে পড়েছে, যদিও কিছুদিন পূর্বে জঃ গফুর হুমকি দিয়েছিলেন, তার মন্ত্রীসভা কিছুতেই সম্প্রসারিত হবে না। মন্ত্রী সংখ্যা আবার ৪৬-এ পরিণত হলেও কি কংগ্রেসের আভ্যন্তরীন সমস্যা বা বঞ্চিত-পীড়িত জনসাধারণের সমস্যা মিটবে? বলা শক্ত। শাসক দলের আভ্যন্তরীন ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে, শাসকচক্রের আজ যিনি ভিন্নমত পোষক, কাল তিনি মন্ত্রী; আবার নতুন ভিন্নমতাবলম্বীর আবির্ভাব পর দিনই সূচিত হচ্ছে। এ বলয়গতি আজ শাসক কংগ্রেসের প্রাণতন্ত্রীর স্থান দখল করেছে। ব্যক্তি এবং দলগত স্বার্থসাধন ছাড়া আর কোন প্রেরণা নেই এ ডাঙ্গা গড়ার জন্যে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শাসকদল নিজেকে নিয়ে এমন বিব্রত বিপন্ন হয়ে পড়েছেন যে, জনসাধারনের কল্যাণ চিন্তাও তার পক্ষে অবান্তর। তাই কারণে অকারণে সৈন্য বাহিনী, বি এস এফ, সি আর পি আজ তাদের একমাত্র সম্বল। ইন্দিরা সরকারের মত এত নিষ্ঠুর গণহত্যার কাজে এদেরকে পূর্ববর্তী কোন সরকার প্রয়োগ করেনি। ক্ষমতা মাতালের দল এটা ভুলেই গেছে, সৈন্যসামন্তও জনসাধারণেই সন্তান। এদের যথেচ্ছ প্রয়োগ নিরাপদ নয়। শ্রীজগজীবনরাম ইত্যবসরে ঘোষনা করেছেন ভারতে সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের কোন সম্ভাবনা-ই নেই। কোন তথ্যের ওপর নির্ভর করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীমহোদয় এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, বলা শক্ত। কিন্তু ইতিহাসের নজির অন্য কথাই বলে।

যা হোক, বিহার গণঅভ্যুত্থানের দাবীগুলি স্পষ্ট এবং আন্দোলনের ধারা-ও কৃতসংকল্প। গুজরাটের উদাহরণ-ও তাদের চোখের সামনে। বিহার বিধানসভা ভেঙ্গে না দিয়ে শাসকচক্র রেহাই পাবেন বলে মনে হয় না। তা ছাড়া মূল সমস্যাটি গুজরাট এবং বিহারের মধ্যে-ও সীমাবদ্ধ নয়। মহারাষ্ট্রে নায়েক মন্ত্রীসভা এবং মধ্যপ্রদেশের সেঠি মন্ত্রীসভার নাভিশ্বাস দেখা যাচ্ছে, নিছক আভ্যন্তরীন কারনেই। উত্তরপ্রদেশও উঁচু গিরিচূড়ার সঙ্কটজনক প্রান্তের দিকে ধাবমান। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড-ও একটু মতিচ্ছন্ন ভাব দেখাচ্ছেন। সর্বাত্মক নষ্টামি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্য বিরোধীদেরকে দায়ী করে এসেছেন তাঁরা এতদিন। সম্প্রতি উমাশঙ্কর দীক্ষিতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পার্লামেন্টারী ভাষনে বিরোধী দলসমূহের অপ-রাধের তালিকা অনেক হালকা করে ফেলেছেন। এমন কি তাদের কাছে সহযোগিতা কামনা-ও করেছেন। শ্রীমতী গান্ধী অবশ্য বলেছেন, জাতীয় সরকার কিছুতেই গঠন করা হবে না। অন্ততম সেরা বামপন্থীদল তো কংগ্রেসের তল্পি বহনেই আত্মনিয়োগ করেছে। বিহারে তাঁরা বিধানসভা ভেঙ্গে দেবার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে গেছেন। এর একটা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অচিরে পাওয়া যাবে হয়ত।

কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠিত (দিল্লী, ২৭।৪।৭৪) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাবে "যত দোষ নন্দঘোষ" বলে কাল্পনিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসী বীর পুরুষদের আহ্বান করা হয়েছে। যদিও "অভাবিত মূল্য বৃদ্ধি," "মুদ্রামূল্য হ্রাসের বিরামহীন চাপ," "শিল্পোন্নয়নে অচলাবস্থা" এবং" উৎপাদনা-ভাবে ভোগ্যবস্তুর সর্বাত্মক আকাল"···এসব কথাই করুণ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তবু সমাধানের প্রধান পদক্ষেপ ফ্যাসী বিরোধী অভিযানেই নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী ফ্যাসীবাদকে ঢাকবার জন্যই কি এ বুনো হাঁস

তাড়ান? কংগ্রেসী-ফ্যাসিবাদকে আরো মিলিটেন্ট করতে হলে তো এ অপপ্রচারই প্রকৃষ্ট পন্থা। একটা মিথ্যা অবিরাম প্রচার করলে সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। এটাও ফ্যাসিবাদের ধ্রুব বিশ্বাস। কিন্তু মানুষের পেটের জ্বালা বেকারির জ্বালা, দুঃশাসনের জ্বালা, নষ্টামির জ্বালা, অযোগ্যতার জ্বালা জ্বালাতে কি আর উসকানির প্রয়োজন থাকে? আপন সার্বিক ব্যর্থতার মুখে নির্লজ্জ যুক্তির মিথ্যা অবতারনা হচ্ছে—যথা কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটলে, বিকল্প সরকার গঠন করবে কে? "তুমি বিদায় হও, তোমার চাইতে অরাজকতাও শ্রেয়" এটাই আজ গণ-আন্দোলনের-ও প্রত্যুত্তর। দেউলিয়া শোষকের শাসন বরদাস্ত করার চাইতে বড় অন্যায় আর কিছু আছে কি? বাঁচার দায়ে সে গণঅভ্যুত্থান ও গণসংগঠন এ দুঃশাসনের পতন ঘটাবে, তাই গণস্বার্থে গণশাসন রচনা করবে। এটা ইতিহাসেরই অমোঘ বাণী। সুতরাং প্রশাসনিক বাতাকলের চাপে বিহারের গণবাদীকে রুদ্ধ করা যাবে না, বরং যাবে শুধু সর্বভারতীয় গণঅভ্যুত্থানের দিন ক্ষণ ত্বরান্বিত করা। এটাই আজ দেওয়ালের লিখন। ক্ষমতামাতালের ঘোলাটে দৃষ্টিতে সেটা সময় থাকতে ধরা পড়বে কি?

নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি জানাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন উন্নতিশীল দেশগুলোকে শুষে খাচ্ছে। এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ, ১৯৬০-৭২ সালে সে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে সমমূল্য না দিয়ে ৬০০০ ডলার মূল্যের রবার, নন-ফেরাস ধাতু ও খাদ্যদ্রব্য লুট করে নিয়েছে। আরো প্রকাশ, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দানের নামে সে অকেজো যন্ত্রপাতি ও অস্ত্র-শস্ত্র বিক্রী করে উন্নতিশীল দেশগুলোকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েত সামরিক পত্রিকা Vnesh-nyaia Torgovlia থেকে নেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি আরো জানাচ্ছে, বিশ্বের বাজারের দামের তুলনায় দ্বিগুণ এমন কি তিনগুণ দাম বেশি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অনেক পণ্যদ্রব্য ভারত ও ইজিপ্টে বিক্রী করেছে। গত অক্টোবরে ইজরাইলের সঙ্গে আরব দেশগুলোর জীবনমরণ সংঘাতের সুযোগ নিয়ে সে নগদ দামে ও কম দামে তেল পাবার শর্তে তাদের যুদ্ধাস্ত্র বিক্রী করেছে। ইরাণকে সে কিভাবে শোষণ করে যাচ্ছে ও শোষণের পদ্ধতির নমুনা স্বরূপ বলা হয়েছে, ইরাণ থেকে প্রাকৃতিক গ্যাস কিনে সে তা চতুর্গুণ বেশি দামে ইউরোপে বিক্রী করেছে।

চীনের আক্ষেপের কারণ বুঝি। তবে পথতো একই। পথ তৈরি হয়ে রইল। আর সোভিয়েত? নিশ্চয় লেনিন পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে কি ভাবে বাণিজ্য করতে হবে সে সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যেমনটি দিয়ে গেছেন মুনাফা সম্পর্কে। সাদা চোখে যা অপরের ক্ষেত্রে যা শোষণ কমরেডদের সংজ্ঞায় তা রণকৌশল।

প্রসঙ্গ ক্রমে

শ্রীচাঁদ

১৭ই এপ্রিল বিকেল পৌনে ছ'টা। গড়ের মাঠ। দূরে একটা তোরণ ও মনুমেন্টের ধারে কিছু লোক জমায়েত দেখে বিষয়টা জানতে এগিয়ে গেলাম। বেশ দূর থেকে চোখে পড়ল বেশ খরচ করে তৈরী একটি মঞ্চ। মঞ্চের নক্সা দেখে বুঝলাম কংগ্রেস আয়োজিত ব্যাপার। আর ব্যাপারটা শ্রীমতী আলেন্দে ও তদীয়া কন্যাকে নিয়ে। ভালই হল সময়টা কাটবে ভাল।

মঞ্চের উপর উপবিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণের দিকে তাকালাম। কাউকে চেনার কথা নয়। তবে বেশ মাজাঘষা চেহারা-পত্র পোষাক-পরিচ্ছদ সবার। রাজা লোক বোঝা যায়।

শুরু হল। কবিতা আবৃত্তি। মাথা নেড়ে ছন্দের তাল রেখে আবৃত্তিকার রাস্তায় রাস্তায় অনেক শিশুর রক্তপাত ঘটাবার ও নিক্সনের মুণ্ডপাত করার পর যখন ক্ষান্ত হলেন, এলেন এক মহিলা। তিনি সুরু করলেন ইংরেজি গান। একে ইংরেজি ভাল বুঝি না তার ওপর ইংরেজি গান। মাথা চনচন করছে। এদিকে আকাশে টুকরো টুকরো কালো মেঘ দ্রুত একত্র হচ্ছে। হাইকমাণ্ডের নির্দেশে যে কোন মুহূর্তে অতর্কিতে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কি করি ভাবছি। তাকিয়ে দেখি, যারা মাটিতে বসে আছেন পাকাপোক্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই গামছা দিয়ে ঘাম মুছছেন। বুঝলাম, সরে পড়া ভাল।

রওনা হলাম; হঠাৎ ঘোষিত হল, এবার এ অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ

CENTRAL LIBRARY

মিঃ আপনাদের নিকট ভাষণ দেবেন। থমকে দাঁড়ালাম। হালের প্রধান বিচারপতির একী হাল! এ যে দেখছি কালে-ঝোলে অম্বলে। জনসেবা ও জনজ্ঞান দানের কী মর্মান্তিক প্রয়াস! তাকালাম। ভদ্রলোককে যেন চিনি-চিনি। স্বর্গত ডাক্তার নারায়ণ রায়ের কাছে সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত, পরে বিচারপতি। ইনি কি তিনি? ভুলও হতে পারে। আর ওসব মনে রাখা আমার কর্মও নয়। যাকগে। কি বলেন শোনবার জন্য দাঁড়ালাম স্থির হয়ে। বাংলায় ভূমিকা সেরে সুরু করলেন ইংরেজিতে। আবার ইংরেজিতে! বিপদ! আবার চলতে শুরু করলাম। কানে এল প্রধান বিচারপতি বলছেন, পঞ্চান্ন কোটি ভারতবাসী চিলির মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে…।

ভালয়ে ভাল! ১৯৭৪ চলছে; ভারতের লোক সংখ্যা কি কমতির দিকে? হবে। প্রধান বিচারপতির তো কিছু ভুল হবার নয়। হতে পারে তিনি আমাদের মত কড়তি-বাড়তিদের বাদ দিয়ে বলছেন। কিন্তু এই পঞ্চান্ন কোটির পক্ষ হয়ে বিদেশী মহিলাকে মিথ্যা আশ্বাস দেবার অধিকার তিনি পেলেন কোথায়? কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কি এসব জজসাহেবদের সামাজিক দর্শনের প্রতি অতি মানুষত্যের প্রতিক্রিয়া? তাঁরই বক্তৃতায় পেলাম, যাকে আমি হালের বুড়ো ছেলেছোকরা মনে করেছিলাম তিনি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে চিনতে না পারা কী লজ্জার কথা।

এরপর আর দাঁড়ালাম না। আকাশ এ্যাকসনের ইঙ্গিৎ দিচ্ছে ঘন-ঘন। তখনও শ্রমিক সংস্কার মিছিলের পর মিছিল আসছে। একটি মাত্র স্লোগান বন্দেমাতরম!

শ্রীমতী আলেন্দের জন্য "আহা" বোধ না করে পারলাম না। চলতে চলতে হঠাৎ যে কখন দাঁড়িয়ে পড়েছি খেয়াল নেই।

শ্রীমতী আলেন্দের তো লালদের সম্পদ হওয়ার কথা। তবে কি কংগ্রেস বেমালুম লাল বনে গেছে? কংগ্রেস যদি লাল হয় লালরা তবে কি? আর, কংগ্রেসের যদি এটা ধারণা হয় তবে লালরা নীরব কেন? সব লালই কি তবে পেঁয়াজের খোসা, আর কংগ্রেস একটি আস্ত পেঁয়াজ? আর নয়, এবার দ্রুত পা ফেলতে লাগলাম।

• •

ঢাকঢোল পিটিয়ে গমের পাইকারী ব্যবসাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছিল। সমর্থনে যে কটা ভোঁতা যুক্তি সম্ভব তার সব কটাকেই এগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল, এর ফলে আর ধাপে ধাপে নয়, কদমে কদমে দেশ এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের পুরীতে। মজুতদার হবে জব্দ। গরীব কৃষকদের গরীবী হটবে আর ঘরে ঘরে হটোপুটি খাবে গমের প্রাচুর্য!

মজুতদার ইলেকসনের লগ্নিদার। তারা মজুতদ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে বাড়তি মুনাফার বড় অংশটা পার্টি ফেন্ডে আনুপাতিক হারে বণ্টন করে দেয়, বাকীটা আয়কর-মুক্ত পুঁজি হয়ে থাকে। এ লগ্নির প্রাণ সরকারী নীতি; প্রাচুর্য, নীতির দুর্নীতি। ঢাকঢোল বাজাবার শব্দ এমন কানে তালা লাগার মত হয়েছিল যে, মজুতদারদের হাসির লহরী তখন জনগণের কানে এসে পৌঁছায়নি। শুদ্ধ চেতনা নিয়ে জনগণ যখন মুহূর্ত গুনছিল, প্রকাশ পেল রাষ্ট্রায়ত্তের সঙ্গে বাজার দামের রয়েছে অপূর্ব মিতালী! গমের দাম খোলা বাজারে ছিল ৭৫ টাকা কুইন্টাল, নিমেষে হল ১০০ টাকা কুইন্টাল। তাও মাথা খুঁড়তে হল মজুতদারের পারে ও দরে গম পেতে। এদিকে সরকারের গুদামে গম আর উঠছে না। বিপরীত ফল দেখে (জানাই ছিল) সরকার তো হতবাক (প্রস্তুতিই ক্রমে?)!

সঙ্গে সঙ্গে আবার ঢাকঢোল। এবার যেন দামাম। কে বলে সমাজতন্ত্র যেতে চলেছে। গম নীতির পরিবর্তন রণকৌশল মাত্র। নীতির বিচ্যুতি ঘটেনি, ঘটেছে পদ্ধতির পরিবর্তন। পুলিসী কায়দায় হাত পাকান অর্থমন্ত্রী সগর্জনে জানালেন। বললেন সরকারী এজেন্সি দিয়ে গম সংগ্রহ চলে না, যোগ্যতার বালাই নেই এর। তেমনি হয়েছে প্রশাসনিক যোগ্যতা! শ্রীমার অর্থনীতি বোঝেন। কারণ তিনি পরিকল্পনা মন্ত্রী। তিনি বিজ্ঞের মত জানালেন, গমনীতির বানচালের পেছনে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতির চাপ। পঞ্চম পরিকল্পনা যে কিসের চাপে পড়েছে এবার তা বুঝতে শক্ত হয় না। সার মহাশয়, নিবেদন করি মুদ্রাস্ফীতির চাপ কি একদিনের ঘটনা? অবশ্য মুদ্রাস্ফীতির চাপ গরীবের উপর। দায়মহাশয়ের কাজ তো তা চেপে যাওয়া!

কমরেডদের গবেষণার ফল কিন্তু পৃথক। এ নিছক Kulak-দের কাছে আত্মসমর্পণ! লেনিনকেও যে একদা এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল! কমরেডগণ, ধীরে!

• •

অল-ইণ্ডিয়া কুডগ্রেণ ডিলার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সরকারকে ভাবনামুক্ত করে বলছেন, প্রায় ১০ লক্ষ টন গম বাজারে আসছে। কোথায় ছিল? কেন, কৃষকদের ঘরে। [কৃষকদের ঘর মজুতদারদের বেনামা আড়ত বলে মনে করার কারণ নেই!] কেন ধরে রেখেছিল? ৭৫—১০০ টাকার কুইন্টালে বাজারে গম বিক্রী হয় না, মজুত হয়। নতুন রপ্তার পাইকার তার "হৃত অধিকার" ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছে। আরো খুশি হবে সে যদি খুচরো বাজারে ১৬০ টাকা কুইন্টাল

দরে বিক্রী করতে পারে। অবশ্য লেভিসরূপ সে তার কোন গমের অর্ধেক ১০৫ টাকা কুইন্টাল দরে সরকারকে দেবে। তবে কতটা পরিমাণ গম তারা সংগ্রহ করতে পারবে সে সম্পর্কে কিছু বলতে তারা অসমর্থ। সরকার যদি মনে করে থাকে বা জনগণকে বলে থাকে পাঞ্জাবরাগণ ৫০-৬০ লক্ষ টন গম সংগ্রহ করবে তবে সে ভুল করেছে বা ঠিক বলছে না!

ভেবেছিলাম, এসব মাটি খুঁড়তে কেঁচো। কিন্তু এ যে দেখছি স্বয়ং বিরলাজী! অনেকদিন এঁদের খবরপত্তর না পাওয়াতে ধারণা হয়েছিল এঁরা সব সমাজতন্ত্রের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। সন্দেহ একটা ছিল কেন গান্ধীজীর স্নেহধন্য, নেহরুজীর স্নেহপুষ্ট বিরলাজীকে নেহেরুজীর কন্যা একান্ত ভাবে প্রত্যাখান করবেন ইতিহাসতো এমনটি লেখে না। সন্দেহের কারণ তবে অমূলক নয়।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সে মিঃ জি ডি বিরলা তাঁর ৪৫ মিনিট ভাষণে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশন করে গেছেন। তিনি একজন "প্র্যাকটিক্যাল ম্যান"—অর্থনীতির ধার ধারেন, অর্থনীতিবিদদের নয়। তাঁর অর্থনীতি বুঝতে হলে তাঁর সমাজ দর্শন বুঝতে হয়। তাঁর মতে, দাম বাড়াও, লোকে খেয়েপরে বাঁচবে। দাম কমালে জিনিসপত্র না পেয়ে না খেয়ে মরবে। যেমন, গমের দাম বেড়েছে, গমের আর অভাব হবে না বাজারে।

যে কথা কাজের কথা সে কথা দিল্লী এখন স্নায়ুতন্ত্ররোগে ভুগছে, কোন কিছুতেই কোন স্থির নির্দেশ নিতে পারছে না। তাঁর কাছে আরো খবর, দিল্লীর চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটছে। এবার ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসতে হবে, হস্তোত্তম হলে, চলবে না। সমাজের পরিবর্তন ঘটবে। তাঁর উক্তি। উচ্ছ্বাসে তিনি বলে ফেলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী একটি মূল্যবান প্রস্তাব করেছেন, ধর্মঘট ও তালাবন্ধের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে।

ব্যবসায়ীগণ যে হতোদ্যম হননি তার কারণ তাঁর পরিচয় তাঁদের সংস্থাগুলোর প্রধানদের ভাষণের উদ্দীপনা। অপরদিকে কেন্দ্রের শিল্প মন্ত্রীর নতুন মূল্যনীতি ঘোষনার কথা ও ডাঃ কিসিঞ্জারের যে মাসে ভারত আগমন অর্থপূর্ণ।

বিরলাজী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে কেন দলে টানলেন বোঝা যাচ্ছে না। গদিতে বসাবার জন্য না গদিচ্যুত করার জন্য?

পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হাওয়া বুঝে হাওয়া হন। বিরলাজী যখন বুঝেছেন তখন তিনিও নিশ্চয়ই বুঝেছেন দিল্লীর হাওয়া কোন দিকে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের দুর্দশার কারণ যে তিনি নন দিল্লী, দিল্লীর যে একটা হিল্লে হতে যাচ্ছে বুঝে তিনি দ্রুত বলতে শুরু করছেন, সব লুটেপুটে নিল মহারাষ্ট্র। ১৯৭৩ সালে মহারাষ্ট্রকে দেওয়া হয়েছে ১৭১টি শিল্প লাইসেন্স, পশ্চিমবঙ্গ পেয়েছে মাত্র ৪১টি।

অবশ্য তার যোগ্যতার গুণে।

কেন্দ্রের শিল্প উন্নয়ন মন্ত্রীর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি অসীম অবজ্ঞা সর্বজনবিদিত। তাঁকে শায়েস্তা করার মত চারিত্রিক বল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আছে বলে তাঁর স্তাবক গোষ্ঠীও দাবি করেন না। বাকী ইন্দিরাজী। তাঁর মেজাজ? সে যে সর্বজ্ঞও জানেন না!

বিরলাজীর হাতে যদি সব শিল্প ও শিল্প প্রসারের লাইসেন্স তুলে দেওয়া যায় তবে কি বলা চলবে তিনি একচেটিয়া কাইকারবার চালাচ্ছেন? না,মোটেও না ব্যবসায়ীদের উচিত ধ্বনি সমর্থন জানান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। তবে মুখ্যমন্ত্রীর মতে অসৎ ব্যবসায়ীদের বাদ দিয়ে ব্যবস্থা করতে হবে।

এ জন্য কুমারটুলীর আশ্রয় নিতে হবে। অবশ্য স্বয়ং, মুখ্যমন্ত্রী যদি ব্যবসায় নামেন, সে স্বতন্ত্রকথা?

বন্ধুবর শ্রীজ্যোতিবসু মহাশয় কিন্তু আবার যুক্তফ্রন্ট সংগঠনের ব্যবসায় নেবেছেন। এবার কেবল পশ্চিমবঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে নয়, গোটা ভারত কে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার সর্বভারতীয় অভিযান।

তা বেশ হল। পঞ্চাশবছর তো পেরিয়ে গেল আর কত পঞ্চাশ শেষে ভারতের "লাল বিপ্লব" নিজের চুপায়ে দাঁড়াবে?

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক

মহাসমারোহে মহানগরী দিল্লীতে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল (৯ই এপ্রিল, ১৯৭৩)। এ চুক্তির বলে—

১) অভিযুক্ত বিচারাধীন ১৯৫ জনও বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন; অপরাপর যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবেন,

২) বাংলাদেশে অবস্থিত অন্তর্ন ৪ লক্ষ অবাংলাদেশীয় পাক নাগরিকদের মধ্যে কতজন পাকিস্তানে নীত হবেন সেটা কার্যতঃ পাকিস্তানের দাক্ষিন্যের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে; এবং ওটা পাক-বাংলাদেশ-এর দ্বিপাক্ষিক একতিয়ারের বিষয়ে পরিণত হল;

৩) ভবিষ্যতে তিনদেশের কূট-নৈতিক বিনিময় দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত হবে।

৪) যাবতীয় অমিমাংসিত বিষয় সমূহ দ্বিপাক্ষিক আলাপ—আলোচনা সাপেক্ষ সাব্যস্ত হল।

এ চুক্তি সম্পাদনে যদি কিছু লাভ হয়ে থাকে, তাহলে তার সব-টুকুই পাকিস্তানের হস্তগত। কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশ কি লাভ করলো এ প্রশ্ন তুললেই মুশকিলে পড়তে হয়। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে দেরী হয় না, এ দুই দেশের যুদ্ধোত্তর দাবীগুলো একে একে সবই ভেস্তে গেছে। "আত্মিক" জয়ের কথাটা স্বতন্ত্র। এ চুক্তির বয়ানের মধ্যে একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে একটি গালভরা কথা—"উপমহাদেশের স্থায়ীশান্তির উদ্দেশে"। এ নাম মাহাত্ম্যের বা নামোচ্চারণের বেশি বাস্তব কোন দাবী ভারত বা বাংলাদেশ আদায় করতে পারে নি।

চুক্তি শেষে মিঃ আজিজ আহমেদের আনন্দোচ্ছাসের কারণ পাওয়া কঠিন নয়, কিন্তু বৃদ্ধ স্বর্ণসিংহ এবং তরুণ কামাল হুসেনের নাটকীয় উল্লাসের মধ্যে নাটকের বেশি পদার্থ ছিল না।...উপমহাদেশের ৭০ কোটি মানুষের নিরচ্ছিন্ন শান্তির জিগির তোলার অধিকার এত উল্লাসের কারণ হলে বলতেই হবে "We pay too much for the whistle," শান্তি প্রগতির উদ্দেশ্য মহৎ বটে! কিন্তু এ ফাঁকা উদ্দেশ্য উচ্চারণ করতে এত দিন বাধাটা কি ছিল? বিচারাধীন ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর প্রশ্নটি কি? এ-উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় দেখা যাচ্ছে ত্রিপাক্ষিক মাধ্যমের পরিবর্তে দ্বিপাক্ষিক মাধ্যমের অবলম্বন।

যদি বলা যায় উপমহাদেশের শান্তি কামনার পূর্বে পারস্পরিক সংগ্রামের মনোভাব পরিহার আবশ্যিক, তাহলে তো স্বীকার করতেই হয়, সিমলা চুক্তি (২রা জুলাই, ১৯৭২) সে অভিপ্রায় দু বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছিল যে "সংগ্রাম ও বিরোধীতার নীতি বর্জনীয়।" বাকী যা ছিল তা হল বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, এবং তারই প্রতিভূ স্বরূপ ৯০ হাজার পাক যুদ্ধবন্দী ভারতে আটক ছিলেন, যাদের রাহা খরচ-ই পৌঁছে গেছে ৪৫ কোটি টাকার অঙ্কে। পাক-ভারতের যাবতীয় বিরোধ মিমাংসার উপায় স্বরূপ দ্বিপাক্ষিক আলাপ আলোচনার কথাও সিমলা চুক্তিতেই স্বীকৃত হয়েছিল। বলা বাহুল্য পাক প্রেসিডেন্ট ২ দিনের জন্যও এ সত্যের মর্যাদা রক্ষার বালাই রাখেন নি। যুদ্ধ বন্দী এবং বন্দীর বিচারের প্রশ্নে একা-ধারে তিনি হেগ-কোর্ট, ইউ-এন-ও বৈঠক প্রভৃতির দ্বারস্থ হয়েছেন এবং অনবরত ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার এবং বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে তিন মহাদেশ মন্থন করে বেড়িয়েছেন। বন্দীমুক্তির প্রশ্নে ভারতের জবাব ছিল : বাংলা-ভারত যুক্ত কমাণ্ডের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছেন, ভারত একতরফা তাদের মুক্তি দিতে পারে না; কাজেই ত্রি-পাক্ষিক আলোচনা অপরিহার্য। এবং সে হেতুই বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ও অবশ্য কর্তব্য। তার পূর্বে বন্দী-মুক্তির কথাই ওঠে না। কিন্তু সে কথা-ও উঠলো বারম্বার। এবং বন্দীমুক্তির পূর্ব-শর্ত হিসেবে বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবী মিঃ ভুট্টো একবারও স্বীকার করেন নি।

বেকায়দায় পড়ে, ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক আপন উদ্ভাবনী শক্তির চরম প্রয়োগে আবিষ্কার করলেন দারুণ এক "মানবতার প্রশ্ন!" আর যায় কোথা! ভারত-বাংলাদেশ-এর দিল্লী বৈঠকে (১৭ই এপ্রিল, ১৯৭২) স্থির হল যে নবা-বিষ্কৃত "মানবতার প্রশ্নটি" যে ঔদার্যের দাবী রাখে তার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা-দেশের স্বীকৃতি গৌণ ব্যাপার বলে ধর্তব্য। কাজেই মানবতার নামাবলী পরে দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিতে আর দেরী হল না। ভারত-বাংলাদেশ যুক্ত প্রস্তাব তৈরী হল এবং পাক-সরকারের কাছে পেশ করা হল, যার প্রধান শর্তাবলী হল—

১) বিচারাধীন যুদ্ধাপরাধী ১৯৫ বন্দী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দী এবং অসামরিক অন্তরীন বন্দীদের পাকি-স্তানে অবস্থিত বাংলাদেশী এবং বাংলা-দেশে অবস্থিত পাকনাগরিকদের ত্রিমুখী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন;

২) ১৮ই এপ্রিল (১৯৭৩)-এর পাইকারী প্রস্তাবের অঙ্গ হিসেবে দুই সরকার (ভারত ও বাংলাদেশ) আপন আপন দেশের দাবী সমূহকে কোন ভাবে ক্ষুণ্ন না করে যাবতীয় "মানবতা সুলভ সমস্যাবলীর" আশু সমাধানে তৎপর হতে প্রস্তুত।

৩) বাংলাদেশের স্বীকৃতিদানে পাকিস্তানী বার্থতার কথা সংখেদে এবং

(২৪৮ পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

জাতীয় শিক্ষক সূর্য্যসেন

ডঃ আশা দাস

আদর্শ শিক্ষক যিনি তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে একাধারে সহৃদয় বন্ধু, কল্যাণকামী উপদেষ্টা, সুযোগ্য পথ-প্রদর্শক। সততা ও ন্যায়নীতি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা তাঁর সমস্ত কর্ম্মকে নিয়ন্ত্রিত করে। গণমনের উপর নিজের কল্যাণকারী প্রভাব বিস্তার করে ছাত্রসমাজকে তিনি সুপথে পরিচালনা করেন। ছাত্রদের কাছে তিনি পিতৃকল্প বা পিতার প্রতিনিধি। মানবিক সহৃদয়তা ও সংবেদনশীলতার মনোভাব তাঁকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। তিনি একাধারে অধিনায়ক, রূপকার, পরিচালক ও সংগঠক। প্রগতিশীল ও দ্রুত সঞ্চারী দৃষ্টিভঙ্গী আর প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব তাঁকে অনন্য স্বাতন্ত্র্য দান করে। দৃঢ়তা আর নমনীয়তার সংমিশ্রণে তাঁর কর্তৃত্ব পরিচালিত। তাঁর মনোভাব উদার ও নিরপেক্ষ, তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বিচার বুদ্ধি সজাগ ও সতর্ক; অফুরন্ত ভালবাসা, সহযোগিতা ও মমতা তাঁকে সুসমঞ্জস ব্যক্তিসত্তার অধিকারী করে তোলে। নিঃসন্দেহে এই মহৎ গুণাবলী যে ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করে তিনি সর্বজন নমস্য। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে খুব কম শিক্ষকের মাঝেই তার সর্বাঙ্গীন বিকাশ দেখা যায়। শিক্ষক সূর্যসেন সেই বিরল দৃষ্টান্তদের মাঝেই একজন। কিন্তু তিনি তো কোন বিদ্যালয় বিশেষের গুটিকয়েক ছাত্রের পেশাদার শিক্ষক নন, কোন শিক্ষক শিক্ষায়তনের সৃষ্টিও তিনি নন। তিনি জন্মগত শিক্ষক, কিন্তু কেবল মনের রূপকার নন, বিপ্লবেরও রূপকার। দ্বিশতবর্ষব্যাপী পরাধীনতার মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন জাতিকে এই অগ্নিপূজারী শিক্ষক বিপ্লবের রক্তক্ষরা পথে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বিপ্লবীদের জীবনে তিনি ছিলেন স্নেহময়তা ও ভালবাসার প্রতিমূর্তি। প্রত্যেক কর্মীর প্রকৃতি, স্বভাবজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা, রুচি, সামর্থ্য ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বৈপ্লবিক কর্ম বণ্টন করতেন। সব রকমের ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরিহার করে তিনি অতন্দ্র প্রহরীর মত স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। বিপ্লবের যে হোমাগ্নি শিখা তিনি প্রজ্বলিত করেন 'জীবনে জীবন যোগ করে' তার প্রসারের পথও তিনি রচনা করেন। সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে তাঁর শাসন ও নেতৃত্ব অনুগামীদের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মনিয়ন্ত্রণে রূপান্তরিত হয়। নির্দ্দেশনা ও পরিকল্পনার পথে তিনি একটি মহান বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং দেশের স্বাধীনতাকামী যুবসম্প্রদায়ের জলন্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা প্রদান করেন। তাঁর এই ভূমিকা তাঁকে অবিসংবাদিত-রূপে জাতীয় শিক্ষকের গৌরবোজ্জ্বল আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কেন সূর্যসেন জাতীয় শিক্ষক অভিধায় চিহ্নিত হলেন তা বুঝতে হলে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশের উপর আলোকপাত দরকার। ভারতের মুক্তিসংগ্রাম তখন দ্বিমুখী ধারায় বয়ে চলেছে—একদিকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন, অন্যদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সশস্ত্র আক্রমণ। ১৯২২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী : চৌরিচৌরায় কংগ্রেসের এক শোভাযাত্রার উপর পুলিশ বাধা দেয়, জনগণ পুলিশের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, পরিণতি সহিংসরূপ নেয়। অহিংসার পূজারী মহাত্মাজী বিচলিত হয়ে আন্দোলন বন্ধ করে দেন। ক্রমশঃ কংগ্রেসী আন্দোলনের দীর্ঘসূত্রতা এবং সহিংস আন্দোলনের প্রতি গান্ধীজীর অত্যধিক স্পর্শকাতরতা দেশের যুবসম্প্রদায়কে হতাশ করে তুলছিল। আবার ১৯৩০ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক আন্দোলনও ছিল কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান ব্যক্তিগত শৌর্য্যবীর্যের পরিচয় দিয়ে শাসক গোষ্ঠীর মনে সন্ত্রাস মাত্র সৃষ্টি করেছে। শিক্ষক সূর্যসেন মুক্তিসংগ্রামের এই দ্বিমুখী পন্থাই পরিত্যাগ করলেন। সারা ভারত ব্যাপী হতাশার রাজ্যে তিনি এক ব্যাপক বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের আয়োজন করতে লাগলেন। নূতন বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হল। চট্টগ্রাম সূর্যকে ঘিরে গড়ে উঠল একটি সৌরমণ্ডল—নির্মল সেন, অনুরূপ সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, সুধেন্দু দস্তিদার এবং লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং আরো অনেকে। এর পর বহু বাঁক ঘুরে, বহু সংঘর্ষ পার হয়ে বিপ্লবী আন্দোলন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের মধ্যে সার্থক রূপ পেয়েছে। চট্টগ্রামের ছাত্রসমাজ ও যুব সম্প্রদায় এবং জাতি-ধর্মনির্বিশেষে চাষী, মাঝি মাল্লা প্রমুখ সাধারণ মানুষ সেদিন ভারত ইতিহাসে যে অতুলনীয় অধ্যায় সংযোজন করেছিল সেই মহৎ সৃষ্টির ভিত্তিভূমি যাঁর প্রাণের ও দানের সম্পদে গরীয়ান তিনি শিক্ষক সূর্যসেন। তিনি বিপ্লবী ভারতের জাতীয় শিক্ষক। যুগে যুগে যাঁরা জাতির মোহনিদ্রা ভেঙেছেন তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বিপ্লবী ভারতকে আহ্বান করলেন—

"আমার জীবনে মাভিঃ জীবন
জাগবে সকল দেশ"

চট্টগ্রামের স্বদেশী যুবকদের চেষ্টায়

ও উৎসাহে গড়ে ওঠা ন্যাশনাল স্কুলে সূর্যসেন ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক। এই নিরীহ শিক্ষকের প্রবল আকর্ষণী শক্তি সেদিন সমগ্র চট্টগ্রামের মৃত্যুপাগল যুবক ও ছাত্রদের সকলকে জয় করেছিল। আদর্শ শিক্ষক ছিলেন বলেই তিনি সার্থক বিপ্লবীও হতে পেরেছিলেন। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও সংগঠন শক্তি, সঙ্কল্পে অবিচল নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি কঠোর মনোভাব; জনসাধারণ ও বিপ্লবী কর্মীদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসা, সর্বোপরি সীমাহীন অন্তহীন দেশপ্রীতি তাঁকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। তাঁর চারপাশের সবার থেকে তিনি এত স্বতন্ত্র আর এত বড় যে তাঁর কোন তুলনাই হয় না। যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁকে আদর্শ শিক্ষক তথা সার্থক বিপ্লবী করে তুলেছে তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

মাষ্টারদা ছিলেন ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার একটি জীবন্ত প্রতীক। দেশমাতৃকার অবমাননা ও লাঞ্ছনার জ্বালা ও পরাধীনতার দুঃখ তাঁর হৃদয়ে ক্রোধ ও প্রতিশোধ স্পৃহার অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছিল, কিন্তু তাঁর বদন মণ্ডলে ছিল এক অপূর্ব প্রশান্তি, আর স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছিল অতলস্পর্শ সমুদ্রের গভীরতা। চরম সুখে যেমন বিগতস্পৃহ, পরম দুঃখেও তেমনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্ত এই মানুষটি ধীরস্থির পদক্ষেপে ভারতের কপালে রক্ততিলক পরিয়ে নূতন ইতিহাস রচনা করে গেলেন মহাকালের মন্দিরে অনাগত কালের জন্য। অনুগামী বিপ্লবীরা জানেন কী অবিচলিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনা করে গেছেন। ১৯২৯ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর লাহোরে ইংরেজ কারাগারে অনশনব্রতী যতীনদাস ৬৩ দিন অনশন করে মৃত্যু বরণ করলেন। চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বলল রক্তের বদলে রক্ত, অত্যাচারের জবাবে অত্যাচার চাই। মাষ্টারদা এই চরম ক্ষণে ধীর নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন—প্রতিশোধ আমিও চাই, কিন্তু আমি চাই আরো বড় প্রতিশোধ, এমন প্রতিশোধ যা অত্যাচারী ইংরেজ জাতি কোনদিন ভুলতে পারবে না। কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার মুখে আগামী দিনের এই পরিকল্পনাকে নষ্ট করলে চলবে না। তাঁর অনুগামীরা যখন একটি মৃত্যুর প্রতিশোধ কামনায় উত্তেজিত, তখন তিনি আরো বড় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে একটি চরম ক্ষণের প্রতীক্ষা করে চলেছেন। কোনপ্রকার উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বিপ্লবকে তিনি অসময়ে আহ্বান করেন নি। কিন্তু ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের সকাল বেলা। সেই চরমক্ষণও যখন আগত প্রায়, সেই সময়েও কেউ কি দেখেছে তাঁর মধ্যে এতটুকু চাঞ্চল্য, সামান্যতম অস্থিরতা? প্রত্যক্ষদর্শী সহকর্মীরা বলেন, সেই বহ্নি উৎসবে যোগদানের পূর্বাহ্নে বিপ্লবী নায়কেরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। মৃত্যু পথের অভিযাত্রী প্রত্যেকটি দলকে সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি অতি সুস্পষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রদান করেন। ক্রমশঃ সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এল। ভারতের রক্তাক্ত বিপ্লবের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় যিনি সংযোজন করবেন তিনি সেই পরম লগ্নেও কী অবিচল আর কর্তব্যনিষ্ঠ। কংগ্রেস অফিস থেকে বের হবার আগের মুহূর্তেও এর কাগজপত্র, হিসেবের ফাইল যথাস্থানে রেখে যথাযথ অফিসঘর তালাবন্ধ করে চিরাচরিত ধীর অথচ কঠিন পদক্ষেপে বাইরে এলেন। জীবনের কত বিনিদ্র রজনী যে মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছেন আজ সেই মুহূর্তেও এই ধীরস্থির চিরসহিষ্ণু মানুষটির মধ্যে কেহ কোনও অস্থিরতা দেখেননি। তারপর ২২শে এপ্রিলের সেই তামসী রজনী, জালালাবাদ যুদ্ধের অবসান হয়েছে। মৃত্যুর হিমশীতল নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে পাহাড়ী উপত্যকায়। দু ঘণ্টা সম্মুখ যুদ্ধে ইংরাজদের আড়াইশ সৈন্যকে নিহত করে জালালাবাদ পাহাড়ের বক্ষে আশ্রয় নিয়েছে ১২ জন বীর বিপ্লবী কিশোর। মাষ্টারদার হাতে তৈরী তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় অনুগামীরা জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করে বৃটিশ ফৌজকে পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য করেছে। যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও রক্তাক্ত, অবসন্ন। এই চরম সময়েও বিপ্লবীর তো শোক করা চলে না। শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী বলেছিলেন—'আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই—পাপপুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার একমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নেই।' বৈপ্লবিক চরিত্রের এই মহিমা ফুটে উঠল সেদিন শিক্ষক সূর্যসেনের কর্মে ও আচরণে। একটি টর্চ জেলে প্রতিটি শহীদের দেহ একে একে নেড়ে চেড়ে জীবনের শেষ দেখা দেখলেন, জানলেন কারা কারা গেল। তাঁর বুকের এক একটি পাঁজর যেন জালালাবাদের তৃষিত বক্ষে শেষ আশ্রয় নিয়েছে। সর্বশেষ শহীদ নির্মল লালা, ১৪ বৎসরের মরণ পাগল একটি কিশোর; এই সেদিন নিজের বই খাতা, পেনসিল আর অতি প্রিয় বাক্সটি বন্ধুদের বিলিয়ে দিয়ে এই মরন যজ্ঞে ছুটে এসেছে, কারো কথা শুনেনি, কারো বাধা মানে নি। কিন্তু বিপ্লবীর তো শোক করা চলে না, কর্তব্যরত ধীর প্রশান্ত প্রতিমা এগিয়ে চলল। মৃত শহীদদের পকেট থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও কোমর থেকে রিভালভার খুলে নিলেন অকম্পিত হৃদয়ে।

(ক্রমশঃ)

নানা রঙের দিনগুলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রসময় শূর

কলকাতায় সে-রাত আমাদের নির্বিঘ্নে কাটেনি। ভূপেন রক্ষিত রায় ও মনীন্দ্র রায় ছিলেন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও কেশবসেন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলের নিকটবর্ত্তী Elisium Lodge নামে মেসের দোতালায়। কিছুকাল ধরে এই আস্তানায় তাঁরা থাকতে আরম্ভ করেছিলেন। শেষ রাত্রে পুলিশবাহিনী তাঁদের ঘরের দরজায় ঘা দিল। দরজা খুলতেই পুলিশ অফিসার ওয়ারেণ্ট দেখিয়ে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করলেন। আমাকে ওদের ওখানে পেলনা বলে পুলিশ খুব নিরাশ হল। আমি ছিলাম বৈঠকখানার ৯৩।১।ডি নং একটা মেসে। ব্যায়ামবীর শ্রীগোপাল চৌধুরী মেসের মালিক। আমার খোঁজে বৈঠকখানার এ বাড়ীতে আসতে তাদের একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল—আমি ভোরে উঠে বেরিয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে শুনলাম পুলিশ আমার খোঁজ করে গেছে। আবার ফিরে আসবে। পুলিশ আমার খোঁজে এসেছিল শুনে এখনই পুলিশের হাতে ধরা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। কারণ বিনয় বসু এখন-ও কলকাতায় এসে পৌছায়নি। কলকাতায় অথবা অন্যত্র কোন নিরাপদ আশ্রয়ে তাঁকে রাখার ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে। অনতিবিলম্বে আমি এক জামা-কাপড়ে বের হয়ে পড়লাম মেস থেকে, সোজা বেলেঘাটায় মেজদার (শ্রীহরিদাস দত্ত) বাসায় গিয়ে উঠলাম। দুপুরটা ওখানে কাটল। খবর পেয়েছিলাম ভোরেই ভূপেন ও মণীন্দ্র রায়কে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমার সম্বন্ধে মেজদার মত হল—বর্ত্তমানে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে আমাকে এবং কোন নিরাপদ আস্তানায় থাকার ব্যবস্থা করে নিতে হবে। এর দিন দুয়েকের মধ্যে সুপতি রায় বিনয়কে নিয়ে নিরাপদে আমাদের গোপন আস্তানা ৭নং ওয়াণ্ডি উল্লা লেনে (ওয়েলেসলি স্কোয়ারে) উপস্থিত হল। ওখানে অধীর প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম আমরা—মেজদা, সুরেনদা, নিকুঞ্জ ও আমি। বিনয়কে পেয়ে আমাদের আনন্দ যেন আর ধরে না। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম বিনয়কে। আনন্দ আজ উপ্‌চে পড়ছে। মেজদা বিনয়কে ডাকলেন 'রাজা' বলে। বললেন তিনি ও যে-আমাদের মধ্যে রাজা, রাজা বিপ্লবী। যে কাজ বিনয় এমন নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে ঘটনাস্থল থেকে একা হাজার চোখের সম্মুখে দিনের বেলায় পালাতে সমর্থ হয়েছে, তা শুধু তাকে দিয়েই সম্ভব।

ঢাকা থেকে বেরিয়ে কলকাতায় পৌছানর বিচিত্র কাহিনী আমরা শুনলাম সুপতি রায়ের মুখে। ধন্য সুপতি, অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তিনি।

খাওয়াদাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা হল দু'জনের জন্য। এর পরে মেজদা বেরিয়ে পড়লেন। বিনয়ের জন্য ভাল জামা-কাপড় ও একখানা লাল সুঙ্গি কিনে নিয়ে এলেন। পথের অনাহার অনিদ্রার পর বিনয় শুয়ে পড়ল বিশ্রাম নেওয়ার জন্য।

এখন আমাদের একমাত্র কাজ বিনয়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। আমাদের মধ্যে আলোচনা চলল। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল কলকাতার বাহিরে কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে কলকাতায় জোর খোঁজ খবর তল্লাসি চলবে বিনয়ের জন্য। তা-ও আমাদের লক্ষ্য করা দরকার। মেজদার একজন আত্মীয় থাকেন কাত্রাসগড় কোলিয়ারি অঞ্চলে। ওখানে একবার চেষ্টা করে দেখলে হয়। মেজদার কথায় আমরা সাড়া দিলাম। মেজদা রওনা হলেন বিনয়কে নিয়ে। ভাল ভাবেই কাত্রাসগড় পৌছে গেলেন দু'জনে। সাদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি দেখা গেল না। বেশ আনন্দের সহিত দু'দিন কেটে গেল আত্মীয় পরিবেশে। বিনয়ের নিরাপত্তার বিচারে ও-অঞ্চলের পরিস্থিতি কিন্তু খুব সুবিধাজনক মনে হলনা মেজদার। তিনি স্থির করে ফেললেন কোন ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবেনা। কাল বিলম্ব না করে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। কলকাতায় ফিরে এসে ওয়াণ্ডি উল্লা লেনের আস্তানাতেই তাঁরা উঠলেন।

সুরেশদার সম্বন্ধী শ্রীসত্য ঘোষ থাকেন বেলেঘাটায়। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী—Military Accounts-এ কাজ করেন। আত্মীয়স্বজনের উপর সুরেশদার যথেষ্ট প্রভাব। এর মধ্যে জন কয়েকের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও একান্ত আন্তরিক। সাংসারিক অনেক ব্যাপারে সুরেশদার উপর তারা নির্ভরশীল। সুরেশদার কথায় যে কোন ঝুঁকি নিতে তারা প্রস্তুত। ঠিক হল সরকারী কর্ম্মচারী আবার মিলিটারী ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত সত্য ঘোষের বাসায়-ই বিনয় থাকবেন।

মেজদা ও আমার-ও একটা আস্তানা দরকার। সুরেশদার আর এক-জন আত্মীয় (ভায়রা ভাই) শ্রীউপেন বসু থাকেন কেওরাতলা শ্মশানের নিকট একটা বাড়ীতে। উপেন বাবুর দুইটা ঘর ছিল। তাঁর ছোট্ট পরিবার—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। সুতরাং একখানা ঘর তিনি ভাড়া দিতে পারেন। কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল এবং সাথে কোন মহিলা নেই এমন লোককে বাড়ী ভাড়া দেওয়া নিষেধ হয়ে গেছে সরকার ও পুলিশের পক্ষ

থেকে। কারণ অতি সুস্পষ্ট। বিপ্লবী-দের অনেকে আত্মগোপন করে আছেন দেশের নানাস্থানে। তাঁরা যেন কোন লোকজনের কাছে আশ্রয় না পান সেজন্যই এই নিষেধ আজ্ঞা জারি। সুতরাং আমার ও মেজদার পক্ষে কোন অপরিচিত নূতন জায়গায় একটা ঘর ভাড়া পাওয়া অসম্ভব। এ অসম্ভব সম্ভব হল সুরেশদার প্রভাবে। আত্মীয়েরা ছুপোষা সংসারী লোক। বিপ্লবী সংগঠন তো দূরের কথা প্রকাশ্য রাজনীতির ধারে-ও তারা থাকেন না। এসব আত্মীয়েরা অবশ্য জানতেন সুরেশদার যোগাযোগ রয়েছে বিপ্লবী দলের সঙ্গে। এই ঘর ভাড়ার ব্যাপারে-ও তিনি তাঁর আত্মীয়কে একটু ইঙ্গিত না দিয়ে পারেন নি। কারণ, কিছুটা জানা থাকলে নিজেরা-ও সাবধান হয়ে চলতে পারবেন, প্রকাশ্যে ভাড়াটিয়ার সাথে মেলামেশা না করা, আর প্রয়োজন হলে আমাদেরকে-ও একটু আড়াল করে রাখা। নূতন ভাড়াটিয়া দুইজনের সম্বন্ধে পাড়াপড়শীরা জানল—আমরা খিদিরপুর ডকে কাজ করি। রাত্রে আমাদের ডিউটিতে যেতে হয়। সারাদিন ঘরে থাকাটা তাই কিছু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি কারো। আমরা যে বেশ অভাবী, স্বল্প মাইনায় নিজেদের খরচ চালিয়ে যাচ্ছি তা দেখাবার জন্য অবসর সময়ে—বিড়ি তৈরীর কাজ আমরা সুরু করে দিলাম। বিড়িপাতা কেনা হল, বিড়ির মশলা সুদ্ধা কেনা হল। দুপুরে বিকেলে বিড়ি বাঁধার কাজে আমরা লেগে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিকুঞ্জ সেন

দিনের পর দিন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণের এই বিদ্বেষ জমা হয়ে হয়ে পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠল; কিন্তু তবু তা ফেটে পড়ল না। ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজের পলাশী জয়ের পরে প্রায় ১০০ বছর তাকে অপেক্ষা করতে হল। এই একশ বছরের ধূমায়িত বহ্নি প্রজ্বলিত শিখায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবার জন্য একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অপেক্ষায় ছিল; সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সন্ধান মিলল ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের অভ্যুত্থানে। ভারতবর্ষের সিপাহীরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবার অব্যবহিত পরেই গ্রামে-গঞ্জে বিদ্রোহের পতাকা নিয়ে এগিয়ে এল ভারতের জনসাধারণ। এইভাবে 'সিপাহী বিদ্রোহ' পরিণত হল গণঅভ্যুত্থানে। এখানে ভারতবর্ষের সিপাহীরা আগে বিদ্রোহ ঘোষণা করল কিংবা জনসাধারণ আগে বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে পথে নামল সেটা বিচার্য্য বিষয় নয়। আসল কথা হচ্ছে এ বিদ্রোহে সিপাহীদের সঙ্গে জনসাধারণ এগিয়ে এসে ইংরেজের বুকে আঘাত হেনেছিল কিনা এবং সে আঘাত ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শক্তিকে উৎখাত করবার জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিনা।

ভুললে চলবে না যে ১৭৫৭ সালের পলাশী বিজয়ের ফলে ইংরেজশক্তি সমগ্র ভারতবর্ষ জয়ের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন চালিয়েছিল যুদ্ধ বিগ্রহ অন্যদিকে তেমনি চালিয়েছিল দেশের অগণিত নরনারীর উপরে দুর্ব্বিসহ অত্যাচার ও নিষ্ঠুর নিপীড়ন। শুধু তাই নয়, গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের জীবিকা অর্জনের প্রধান অবলম্বন কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে এবং খেতখামারের ফসল লুণ্ঠন করে তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল। এই লুণ্ঠিত অর্থ সরকারী অর্থ ভাণ্ডারে বড় একটা জমা হত না—ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। সে যুগের বহু ইংরেজ এই লুণ্ঠিত অর্থের দৌলতে অসামান্য ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছেন। মিঃ বারওয়েল ও ভ্যান্সিটার্ট অসদুপায়ে যে প্রচুর সম্পত্তির মালিক সেদিন হয়েছিলেন ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। এইভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ইংরেজের এই বেপরোয়া লুণ্ঠন কার্য্যের ফলে অসহায় ভারতবাসীরা মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগল।

ইংরেজের এবম্বিধ শোষণ যে কত ভয়াবহ তার বর্ণনা আছে নবাব মীর কাশিমের একটি পত্রে। সে পত্রখানার উদ্ধৃতি আছে শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথায়'। নবাব মীরকাশিম বলেছেন, ইংরেজ বণিকেরা এ দেশবাসী প্রজা ও ব্যবসায়ীর গৃহ হতে জোর করে মাল উঠিয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃত মূল্যের এক চতুর্থাংশ

দাম তারা দেয়। অপরদিকে প্রজাদের হাতে বিলিতি জিনিস জোর করে গুঁজে দিয়ে এক টাকার জায়গায় পাঁচটাকা আদায় করে নেয়। তিনি আরো বলেছেন যে তাঁর রাজপুরুষদেরকে এরা শাসন বা বিচারের কাজ করতে দেয় না। এইরূপ অত্যাচারে তাঁর ২৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব কমে গেছে।

শ্রীদেউস্কর বলেছেন নবাব মীর-কাশেমের কথা যারা বিশ্বাস করবেন না তাঁরা যেন সার্জেন্ট ব্রেণো নামক জনৈক ইংরেজের ২৬।৫।৬২ তারিখের পত্রখানা পড়ে দেখেন। তিনি যা বলেছেন তার মর্ম্ম হল এই যে কোম্পানীর লোকের হাতে অসীম ক্ষমতা। তারা গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় গিয়ে গ্রামের অধিবাসীদের কাছ থেকে জোর করে যে কোন মূল্যেই মালপত্র খরিদ করে। কেউ যদি তাদের আদেশ অমান্য করে তবে তার প্রতি নিষ্ঠুর শাস্তির ব্যবস্থা হয়। বহুক্ষেত্রে মালিকদের সঙ্গে চুক্তিপত্র এই মর্ম্মে সাক্ষারিত হয় যে ইংরেজ বণিক ছাড়া আর কারো কাছে তারা মালপত্র বিক্রি করতে পারবে না। তা ছাড়া কোম্পানীর নামে কোম্পানীর লোকেরা ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্য-ও দেশবাসীর উপরে অকথ্য অত্যাচার চালাত। যে দ্রব্য তারা কিনত তার জন্য উচিত মূল্য দেওয়া ত দূরের কথা—বহুক্ষেত্রে বিনামূল্যেই তা জোর জবরদস্তি করে গ্রহণ করা হত। তিনি আরো বলেছেন, এইরূপ অত্যাচারের ফলে বাখরগঞ্জ জেলা জনশূন্য হয়ে পড়েছে। এখানকার হাট বাজারেও বেশী জিনিসপত্র বেচাকেনা হয় না। তবু ইংরেজ বণিকের পিয়নেরা অবাধে দরিদ্র লোকের উপরে জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। জমিদাররা যদি প্রজাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন তবে তাদেরকেও ভয় দেখান হয়। সাধারণ মানুষ সরকারী কাছারিতে আগে অভিযোগ করে বিচার পেত। এখন ইংরেজ বণিকের গোমস্তাই বিচার করে। প্রত্যেক গোমস্তার ঘরেই আদালত বসছে। এইভাবে একদিকে শাসন কার্য্য ও অন্যদিকে শোষণকার্য্য এক সঙ্গেই চলতে লাগল। এই অন্যায় শাসন ও বেপরোয়া শোষণের ফলে দেশের সাধারণ মানুষের মনে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ সঞ্চিত হতে হতে তা পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে উঠতে থাকে।

শাসন ও শোষণের এই বিরাট অচলায়তন বছরের পর বছর ভারত-বাসীর বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত স্থির হয়ে রইল। ইংরেজের অত্যাচার ও উৎপীড়নে ভারতবাসী আশ্রয় হারাল, চাষের জমি হারাল। এর ফল হ'ল এই যে, যে বছর অতিবৃষ্টি কিংবা অনাবৃষ্টির ফলে ক্ষেতে ফসল কম ফলত ভারতবাসীর পক্ষে সে বছরই হত দুর্ভিক্ষের বছর, কেননা বাজারে ফসল পাওয়া গেলেও অতিরিক্ত মূল্যে তা কেনার ক্ষমতা সাধারণ লোকের একেবারেই নেই। এর ফল হয়েছে এই যে গত ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমগ্র বৃটিশ ভারতে বশলক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মারা গেছে।

যে দেশে ২৫ বছরে দশলক্ষ লোক শুধু অনাহারে প্রাণত্যাগ করে সে দেশের শাসনকর্ত্তাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রাণে বিক্ষোভ ধীরে ধীরে জমাট বাধতে বাধতে যদি তা একদিন ফেটে পড়ে, তবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ভারতবর্ষেও পলাশী বিজয়ের পরদিন থেকে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত তাই ঘটেছিল। ভুললে চলবে না যে এ বিক্ষোভ জমা হচ্ছিল প্রায় ১০০ বছর ধরে। পলাশীযুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আর সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই একশ বছরে ইংরেজের ভারত জয়ের কাহিনী শুধু বাহুযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল না। একই সঙ্গে চলছিল বাণিজ্য যুদ্ধ ও কৃষিযুদ্ধ।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ সাহিত্য

অতুল চক্রবর্তী

দেশ ও কাল ভেদে মনুষ্য সমাজের সাহিত্যও বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রত্যেক সাহিত্যই কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই অনুবাদ ভিন্ন এক দেশের সাহিত্যের আস্বাদ অপর ভাষাভাষী দেশের মানুষের লাভ করা দুঃসাধ্য। শুধু তাই নয় ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেই সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে এবং অনুবাদ ভিন্ন ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্র স্বভাবতঃই খুব সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে।

যদি কোন দেশের সাহিত্যিক-সমাজ মনে করেন, নিজেদের দেশের ভাষার গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজনীয়তা নেই তবে তাঁদের রচনার পরিধি সীমিত ও একদেশদর্শী হতে বাধ্য। বিশেষতঃ আজকের পৃথিবীতে মানব-সমাজ সর্বস্তরে একান্ত-আশ্রয়ী ও নিকট থেকে নিকটতর বন্ধনে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে কাজেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান অপরিহার্য্য এবং একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কেউ কেউ মনে করেন মূল গ্রন্থ পাঠে যে আনন্দ ও রসাস্বাদন লাভ করা সম্ভব, অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। একথা সত্য বলে ধরে নিলেও এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, সকল মানুষের পক্ষেই পরভাষার এতোদূর পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নয় যাতে বিদেশী ভাষার মূল গ্রন্থ পাঠ করে পরিপূর্ণ রসাস্বাদন করতে তারা সক্ষম হবে। অতএব অনুবাদের ওপর নির্ভর করা ভিন্ন সাধারণের পক্ষে গত্যন্তর নাই।

দ্বিতীয়তঃ অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষেও একাধারে পৃথিবীর সকল ভাষার ওপর সমান পাণ্ডিত্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই পাশ্চাত্য মহাদেশে দেখা যায় কোন একটি ভাষাতে যদি উল্লেখযোগ্য কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান রুশ প্রভৃতি প্রধান ভাষাগুলিতে অনুবাদ সংস্করণ মুদ্রিত হয়ে থাকে।

মোট কথা বিশ্বের দরবারে যে সকল সাহিত্য নিজেদের শ্রেষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তারা পারস্পরিক অগ্রগতি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কোন অভিনব ভাবধারার আবির্ভাব ঘটলে অথবা নতুন কোন শিল্প কুশলতার পরিচয় পেলে অবিলম্বে তারা তা নিয়ে অনুধাবন করতে বসে। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীগণের জ্ঞানার্জন স্পৃহা এতোই প্রবল যে অনেক প্রাচ্যদেশীয় প্রাচীন গ্রন্থও তাঁরা দীর্ঘ অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য মহাদেশের পাঠক সমাজের সামনে পরিবেশন করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত গ্রন্থ "শকুন্তলার" নাম সর্বাগ্রেই উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৭৮৯ খ্রীঃ স্যার উইলিয়ম জোনস্ শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ প্রথম প্রকাশ করেন। অমনি ইওরোপের সাহিত্য সমাজে একটা বিস্ময়ের সাড়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মান, ফরাসী, ডেন ও ইতালীয় ভাষায় গ্রন্থখানি অনুদিত হয়। জার্মান মহাকবি গ্যেটে গ্রন্থখানি পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে যান! কথিত হয় তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ফাউস্টের মুখবন্ধ শকুন্তলা কাব্যের মুখবন্ধের অনুসরণে রচনা করেছিলেন।

অনুরূপ ভাবে ১৮৫৯ খ্রীঃ এডোয়ার্ড ফিজেরাল্ড পারসী কবি ওমর খৈয়ামের রুবাইৎ মূল পারসী ভাষা থেকে ইংরেজী অনুবাদ করে ইংরেজী সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছেন। রুবাইৎ শব্দটি আরবী ভাষা থেকে আগত এবং এর অর্থ চতুষ্পদী স্তবক সম্বলিত কাব্যসংগ্রহ। ওমর খৈয়াম সম্ভবতঃ একাদশ শতকের মধ্যভাগে ইরাণে জন্মগ্রহন করেন। শুনলে বিস্মিত হতে হয়, তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও গণিত শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং একাধারে রাজকবির দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছিলেন। অথচ তাঁর রচিত কবিতা-গুলো এমন ভাববিহ্বল ও সকরুণ গীতি কাব্যময় যে পাঠ করলে সহসা মনে হয় তিনি বোধ হয় একজন উদ্দাম ও উদভ্রান্ত প্রেমিক ছিলেন, জীবনের দৃঢ় বাস্তব অথবা কঠোর হিসাব নিকাশের সঙ্গে বুঝি তাঁর কোনই সম্পর্ক ছিল না। ধারণা হয়, আজকের দিনে বোহেমিয় বলতে যা বোঝায় সম্ভবতঃ তিনি তাই ছিলেন। খৈয়াম শব্দের অর্থ তাঁবু-নির্মাতা, সম্ভবতঃ ওটা ওঁর পৈতৃক পেশার নামবাহী।

তাঁর কাব্যের বেশির ভাগ অংশেই জীবনের অনিত্যতা, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং অতীত অনুতাপের অসারতা মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, ইহজীবনের সুখ ও সম্ভোগই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্যরূপে তাঁর রচনার বহু ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছে। জীবনদর্শন হিসেবে কবির এই দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো সমালোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু রচনার মাধুর্য্য ও সুমিষ্ট শব্দবিন্যাসে এই বাক্য সংগ্রহ অনবদ্য। রুবাইতের অনুমান বারোশত স্তবকের মধ্যে ফিজ গেরাল্ড বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রায় একশতটি স্তবকের ইংরেজি অনুবাদ করে যশস্বী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যেও একাধিক কবি রুবাইতের বঙ্গানুবাদ করেছেন, তন্মধ্যে কান্তি ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ দেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্বে কাব্যানুরাগী নবীন বাঙ্গালী সাহিত্যিক সমাজে ওমর খৈয়ামের কাব্য অহরহ আবৃত্ত হতো। কিন্তু এখন যেন তা স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবুও বিস্মৃতির পরপার থেকে এখনও সুদূর অতীতের দু'একটি বিচ্ছিন্ন কলির ক্ষীণ রেশ কানে আসে।

রুবাইতের সর্বাধিক আলোচিত অংশগুলির মধ্যে দ্বাদশ স্তবক অন্যতম।

কান্তি ঘোষ অনূদিত পঙ্ক্তাংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :—

রাজ্য সুখের আশায় বৃথা কেউ বা
কাটায় বরষ-মাস
স্বর্গ সুখের কল্পনাতে পড়ছে,
কারুর দীর্ঘ-শ্বাস—
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও,
বাকির খাতায় শূন্য থাক—
দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে ? মাঝখানে
যে বেজায় ফাঁক।

বলতে গেলে বাংলা ভাষায় বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদের সূত্রপাত হয় প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) আমল থেকে। বীরবল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন উন্নততর বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ ভিন্ন বাংলা সাহিত্যের ভাবসম্পদ ও রচনা শৈলীর পরিধি বিস্তৃত হওয়া সম্ভব নয়। ফরাসী লেখক প্রসপার মেরিমির 'ফুলদানি' গল্পটি তৎকর্তৃক অনূদিত হয়ে ১৮৯১ খ্রীঃ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে "সবুজপত্রে" বহু ফরাসী গল্পের অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন।

বীরবল বাংলা সাহিত্যে যে পথ-প্রদর্শন করেন পরবর্তী যুগে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরা সে ঐতিহ্য অব্যাহত রেখে ছিলেন। এই সময়ে কল্লোল সাহিত্য চক্রের ওপর হুটহামসুন, যোহান বোয়ার; সমার সেট মম প্রমুখ পাশ্চাত্য দেশীয় সাহিত্যিক বর্গের প্রভাব গভীর ছায়াপাত করে। এই চক্রের রচনাগুলি প্রধানতঃ আবেগ-ধর্মী ও রোমান্টিক ভাবব্যঞ্জক কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গালী পাঠক সমাজে তারা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

সবুজপত্রের সম্পাদক বীরবলের সাহিত্যচিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে কল্লোলের লেখকদের একটা জবরদস্ত মতপার্থক্য ছিল। বীরবলের রচনা ছিল ধীর, মন্থর, জ্ঞানগর্ভ এবং উচ্ছ্বাস ও আবেগ বর্জিত, পক্ষান্তরে কল্লোল-সাহিত্যিকদের রচনা ছিল তীব্র আবেগ-ময়ী ও ক্ষিপ্র বেগতরী। সে যাই হোক সাহিত্যসেবার আসরে সবুজপত্র ও কল্লোল উভয় গোষ্ঠীই অকৃত্রিম নিষ্ঠার পরিচয়দান করেছে এবং তাদের একনিষ্ঠতা বঙ্গসাহিত্যকে বিদেশী সাহিত্যের দরবারে পরিচিতি লাভের পথে মূল্যবান পাথেয় জুগিয়েছে।

কল্লোল যুগে বাংলা সাহিত্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য বিদেশী গ্রন্থ অনূদিত হয়েছিল—নরওয়েজিয় কথা সাহিত্যিক হুটহামসুনের প্যান ও "হাঙ্গার এবং যোহান বোয়ার রচিত "প্রিসনার হু স্যাং", প্যান গ্রন্থটির অনুবাদ করেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এবং হাঙ্গার গ্রন্থটির অনুবাদ "বুভুক্ষা" নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অনুবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, গ্রন্থ দুইখানি তদানীন্তন বাঙ্গালী পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিল। কথিত আছে বুভুক্ষার প্রচ্ছদপট নাকি এতো রমণীয় হয়েছিল যে হুটহামসুন স্বয়ং তার এক কপি চেয়ে পাঠিয়ে-ছিলেন। প্রিসনার হু স্যাং গ্রন্থখানি প্রবোধ সান্যাল "বন্দী বিহঙ্গ" নাম দিয়ে অনুবাদ করেছিলেন এবং এই গ্রন্থটিও তৎকালীন বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর বিশ্বসাহিত্যের দরবারে স্বাক্ষর কোন বিদেশী গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ বাংলা ভাষায় তেমন একটা চোখে পড়ে নি। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর জার্মান সাহিত্যিক রেমার্কে-রচিত ইম্ওয়েষ্টেন নিখ্ট্ নিউস" (অল কোয়ায়েট অন্ দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট) বিশ্ব সাহিত্যে একটি সাড়া সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থটি সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল ভাষাতেই অনূদিত হয়েছিল। বাংলা ভাষাতেও এর একটি সংস্করণ পাঠ করেছি। "অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্নফ্রন্ট গ্রন্থখানির সকল দেশে বিপুল সমাদর লাভ করবার মূল কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, লেখক জাতিধর্ম ও দেশ নির্বিশেষে যুদ্ধের করুণ দিকটি পরিস্ফুট করে বিশ্বমানবের হৃদয়ে এক ব্যাকুল আবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রচনার মধ্যে একাধারে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে এবং সেই সঙ্গে রয়েছে গভীর সমবেদনা।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিষয়ক যে দুই একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক এবং মিত্রপক্ষের প্রচার সাহিত্যরূপেই তাদের জন্ম। তাদের মধ্যে বিশ্বজনীন উদারতার পরিধি সীমায়িত। কাজেই সুসাহিত্যের আসরে তারা তেমন স্বীকৃত লাভ করেনি এবং বাংলা ভাষাতেও তাদের অনুবাদ তেমন একটা চোখে পড়েনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর রচনাগুলির মধ্যে ফরাসী লেখক পিয়ারি বোল রচিত "ব্রিজ অন্ দি রিভার কোয়াই" উপন্যাস-খানি একটি ব্যতিক্রম। লেখকের রচনায় মামুলি দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে কিছু বক্তব্য রয়েছে। অর্থাৎ মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী অক্ষ শক্তির সেনাদল থেকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ এবং মিত্রশক্তি জগতে ন্যায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, পিয়ারি বোলের উপন্যাসে এই মতের অন্ধ সমর্থন পাওয়া যায়না, যাই হোক এই বই-খানিরও কোন বাংলা অনুবাদ চোখে পড়েনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে যে দু'টি বিখ্যাত রুশ উপন্যাস নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে তাদের নাম যথাক্রমে "ডক্টর জিভাগো"—প্রণেতা, বোরিস পাস্তেরনাক এবং "এণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দি ডন"—প্রণেতা, মিখাইল সোলোখভ। দুটি গ্রন্থেরই বিষয়বস্তু পুরাতন এবং রুশ বিপ্লবের পটভূমিতে রচিত। উভয়েই রাজ-নৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। মনে হয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে তারা তেমন

আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি এবং বাংলা ভাষায় তাদের সার্থক অনুবাদও বড় একটা চোখে পড়েনি।

পূর্বেই কথিত হয়েছে, কল্লোল-যুগে নরওয়েজিয় কথা সাহিত্যিক হুটহামসুন বাংলা সাহিত্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বঙ্গসাহিত্য-গগণ থেকে তাঁর সৌরবরবি অস্তমিত হয়েছে। তাঁর নাম এখন আর তেমন শোনা যায় না। অন্যান্য কারণের মধ্যে তাঁর নামযশ ম্লান হয়ে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ রাজনৈতিক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পৃথিবীর মানুষ নানাবিধ রাজনৈতিক উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে পড়েছে, আণবিক অস্ত্র আবিষ্কার, আন্তর্জাতিক শক্তিসাম্য, সমাজ বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদের পতন, ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের চঞ্চলতায় মানুষ আজ অস্থিরচিত্ত। তাই সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে বিশ্বমানব দরদী সাধকের আজ অভাব অনুভূত হচ্ছে।

সে যাই হোক মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। অনুবাদ সাহিত্যের সার্থকতা আজও শেষ হয়নি। এই প্রসঙ্গে ১৯২৫ সালে প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক এইচ্. জি. ওয়েলস্ যা বলে ছিলেন তা স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন একজনকে অবশ্যই খাঁটি ইংরেজ হতে হবে এবং একজন বাঙ্গালীর খাঁটি বাঙ্গালী হওয়াও অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তারা উভয়েই সভ্যজগতের সাহিত্যআসরে বিশ্বনাগরিক এবং পারস্পরিক ভাবধারার অংশভাগী। এই ভাববিনিময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম অনুবাদ।

মূল্যবৃদ্ধি ও আমরা

ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত

অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে দেশের গরীব জনসাধারণ আজ মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। এর হাত থেকে বাঁচবার অদূর ও সুদূর ভবিষ্যতে তারা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছেনা। কোটি কোটি বেকারের দেশে যারা কোন কাজে নিযুক্ত তারা তাদের মনিবদের কাছে ক্রমাগত বাঁচার মত মজুরীর জন্য দাবী জানিয়ে যাচ্ছে। এ দাবী অন্তহীন, এ দাবী চলছে, চলবে। দেশের সাধারণ মানুষ কেউ সন্তুষ্ট নয়, কারো মনে শান্তি নেই, গৃহে শান্তি নেই। সমগ্র সমাজ জীবন যেন মৃত্যু—যন্ত্রণায় ধুকছে—বিচারের জন্য, জীবনের জন্য কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে ঠিক করতে পারছে না। আর মানুষের এই মহাশ্মশানে দিকে দিকে, চলছে সুযোগ সন্ধানী প্রেতের তাণ্ডব নৃত্য। এক কথায় আজ এই অবস্থায় আছি এবং এখনও বেঁচে আছি।

এই অবস্থা কি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়? ভূমিকম্পের মতো মানুষের দ্বারা অপ্রতিরোধ্য এবং ভাগ্যের অমোঘ লিখন? কথাটি গভীর ভাবে বিবেচনার বিষয়। অর্থনীতির ছাত্র মাত্রই জানেন যে মূল্যবৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির দুটি লক্ষণ। একদিকে মুদ্রার যোগানের বৃদ্ধি এবং অপরদিকে ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন সে তুলনায় কম। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন যদি না বৃদ্ধি পায় অথচ টাকার যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তবে পূর্ব্বে যে জিনিষটির দাম একটাকা ছিল তাই পরে দু'টাকা বা পাঁচটাকা হতে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় কি ঘটেছে বা ঘটবে দেখা যাক্।

প্রথমে মুদ্রার যোগানের বৃদ্ধির কথাই ধরা যাক্। সে দায়িত্ব তো সম্পূর্ণ ভাবে দেশের সরকারের। বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমীক্ষায় দেখা যায় টাকার যোগান ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য প্রথমে ফালতু নোট ছাপানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বিখ্যাত অর্থ বিজ্ঞানী কেন্‌সের মতে উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে ফালতু নোট ছাপানোর (deficit financing) দোষ তো না-ই বরং গুণ আছে। তাতে গরীব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়, দেশের সম্পদেরও পূর্ণ ব্যবহার ও দেশের মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়, এবং সেটাই তো আমাদের কাম্য। সেজন্য সামান্য মূল্যবৃদ্ধি হলেও মানুষের তথা পরিবারের আয় বৃদ্ধির দ্বারা সে চাপ বিশেষ অনুভূত হবে না। দেশের স্বাধীনতার (?) পরে অনেক আশা নিয়ে বহু পরীক্ষিত এই অর্থনৈতিক সত্যটি আমরা সাদরে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এই ছাব্বিশ বছরে কি দেখলাম—"সত্য সেলুকাস্, কি বিচিত্র এই দেশ!" এতবড় একটা অর্থনৈতিক তত্ত্বকে আমাদের চরিত্রবলে কেমন মিথ্যা ও হাস্যাস্পদ করে দিলাম। এত নোট ছাপানো হলো কর্ম সৃষ্টির জন্য,

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। কর্ম সৃষ্টি হ'ল, দেশের ভাগ্যবানেরা তা পেল, কিন্তু তার জন্য উৎপাদন করতে হবে কেন? বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিত্তশালী দেশের মানুষের বিলাস বহুল জীবন ম্যাজিকের মতো অনায়াসে আমরা আয়ত্বে এনে ফেললাম। চারিদিকে শুধু বিলাস আর বিলাস এবং কে কত ভোগ করতে পারে তার জন্য প্রতিযোগিতা। কিন্তু টাকা যোগাবে কে? কেন সৌম্য সেন—দেশের সরকার? আমাদের দাবী মানতে হবে, আরো, আরো, অনেক দিতে হবে—দিতেই হবে। না, যদি দাও সব ভেঙ্গেচুড়ে আগুন লাগিয়ে জালিয়ে দেব। কিন্তু টাকা দিয়ে যা কিনবে তা বানাচ্ছ কী? না সে আমরা কি জানি। আসি যাই মাইনে পাই—কাজের কথা আবার কেন। কাজ করাতে হলে 'ওভারটাইম' চাই। সাতশত টাকা বেতন হলে দু'হাজার টাকা ওভারটাম। অতএব আরো নোট ছাপাও, এদের শান্ত কর। কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে চাকরী করি, দিনে যদি দেড় দু'ঘণ্টা কাজ করি তা হলেই সরকারের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। যে কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে কিছু অফিসার ও কিছু বোকা (?) নিষ্ঠাবান কর্মী কাজ করে। তাদের সংখ্যা আঙ্গুলে গোনা যায়। বাকী সব আসে যায় গল্প করে, খায়দায় আর দল পাকায় আরো আদায়ের ফন্দি আটতে। অর্থের এই অপচয় ফালতু নোট ও ট্যাক্সের পর্বত প্রমাণ বোঝা বোবা জনসাধারণের উপর চাপিয়ে পূরণ করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির বাজেট আলোচনা করলে দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনের অনেক বেশী ব্যয় করে এই পর্বত প্রমাণ অর্থের অপচয় হচ্ছে। ব্যয় সঙ্কোচের কথা উঠলে মন্ত্রীরা চিল চেঁচানো শুরু করেন—"তা হলে তো সব গেল।" প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে সর্বত্র এই অবস্থা। এই বস্তা বস্তা টাকা ভাগ্যবানদের হাত দিয়ে বাজারে এসে এই অসহনীয় মূল্যবৃদ্ধি ঘটায়। কত estimate committee-র হুঁশীয়ারী, বিরুদ্ধ পক্ষের ধিক্কার, কিন্তু একবার গদিতে বসতে পারলে, তথাকথিত গণতন্ত্রের মহিমায়,—কারো কথা শোনার প্রয়োজন নেই। গদিতে যে বারে বারে আসতে হবে এবং সেজন্য তো এদের হাতে রাখা প্রয়োজন। টাকা তো আমাদের পকেট থেকে যাচ্ছেনা মুদ্রাযন্ত্রে ছাপানো হচ্ছে মাত্র। আর গদিই যদি না রইলো, হিমালয় প্রমাণ সম্পদই যদি নিজের জন্য গড়ে তোলা না গেল, তবে এত মেহেনৎ করে দলগড়া কেন?

দলগড়ার ব্যাপারে এসে গেল আমাদের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গরিবী হটানোর কথা। দলছাড়া গণতন্ত্র চলেনা। ক্ষমতা লাভের জন্য চাই নির্বাচনে জয়লাভ। নির্বাচনের জন্য চাই প্রচুর অর্থ। সে অর্থ যোগাবে কে? যদিও সংবিধানে আছে একজন প্রার্থী নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ কত খরচ করতে পারবে। নির্বাচন শেষে হিসাব দাখিল করে দেখাতে হবে সে এর চেয়ে বেশী খরচ করেনি। কিন্তু সে বিধান যে আজ হাস্যকর চোখা কাগজে পরিণত হয়েছে, তা যে শিশু এখনো ভূমিষ্ট হয়নি সেও জানে। অতএব নির্বাচনের খরচ যোগাবে কে! না দেশের ধনবান ব্যবসদার শ্রেণী। তাদের স্বার্থ কি? না-তারা যা দেবে দল ক্ষমতায় এলে তার দশগুণ শোষণের সুযোগ তাদের জন্য করে দেবে। শোষণ অবশ্য জনসাধারণকেই করতে হবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দ্বারা। সরকার তখন চোখ থাকতে দেখবেন না, কান থাকতে শুনবেন না। শাসক-দল সম্বন্ধে একথা খাটে আবার যারা ক্ষমতায় আসতে পারেননা তাদের সম্বন্ধে যে একদম খাটেনা তা নয়। আমাদের বিচিত্র গণতন্ত্রের অনেক গুপ্ত কথা আছে সব আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। বড় ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু প্রকাশ্যে রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনের জন্য অর্থ দান করতে পারেনা। যারা এই দান গ্রহণ করেন বা 'গরিবী হটানোর' মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ন, কোম্পানী আইনের এই বিধান তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের রং-এর তুরুপ। এই বেআইনি অভিযোগ তুললে অভিযোগকারীই অপরাধী প্রমাণ হবে। অতএব মাভৈ! তবে এ টাকা ব্যবসায়ীরা কোথা থেকে দেয়? এটাও কারো আজ অজানা নেই। যে কালো টাকার বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে এতো আস্ফালন, এ সেই জনতার রক্তশোষা কালো টাকার অংশ। ক্ষমতাসীন দল কালো টাকার সবচেয়ে বড়ো সমর্থক তবে সমর্থনটি গোপন এবং নানা কৌশলে প্রয়োগ করা হয়। কালো টাকার কারবারীরা তাই বুক ফুলিয়ে চলে—একবার যখন ঘুষ দান খেয়েছে, তখন আর যাবে কোথায়? আমাদের তো নির্বাচন লড়াইয়ের শেষ নেই। পাঁচ বছরের নির্বাচন এখন বাৎসরিক কখনো ষান্মাসিক যজ্ঞে পরিণত। অতএব বারে বারে হাত পাততে হবে। আমরা অবশ্য উদার হাতেই দেব—তবে প্রতিদানে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে দশগুণ তুলে নেব। তোমরাও গদিতে থাকো বহাল তবিয়তে, আমরাও থাকি বহাল তবিয়তে। সুন্দর ব্যবস্থা। মূল্যবৃদ্ধির আসল কারণ এখনো কি গরীবরা বুঝতে পারেনি? পেরেছে এবং হাড়ে হাড়ে পেয়েছে। তবুতো

সংস্কার বলে কথা—দুর্গামাইজীর অপূর্ব ভাবমূর্তি, তিনি কথা দিয়েছেন ধৈর্য্য ধরলে তিনি আমাদের সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবেন। গরীব মানুষ না শুনে করবেই বা কি? কার কাছে যাবে? সর্ব্বত্রই তো মৃত্যুর ফাঁদ। কাকে বিশ্বাস করবে? সবাইতো মহামানব। মাঝে মাঝে মৃত্যু যন্ত্রনার হাত পা ছোঁড়া। সৃষ্টি হয় গুজরাটের, বিহারের। পণ্ডিতেরা, লুটের অংশীদারেরা হৈ হৈ করে ওঠেন—'একি! হিংসা! গণতন্ত্রের অবমাননা! আস্পর্দ্ধাতো কম না। ভাকো সৈন্যদল, তোপের মুখে করেক-শত তরুণ প্রাণ উড়িয়ে দাও। সব ঠাণ্ডা করে দাও। বিহারের 'জিলিপি ওয়ালা', লাড্ডু ওয়ালাদের পেছনে লাগলে কি হবে তা ভালো করে বুঝিতে দাও।' দ্রব্যমূল্যের চাপ কিন্তু এই ক্ষিপ্ততাতে আরোও বেড়ে যাবে, ব্যবসাদারেরা এই সুযোগ নিয়ে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করবে। কথাটি ঠিক। দেশের সরকার এরই আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু কদিন এ চলবে, অনন্তকাল কী? নেতাদের তথাকথিত মুখোশ কি শাশ্বত? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে। তবে আজ আর পিছিয়ে আসারও পথ নেই, আছে সম্ভব হলে পলায়নের পথ। টাকার যোগান সৃষ্টি যে নৈসর্গিক ঘটনা নয়, মানুষের সৃষ্ট করা সমস্যা সে সম্বন্ধে সামান্য আলো-চনা করা গেল। এখন উৎপাদন বৃদ্ধি বা মুদ্রাস্ফীতির আর একটি দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক্।

মানুষের উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রধানত কৃষি ও শিল্প। কৃষিই আমাদের অর্থ-নীতির মূল ভিত্তি। কৃষি উৎপাদন কতটা বাড়ছে, তা পরিকল্পনা মতো না তার চেয়ে কম জানা দরকার। সরকারী পরিসংখ্যান মতে কোন কোন বছর কৃষি উৎপাদন লক্ষ্য ছুঁতে পারে, অনেক বছরই পারেনা। একবার 'সবুজ' বিপ্লব সম্ভব হলেও তার ফল স্থায়ী হয়না, অনিশ্চয়তা দূর হয়না। কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত কৃষকরা অলস নয়, একথাও স্বীকার করতেই হবে। তারা নানাভাবে বঞ্চিত হয় কিন্তু সমাজকে বঞ্চনা করেনা। তবে কৃষি উৎপাদন নিয়ে এ-অনিশ্চয়তা কেন? তার কারণ দুটি,—প্রাকৃতিক ও মানবিক। ভৌগলিক সমীক্ষা নিয়ে দেখা যায় ভারতের কোন না কোন প্রদেশে প্রতি তিন, চার, পাঁচ বছরে একটি খরা হবেই। এর উপরে মানুষের হাত নেই। খরা প্রতিরোধক ব্যবস্থা মানুষের হাতে; তা হ'ল একদিকে সেচের জলের ব্যবস্থা করা অপরদিকে খরামুক্ত বছরে যাতে কৃষি উৎপাদন যতটা সম্ভব বাড়ানো যায় সে চেষ্টা করা এবং উদ্বৃত্ত ফসল দুর্দ্দিনের জন্য মজুত ভাণ্ডারে জমা রাখা। এটি মান-বিক সমস্যা। এ সমস্যা সততা ভিন্ন সমা-ধান করা যায় না। কৃষকের যখন সার ও বীজের বিশেষ প্রয়োজন তখন তা সরবরাহ নিয়ে শুরু হয় লুট, অতি মুনাফা আর ঘুষের তাণ্ডব নৃত্য। ফলে কৃষকের সে চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অসাধু অতি মুনাফালোভী ব্যবসাদারকে সাহায্য করে রাজনৈতিক দলের নেতা উপনেতা আর ঘুষখোর ছোট বড় প্রশাসক—এ সত্য আজ কারোও অজানা নেই। প্রতিদিনের সংবাদ পত্রে কৃষকের এই আর্ত্তনাদ ছাপা হয় কিন্তু কারোরই প্রাণে কোন সাড়া জাগায় না। বছরের পর বছর এই অবস্থাই চলছে এবং চলবে। এ যেন আমাদের দেশের বিধির লিখন। আর কোন ভাগ্যবান কৃষক যদি উপাদান সংগ্রহ করতেও পারেন তার ফল ভোগ করবে ধনী কৃষক বা অন্য সুবিধা-ভোগীরা। ব্যবসায়ীরা, সরকারী সংগ্র-হকারী ও বণ্টনকারীরা সর্ব্বদা ঝোল টানবে নিজের কোলে—ফলে দ্রব্য উৎপাদন ও মূল্য স্বাভাবিক অর্থনৈতিক নিয়ম মেনে চলবে না। গত বছর আমাদের দেশে সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত হয়েছে—সবার প্রাণ ভরা আশা, পেট ভরে চারটি ভাতকটি খেয়ে বাঁচা যাবে। কিন্তু এবছরই প্রায় দুর্ভিক্ষের অবস্থা কেন? এর উত্তর খুব সোজা, দুর্নীতি—পর্ব্বত প্রমাণ দুর্নীতি। এর ধারক বাহক জ্ঞানে অজ্ঞানে দেশের অনেক মানুষ যারা জাতীয় জীবনমরণ এর চেয়েও ব্যক্তিগত লোভকে সযত্নে লালন করে। এদের সংখ্যা এতোই বেশী যে কে কাকে শাসন করবে? এরা সর্ব্বত্র জড়িয়ে আছে সমাজের উঁচু উঁচু আসন দখল করে, দেশের যাবতীয় প্রচার যন্ত্র দখল করে। মূল্যবৃদ্ধি এদের সৃষ্ট সমস্যা।

এরপরে শিল্প উৎপাদনের কথা। কৃষি উৎপাদনের কিছু বৃদ্ধি দেখা গেলেও, শিল্প উৎপাদনে গত কয়েক বছর বিশেষ কোন বৃদ্ধিই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। পরিকল্পনার উৎপাদন লক্ষ্য থেকে অনেক শিল্পই পিছিয়ে আছে। অথচ দেশে শিল্প বিস্তারের যে সুযোগ রয়েছে তার তুলনা হয় না। সেখানেও শুধু নাই আর নাই। কয়লা নাই, বিদ্যুৎ নাই, পরিবহনের সুযোগ নাই। কিন্তু এটিও মানুষের তৈরী সমস্যা ভিন্ন আর কিছু নয়। এক শ্রেণীর শ্রমিক নেতার ভূমিকা এখানে মুখ্য। মজুর কল্যাণের নামে এরা আরো পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের ক্রমাগত উত্তেজিত করে চলেছে। স্ট্রাইক্ আজ অতি সাধারণ ঘটনা। এর ওপরও কাজ না করার আরো কতো কৌশল যে আছে তার ঠিক নাই। ফলে উৎপাদন হ্রাস ও উৎ-পাদিত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি। সে বৃদ্ধি আজকাল বছরে বছরে নয়, মাসে মাসে মাসেও নয়, দিনে দিনে। এর শেষ

নেই। মূল্য বৃদ্ধি চলছে চলবে। এটা দেশের অর্থমন্ত্রী থেকে ছোট বড় সবাই আমাদের প্রতিদিন শোনাচ্ছেন এবং আমরাও প্রায় দৈবের মতো অমোঘ বলে একে ধরে নিয়েছি। আমাদের দেশের শ্রমিক নেতারা শ্রমিক দরদী না আত্ম-দরদী পার্টিদরদী। ওঁরা প্রথমটি নিশ্চয়ই নন নইলে উৎপাদন বৃদ্ধি না করে শুধু মজুরী বৃদ্ধির জিগির যে কতো অচল খিয়োরী তা আজ সবাই জানে। কিন্তু ওদের কাছে দেশ বা দেশের জনসাধারণ তো কেউ নয়, কিছু নয়। এরা নানা ভাঁওতায় সরল শ্রমিকদের অকর্মণ্য বানান অথচ নিজেদের পকেট ঠিকই মোটা করেন। তাছাড়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পবিত্র কর্মে দেশের কোটি কোটি শ্রমিককে দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহার করা তো এদের পবিত্র কর্ত্তব্যের একটি। তাতে যাক্‌সে গরীব রসাতলে, দেশের ভবিষ্যত রসাতলে। আজ কলকার-খানায়, খনি বন্দরে এদের দাপটে নৈরাজ্য চলছে। এমন দৃষ্টান্ত বহু দেখা যাচ্ছে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য -একই দলের পতাকা নিয়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কাঁপিয়ে পড়েছে একই প্রতি-ষ্ঠানে, গড়ছে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন। প্রকাশ্যে চলেছে পরস্পরের প্রতি কর্দ্দম নিক্ষেপ। রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠালাভের এমন সোজ সরল পথ তো আর নেই, অতএব ভারতমাতা তুমি রিক্তা থেকে আরও রিক্তা হতে থাকো। এ সব ক্রিয়াকর্মের নিট ফল—উৎপাদন হ্রাস বা তার বৃদ্ধি রোধ ফলে মূল্যবৃদ্ধি।

উপসংহারে বলতে পারি মানুষের সৃষ্টি করা এই অসহনীয় অবস্থা আবার মানুষই দূর করতে পারে। দেশে সবচেয়ে বড় অভাব চরিত্রের, দৃঢ় নৈতিক চরিত্রের। নৈতিক নেতৃত্ব ভিন্ন এ সমস্যার সমাধান কিছুতেই হবে না। কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্য, পৃথিবীর বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর অমূল্য সাহায্য ও উপদেশ কিছুতেই আমাদের আর বাঁচাতে পারবে না। দুর্নীতির প্লাবনে সব ভেসে যাচ্ছে ও যাবে। সংকল্পে কঠিন, চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, সেবাব্রতী ভারতবাসীগণ এগিয়ে এসে সমাজের সর্ব্বক্ষেত্রে নৈতিক নেতৃত্ব দিলে এই পৈশাচিক উল্লাস স্তব্ধ হতে পারে। মনে মুখে এক হয়ে জীবন পণ করে যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার সময় এসেছে একথা প্রতি প্রবন্ধেই বলে আসছি। কেউ ছোট নয়। চরিত্রে ছোট না হলেই হ'ল। সমাজে যে যেখানে আছে রুখে না দাঁড়ালে পিশাচেরা নরকের আগুনে সবাইকে পুড়িয়ে মারবে! মূল্যবৃদ্ধি সেই আগুনের একটি শিখা মাত্র। দেশের যুবশক্তিই দেশের সঞ্জীবনী শক্তি, দেশের আশা ভরসা। তারা কী এগিয়ে আসবে না দেশকে বাঁচাতে, তাদের অসংখ্য পূর্ব্বসূরী শহীদদের মতো?

গ্রন্থ সমালোচনা ঃ

রুশ লেখক সোলজেনিৎসীন

ও

গুলাগ আর্কিপেলেগো

রুশদেশের সাহিত্যিক সোল-জেনিৎসীন "গুলাগ আর্কিপেলেগো" বইখানা লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। কিন্তু এই বইখানির জন্য তিনি রুশ দেশের সাহিত্যিক সম্প্রদায় হতে বহিষ্কৃত ও নিজ জন্ম-ভূমি থেকেও বিতাড়িত হয়েছেন। সম্প্রতি তিনি সুইজারল্যাণ্ডে স্থায়ী ভাবে বসবাস করবেন বলে স্থির করে-ছেন, যদিও ইংলণ্ড, আমেরিকা ও আরও অনেক দেশ তাঁকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন ও নিজ নিজ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করবার কথাও বলা হয়েছে। স্টালিন বেঁচে থাকলে সোলজেনিৎসীনকে আর রুশদেশ হতে বিতাড়িত হ'তে হোত না, নিজ দেশেই তিনি 'খতম' হয়ে যেতেন। বর্ত্তমান রুশগভর্ণমেণ্টের কিছু উদার ভাব, ও সবচেয়ে বড়, সারা বিশ্বের জনমত তাঁর পক্ষে দাঁড়াতে তিনি বেঁচে গেলেন প্রাণে।

এক সোভিয়েট এরোপ্লেন তাঁকে রাশিয়া থেকে এনে ফ্রান্সে নামিয়ে দিয়ে চলে যায়। তার স্ত্রীকেও এখন রাশিয়া থেকে বাইরে যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

এই "গুলাগ আর্কিপেলেগো" বই গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকের স্টালিন গভর্ণমেণ্টের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের বিশদ বিবরণ, যা এতদিন অন্ধকারে ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর "All

quiet on the Western Front" বইখানা যেমন সারা যুদ্ধোত্তর জগতে আলোড়ন এনেছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 'গুলাগ আর্কিপেলেগো' বই বোধ হয় তার চেয়েও বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তফাৎ শুধু, যে প্রথমোক্ত বইখানিতে লেখক এরিয়া রেমার্ক (জার্মান) কোন দেশ বা কোন গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অভিযোগ করেন নাই, সামান্য দুই এক জায়গা ছাড়া। কিন্তু শেষোক্ত বই খানিতে লেখকের স্টালিন ও তার গভর্নমেণ্টের উপর কঠোর ও করুণ অভিযোগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার্মানীতে কয়েক লক্ষ রুশ বন্দীদের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। বৃটিশ বা আমেরিকান যুদ্ধবন্দীরা নিজ দেশ থেকে রেডক্রশ মারফৎ পেত নিয়মিত খাবার, কাপড়জামা, বই, খবরের কাগজ ও আত্মীয় স্বজনের চিঠি পত্র। কিন্তু এই হতভাগ্য রুশবন্দীরা স্বদেশ থেকে খাদ্যবস্ত্র তো দূরের কথা আত্মীয় স্বজনের চিঠি পত্রও পেত না। এদের জীবন ধারণ নির্ভর করতো জার্মান সরকারের দয়ার উপর, এবং বলা বাহুল্য সে সময়ে জার্মানীর নিজ অবস্থা মোটে ভাল ছিল না; দেশে দারুণ খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব। কাজেই রুশ বন্দীদের অবস্থা সহজেই বোধগম্য। অনাহারক্লিষ্ট বহু রুশসৈন্য বন্দিশিবিরেই মারা যায়, অসহ্য কষ্টে। সোভিয়েট সরকার তাদের কোন খোঁজও করতো না, সাহায্য পাঠান তো দূরের কথা। বহু রুশসৈন্য যারা কষ্ট সহ্য করে বেঁচে ছিল, দিন গুনছিল কবে যুদ্ধ শেষ হবে, কবে দেশে ফিরতে পারবে।

কিন্তু হায়! যুদ্ধশেষে ফল হোল উল্টো। বিজয়ী মিত্রশক্তি জার্মাণী বন্দীশিবিরের সমস্ত বন্দীদের মুক্ত করে দেওয়ার পর সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট সমস্ত রুশসৈন্য, সমস্ত রুশনাগরিক যারা যুদ্ধের সময় রুশদেশের বাইরে ছিল, এমন কি যারা কম্যুনিষ্ট বিপ্লবের সময়ে রাশিয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বসবাস আরম্ভ করেছিল, এদের সকলকেই রুশ দেশে নিয়ে গিয়ে আবার বন্দী শিবিরে নিয়ে রাখে! যুদ্ধের সময় রাশিয়া হতে বহু সহস্র রুশ শ্রমিকদের বলপূর্ব্বক জার্মানীতে নিয়ে আসা হয়েছিল কাজ করবার জন্য, নানা কলকারখানায় ও মাঠে কৃষিকাজে, কারণ জার্মানীতে তখন লোকাভাব। যুদ্ধশেষে মুক্তি পেয়ে তারা দেশে ফিরে দেখে তাদেরও স্থান সোভিয়েট বন্দী শিবিরে। শত্রুর বন্দীশিবির হতে মুক্ত হয়ে এখন নিজের দেশের বন্দী-শিবিরে। লেখক সোলজেনিৎসীনকে ও বিশেষ কারণে এই বন্দী অবস্থায় থাকতে হয় এবং তাঁর 'গুলাগ আর্কিপেলেগো' বইতে এদের বিশদ বিবরণ আছে।

প্রথমতঃ এই সব বন্দীদের অপরাধ কি? লেখক লিখেছেন "এদের অধিকাংশই তরুণ সৈন্যদল, অতি সরল, মূর্খ ও রাজনীতিতে একেবারে অনভিজ্ঞ। কোথায় যুদ্ধের অবসানে দেশে ফিরে বীরের সম্মান পাবে, প্রশংসা পাবে, তা নয়, অদৃষ্টের পরিহাস—নিজের দেশে আবার বন্দী! স্টালিনের অভিযোগ কেন তারা যুদ্ধে প্রাণ না দিয়ে শত্রুর কাছে আত্মসমর্পন করলো। এত বছর তারা শত্রুর দেশে ছিল, হয়ত শত্রুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, হয়ত তাদের মধ্যে শত্রুর গুপ্তচরও আছে, এদের মুক্ত রাখা চলের কারণ।"

সোলজেনিৎসীন লিখছেন "গুপ্তচর ভয়ও সর্বজনে সংশয় ছিল স্টালিনের ম্যানিয়া। স্টালিনের দিব্যচক্ষু দেখতো যে তাঁর দেশ কেবল গুপ্তচরে ভর্ত্তী। তাঁর মতে একজন দোষীকে ধরবার জন্য যদি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই জনকে বন্দী করে রাখতে হয়, তো সেও ভাল।" এই রুশসৈন্যদল, এতদিন যারা শত্রুর দেশে কাটিয়ে এসেছে, এদের কি করে বিশ্বাস করা যেতে পারে। সুতরাং আগে তাদের বন্দী শিবিরে (prison Camp) রাখা হোক। পরে তাদের দেখা যাবে পরীক্ষা করে।

আবার শত্রুর বন্দীশিবির হতে মুষ্টিমেয় কয়েকজন- রুশসৈন্য নানা বিপদসঙ্কুল পথে পালিয়ে দেশে ফিরে আসতে পেরেছিল, তাদেরও রক্ষা নেই। সাধারণতঃ শত্রুর হাত থেকে পালিয়ে আসতে পারা সবদেশেই বীর ও বুদ্ধিমানের কাজ বলে গণ্য হয়। গতযুদ্ধে কয়েকজন বৃটিশ পাইলট জার্মানির বন্দীশিবির হতে রক্ষীদের চোখে ধুলা দিয়ে নানা বিপদের মধ্যে সুইডেন হয়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল ও ইংলণ্ডে চরম বাহাদুরীর সম্মান লাভ করেছিল। সে দুঃসাহসিকতার বিবরণের বই বেড়িয়ে গেছে (The Wooden Horse)

কিন্তু রুশবন্দীদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। "কি করে তুই এলি? অন্যেরা আসতে পারল না, আর তুই এত সহজে চলে এলি? ব্যাপারটা সন্দেহ জনক বলে মনে হচ্ছে। সত্যি করে বল জার্মানরা কি কাজের জন্য তোকে পাঠিয়েছে?" এমন কি বুখেন ভাল্ডে Buchenwald Concentration Camp)—যাকে বন্দীশিবির না বলে মৃত্যুশিবির বলা হয়, যুদ্ধের শেষে সেখানে কিছু জীবিত রুশ (ইহুদি?) পাওয়া যায় ও তাদের রুশদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু স্বদেশে তাদের নিস্তার নেই। "কি করে তোরা বেঁচে রইলি? নিশ্চয়ই তোরা জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলি" —ইত্যাদি, এবং শেষ পর্যন্ত স্বদেশেও তাদের বন্দীশিবিরে অবস্থান। লেখক সোলজেনিৎসীন

লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, এস্টোনিয়া, রুমানিয়া) রুশের উপরে। এবং এইসবদেশের জনসাধারণ চার্চিল ও রুজভেল্টের নীতির উপর বড় বেশী রকম আস্থা ও শ্রদ্ধা রাখতো। কিন্তু পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতার জন্য যারা গ্যারান্টি দিয়েছিল, ১৯৪৫ সালে তারা স্টালিনের দাবীর কাছে হার মেনে এত শীঘ্র সে গ্যারান্টীর কথা ভুলে গেল। তাছাড়াও যে কয়েক সহস্র রুশ যুদ্ধবন্দী জার্মানদের প্ররোচনায় ভুলে এবং অনাহারের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে জার্মানদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, এবং যুদ্ধশেষে যারা আর রুশদেশে যাতে ফিরে যেতে না হয় সেই আশায় বৃটিশ ও আমেরিকানদের কাছে আত্ম সমর্পণ ও শরণ চেয়েছিল, সেই বৃটিশ ও আমেরিকানরা তাদের সকলকে স্টালিনের দাবীতে কি করে রুশদেশে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে দিল।"

GULAG (Glawnoje upra-wlenije lagerej-অর্থাৎ Main administration of prison camps সম্বন্ধে স্টালিনের সময়কার অনেক অজানা ও গোপন তথ্য সোলঝেনিৎসীন জগতের সম্মুখে বার করেছেন অনবদ্য ভাষায়। শুধু সাহিত্যের দিক থেকে নয়, ইতিহাসের দিক থেকেও এরূপ অপূর্ব গ্রন্থ খুব কমই বাহির হয়েছে।

নিশানা

কালী কিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

নিশানা
পাই কিছু নিশানা
কোথা আজ
লক্ষ্যের ধ্রুবতারা
সংশয়-মেঘে হারা
মনোমাঝে।
নির্ব্বাণ মুক্তি,
বহুকাল নিল অনুরক্তি
ক্রমে হলো ফ্যাকাশে
পরলোক
ভুলে গিয়ে মরলোক
প্রমত্ত ভাবনায় ভাসে।
সম্পদ সম্মান
পানে হই ধাবমান
সকলে
সম্ভোগ বিলাসে
কতশত মানুষে
বলি দিয়ে।
অজস্র বিত্তের
সুচতুর লুণ্ঠনে চিত্তের
মহাসুখ পাই
রেশারেশি
কে কত পেয়েছে বেশী
নিশানাটা তাই।
স্বাধীনতা অর্জ্জন
বিদেশীর দাসত্ব বর্জ্জন
এলো ঢেউ
লাখে লাখে,
সে নিশানা ধরে বুকে
উতল উধাও।
অসাম্য
মানুষে মানুষে নয় কাম্য
ঘুচুক এবার
খেয়ে প'রে
সবাই ঘুমুবে ঘরে
নেই অনাহার।
মানুষের সম্মান
শক্তিমানেরাও ক'রবে না ম্লান
যত ছোট তা' কেউ হ'কনা
মেহনত কাজ
দিয়ে গড়ি নতুন সমাজ
এই হোক্ নিশানা।
অনেকের
শ্রম ঘাম নিয়ে—সুখ কয়েকের
হ'তে দেওয়া হবেনা
ভাগ্যের
দোহাই দিয়ে—স্বর্গের
সম্ভোগ রবেনা।
বিনা শ্রমে
সুখভোগ—চাতুরীর মাধ্যমে
ভাগ্য নয়—বুঝুক সবাই
বোঝাবার
এ দায়িত্ব তোমার আমার
নিশানাটা তাই।

চিন্তাজগতে শোষণ এবং প্রতিকারের উপায়

"অনামী"

সর্বতন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে মানব-চেতনা জাগরূক ও মানববিবেক সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। প্রায়শঃ বস্তুজগতে শোষণ তথা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রই মানুষের চোখে ধরা পড়ে প্রকট হ'য়ে। তাই বস্তুবাদী চিন্তার ঢক্কানিনাদে মানব-সমাজের সমস্ত ব্যাধির মূল অন্বেষণে বেশীরভাগ মানুষই পরাঙ্মুখ। অথচ একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, চিন্তা-জগতে শোষণ (thought exploitation) বস্তুজগতের শোষণের (material exploitation) চেয়ে অনেক বেশী আদিম এবং সুদূরপ্রসারী। এমন কি বস্তুজগতে শোষণের মূলেও রয়েছে চিন্তার শোষণ। স্বাধীন, স্বতঃস্ফূর্ত চিন্তাকে পঙ্গু করে দেওয়ার সচেতন অথবা অচেতন বা অবচেতন বিচিত্র প্রয়াস অনুধাবন করলে বিস্মিত হ'তে হয়। কেননা, চিন্তার শোষণই মূল ব্যাধি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণ উপসর্গমাত্র (symptom)। তাই চিন্তার শোষণ, বিকৃতি এবং ব্যভিচার নিরুদ্ধ না হ'লে সুখী, সুস্থ, সুন্দর মানবসমাজের কল্পনা অলীকমাত্র।

'A thing in a finer state acquires more potency than the gross one.' সূক্ষ্ম সব সময় স্থূলের চেয়ে বেশী শক্তিশালী। তাই স্থূল শোষণ থেকে ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম শোষণের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে স্থূল-শোষণের কারণস্বরূপ চিন্তার শোষণ। কেননা বিকৃত চিন্তা অসুস্থ ভাবনা, বিচ্ছিন্ন জীবনদর্শন, আপাতসিদ্ধ যুক্তির মোহজাল মানব-সমাজের শোষণের মূলে আছে। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে লক্ষিত হয় যে, অধিকারস্পৃহা মনো-বৃত্তির (possessive instinct) সূচনা মানুষের আগুন-আবিষ্কারের পর থেকে অথবা কৃষিকার্যের আদিপর্বে। সামন্ত-তান্ত্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রাথমিক স্তরে দেখা যায় যে, কতিপয় ব্যক্তির হ'লো জমির মালিকানা অথচ বিরাট গণশক্তি ধীরে ধীরে হ'ল ভূমিদাসে রূপান্তরিত। এমনটি নিশ্চয়ই নয় যে, জমির মালি-কানা অসংখ্য বলবান মানুষ কতিপয় ব্যক্তিকে ছেড়ে দিয়েছিল শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষমতায় পর্যুদস্ত হয়ে। দৈহিক ক্ষমতার চেয়ে চিন্তার ক্ষমতা অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী। ভাবের ঘরে ভেজাল : বস্তুতে ভেজালের চেয়ে অনেক বেশী লাভজনক এবং স্বার্থরক্ষায় অধিক ফলপ্রসূ। তাই সম্পত্তিবোধ জাগরণের আদিম লগ্নে যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি জমির মালিকানা অর্জন করেছিল, তারা সুকৌশলে অসংখ্য মানুষের চিন্তাকে মুষ্টিমেয়ের অনুকূলে প্রভা-বান্বিত করতে পেরেছিল। এই কতিপয় শোষক অসংখ্য শোষিতের চেয়ে চাতুর্যে, কৌশলে, এমন কি হৃত বাশক্তিতে, দূরদৃষ্টিতে, চিন্তায় অগ্রগামী ছিল। তাই মুষ্টিমেয় শোষকের প্রচারিত ভাব ও ধারণার আফিমে অসংখ্য শোষিতের স্বাধীন, ঋজু চিন্তার অবসাদ এলো। এই মুষ্টিমেয় শোষক অসংখ্য শোষিতের জন্য একটা make-believe world বা অলীকজগৎ তৈরী করতে পেরেছিল। শোষক অসংখ্য শোষিতকে বোঝাতে পেরেছিল যে, শোষকই তাদের মা-বাপ—অসংখ্য শোষিতের সবচেয়ে সুখ শোষকের তাঁবেদারীতে। যেহেতু চিন্তাশক্তিতে শোষক ছিল অনেক অগ্রগামী, তাই তার সৃষ্ট চিন্তার সম্মোহনে ঝিমিয়ে পড়েছিল চিন্তা জগতে পেছিয়ে-থাকা অসংখ্য মানুষের বুদ্ধি। একথা আজও খাটে। যারা নির্যাতিত, তারা বুঝতে পারে না যে তারা নির্যাতিত। শোষককে শোষিত মনে করে বন্ধু, বন্ধুকে মনে ক'রে শত্রু। কেন এমন হয়?

পূর্বেই বলেছি, দৈহিক ক্ষমতার চেয়ে সূক্ষ্ম চিন্তার শক্তি অনেক বেশী। এই চিন্তাশক্তির বহুমুখী অপপ্রয়োগই বস্তুজগতে শোষণের ভিত। চিন্তায় অনগ্রসর ব্যক্তি তার থেকে চিন্তা এবং বুদ্ধিতে উন্নত ব্যক্তির দাসানুদাস হ'য়ে পড়ে। Inferior intellect succumbs to the superior intellect. ক্ষুদ্র চিন্তাশীল ব্যক্তির স্বকীয়তার (originality) অপমৃত্যু তথাকথিত চিন্তানায়কদের সর্বগ্রাসী বুদ্ধির যূপকাষ্ঠে। ব্যক্তি পূজার (Personality cult) রহস্যের এটাই চাবিকাঠি। একেই বলে 'অজগরের প্রেম'। ব্যক্তিপূজোর বাড়াবাড়ি মোটেই ভক্তি নয়, শ্রদ্ধা নয়। বরং স্বাধীনচিন্তার অপমৃত্যু, অন্ততঃপক্ষে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অপমৃত্যু। অগ্রসর পরিমাণবোধ ছাড়া ভাল এবং মন্দ বোঝা যায় না। ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে ভাল এবং মন্দ, শুভ এবং অশুভ, শ্রেয় এবং প্রেয় সম্পর্কে নানা-মুনির নানামত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্থায় মন এবং বুদ্ধির বৈচিত্র্যহেতু মত ভিন্ন ভিন্ন, পথ ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং চিন্তাজগতে শোষণের সুযোগ অবারিত। এই চিন্তার-শোষণ থেকে মুক্তির পথ কী??? হ্যামলেটের "to be or not to be"র প্রহেলিকার হাত থেকে মানুষের বাঁচার পথ কী? নীতি? মূল্যবোধ? নীতি এবং মূল্যবোধের ভিত্তি কী?

নৈতিক অনুশাসন মানা বা না মানার পেছনে কী যুক্তি, কী সার্থকতা? প্রাচীন মূল্যবোধ ভাঙলে ক্ষতি কী? কোনও মূল্যবোধের আদৌ কি কোনও প্রয়োজন আছে? নয়া মূল্যবোধই বা কি এবং কেন? কোন নয়া মূল্যবোধ, নয়া সামাজিক-নীতি সত্য এবং মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে মানুষের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ এবং অনাবৃত রাখতে পারে? পারে কী মন এবং বুদ্ধির বিবিধ আরোপপ্রবণতা (Superimposition) শুদ্ধ ক'রে অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ জাগাতে?

শোষণের ভিত্তি ব্যাপক ও সুদৃঢ় করার জন্য তৈরী হয় নতুন নতুন মূল্যবোধ এবং নীতি। বলা বাহুল্য, সকল নয়া মূল্যবোধ এবং নয়া সামাজিক-নীতি (social ethics) আরোপ-দোষদুষ্ট বিচ্ছিন্ন জীবনদর্শন এই ধরণের বিকৃতির সূতিকাগার। নয়া মূল্যবোধ এবং নৈতিক অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় চরম ঔদার্যের নামাবলীতে এবং আপাতরম্য যুক্তির ইন্দ্রধনুবাশে। আর সাধারণ এবং অনেক অসাধারণ মানুষও দিশেহারা হয় ঐ অলীক জগতে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ ছিল "white man's responsibility" বা অশ্বেতাঙ্গদের মানুষ করার পবিত্র ভণ্ডামিতে। যে কোনও অন্যায়ের সাফাই গাওয়া চলে, যদি "পবিত্র" বা "মহান" শব্দটিকে জুড়ে দেওয়া যায়। বিশ্বের মানুষের মুক্তি-দাতা হিসাবে কোনও দেশ বা জাতি বা ব্যক্তি যদি আত্মপ্রকাশের ভাঁড়ামি করতে চায়, তার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র হয় কিছু গাঁজানো মূল্যবোধ এবং আজগুবি নয়া নীতির অবিরাম সংকীর্তন।

হিটলারের জার্মান-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নির্বিকার ঘোষণা এবং উন্মাদনার মূলেও আছে সূক্ষ্ম চিন্তার সম্মোহন, ভাবের ঘরে চুরি। কার দায়িত্ব, কি দায়িত্ব, কেন দায়িত্ব—এ প্রশ্নগুলিকে দাবিয়ে দেয় সর্বগ্রাসী ভাবোন্মাদনা। তৈরী করে একটি ব্যাপক সাংস্কৃতিক স্নায়ুবিকার (cultural neurosis). তখন চিন্তায় জবুথবু মানুষ পতঙ্গের মত যে কর্মাগ্নিতে আত্মাহুতি দেয়, তা আত্মহত্যার নামান্তর!

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তা মার্কস-কথিত নয়া সামাজিক নীতিও আরোপদোষদুষ্ট এবং ভাবোন্মাদনায় পূর্ণ। তাঁর বিচ্ছিন্ন জীবনদর্শন বিবিধ অসংগতি এবং সাংস্কৃতিক স্নায়ুবিকারের জন্য দায়ী। মার্কস বস্তুবাদী হ'লেও কার্যক্ষেত্রে তাঁর বস্তুবাদের ভিত্তি হ'ল ভাববাদ। এই পরস্পর-বিরুদ্ধতাই সবচেয়ে ক্ষতিকর। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, চে গুয়েভারা মুখে বস্তুবাদী, অন্তরে ভাববাদী। আদর্শের বেদীমূলে ত্যাগ না থাকলে আদর্শের বাস্তব—রূপায়ণ সম্ভব নয়। মার্কসবাদে আস্থাশীল যে কোনও বিপ্লবী চে গুয়েভারার মত ত্যাগে বিশ্বাসী এবং সংকীর্ণ ভোগবাদ দর্শনের বিরোধী। যিনি ত্যাগের মহিমায় বিশ্বাসী, তিনি ভাববাদী, না, বস্তুবাদী? ত্যাগ কী? বস্তু, না, ভাব? spirit of sacrifice or matter of sacrifice? ত্যাগই হ'ল বিপ্লবীর জীবনদর্শন। কেন মানুষ ত্যাগ করে? পরহিতার্থে? কেন পরহিত করতে যাবে মানুষ? ত্যাগে আনন্দ? ত্যাগে যে আনন্দ, সেই আনন্দের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে যে, ত্যাগ বস্তু নয়, ভাব। অথচ ভাববাদের বিরুদ্ধে মার্কসের বিপ্লবী বিবেক সোচ্চার। তাই মার্কসের 'সামাজিক নীতি'র স্থির ভূমি নেই। তাঁর বিচ্ছিন্ন জীবন-দর্শন চিন্তার শোষণ থেকে মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে পারেনা—পারেনা অপ্রমত্ত পরিমাণবোধ জাগাতে, পারেনা সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণ থেকে অচঞ্চল, ধ্রুবসত্যের দিশারী দিতে। তাই রজোগুণসম্ভূত মন এবং বুদ্ধির অসংখ্য বিকৃতি থেকে মার্কসবাদ মানুষকে মুক্ত করতে পারেনা।—

বিচ্ছিন্ন জীবনদর্শন কাকে বলে? বিচ্ছিন্নতা (Alienation) কি? একাত্মতা (Integration) বা কি এবং কেন?

ত্যাগের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলেই এ প্রশ্নগুলির সদুত্তর পাওয়া যাবে। "Love your neighbour as yourself. But why should I do so since by the order of nature, I feel pain and pleasure only in myself and not in my neighbour The answer is not in the Bible but it is in the vedas—in the great formula—'তত্ত্বমসি'—That thou art—which gives in three words, metaphysics and morals together" যে কোন-ও নীতির প্রকৃত স্থিরভূমি metaphysics বা দেহাতীত জীবনদর্শন। ত্যাগের প্রেরণার উৎস-সন্ধানে সচেষ্ট হলে এক দেহাতীত দর্শনে পৌছুতে মানুষ বাধ্য। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রবক্তারা মৃত্যুকে জীবনের অংশ বলে মনে করেন না। মৃত্যুচেতনা তাঁদের দর্শনে কোনও স্থান পায় না। যদি মৃত্যুই জীবনের সমাপ্তি হয়, তাহলে জড়ের বিকারস্বরূপ এই মানবদেহ মৃত্যুর পর পৃথক জড়ে রূপান্তরিত হয় মাত্র। সুতরাং এই জীবনের কামনা-বাসনার সঙ্গে মরণোত্তর পরিবর্তিত জড়দেহের কোনও যোগসূত্র থাকছে না। তাহলে অন্যায় যথেচ্ছ আচরণ করতে বাধা কী? কেন না, মৃত্যুর পর খারাপ কাজের জন্য কোন বস্তুবাদীকে জবাব-দিহী করতে হয় না। মৃত্যুর পর

জীবনের Continuity বা যোগসূত্রের কথা উড়িয়ে দিলে সর্ব নীতি এবং মূল্যবোধ অর্থহীন হয়ে পড়ে। দেহাতীত জীবনদর্শনের নামগন্ধহীন মার্কস-কথিত সামাজিক নীতির অনুশাসন মানা বা না মানার জন্য প্রকৃতপক্ষে কিছু এসে যায় না। এটি মার্কসীয় দর্শনের সবচেয়ে বড় ত্রুটি। দ্বিতীয়তঃ বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ মানে অনেকাংশে দেহবুদ্ধিরও ত্যাগ, কামনা-বাসনা ত্যাগ। স্থূল বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে কি নিয়ে বিপ্লবী বাঁচার মত বেঁচে থাকে? উত্তরে বলতে হয়, meta-physics—এমন একটা কিছু, যা নশ্বর বস্তুর মত হারাবার নয়—যা বাইরের জগতের বস্তু নয়, যা অন্তরের ঐশ্বর্য। তাই অর্থনৈতিক অভিসন্ধির (Economic motive) মত স্থূল প্রেরণা ত্যাগের আনন্দের ব্যাখ্যা করতে পারে না। ত্যাগীর যেখানে আনন্দ, সেখানে অন্তর্জগৎই সব, বহির্জগৎ অকিঞ্চিৎকর। ত্যাগীর মূল আশ্রয় পরহিতের চিন্তা বা Idea, মার্কসবাদী বলেন, চিন্তাও ত' বস্তু (matter)। কিন্তু চিন্তা কেমন বস্তু? স্থূল? সূক্ষ্ম? ভাব বস্তু (Thought-material)? ভাব-মূর্তি? বস্তুর মূলে আছে শক্তি (Energy)। তাহলে কি "চিন্তা" হচ্ছে ভাবশক্তি? সব শক্তির উৎস হচ্ছে বিশ্ব শক্তি (Cosmic Energy or Absolute Energy)। এই বিশ্বশক্তির উৎস কি? ভাব, না, বস্তু? বিজ্ঞান নীরব, মার্কসও। সুতরাং ত্যাগকে বস্তু আখ্যা দেওয়া কি যুক্তি-সংগত? যদি ত্যাগের মূল প্রেরণা 'ভাব' বা Idea হয়, তাহলে সকল আদর্শের মত মার্কসবাদেরও মূল ভূমি ভাববাদ, বস্তুবাদ নহে। তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক-উদ্দেশ্য-মুক্ত অন্য কোন প্রেরণাই মানবজাতির সভ্যতা, সংস্কৃতি, নীতি এবং আদর্শের স্রষ্টা, ধারক ও বাহক। "Disinterested Intellcetual curiosity is the life blood of modern civilisation." অর্থনৈতিক অভিসন্ধি (Economic Motive) জ্ঞানের জগতে, ত্যাগের জগতে, সৃষ্টির ক্রমবিকাশে মূল ভূমিকা গ্রহণ করে নি। তাই যে মার্কসীয় নীতিজ্ঞানের একমাত্র প্রেরণা অর্থনীতি তা শুধু একপেশে নয়, আত্মহত্যার নামান্তর। চতুর্থতঃ, যে কোনও জড়-দর্শনের বিভক্তিয়া এই যে, তা মানুষকে অন্নময় কোষে নামিয়ে রাখে বড় জোর প্রাণময় কোষের কিঞ্চিৎ স্বাদ দিতে পারে। মানুষের বিবর্তন যে বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষে, তার সন্ধান মার্কসীয় দর্শন দিতে পারে না।

ভূমৈব সুখম্, নাল্পে সুখম্। ব্যাপ্তিতে প্রকৃত আনন্দ,সংকীর্ণতায় প্রকৃত দুঃখ। চরম ব্যাপ্তিই ভূমা বা অসীম। অসীমের সঙ্গে মানুষ "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" সম্পর্কে বিধৃত। ভেদ (Alienation) এবং অভেদ (Integration)। একই সময়ে এই ভেদ এবং অভেদ। চিন্তার অতীত এই সম্পর্ক। স্থূল চেতনায় (Superficial Conciousness) অসীমের সঙ্গে ভেদ বা বিচ্ছিন্নতাই ধরা পড়ে। চেতনার গভীরতম স্তরে মানুষ এবং অসীম অভেদ বা একীভূত। তাই মানুষের মধ্যে নিহিত সুপ্ত গভীরতম চেতনার উন্মেষই সবচেয়ে বড়ো আনন্দ। অসীমের সঙ্গে অভেদের (Integration) সম্পর্কটা এত বেশী অব্যক্ত যে মানুষ ভাবভেদও পারে না অসীমের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার কথা। অথচ মানুষের মধ্যে অনন্ত-চেতনা আত্মপ্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি ক'রে। তা কোথাও ব্যক্ত, কোথাও অব্যক্ত। কেউ বুঝতে পারে, কেউ বিস্মৃত। এই বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিতে, সুপ্তি থেকে জাগরণে, ভেদ (Alienation) থেকে অভেদে (Integration) সচেতন পরিক্রমাই মানব-প্রগতির দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত কাঙ্ক্ষিত ইতিবৃত্তি। তাই সংকীর্ণতা থেকে ভূমায়, ভোগ থেকে ত্যাগেই চরম আনন্দের সঞ্জীবনীসুধা। অসীমের সঙ্গে একাত্মতার চরম প্রকাশ অহম-বিলুপ্তিতে, চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উর্ধ্বে। তখন সোঽহম্।

সুতরাং বিচ্ছিন্নতাবোধ (Sense of Alienetion) শুধুমাত্র জনগণ থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়। প্রকৃতপক্ষে, অসীমের থেকে বিচ্ছিন্নতা। ক্ষুদ্র-অহং-এর থেকে কিছুটা ব্যাপ্তি জনগণের সঙ্গে একাত্মবোধে। তাই এই একাত্মবোধের মূল প্রেরণা অসীমের টান। তাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপ্লবীরা বলেন: আমি আনন্দিত। অসীমের সঙ্গে মানুষের অভেদের (Integration) সম্পর্কটি মানবচেতনায় পরিস্ফুট হওয়ার একটি সোপান এই দেশপ্রেম বা ত্যাগ। মানুষের অনুভূতি যত কেন্দ্রাতিক (Centripetal), তত বিচ্ছিন্নতাবোধ। এই অনুভূতি যত কেন্দ্রানুগ (centrifugal), ততই ত্যাগের প্রেরণা, চতুর্বিংশতি-তত্ত্বের অবলুপ্তির সম্ভাবনা, অহং-মুক্তির পদধ্বনি। সুতরাং ত্যাগ বস্তু নয়, ভাবমাত্র। বস্তু থেকে ভাবে, ভাব থেকে মহাভাবে মানুষের দুর্গম পথচলাই প্রগতি। এই প্রগতির বিচিত্র স্তরে নীতির ভূমিকা কি? নীতি এবং মূল্যবোধের একমাত্র অবদান হচ্ছে প্রত্যেক মানুষকে তার আত্মিক স্তর থেকে উচ্চতর আত্মিক স্তরে উন্নীত করা। নীতি উপায় (Means), লক্ষ্য চরম ব্যাপ্তি বা ভূমা 'ন কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি।' উপভোগ নয়, বৈধী ভোগ। সংস্কার অনুযায়ী, আত্মিক-স্তর অনুযায়ী প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি-মার্গের সঠিক ক্রমবিন্যাসই

নীতির ভূমিকা।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরামনঃ
মনোসস্তু পরাবুদ্ধিঃ বুদ্ধেরাত্মা মহানপরঃ॥

বিষয় বা বস্তুর থেকে ইন্দ্রিয় বড়।

ইন্দ্রিয়ের থেকে মন বড়। মনের থেকে বুদ্ধি বড়। বুদ্ধির থেকে আত্মা বড়। এই আত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎকার ছাড়া চিন্তাজগতে শোষনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার নান্য পন্থা। বাঁচার মত যে বাঁচা, তা Abstract কিছু বা 'ভাব' নিয়ে বাঁচা। তাই মানুষকে যা ধরে রাখে এবং মানুষ যা আঁকড়ে ধরে থাকে, তার নাম ধর্ম। আত্মানুভূতি বা Realisation ছাড়া আরোপদুষ্ট বুদ্ধির কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই, চিন্তার শোষনের বিরাম নেই।

বিবেকানন্দের ভাষায়: "Microcosm is the miniature repetition of the macrocosm" যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে ক্ষুদ্রভাণ্ডে। সগুন ব্রহ্ম এবং নির্গুনব্রহ্ম—দুইই আছে প্রত্যহ মানুষের অন্তর্জগতে। মানুষের মধ্যে সুপ্ত অনন্ত-চেতনার জাগরনেই চিন্তার শোষনের যবনিকা। [ক্রমশঃ]

(২৩: পৃষ্ঠার পর)

উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য এবং লিপিবদ্ধ করা হল; (বলাবাহুল্য, এখানেই নীতিগত দাবী মিনতিতে পরিনত হল!)

৪) সার্বভৌম এবং সমতার ভিত্তি ছাড়া কোন হীনতর অবস্থাতেই বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে কোন আলোচনায় যোগদান করা সম্ভব নয়। পাকিস্তান ভারত-বাংলাদেশের নীতিবিরোধী দুর্বলতার সুযোগকে লুফে নিল। এবং যুক্তপ্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা বৈঠক ইসলামাবাদে আহ্বান করলো কিন্তু বাংলাদেশের অস্তিত্বকে উপেক্ষা করবার নীতিতে বহাল হইল। পরন্তু মিঃ ভুট্টো বাংলাদেশে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী বন্দীর বিচারের বদলা হিসেবে পাকিস্থানে অন্তরীণ বাংলাদেশীদের পাল্টা বিচারের হুমকি দিলেন। বলাই বাহুল্য সে সভাতে বাংলাদেশ অপাঙক্তেয়ই রয়েগেল। এ আলোচনার মাত্র ৪ মাস পর (২৯/৮/৭৩ পাক-ভারত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, যার মর্ম হল—

১) ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছাড়া সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেয়া হবে;

২) সে বন্দীমুক্তি আর বাংলাদেশের স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল রইল না;

৩) "মানবতা সুলভ" পদক্ষেপই যুগ্ম সংশ্লিষ্ট বিবৃতির প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং ভারত যুগপৎ ত্রিমুখী বন্দী প্রত্যর্পন নীতি মেনে নিলেন।

পাকিস্তানের বুঝতে বাকী রইলনা আর একটু ক্রু-টাইট দিলে পরবর্তী ধাপে বাকী ১৯৫ জন যুদ্ধ বন্দীর মুক্তি-ও আসার হবে। একটা যুদ্ধের জন্যকে শান্তি-বৈঠকে খোয়ানর অন্যতম নিদর্শন-ই বলতে হয় একে!

পাক—ভারত সীমান্তে বিজিত ভূমি ও পশ্চিম সীমান্তে বন্দী বিনিময় অনুষ্ঠান আর বিলম্বিত হলনা। যদি-ও নাটকীয় ভঙ্গিতে যুদ্ধ বিরতিরেখা লঙ্ঘিত হতে লাগলো। উভয় বাহিনীর কমাণ্ডারদের মধ্যে সমঝর্ষ এবং সৌজন্য বিনিময় তরঙ্গাকার ধারণ করলো।

সেনাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে কুখ্যাত টিক্কা খাঁ পাকিস্তান স্বার্থে উপস্থিত হলেন। ভারত পক্ষ তার বিরুদ্ধে টুঁশব্দটি করতে পারলেন না। পাছে নরঘাতক টিক্কা খাঁ-কে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তান চটে যায়? এই নীরব নতি স্বীকারের মধ্যে ভারতীয় দুর্বলতার আর এক ধাপ প্রকট হল। পাকিস্তান তো পরীক্ষামূলক ভাবেই এ সার্থক কূটচাল চেলেছিল।...পরবর্তী ঘটনা সমূহ এ দুর্বলতারই প্রত্যক্ষ ফল!

দিল্লী চুক্তির (১৭ই এপ্রিল, ১৯৭৩) পরিণাম ক্রমে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পথ রচনা করলো। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির (৯ই এপ্রিল, ১৯৭৪) বলে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীও ছাড়া পেলেন। প্রায় ৯০ হাজার পাক যুদ্ধবন্দীতো পূর্বেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন। পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশী নাগরিক ও অনেকে স্বদেশে ফিরেছেন। কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত পাক নাগরিক ৪ লক্ষাধিকের মধ্যে কত জনকে পাকিস্তান ফিরে নেবে সে ব্যাপারটি অনুদার ভাবেই অস্পষ্ট রয়ে গেল।

স্মরণ থাকে, দিল্লী চুক্তির বৈঠকে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ প্রবেশাধিকার পায়নি। অপাঙক্তেয় হয়ে পরদার আড়ালেই তাকে কাল কাটাতে হয়েছে। পাকিস্তান বরাবর দাবী করে এসেছে, বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধটা আদপে পাক-ভারত যুদ্ধ বই আর কিছু নয়।...কাজেই পাকিস্তানের 'মর্যাদা' রক্ষার অতিগরজে বাংলাদেশকে কার্যত অবমাননাই করা হল! স্বেচ্ছায় সানন্দে বাংলাদেশ এ অমর্যাদা গ্রহণ করল বললে ভুল হবে। এ ক্ষেত্রে-ও ভারতীয় দুর্বল আচরণ দুরপনেয় অপকীর্তিরই নামান্তর হয়ে রইল!

তবু কি পাক প্রেসিডেন্ট শান্ত রইলেন? বাংলাদেশের ইউ এন ও-সাধারণ সভায় প্রবেশাধিকার তিনি চীনা যোগসাজশে বানচাল করলেন!

তদুপরি, নতুন সৈন্য সংগঠন এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহে তিনি বেপরওয়া হলেন। আন্তর্জাতীয় ষ্ট্রাটেজিক ষ্টাডিজ্, লণ্ডন (Inter-Natinal Institute of strategic studies, London)-এর হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়—বিগত দুবছরে পাক সামরিক বাহিনী লোকবলে দ্বিগুণ এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রবলে বহুগুণ বলীয়ান হয়েছে। তার সঙ্গে সন্যমুক্ত ২০ হাজার প্রতিহিংসা—প্রবণ সৈন্য যোগ দিলে বিষয়টির গুরুত্ব সহজেই উপলব্ধ হতে পারে।

ভারত সরকার, বারে বারে' অসহায়ভাবে জনসাধারণকে এই বহিঃ শত্রুর সম্বন্ধে সজাগ রাখতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে সামরিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের কথা মুখ ফুটে বলেন নি! কেন?

ইত্যবসরে 'ধর্মপ্রাণ' ভুট্টো সাহেব লাহোর ঐস্লামিক বিশ্ব সমাবেশে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশকে ঐস্লামিক রাষ্ট্রের পরিচয়ে স্বীকৃতি দিলেন। কী কৃপা! পৃথিবীর ১০০টির উর্দ্ধে রাষ্ট্র যাকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাকে স্বীকৃতি না দিয়ে ভুট্টো সাহেবের কি উপায় ছিল? পূর্বাপর দুর্বল নীতি অনুসৃত না হলে, প্রায়শ্চিত্তের পাতির মত এ স্বীকৃতি বাংলাদেশকে গ্রহণ করতে হতনা। সম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন কি এক? তাহলে পূর্ব পাকিস্তান ধ্বংসের যজ্ঞে ভুট্টোই বা এত উৎসাহ পেলেন কি করে?

যা হোক, এই আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি অনুসরণ করে কালবিলম্ব না করে ত্রিপাক্ষিক দিল্লী বৈঠক (৫-৯ এপ্রিল, ১৯৭৪) সাড়ম্বরে আহুত হয়েছিল। এক কথায় পাকিস্তান পূর্বাপর একটি শর্ত-ও না মেনে তার যা কিছু দাবী সব আদায় করে নিল এবং বাংলাদেশ তার যাবতীয় দাবীর নীতিগতভিত্তি বারে বারে খোয়াল। ভারতীয় নেতৃত্ব 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে উপ-মহাদেশের শান্তির ফানুসটি ভারতীয় আকাশ জুড়ে উড়িয়ে আত্মপ্রসাদ আবিস্কারে মশগুল হলো।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তির প্রধান ফসই হল, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও ভারত-বর্ষ একক ভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যার মোকাবলা করবেন। তৃতীয় পক্ষের মাথা ঘামানর অবকাশ তাতে থাকবে না। এখানেই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আরম্ভ এবং শেষ। প্রশ্ন জাগে, সম্প্রতি ত্রিপাক্ষিক চুক্তির নামে ভারত ও বাংলাদেশ পাকিস্তানের জিদের কাছে যা সব সমর্পণ করলো তা আড়াই বছর আগে করলে কি ক্ষতি হত। অন্ততঃ ৯০ হাজার পাকবন্দীর রাহাখরচা হিসেবে ৪৫ কোটি টাকার সাশ্রয় হত নাকি? তাছাড়া যুদ্ধবন্দীদেরকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক ঈর্ষাদ্বেষের আগুনে পাখা চালিয়েই বা কি লাভ হল?

পাকিস্তানের যুদ্ধবাজদের এতে সুবিধে মোল আনাই হবে। পাক-ভারতের মধ্যকার যে সমস্যাগুলো কিছুকাল ঝুলিঘরে ছিল সে গুলো সবই এখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিরই আশঙ্কার মুখে ভারতকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

সর্বোপরি রুশ-চীন আন্তর্জাতিক কোন্দল ভারতীয় উপমহাদেশের ভাগ্যাকাশে ঘন কালো মেঘকে পুঞ্জীভূত করে চলেছে। চীন-ভারত আক্কোশকে জী-ইয়ে রাখার কাজে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সেবিয়েত কূটনীতির অক্লান্ত প্রয়াস লক্ষণীয়। ভারতীয় কূটনীতি রুশ কূটনীতির প্রেমে আকুল। ইতিহাসের শিক্ষা তার কাছে ব্যর্থ। ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠাই যদি ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান ত্রিপাক্ষিক চুক্তির উদ্দেশ্য বলতে হয়, তাহলে রুশ-চীন দাবানলে উপমহাদেশকে আত্মাহুতি দেবার এ উৎকট আয়োজন কেন? ভারতের রুশপ্রেমই পাকিস্তানের চীনাপ্রেমের উদ্দীপক নয় কি? এ-ও মনে রাখতে হবে যে এ-ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে বাংলাদেশকে খাটো করে শুধু তার আভ্যন্তরীন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যা জাতীয় সংহতি বিপন্ন করতে সদাপ্রস্তুত, তাকেই আশকারা দেয়া হয়েছে।

এক কথায় ত্রিপাক্ষিক চুক্তি শান্তির নামে পাক-ভারত যুদ্ধোন্মত্তকেই উৎসাহিত করবে, মনে হয়।

মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ

অংশুমান

জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানাচার্য্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সম্প্রতি মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে ভারতবর্ষের ও বিজ্ঞান জগতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হোল' সেকথা ভেবে এদেশের সকল বিজ্ঞানীই অল্পবিস্তর মর্মাহত হবেন সন্দেহ নেই। বিশ্ববিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদানের বিষয়টি নিয়ে তাঁর মৃত্যুর পর নানা যোগ্য ব্যক্তি নানা ভাবে পর্যালোচনা করেছেন, বা ভবিষ্যতেও করবেন। এ ব্যাপারে কিছু বলবার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি শুধু এখানে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনাকে তুলে ধরতে চাই, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও ব্যঞ্জনায় হয়ত সামান্য নয়, এবং যেগুলি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের বিশাল ব্যক্তিত্বের নানা বিচিত্র দিক উদ্ঘাটিত ক'রে তাঁকে মানুষ হিসাবেও আমাদের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে এই সমস্ত ঘটনার সব কটিই আমি জেনেছি সত্যেন্দ্রনাথেরই প্রাক্তন ছাত্র আমাদের 'নিশানা' পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষ জোয়ারদার (জ্যোতিদা)-এর মুখ থেকে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং পরে তাঁর জীবনের নানা কাহিনী আমরা জ্যোতিদার কাছে সব মিলিয়ে যে কতবার শুনেছি, তার সম্ভবতঃ ইয়ত্তা নেই। এই সব কাহিনীর মধ্য দিয়েই আমি ধীরে ধীরে তাঁকে শ্রদ্ধা করতে ভালবাসতে শিখি, এবং এই ভাবেই তাঁর কাছ থেকে বিস্তর দূরে থেকেও তাঁর সাথে আমার এক ধরণের পরিচয় গড়ে ওঠে। বস্তুতঃ তাঁর ঈশ্বর মিল লেন-এর বাসভবনে তাঁর কাছাকাছি যাবার সৌভাগ্য আমার জীবনে মাত্র একবারই এসেছিল। এবং সেও জ্যোতিদারই সূত্রে। সেটা হবে বোধ হয় ১৯৬৮ সালের শেষাশেষি। সেই সময় তাঁকে দেখেছি আমার মতন নিতান্ত অভাজনকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন পাশে বসিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে আদর জানাতে তাঁর পক্ষে একটুও বাধেনি। এবং সম্প্রতি যদিও কোন অজ্ঞাত কারণ বশতঃ তাঁর মারা যাবার বেশ কিছুদিন পূর্ব্ব হতেই তাঁর কাছে আরও একবার যাবার জন্য আমার মন বারংবার উতলা হচ্ছিল, কিন্তু আমার জীবনে সেই সৌভাগ্য দ্বিতীয়বার আসার পূর্ব্বেই তিনি চলে গেলেন, পরলোকের ডাক শুনতে পেয়ে।

শুরু করার পূর্ব্বে আরও একটি কথা। নীচের ঘটনাগুলি কালানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়নি। সেরূপ সম্ভবও ছিল না। তাই পূর্ব্বের ঘটনা পরে এবং পরের ঘটনা পূর্ব্বে এসে থাকতে পারে। এবং যেহেতু মুখে মুখে শোনা, তাই সন তারিখেরও উল্লেখ সম্ভব হল না।

সেই সময় সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। একদিন তাঁর এক বেয়াদপ ছাত্র তাঁকে ক্লাসের মধ্যে চরম স্পর্ধা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে বসেছিল, 'আচ্ছা মাষ্টারমশাই, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্ত প্রফেসরের ডক্টরেট ডিগ্রী আছে, আপনার কোন ডক্টরেট ডিগ্রী নেই কেন?' সেদিন কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রের এই বেয়াদপী প্রশ্নে একটুও চটেন নি, তিনি শুধু শান্ত ও নির্বিকারভাবে বলেছিলেন, "I do not know what is there in a carrier. But if you mean studies, then I may be of some service to you?

ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ রসায়নে আবিষ্কার করেছিলেন যে তরল এবং ঘন উভয় প্রকার দ্রবণেই যৌগিক অণুর আয়নকে বিযুক্ত (dissociated) অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। তাঁর আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কিন্তু পৃথিবীর রসায়ন বিজ্ঞানীর মহলে জানা ছিল যে একমাত্র তরল দ্রবনেই যৌগিক অণুর আয়ন বিযুক্ত অবস্থায় থাকে। কিন্তু একদিন ইংলণ্ড থেকে খবর এল যে, তাঁর আবিষ্কার ভুল প্রমাণিত হয়েছে। ওখানকার বিজ্ঞানীরা রসায়নের নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে তাঁর আবিষ্কার খাটছে না। এই সংবাদ কলকাতায় পৌঁছালে ডঃ ঘোষ স্বভাবতঃই বেদনাহত হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর থিওরী কীভাবে প্রমাণিত করবেন, তা কিছুই ভেবে পেলেন না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তখনো বেঁচে। তিনি নাকি সব শুনে মন্তব্য করেছিলেন, 'গেল তো, সব তো যায় এবার!' এই সময় সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু বিজ্ঞানীকে বাঁচাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনকভাবে এগিয়ে এলেন। তিনি তাঁর এক ছাত্রকে ডেকে তাকে বেরিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট ইত্যাদি সালফার যৌগের ঘণ দ্রবণ প্রস্তুত ক'রে তাদের X-ray spectrum ফটোগ্রাফি নিতে বললেন। প্রথমাবধি কেউই অনুধাবন করতে পারেননি তাঁর এবংবিধ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য। এমনকি যে ছাত্রের ওপর পরীক্ষা চালাবার ভার পড়ল, সে-ও নয়। সে শুধু তাঁর কথামত দীর্ঘদিন ধরে ক্রমাগত ফটোগ্রাফ নিয়ে চলল। সত্যেন্দ্রনাথ সেই সব ফটো বিশ্লেষণ ক'রে তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, সব কটি ফটোগ্রাফেই অন্যান্য মৌল পদার্থের Spectrum line-এর পাশাপাশি দিব্যি সালফারণের Spectrum লাইন পাওয়া যাচ্ছে। যদি ঘন দ্রবনে সালফারন বিযুক্ত অবস্থায় না

থাকত, তবে তার Spectrum লাইন পাওয়া কিছুতেই সম্ভব হত না। এর থেকেই প্রমাণিত হল যে ডঃ ঘোষের আবিষ্কারই ঠিক। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ডঃ ঘোষকে ডেকে এনে সব কিছু দেখালেন এবং বললেন, 'তুমি নিজেই যেন এ এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়েছ এইভাবে সমস্ত এক্সপেরিমেণ্ট-এর পূর্ণ বিবরণ ফটোগ্রাফ সহ ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দাও।" এই ভাবেই সেবার ডঃ ঘোষ ইংলণ্ডের বিজ্ঞানী মহলের মুখ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু, পৃথিবীর কেউই ঘুনাক্ষরেও জানতে পারেনি তাঁর থিওরীকে পুনরায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার পিছনে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান ছিল কতখানি

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা Astro-Physics-এ তাঁর থিসিস পড়বেন, এলাহাবাদে সায়েন্স-কনফারেন্সে। কনফারেন্সে যে সব বৈজ্ঞানিক থাকবেন তাঁদের মধ্যে এডিংটনও রয়েছেন। কলকাতা থেকে সি, ভি, রমন, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ কনফারেন্সে যোগদান করার জন্য এলাহাবাদে এসেছেন। এঁরা তিনজনেই এলাহাবাদে ডঃ মেঘনাদ সাহার বাড়ীতেই উঠেছেন। কনফারেন্স শুরুর আগের দিন মেঘনাদ তাঁর বন্ধুকে বললেনঃ 'সত্যেন, থিসিস তো যা হোক একটা কিছু খাড়া করেছি। কিন্তু কী হয়েছে কে জানে। এখন আমার ইচ্ছা থিসিসটা আদ্যোপান্ত একবার তোমার সামনে প'ড়ে যাই। তুমি সব শুনে দেখ, কোথাও কোন ভুলচুক রয়েছে কিনা। তাতে আমি মনে মনে একটু ভরসা পাই।' কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ বললেন 'না' থিসিস এখন শুনব না। পরে কনফারেন্সে যখন যাব তখন সব পুরোনো হয়ে যাবে। কনফারেন্সেই বসে বসে শুনব।' তা সত্যেন্দ্রনাথ কনফারেন্সে গিয়েছেন। মেঘনাদ সাহা তাঁর থিসিস প'ড়ে চলেছেন। হলঘর আস্তে আস্তে ফাঁকা হতে শুরু করেছে। সত্যেন্দ্রনাথ কনফারেন্স শুনতে শুনতে ভুলে গিয়েছেন যে তিনি কনফারেন্সে বসে রয়েছেন। মেঘনাদের থিসিস শুনতে শুনতে তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, মেঘনাদ যা বলছেন তার কোন graphic picture দেওয়া যায় কিনা। সহসা তিনি মেঘনাদকে মাঝপথে থামিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেনঃ 'আচ্ছা, তুমি যা বলছ তাকে graphically represent ক'রে দেখাতে পার?' মেঘনাদ বললেনঃ 'আমি তো এ ব্যাপারে চিন্তা করি নি।' তখন সত্যেন্দ্রনাথ একটা দেশলাই-এর কাঠি নিয়ে শূন্যে আঁকতে থাকলেন, এবং মেঘনাদ তাঁকে অনুসরণ ক'রে বোর্ডে আঁকবার চেষ্টা করলেন-কিন্তু পারলেন না। সহসা সত্যেন্দ্রনাথের খেয়াল হয়েছে যে তিনি কনফারেন্সে বসে আছেন, এবং খেয়াল হতেই তিনি আর একটিও কথা না ব'লে চুপ মেরে গিয়েছেন এবং মেঘনাদও আবার থিসিস পড়া শুরু করেছেন। কনফারেন্স শেষ হতে সত্যেন্দ্রনাথ কোন দিকে না তাকিয়ে হন হন ক'রে বাড়ী চলে এসেছেন। এবং তাঁর ঘরের দোর এঁটে গুম হয়ে বসে রয়েছেন ভিতরে। বন্ধুর কনফারেন্সে তিনি মাঝপথে এমনভাবে বাগড়া সৃষ্টি করলেন!—তাই তাঁর মনে খুব দুঃখ বেজেছে। নিজের ওপর তাঁর খুব রাগ হয়েছে। ওদিকে মেঘনাদ কনফারেন্স শেষ ক'রে অভ্যাগতদের কথাবার্তা সেরে একটু দেরীতে বাড়ী ফিরেছেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে চা খাবার জন্য ডাকাডাকি করতে লাগলেন তাঁকে দরজা খুলতে বললেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কিছুতেই দরজা খুলবেন না। ভিতর থেকে বন্ধুকে তিনি জানিয়ে দিলেন চা তিনি খাবেন না। অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর সত্যেন্দ্রনাথ দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। সাথে সাথে মেঘনাদ তাঁর হাতের কাছে কাগজ কলম এগিয়ে দিলেন। বললেন 'কনফারেন্সে যা যা বলছিলে, সব এঁকে দাও।' সত্যেন্দ্রনাথ কাগজ কলম পেয়ে আঁকতে শুরু করলেন। পরে মেঘনাদ সাহা তাঁর থিসিস-এ সেটিকে Incorporate ক'রে নিলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের নাম জানল না কেউ।

এরোপ্লেন যখন আকাশে ওড়ে তখন দেখা যায় বাতাসের স্তরে প্রায়ই ups and downs এর সৃষ্টি হচ্ছে। ups and downs কেন হয় তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর সব দেশেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে Aerodynamics নিয়ে গবেষণা চলছে। ভারতবর্ষেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রফেসর এই প্রব্লেম নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। তাঁদের পরীক্ষার আয়োজনটা ছিল এইরকম—একটি লোহার জালের নীচে বুনসেন বার্নার বসিয়ে Dust Particle-কে গরম করা হচ্ছে। ফলে নীচের বায়ুস্তর গরম হয়ে হাল্কা হবার ফলে উপরে উঠে যাচ্ছে এবং উপরের ঠাণ্ডা ভারী বায়ুস্তর নীচে নেমে আসছে। এইভাবে বিভিন্ন ঘনত্বের হালকা ও ভারী বায়ুস্তর তৈরী হওয়ার ফলে Mirage পাওয়ার মত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। এবং লেন্স দিয়ে সেই কৃত্রিম বায়ুস্তরের Field Study ক'রে দেখা যাচ্ছে যে তাতে সত্যসত্যই ঘরে অবস্থিত চেয়ার, মানুষ ইত্যাদির উল্টানো Mirage পাওয়া যাচ্ছে। খুব কাছাকাছি কোথাও খুব জোরে শব্দ সৃষ্টি করলে দেখা যাচ্ছে যে বায়ুস্তরে Ripples-এর মত ঢেউ খেলে যাচ্ছে। এ সমস্তই নিখুঁত ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যাচ্ছে, কিন্তু এরোপ্লেনের প্রপেলার যখন ঘুরতে থাকে, তখন প্রপেলারের চার পাশের বায়ুস্তরে যে ঘূর্নির সৃষ্টি হয়, সেই ঘূর্নির ছবি কীভাবে পাওয়া যায়, তা কিছুতেই ভেবে বের করা যাচ্ছেনা।

যে ল্যাবরেটরীতে এই পরীক্ষা চলছিল, একদিন সত্যেন্দ্রনাথ সেখানে গিয়েছেন। তিনি সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখলেন, পরীক্ষা চালাতে গিয়ে কী সমস্যা দেখা দিয়েছে সে বিষয়েও অবহিত হলেন, তারপর অত্যন্ত সহজভাবে বললেন : ,Make a smoke and have a photo graph' যে সব প্রফেসর সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা ভাবলেন, 'এতই কী সহজ! আমরা পাঁচ ছ'বছর ধরে চেষ্টা চালাচ্ছি!' সত্যেন্দ্রনাথ তখন প্রফেসারের সামনে মুখ থেকে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে দেখলেন যে বিশ্বি সুন্দর Vartex (ঘূর্ণি) পাওয়া যাচ্ছে। তখন দেখা গেল সত্যই এত সহজ, এত কিছু আয়োজনের কিছুই প্রয়োজন ছিল না।

পণ্ডিত নেহেরু স্বাধীনতা লাভের পর একবার সত্যেন্দ্রনাথকে দিল্লীতে ডেকে এনে তাঁর কাছে একটি Standardization এর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কথা ব্যক্ত করেন। এবং তিনি সত্যেন্দ্রনাথকেই সেই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভার দিতে চান। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ সেদিন নেহেরুর এই অনুরোধের উত্তরে স্পষ্ট ও নির্ভীক কণ্ঠে জানিয়েছিলেন, 'Do you think Mr Nehru India produces anything worth Standardizatin?' বলাই বাহুল্য নেহরু সেই প্রশ্নের কোনই উত্তর করতে পারেন নি। এবং জ্ঞানতাপস সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও সেদিন সম্ভব হয় নি ক্ষমতা ও পদমর্যাদামোহে একটি বিরাট তামাসার মধ্যে নিজেকে সঁপে দেওয়া। বস্তুতঃ সত্যেন্দ্রনাথের মতো একজন বিশ্বের সর্বোচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে তার উপযুক্ত ব্যবহারে না লাগিয়ে Standardization-এর মতো একটি তুচ্ছ কাজে লাগানোর চিন্তা করা বোধ হয় পৃথিবীতে একমাত্র আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের পক্ষেই সম্ভব। পণ্ডিত নেহেরুর আরও কীর্তি আছে। যদিও এখানে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক, তবু ভারতীয় বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলেই ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করছি। একবার নেহেরু কোন এক উপলক্ষে ডঃ মেঘনাদ সাহাকে উদ্দেশ্য ক'রে বলেছিলেন, 'He is no lohger a Scientist? মেঘনাদ সাহাও এর মুখের মতন জবাব দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'নেহেরু, আমি বিজ্ঞানে যেটুকু কাজ করেছি তাতেই পৃথিবী আমি মারা যাবার তিনশো বছর পরও আমাকে মনে রাখবে। কিন্তু তুমি মারা গেলে তোমাকে ক'দিন মনে থাকবে তার?'

বিশ্ব বিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মহাকর্ষ ক্ষেত্র (gravitational field) এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র (electro-magnetic field)—এই দুটি ক্ষেত্রকে একটি তত্ত্বের বাঁধনে বাঁধতে চেয়ে ছিলেন। এই তত্ত্বটিই হল তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরী'। বস্তুতঃ এ ব্যাপারে সফলকাম হলে তাঁর জীবনের একটি বিরাট সাধ পূর্ণ হত। কিন্তু তিনি সারাজীবন প্রয়াস চালিয়েও সফল হতে পারেন নি। শেষ জীবনে যখন তিনি অনুভব করলেন তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে, তখন তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সাথে একবার আলোচনায় বসবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে জানালেন, তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীরের শক্তি নিঃশেষিত প্রায়, এই অবস্থায় আমেরিকান গভর্নমেন্ট তাঁকে বাইরে যাবার অনুমতি দেবেন না। নতুবা তিনি নিজেই যেতেন। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ যদি আমেরিকায় তাঁর কাছে এসে দেখা করেন, তবে তিনি তৃপ্তি নিয়ে মরতে পারেন। আইনস্টাইনের এই চিঠির খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে সোরগোল উঠল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ—তাদের মধ্যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীও ছিল—চাইল জানতে আগল বোস-আইনস্টাইনের মধ্যে সাক্ষাৎকার হবে যে তো বিশ্ববিজ্ঞানের পক্ষেই এক বিরাট চূড়াস্পর্শকারী ব্যাপার! সুতরাং সেই সাক্ষাৎকার পৃথিবীর সুদূর এক কোনে আমেরিকার না হয়ে পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে কোথায় হবে সেই প্রশ্ননিয়ে ইউরোপের বড় বড় দেশগুলির মধ্যে বাদবিতণ্ডা চলেছে, তখন আইনস্টাইন সহসা মারা গেলেন। ফলে বিশ্ববিজ্ঞানের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই দুই বিজ্ঞানীর মিলন আর ঘটল না। কিন্তুআইনষ্টাইন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর উইলে উল্লেখ ক'রে গেলেন ফরাসী পদার্থবিজ্ঞানী ষ্ণব্রগলী যেন সত্যেন্দ্রনাথের সাথে আলোচনায় বসেন। আইনস্টাইনের উইলের খবর প্রকাশিত হলে পর ষ্ণব্রগলী তখনই ভারতবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। ষ্ণব্রগলী তখন বেশ বৃদ্ধ হয়েছেন। তাই তাঁর দেশের সরকার অত দূর দেশে যাওয়া আসার ধকল তাঁর এই বয়সে সইবে না এই কথা বলে তাঁকে নিরস্ত করেন এবং বলেন যে তাঁরাই বরং সত্যেন্দ্রনাথকে ফ্রান্সে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসবেন। সেই অনুযায়ী ফরাসী সরকারের পক্ষ থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে আমন্ত্রণ আসে তাঁদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অতিথি হবার জন্ত। সত্যেন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ফরাসী সরকার প্রেরিত বিশেষ বিমানে মিশরের পথে প্যারিস যাত্রা করেন। মিশরের কায়রোতে যখন তাঁর বিমান থেমেছে, তখন সেখানে তাঁর কাছে ইংলণ্ডের রাণীর এক বিশেষ দূত এসে হাজির। উদ্দেশ্য সত্যেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানানো যাতে তিনি প্যারিসে আলোচনায় বসবার পূর্বে ইংলণ্ডে একবার

গিয়ে তাঁদের দেশের রাণীর সাথে ঘরোয়া বৈঠকে একটু চা পান ক'রে যান। সত্যেন্দ্রনাথ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন কিন্তু চা পানের বৈঠকে গিয়ে দেখেন সেটি নিছক চা পানের আসর নয়। কেননা সেখানে তিনি চা পানের আসরে রাণীকে ঘিরে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সমস্ত বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিককেই উপস্থিত দেখতে পান। এবং সেই দিনই তাঁকে রাতারাতি রয়াল সোসাইটির ফেলো ক'রে নেওয়া হয়। অথচ এই বৃটিশ সরকারই ভারতবর্ষের পরাধীনতার কালে সত্যেন্দ্র নাথের প্রতিভাকে যথাযোগ্য মর্যাদা তো দেয়ই নি, উপরন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছে তাঁর নিন্দাবাদ রটানো যায় কিনা সেই চেষ্টাও চালিয়েছিল, এই কাজে বৃটিশ সরকার যাঁকে নিয়োগ করেছিল, তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই দর্শনের প্রফেসর, একজন ইংরেজ, Hartzog, সত্যেন্দ্রনাথের নিন্দা রটানোর কাজটি সুচারুরূপে সমাধা করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে ইউরোপ ভ্রমণের জন্য তিনমাসের বিশেষ ছুটি দেওয়া হয়। ইউরোপে তিনি সিলভ্যা লেভি, প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন ইত্যাদির সাথে সাক্ষাৎ ক'রে সত্যেন্দ্রনাথকে হেয় করার যথেষ্ট অপপ্রয়াস চালান। কিন্তু কোথাও পাত্তা পান নি।

শুধুমাত্র এই সন্দেহের বশবর্তী হয়ে যে তাঁর সাথে বিদেশেঅবস্থানকারী বাঙ্গালী বিপ্লববাদী দলগুলির গোপন যোগাযোগ আছে। এবং সেদিন ব্রিটেনকে যে ঘটনা সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাদের এতদিনকার অবহেলা, ঔদাসীন্য, অবমাননা ইত্যাদি ভুলে যেতে প্ররোচিত করে, সেটি হয়তো সত্যেন্দ্রনাথকে লিখিত আইনস্টাইনের পত্রটি প্রকাশ পাওয়ার ঘটনা। এবং আমাদের দেশেও কর্তাব্যক্তিরা এই একটি ঘটনার ধাক্কায় ঘুম ভেঙ্গে নড়ে চড়ে বসেন এবং তাঁকে শান্তি নিকেতন উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করা হয়। যদিও শান্তিনিকেতনের চাইতে বড়ো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের—এবং তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের পদে বৃত ক'রে তাঁর সুযোগ্য নির্দেশনাও সহায়তায় এদেশের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজকে প্রভূত দূর এগিয়ে নেওয়া যেতো, কিন্তু এদেশের কর্তাব্যক্তিরা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁদের পক্ষে যতখানি অবহেলা প্রদর্শন সম্ভব, ততখানি অবহেলা দেখাতে কখনো কার্পণ্য করেন নি। যাই হোক, এ বিষয়ে আলোচনায় ছেদ টেনে কথা প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে গিয়ে তিনমাস রাষ্ট্রীয় অতিথির মর্যাদায় থাকেন এবং তিন মাস শ্রদ্ধগলীর সাথে তাঁর আলোচনা হয়। সেই আলোচনার কোন authentic decument পাওয়া যায় নি ব'লে বিশ্বের কারও পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি তাঁদের উভয়ের মধ্য কতদূর ফলপ্রসূ আলোচনা চলেছিল। এবং আইন-স্টাইনের 'ইউনিফাইড ফিল্ড থিওরী'-র গতি শেষ পর্যন্ত কী হল সে বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ও পরে আর কোন মন্তব্য করেন নি। তবে ১৯৬০ সালে শ্রদ্ধগলী একটি বই লেখেন, সেখানে তিনি কোয়ান্টাম ষ্ট্যাটিসটিক্স্-এ সত্যেন্দ্রনাথের অবদান সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে একটি অত্যন্ত সুন্দর মন্তব্য করেন: 'Compared to Boson, Fermion is a savage'। বোসন, ফার্মিয়ন উভয়েই কোয়ান্টাম ষ্ট্যাটি-টিক্স্-এ পদার্থবিজ্ঞানের জগতের কণাসমূহের সমষ্টিগত আচরণের ব্যাখ্যার পদ্ধতি বা সূত্র আবিষ্কার করেন। যে সমস্ত কণা যেমন, লাইট কোয়ান্টা—বোস ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ মেনে চলে, তাদের বলা হয় বোসন। এবং ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি যারা কার্যিও ডিরাক আবিষ্কৃত ষ্টাটিষ্টিক্স্ মেনে চলে, তাদের বলা হয় ফার্মিয়ন।

১৯৫৩ সালে প্যারীতে unesco বৈঠক বসে। সেখানে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য পণ্ডিত নেহেরুর দিক থেকে সত্যেন্দ্রনাথের কাছে অনুরোধ আসে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ নেহেরুকে জানান, তিনি যদি ইউরোপ যান তবে তিনি শুধু প্যারী ঘুরেই ক্ষান্ত থাকবেন না, তিনি দুই বিশ্বযুদ্ধের বৃটিশ-শত্রু জার্মান দেশে একবার যাবেনই। কিন্তু বৃটিশ-ঘেঁষা রাজনীতিবিদ নেহেরুর এটি ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে বারংবার বলেন, তোমার কিছুতেই জার্মানীতে যাওয়া ঘটে না। তবে আমার কনফারেন্সে যাওয়া ও হবে না। তুমি তোমার যে কোন বিজ্ঞানীকে কনফারেন্সে পাঠিয়ে দাও। অগত্যা নেহেরু তুমি চুলোয় যাও গাছের ব'লে হাল ছেড়ে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্যারীতে কন-ফারেন্স শেষে জার্মান সীমান্তে গিয়ে পৌঁছান রাত দশটায়। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য জার্মানীর পাচশো বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক সীমান্তে তাঁর গাড়িটি পাঠিয়ে দেন সত্যেন্দ্রনাথের ব্যবহারের জন্য। সেই সাথে প্ল্যাঙ্ক তাঁকে চিঠি পাঠিয়ে জানান, তিনি বার্দ্ধক্য হেতু নিজে আসতে পারলেন না। নতুবা তিনি স্বয়ং এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তবে তিনি তাঁর গাড়ীটি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। সত্যেন্দ্রনাথ যেন সারা জার্মানী তাঁর এই গাড়ীতে ভ্রমণ করেন এবং তিনি যেন ভেবে নেন তিনি সদাসর্বদাই প্ল্যাঙ্কের বাড়ীতেই রয়েছেন। তাইলেই প্ল্যাঙ্ক অন্তরের তৃপ্তি পাবেন। সত্যেন্দ্রনাথ সারা জার্মানী সেই গাড়ীতে ক'রে ঘুরে দেখেন এবং এক বিশাল কনভয় সদাসর্বদা তাঁর সাথে

সাথে যেতে থাকে। জার্মানরা তাঁকে তাদের দেশের প্রথম সারির চৌষট্টিটি ল্যাবরেটরী ঘুরিয়ে দেখায়। আজ পর্য্যন্ত তারা পৃথিবীর আর কোন বৈজ্ঞানিককেই একসাথে অতগুলি ল্যাবরেটরী ঘুরিয়ে দেখায় নি। এর থেকে বোঝা যায় সমগ্র জার্মান জাতি সত্যেন্দ্রনাথকে কী চোখে দেখতো। কতখানি অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তাদের তাঁর প্রতিভার প্রতি। সেখানে তিনি সর্বত্রই এত অপূর্ব্ব সুন্দর যন্ত্রপাতি দেখতে পান যে তিনি রীতিমত বিস্মিত হন। তিনি জার্মানদের শুধান: 'তোমরা এসব কোথায় পেলে?' তারা তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করে: 'তুমি কী আমাদের Brain-কে সন্দেহ করছ?' তিনি বলেন: 'না, কিন্তু টাকা এল কোত্থেকে?' তখন তারা তাঁকে জানায়: 'আমাদের দেশে যে কেউ যে কোন ইওরোপী করুক না কেন, সে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নিজেকে টিঁকিয়ে রাখবার জন্য রিসার্চে কিছু টাকা ঢালবেই। এটাই এখন আমাদের দেশে রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মার্শাল প্ল্যানে' আমাদের দেশে যখন টাকা এল, তখনই আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সবকিছু গড়ে তুলবার সুযোগ পেয়ে গেলাম।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ কত দ্রুততার সাথে নিজেকে পুনরায় গড়ে তুলেছে' এটি সত্যেন্দ্রনাথ নিজের চোখে দেখে মুগ্ধ হয়েফিরে এলেন। বস্তুতঃ তাঁর জার্মানী যেতে চাওয়ার পিছনে উদ্দেশ্যও ছিল তাই—ছাত্রাবস্থায় যে জার্মানীতে তাঁর সাথে সর্বপ্রথম তাঁর গুরু আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সেই জার্মান দেশের কী হাল হয়েছে, তা নিজের চোখে দেখে আসা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জার্মানীকে যেভাবে ধ্বংস করেছিল, তাতে যে সেই দেশ আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না—জার্মান দেশ ঘুরে দেখে তাঁর এই ধারণা পাল্টে যায়।

সবশেষে একটি ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ করি। স্যার সি. ভি. রমন, ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং সত্যেন্দ্রনাথ—এঁরা তিনজনে কলকাতা থেকে ট্রেনে ক'রে এলাহাবাদে যাচ্ছিলেন, ডঃ মেঘনাদ সাহার Astro-Physics এর কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য, যার উল্লেখ আগেই করেছি। এটি রমণের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরের ঘটনা। ট্রেন যখন চলতে সুরু ক'রে শিয়ালদা ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর গিয়েছে, তখন রমণ ডঃ ঘোষকে সম্বোধন ক'রে সহসা ব'লে বসলেন,'Do you understand Ghose, now merit is forsaking Bengal and it is now migrating to Madras. রমনের মুখ থেকে এইরূপ এক বিশ্রী কথা শুনে জ্ঞান ঘোষ তো চুপ ক'রে রয়েছেন এবং মনে মনে ভাবছেন সত্যেন্দ্রনাথ শুনতে পেলেন কিনা। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ কথাগুলি ঠিকই শুনেছেন এবং সাথে সাথে জবাবও দিয়েছেন তেমনি,'So long our boys prefer to go to Jail' ব্যস, এই কথা শোনার পর রমণ সেই যে বোবা মেরে গেলেন, তারপর এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ট্রেনে একবারও মুখ খোলেন নি।

"একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব পশ্চিমের মিলন যজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গ সাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গ-সাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গ-সাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদান প্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।"

—সমাজ, রবীন্দ্রনাথ—

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েদ কর্তৃক ১২/সি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ স্থিত নিউ বিশ্বনাথ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

15th April 1974 · NISHANA Phone : 44-1460 Regd. No. RN—24618/73 Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from .

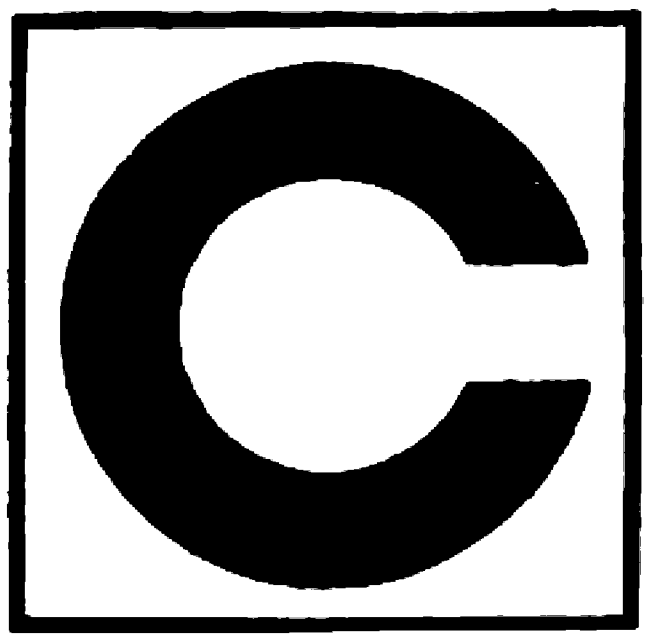

Gram GOLEATHERS Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

20H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, LK & HANDICRAFTS

নিশানা

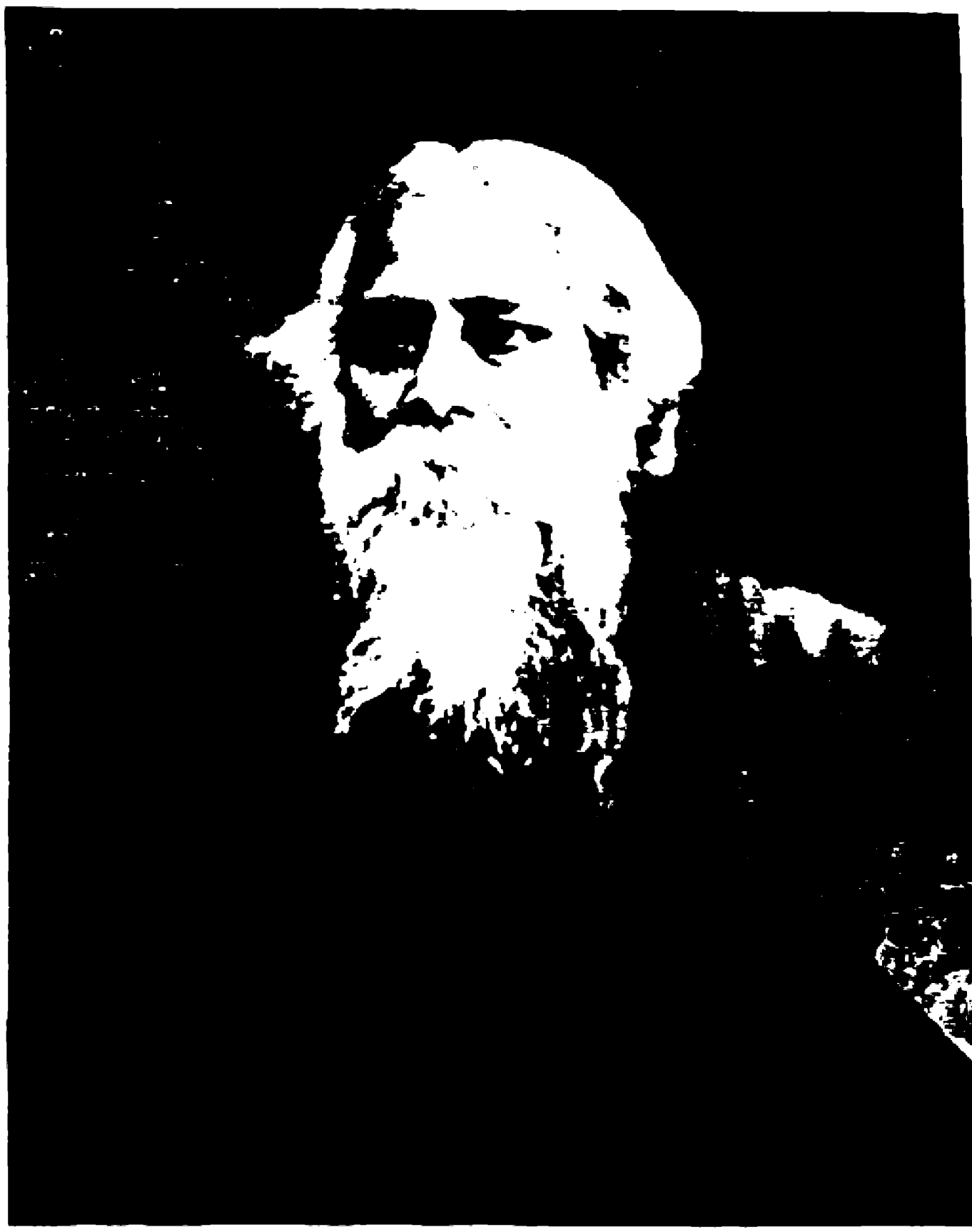

২য় বর্ষ | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা | ১৫ই মে ১৯৭৪ | মূল্য ১·০০ টাকা

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

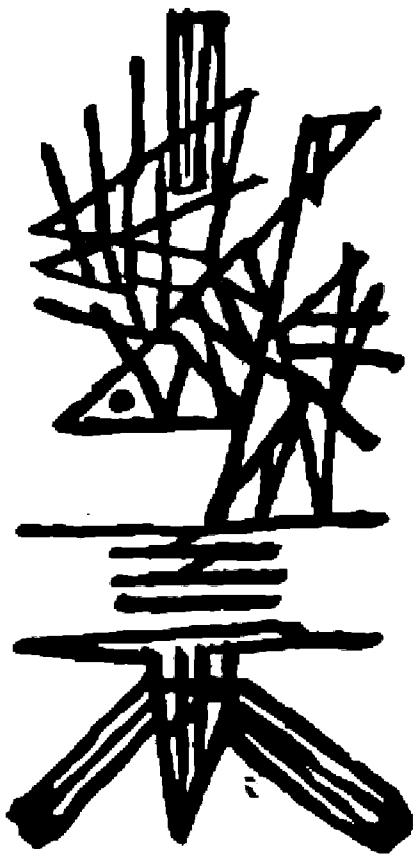

ARTS & PRINTS PVT. LTD.

31 PARK MANSION

CALCUTTA-16

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১। জন্মদিনে	...	সম্পাদকীয়	...	২৫৭
২। রবীন্দ্রনাথ (কবিতা)	...	স্বপনবুড়ো	...	২৫৯
৩। পঁচিশে বৈশাখঃ আমদের ঋণ	...	অধ্যাপিকা নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৬০
৪। রবীন্দ্র আবির্ভাবে	...	উমা দেবী	...	২৬১
৫। শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র	...	স্মৃতিরঞ্জন গুহ	...	২৬২
৬। গুরুদেব প্রসঙ্গে	...	হাসিরাশি দেবী	...	২৬৫
৭। রবীন্দ্রনাথের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনবেদ	...	অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী	...	২৬৮
৮। রবীন্দ্রনাথ —দুই বাংলায়	...	অনীতা গুপ্ত	...	২৬৯
৯। নেশন কী	...	রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উদ্ধৃতি	...	২৭৩
১০। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র	...	ডঃ সরোজ কুমার দাশ	...	২৭৯
১১। তুমি আমাদেরই লোক	...	শ্রীকৃষ্ণকান্ত দত্ত	...	২৮২
১২। বিপ্লবীর দৃষ্টিদীপে রবীন্দ্রনাথ	...	নিকুঞ্জ সেন	...	২৮৪
১৩। হেটো বই হেটো ছড়ায় ঐতিহাসিক উপাদান	...	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	...	২৮৭
১৪। জাতীয় শিক্ষক সূর্যসেন	...	ডঃ আশা দাস	...	২৮৯
১৫। শহীদ কানাইলাল	...	রণজিৎ কুমার সেন	...	২৯১
১৬। আজকের সাহিত্য	...	নাট্যকার মন্মথ রায়	...	২৯৩
১৭। দিল্লীর কড়চা	...	কালিকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়	...	২৯৪
১৮। ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ	...	রসময় শূর	...	২৯৬
১৯। গোলকুণ্ডার দুর্গ	...	দীপেন রাহা	...	২৯৮
২০। পাটনার ডায়েরী	...	অদ্ভুপম রায়	...	৩০০
২১। নিখিল বঙ্গের মাতা	...		...	৩০২

সম্পাদকমণ্ডলীঃ

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ স্মৃতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী

"প্রভাতসূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হোক জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

'নিশানার' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যগণকে প্রতিমাসে দুটি পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৌল ও সময়োচিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হবে। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানার পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ECONOMIC AFFAIRS

INDIA'S PREMIER ENGLISH ECONOMIC MONTHLY

Now on its 19th year of continuous publication

Editor HIMANSU ROY

Deals with advanced economic theory and topical economic problems. Discussion of India's planned economy is its primary objective. Read throughout the world.

Subscription :

Annual : Inland Rs. 20·00

Foreign US $ 6·00

For further information

Manager

ECONOMIC AFFAIRS

10, Galiff Street, Block-5,

Suite-64 Calcutta-700003

শান্তিনিকেতনে

রবীন্দ্রনাথ

১১৩৮

নিশানা

১লা ও ১৫ই মে, ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

জন্মদিনে

স্বদেশের অন্তহীন প্রতিকারহীন দুঃখ বেদনা—হতাশার এক ঐতিহাসিক লগ্নে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হিমাদ্রিসদৃশ বিশ্বব্যক্তিত্বের আবির্ভাব—করপুটে ধারণ করে এক অনির্বান আশার প্রদীপ, আর কণ্ঠে মৃত্যুঞ্জয়ী অভয়বাণী! রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নের মধ্যে এক মহামানবের জন্মমাত্র নয়, একটা গোটা মহাজাতির তথা এক নবযুগেরই জন্মলগ্নের ছোতনা।

একাধারে নারী-পুরুষ, শিশুবৃদ্ধ-যুবার আনন্দ বেদনার ভাষা নির্ঝর, বঞ্চিত নিপীড়িত অসহায়ের ক্রন্দন রোল, আর দুর্দান্ত বিদ্রোহীর সংকল্পের তিনি ছিলেন বাণী মূর্ত, স্বদেশাত্মার প্রাণবীণা। মানবাত্মারও তাই।

সত্যসন্ধ কবির বিশ্বপ্রেম তাঁর জলন্ত স্বদেশপ্রেমকে এতটুকু নিষ্প্রভ করতে পারেনি। মুহূর্তের জন্যও কোন সমাজ, জাতি বা সাম্রাজ্যপুষ্ট সংকীর্ণতা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। অপরের পরাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত উৎকট স্বাধীনতার অহঙ্কারকে তিনি বর্বরতারই নামান্তর বলে আজীবন ধিক্কার দিয়ে এসেছেন, ও ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন। অপরদিকে স্বাধীনতা বা স্বাধিকার অর্জনের পথে প্রভুশক্তির কৃপাভিক্ষাকেও তিনি শতত নিন্দার্হ মনে করছেন; এবং সংগ্রামের উপযোগী সংহতি এবং সংগঠনকেই উৎসাহ দান করেছেন। প্রতিনিয়ত ত্যাগ ও দুঃখ বরণের উদাত্ত আহ্বানে স্বদেশের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করেছেন। অজস্র গানে, কাব্যে রচনায় স্বাধীনতা সংগ্রামীকে মৃত্যু ভয়হীন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বিশ্ব সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ খ্যাতি লাভ করেও খ্যাতির মোহে আবিষ্ট হননি তিনি, তাঁর বাণী হয়নি আড়ষ্ট। সত্যের দেউলে জাতীয় তথা আন্তর্জাতীয় মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে রাজদত্ত খ্যাতিকে অনায়াসে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অন্যায়কারী এবং অন্যায়ের পৃষ্ঠপোষক রাজশক্তি কবির বাক্যে আচরণে যত কষ্ট হয়েছে, পৃথিবীর বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী মহাকবির মহত্ত্বকে ততই মুগ্ধ শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছে।

বিশ্বের কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ কবীন্দ্র রবীন্দ্রের মধ্যে এক মহাজ্যোতির্ময় প্রতিভা ও উদার মনুষ্যত্বের অপূর্ব মিলনকে সাক্ষাৎ করে পরম শ্রদ্ধায় ভালবাসায় তাঁকে অর্ঘ নিবেদন করেছেন, অকাতরে।

সত্য শিব সুন্দরের উপাসক কবি প্রকৃতির সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন আমাদের সামনে। তাঁর রচিত সাহিত্য, তার ব্যক্তিগত জীবন সাক্ষ্য দিচ্ছে, "জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই নাম ভালবাসা; প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্যসম্ভোগ।" তার কাব্য সাধনার উদ্দেশ্য নির্দেশ করতে গিয়ে কবি নিজেই বলেছেন, "আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার একটি মাত্র পালা—সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে—সীমার মধ্যে অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" আবার, গতির কবি সত্য সন্ধানী জগৎকে এক অন্তহীন অজানা আনন্দলোকের উদ্দেশ্যে অকারণ অবারণ চলার গতিচ্ছন্দে ছন্দিত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, থেমে যাওয়া মানেই প্রাণহীন বস্তুর জড়ত্বে পথ হারান। মুহূর্তের ক্লান্তিভরে থমকে দাঁড়াতে গেলেই "উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে"। এই অন্তহীন গতির মধ্যেই বিশ্বের প্রাণ প্রবাহ। কাজেই থেমে যাওয়া চলবে না। কবি আপন চিত্ত বিহঙ্গকে অভয় দিচ্ছেন—যদি আশা নাও থাকে, ভাষা নাও থাকে, যদি পাখা মাত্র সম্বল থাকে আর চোখের আগে থাকে মহানভ অঙ্গন আর নিবিড় তিমির আকা দিশাহারা উষা তবু—

"ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।"

বন্ধন মুক্তির অভিযানে মুক্তি সন্ধানীর পেছনে চাওয়া বারণ। তার কাছে বন্ধন ক্রন্দন বৃথা—

"চাবো না পশ্চাতে মোরা, মানিনা বন্ধন ক্রন্দন,"।

জগতের কল্যাণে নিজের বিশ্ব বিজয়ন দিয়েও 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলার মহাস্রোতকে অব্যাহত রাখতে হবে। এটাই কবির বিশ্বপ্রেমের দাবী।

এ-বিশ্বপ্রেমে আর স্বদেশপ্রেমে কবির মনে কোন বিরোধ নেই। ভারতবাসী হিসেবে ভারতকে-ও যেমন বাংলাকেও তেমনই ভালবেসে তিনি নিজেকে ধন্যই মনে করেছেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।"

আবার স্বদেশে জননীর মধ্যে বিশ্বমায়ের খণ্ড প্রকাশ নিয়ত উপলব্ধি করেছেন তিনি এবং সমগ্র স্বদেশবাসীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে গেয়েছেন কবি—

"ও আমার দেশের মাটি
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর
আঁচল পাতা।

তদুপরন্ত মৃন্ময়ী মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন কবি তার চিন্ময়ী সত্তাকে আবাহন করে। স্বদেশের আদর্শ স্বাধীনতার রূপ কল্পনা করতে গিয়ে অনৈক্য অসাম্যের বিরুদ্ধে তিনি খড়গহস্ত হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
ভারতের সেই স্বর্গে কর জাগরিত !"

সমগ্র জাতির মধ্যে সজাগ সচেতন ঐক্য সাধন স্বাধীনতা সংগ্রামের অপরিহার্য অঙ্গ হলে, বিদেশী শাসক গোষ্ঠী 'পথ কুক্কুরের' বেশী মর্যাদা দাবী করতে সাহসী হবে না; এই বিশ্বাস দেশবাসীর মনে জাগ্রত করে তিনি লিখলেন—

…এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এইসব শ্রান্ত ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যখনই দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনই সে
পথ কুক্কুরের মত সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে :

তদানীন্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী যুব শক্তিকে নির্যাতন ভয়, কারাভয়, এমনকি মৃত্যুভয় হতে মুক্ত করে দিয়েছেন কবি তাঁর প্রাণস্পর্শী গানে গানে কাব্যে সাহিত্য রচনায়।

আবার নির্বিশেষে বিশ্বকে কৃতার্থ করে-ও কবি সোনার বাংলাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন। বাংলার মাটি, বাংলা জলে মানুষ হয়ে, বাংলা ভাষাকে তাঁর বাণীর বাহন করে বাঙালিকে তিনি ধন্য করলেন।

বাঙালির হাসি-কান্না জীবন-যৌবন, ধ্যান-ধারণা, ভাব-আদর্শকে কবিগুরু নব যুগের রঙে, রসে, গন্ধে এমন করে রাঙিয়ে দিলেন যে একটা জাতিগত হতাশা মহাকবির পরশমণির স্পর্শে এসে একখানি মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মপ্রত্যয়ে পরিণতি পেল। সভাই যেন "স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি" নিয়ে এলেন কবি। তারই মানে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে বাংলার ছেলেমেয়ে হাসিমুখে ফাঁসি যাবার, বুকের হাড় পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলার গোপন মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেল। মহাকবি উচ্চারণ করলেন—"মৃত্যুর সিংহ-দ্বার দিয়েই নব জন্মের জয়যাত্রা।

জীবন উজার করে সত্যসাধনের এমন একখানি পরম সার্থকতার ছবি কবি এঁকে দিলেন, যার আকর্ষণ স্বাধীনতা সংগ্রামীর অন্তরে মৃত্যুর গর্জনকে সঙ্গীতের মাধুর্যে অনুরণিত করল! কবি উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—

"…শুধু জানি সে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে,
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ববিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি, মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত…

কবির এ-মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেরণা কত শহীদের জীবনের চরম লগ্নকে জ্যোতির্ময় আনন্দময় করে তুলে ধরেছে!

অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহাকবির জলন্ত বাণী শুধু পরোক্ষে প্রেরণা দান করে ক্ষান্ত হয়নি। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন তখনই দ্বিধাহীন চিত্তে অপরের অপেক্ষা না রেখে মহাজাতির সমক্ষে তাঁকে অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে তাঁকে। রাজরোষ খ্যাতির বালাই তাঁকে এতটুকু পিছ-পা করতে সমর্থ হয়নি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রেরণাময় সাহচর্য, এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তার গৌরবময় অবদান অবিস্মরণীয় উদাহরণ। হিজলী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বেদনাহত কবি, অত্যাচারী বিদেশী শাসনের ক্ষমাহীন বিনাশ কামনায় যে অগ্নিময়ী বাণী উচ্চারণ করলেন তা কি কোন দিন ভোলা যাবে—

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশি সঙ্গীত হারা।
• • •
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিবাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

সর্বজনপূজ্য গুরুদেব ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীন গুরুতর অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে-ও তাঁর সমস্ত ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। প্রবল অন্যায়-কারীর বিরুদ্ধে ন্যায়ের পক্ষ সমর্থনে কারো মুখাপেক্ষা করেন নি তিনি। বলাই বাহুল্য, ইতিহাস তাঁর বিচারকে মেনে নিয়েছে। বৃটিশ পার্লামেন্টে তদানিন্তন ভারতের বিরুদ্ধে মিস্ র‍্যাথ বোন-এর তিক্ত মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে কবিগুরু রচনা করলেন তার 'সভ্যতার সংকট' নামক পুস্তিকা। আশি বছর বয়সে, জীবদ্দশায় তাঁর সর্বশেষ জন্মোৎসবে কবিজীবনের সর্বশেষ অভিভাষনে কবিগুরু স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষকে শেষ আশ্বাসন ও আশীর্বাণী দান করলেন—

"ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরাজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।……আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণ কর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকবো সভ্যতার নৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।…

আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মানুষের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপ-শালীরও "ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।…"

মহাকবির সহস্রমুখী প্রতিভার নানা দিক নিয়ে সর্বত্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আজ তাঁর স্মৃতিচারণ হচ্ছে। স্বভা-বতই এ-অনুষ্ঠানে তার স্বদেশ এবং রবীন্দ্রপ্রেমিক বিশ্ববাসী নানা স্থানে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। ক্ষুদ্র মহৎ সংখ্যাতীত অনুষ্ঠানে-ও আজ তৃপ্তি নেই। আরো চাই।…ঐকান্ত্যের আবেগে, গর্বে, কৃতজ্ঞতায় নিশানা'-ও কবিগুরুকে নিবেদন করছে তার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথ

স্বপনবুড়ো

তুমি এসেছিলে তাই ত' কাননে ফুটিল প্রীতির ফুল,
তুমি গেয়েছিলে তাই ত' মানুষ পেয়েছে নতুন কূল।
তুমি ডেকেছিলে তাই ত' সবার ভেঙেছে অলস ঘুম,
তুমি চেয়েছিলে তাই মৌমাছি কুসুমেরে দেয় চুম।
তুমি সেজেছিলে তাই ত' ধরণী নতুন সাজেতে সাজে—
তুমি ভেসেছিলে তাই নদীজল মেতেছিল নিজ কাজে।
তুমি জেগেছিলে তাই ত' সকলে শোনে জাগরণী গান,
তুমি পেয়েছিলে তাই ত' মানুষ খুঁজে পেলো নিজ প্রাণ॥

পঁচিশে বৈশাখ : আমাদের ঋণ

অধ্যাপিকা নীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

শতাব্দী-পার থেকে
আবেক বৈশাখে—
যে-সূর্য উঠেছিল এই আকাশেই,
অপার বিস্ময়ের মতো
অজস্র আলো
ঢেলে দিল, ছেয়ে গেল দিক-দিগন্তেই।

সন্ধ্যার সংগীত গুরু
জীবন-প্রভাতে,
কড়ি ও কোমলে বাজে পদাবলী-নীড়,
সুরের সুরধুনী
দুকূল ছাপাতে চায়,
সহেনা, সহেনা তার সুখে-বাঁধা নীড়।

প্রভাত-সংগীত শুনে
সেই কোন্‌দিন
হয়েছিল স্বপ্ন-ভঙ্গ শৈল-নির্ঝরের,
তারপর শুরু হ'ল
সোনার তরণী বেয়ে
নিরুদ্দেশ যাত্রা-পথ বলাকা-মনের।

মনের মানসী তার
সেই খেয়া বায়,
কণিকা, চিত্রা আর কল্পনা, চৈতালী
স্মরণের ফুলে ভরে
উৎসর্গের ডালি ;
গানের নৈবেদ্য সাজায় পূরবী-গীতালি।

শ্যামলী বীথিকা-মাঝে
বনবাণী বাজে,
বিচিত্রিতা ধরণীর হৃদয় উথলি—
পত্রপুটে থরে থরে
নিবেদন করে
পুলকে-বেদনে নব নব গীতাঞ্জলি।

মহুয়ার গন্ধ-মাখা
ক্ষণিকার স্মৃতি,
ছবি ও গানের সুর তোলে শিহরণ,
রসের মাধুরী ভরা
সুধা-পাত্রখানা
বর্ণময় লিপিকার মধুর লেখন।

খাপছাড়া জগতের
ভোলানাথ শিশু
নব জাতকের ভাষা করে কানাকানি ;
জন্মদিনে কবিতার
আশীর্বাদ আনে
রোগশয্যায় শুয়ে লেখা আরোগ্যের বাণী।

সানাই তুলিল শেষে
সুরের সপ্তক।
প্রান্তিক-সীমায় তাই চিত্ত পলাতকা ;
বেদনার গীতিমাল্য
করিছে রচনা,
আকাশ-প্রদীপ জ্বালি হয় শেষ-লেখা।

* * * *

সে দিনের সে বৈশাখ
শতাব্দীর পারে
আজিও বহন করে আলোর অমৃত,
তাপ দেয়, প্রাণ দেয়,
মননের শক্তি দেয়,
জীবন্মৃত জীবনেরে করে মৃত্যু-জিত।

শিরায় শিরায় সেই
প্রাণের স্পন্দন,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে ঢালা সে আলোর ঋণ,—
শুধিবার দায় নেই,
যত খুশী তত নাও,
যদি পার মনে কোর, শুধু 'এই' দিন।

রবীন্দ্র-আবির্ভাবে

উমা দেবী

কালিদাস লিখেছিলেন এক উত্তুঙ্গ গিরিমালার কথা,

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ"—

যদি জন্মাতেন এ যুগে—হয়তো লিখতেন—

"আসীৎ বঙ্গদেশে কবির্মনীষী রবীন্দ্রনামা বাগীশো বিপ্রঃ।"

বলেছিলেন কালিদাস হিমালয় সম্বন্ধে—

"পূর্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"—ঠিক অনুরূপ কথাই হয়তো বলতেন এ যুগেও—

"পূর্বাপরৌ"—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুই মহাসাগরের ভাবসলিলরাশির সমতা সম্পন্ন করেছিলেন—এই রবীন্দ্রনাথ—তাইতো তিনি—"স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ।"

তাঁকে স্মরণ করলে মনে পড়ে এক আশ্চর্য মনির কথা—যা থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে ঝলকে ঝলকে রক্তিম কিরণসূচী—নানা দিগ্‌দিগন্তরে।

তাঁকে মনে হয় যেন এক আশ্চর্য জহুরী
যাঁর হাতের স্পর্শে সমস্ত মেকি আর খাঁটি—
কাঁচ আর জহরৎ
মিশ্রিত হয়ে থেকেও পৃথক হয়ে পড়ে।
খনির বোবা পাথর হয়ে ওঠে মুখর মণি।
তিনি যেন প্রাবৃটের প্রথম মেঘ-সমারোহ
বিদ্যুতে বজ্রে ঝঞ্ঝায় আর বর্ষণে।

এই পরাধীন দেশের পক্ষে তিনি কি ছিলেন "আকস্মিক?" যে তারকাটি আজ নিশীথ-শিখরে দীপ্যমান সে কি "আকস্মিক?"

কত যুগ-যুগান্তের তপস্যা চলেছে ছায়াপথে
কত জ্যোতিষ্কের আভাস জ্যোতির উজ্জীবন-বহ্নে!
হঠাৎ একদিন আকাশের ছায়াপথের নদীটির
একটু কেনা ছিটকে পড়ে—
প্রক্ষেপের প্রচণ্ড বেগের ঘূর্ণিতে সে রূপ নেয়
তারকার—
তাকে তো বলি না "আকস্মিক"।
সৃষ্টির আদিম ক্ষণে যে প্রাণ সুন্দর হতে চেয়েছিল
সেই তো কত লক্ষ যুগ অপেক্ষা করে আজ-একটি
পুষ্প হয়ে ফুটে উঠল।
পাহাড়ের শিলীভূত আত্মা যে একদিন নেমে এলো
নির্ঝরের শতধার উৎসারে
সেও তো কত যুগের সাধনার ফল!

তাই দেখি—কবিগুরু এলেন আমাদের কাছে মূর্ত হয়ে আমাদের শূন্য ঘটকে রসের ধারায় পূর্ণ করে দিতে।

আমাদের রুক্ষ চিত্রপটে
জীবনের হাজার রঙের উদ্ভাসন ধরিয়ে দিতে।
হাজার রঙের রেশমি সুতোয়
সোডশী সরস্বতীর চুলের বিনুনি গেঁথে দিতে।
সমস্ত যুগ চাইছিল তাঁকে।
সমস্ত মানুষ—সমস্ত দেশের মানুষ চাইছিল তাঁকে।
কালের হুঙ্কারে তাইতো মূর্ত হয়ে এলো
এক নূতন প্রত্যয়
মডিনত্ব যার সব কিছুতেই।

কী আশ্চর্য! ছেলেবেলায় পড়েছিলাম রূপকথায় দেশের গল্প, যেখানে সবাই ঘুমিয়ে আছে।

রাজপুত্র হয়তো এসে পড়েছে কাটাবনের শূন্য প্রাসাদে
ক্ষুধার খাবার দেখলেন—
শুকনো দু'খানা রুটি কাঁসার থালায়,
হঠাৎ ফেললেন একটু দীর্ঘশ্বাস—তপ্ত বাতাসের মতো,
সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এলো থরে থরে ভোজ্য—
মোটা রসের নানা নয়—সূক্ষ্ম সুকুমার রসের ব্যঞ্জনা,
কোথা থেকে এলো সৌরভ—মঞ্জুলো মাজনা—
এলো শ্রীময়ী রাজকন্যা।
এই নূতন রস
এক পরমা প্রতিশ্রুতির—
এক অপ্রত্যাশিতের অথচ অবশ্য—প্রাপনীয়ের
আমাদের জীবন পিপাসা ও রসপিপাসা দুইই যা মিটিয়েছে।

তুমি গায়ত্রীচ্ছন্দ—
প্রথম পুণ্যশ্লোক বিহঙ্গম
নিত্য কণ্ঠাশ্রয়ী।
আমাদের হৃদয়কক্ষের
চিরদীপ্যমান দীপ।
জীবন সম্পুটে—
প্রাণ ভ্রমরের চিরগুঞ্জরণ।
আমরা আপন অন্তরকেই দেখে নিয়েছি তোমার আলোয়।
তুমি আমাদের পরিচ্ছন্ন আয়না
আমরা তাতে ছায়া ফেলেছি নিজেদের।
কে বলে তুমি ঊর্ধ্বাকাশচারী দূরনিরীক্ষ্য এক তারার তুলনা
আমাদের অগম্য অলভ্য এক সত্তা?

তুমি তো রয়েছ আমাদেরই অন্তরঙ্গতায়
তাই তোমায় বাণীই উচ্চারণ করে বলি—
—এই পরিচয় সত্য হোক
তুমি আমাদেরই লোক।
মহামানবের হয়ে মহাপুরুষই দেহধারণ করেন যুগে যুগে
বরণ করেন দুঃখ কালে কালে
তাই তোমার অশ্রুতে ফুটে ওঠে কবিতার কমল
তোমার হাসিতে জ্যোতিষ্কে ম্লান হয়ে যায় গ্রহ-চন্দ্র—
তারকার জ্যোতিও
পাঞ্জির পুঁথির পাতা শুধু ছুঁয়ে একবার আসে
২৫ শে বৈশাখ।
কিন্তু নিত্য তোমার আবির্ভাব
নব নব ক্ষণে
আমাদেরই চিত্তলোকে,
যখনই প্রত্যূষে স্থির হয়
সত্তার আনন্দনির্ভর প্রতিষ্ঠা।

শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র

(উক্তি)

স্মৃতিরঞ্জন গুহ

সুভাষচন্দ্রকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন,

"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র! আমাদের যা বলবার কথা, হাজার বছর পূর্বে আমাদের কবিরা তা বলে গেছেন। যে আগমনী মন্ত্র এখানে শুনলে, পৃথিবী যাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করে তাঁদের জন্য তার অভ্যর্থনা বাণী কতদিন হ'ল তাঁরা বলে গেছেন। সে পুরাতন হবে না। সমস্ত দেশে যে অভ্যর্থনার ভিতর দিয়ে তুমি এসেছ, আমাদের দেশ তোমাকে যে আসন দিয়েছে, সেই আসনের বার্তা রয়েছে কবিদের সেই পবিত্র বাণীর ভিতরে। তাঁদের বাণীতে তুমি পেয়েছ তোমার আসন। আমার খুশি হবার একটা কারণ হচ্ছে এই—এই সুযোগে তুমি আমার পরিচয় পাবে। এ কথা শুনে হাসতে পার, তুমি বলতে পার আমার পরিচয় তোমার জানা আছে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ প্রকৃত কথা নয়। কেননা আমার পরিচয় জানবার গুরুতর বাধা আমাদের দেশে ছিল। আমার আধখানি পরিচয় নিয়ে আমি বাংলাদেশে এসেছি। আমাকে জানে আমি বাণীর সাধক। এখানেই থেমে গেছে। তারপর যে আমার আর কোন সাধনার দেশ আমাকে আহ্বান করছে, সে খবর পৌঁছতে বিলম্ব হল, সেটা মনের ভিতর গ্রহণ করতে বাধা হওয়ার কথা। দোষ দিইনা। আমাদের কবি কালিদাস ব'লে গেছেন—বাগার্থিবিব সম্পৃক্তৌ—বাক্য এবং অর্থ, দুই-ই একসঙ্গে সংযুক্ত। বাক্যের সঙ্গে অর্থের পরস্পর যোগ রয়েছে। যে অংশে আমি বাণীর চরণে আমার অর্ঘ এনে দিয়েছি সেখানে দীর্ঘকাল তোমরা আমাকে পেয়েছ, দেখেছ, হয়ত আনন্দও পেয়ে থাকবে—কখন কখন হয়ত আঘাতও পেয়েছ। কিন্তু অর্থের যে সাধনা, যে অর্থ নিজের জন্য নয়, দান করবার জন্য, সে অর্থের সাধক যে আমি এটা তোমাকে জানতে হবে, নইলে আমার সম্পূর্ণ পরিচয় হবে না। বাক্ এবং অর্থ দুই-ই এক জায়গায় যদি দেখ তাহলে বুঝবে আমার মধ্যে উভয়ের সম্মিলন শুভোদয়ের জন্য হয়েছে। আমার সৌভাগ্য, বাণীর আহ্বানের সঙ্গে অর্থের আহ্বান আমাকে আকর্ষণ করেছিল জীবনের কোন এক সময়ে। যৌবনের প্রান্তভাগে একদিন আহ্বান পেয়ে এখানে এসেছি। তারপর দীর্ঘকাল এই সাধনা করেছি লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেটা দেখবার কারো দরকার ছিল না। দেখেনি। চোখে না-পড়বার কারণ এই—অত্যন্ত অস্পষ্ট করে আমাকে দেখেছে। অস্পষ্ট আমার পরিচয়, আমি অর্থের সাধক। সে সাধনায় সিদ্ধি হয়েছে কিনা সে অপর কথা। বাণীর সাধনায় আমার সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছ। যাঁরা আমাকে ভালবাসেন তাঁরা বলেন, আমি একটা কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করেছি বাক্ দেবতার কল্যাণে। কিন্তু তোমার দৃষ্টিতে পড়বে—তুমি যদি এসে দেখ, এই কর্মক্ষেত্রে আমার পরিচয়, তোমার দৃষ্টিতে এই জন্য পড়বে, তোমার সহৃদয়তার জন্য শুধু নয়, তোমার অভিজ্ঞতা সর্বদেশব্যাপী। তুমি দেখেছ,—

য়ুরোপে যারা অর্থের সাধক, তাদের সাধনার পীঠস্থান তুমি দেখেছ,—তারা কি রকম করে ত্যাগে কর্মে বড় হয়ে উঠেছে, কিরকম অর্ঘ দিয়েছে জীবনে নানা বিচিত্র দিক থেকে তুমি দেখেছ। তার মধ্যে একটা পরিচয়—মানুষের মানবত্ব—সে পরিচয় যদি এখানে জাগ্রত হয়ে থাকে, ত্যাগের ক্ষেত্র, সাধনার ক্ষেত্র যদি এখানে খুলে থাকে, তাহলে তুমি আনন্দিত হবে আমি জানি। আর সে পরিচয় আমি গর্বের সঙ্গে তোমাকে দিতে চাই, এই কারণে দিতে চাই তুমি এখানে দেশের কর্ণধার রূপে এসেছ, দেশ তোমাকে স্বীকার করেছে। এখানে দেশের যে সাধনা সে তোমাকে জানতে হবে, স্বীকার করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে। যদি তুমি স্বীকার কর তাহলে এ চিরকালের জন্য সার্থক হবে। এখানে অনেক দৈন্য আছে, দুঃখ অনেক পেয়েছি, আমার দুঃখ অপরিসীম। চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কত শোক, কত দুঃখ, কত দৈন্য, কত ঋনজালে জড়িত বিড়ম্বনা, কত নিন্দা, কত অন্যায় উক্তি, কত নিরাশার কারণ—এর ভিতর দিয়ে এসেছি। আমার সৌভাগ্য আজ তোমাকে আহ্বান করে এনেছি আমাদের এই কর্মক্ষেত্রে—আর কিছুর জন্য নয়, তুমি আমাকে জানবে।

"তোমাকে আমি রাষ্ট্রনেতারূপে স্বীকার করেছি মনে মনে। আমার সংকল্প আছে, জনতার মধ্যে আমার সেই বাণী আমি প্রকাশ করব। তুমি বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় অধিপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, অন্য দেশকে আমি জানিনা, সেখানে আমার জোর খাটবে না, আমি বাঙালি, বাংলাকে জানি—বাংলার প্রয়োজন অসীম। সেই জন্য তোমাকে যদি আহ্বান করি, স্বীকার করতে হবে—আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী কলকাতায় আমি তোমাকে আহ্বান করব রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ নিয়ে। এখানে তুমি আমাদের বন্ধু। আমাদিগে দেখে আমাদের কার্যভার যদি লাঘব করতে পার কর। অবসর হলে আসতে দেতে হবে। আজকে আমার আনন্দ এই জন্য, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তুমি আশ্রমে ঢুকনি—সে খুব বড় কথা। এই সীমানার মধ্যে এরূপ অন্য রকম।

"দেশে যারা অপমানিত তাদের সম্মান দেবার জন্য আয়োজন করেছি এখানে। ছেলেরা, যারা বাল্যকাল থেকে শিক্ষার বিড়ম্বনায় পীড়িত, যারা বিদ্যালয়ে ভোগ করে সহস্র কারাদণ্ড, শান্তি নাই, সৌন্দর্য নাই, মুক্তি নাই, কিছু নাই—কেবল আছে পড়া মুখস্থ করা। যতগুলি ছেলেমেয়েকে পেয়েছি কারাগার থেকে মুক্ত করবার সাধনা করেছি—তার আনন্দ তুমি বুঝবে, তুমি কারাবাস ভোগ করেছ। এই কারাবাস আমাদের প্রত্যেক শিশু ভোগ করছে—কি দুঃখ, কি পীড়ন আমি জানি। যে-সময় শিশুদের মন সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম অন্তরঙ্গভাবে যুক্ত থাকবে, যখন তারা গাছপালা, পশু পাখীর সঙ্গে মিলনের আনন্দে মগ্ন থাকবে, সে-সময় তাদেরকে জাঁতাকলে ঠেলা হয়—কি শিক্ষা শেখান হয় তার নমুনা আমরা দেখেছি। পড়াপাখী, বুলিবলা পাখীর মত গতানুগতিক দল সৃষ্টি করি; তারা হয় বিদেশের বুলি মুখস্ত করা খাঁচার পাখী। চেয়েছি করতে, পারি না পারি চেষ্টা করেছি আনন্দ দিতে, মুক্তির স্বাদ দিতে। এখানকার হাওয়াতে এখানকার ছেলেমেয়েদের যে আনন্দ, তাতে তাদের দাবী আছে, এইজন্য তারা জন্মেছে। তা নইলে কেন ফুল ফোটে, দিনান্তে কেন পাখী ডাকে যদি তারা ক্লাস ঘরে ঢুকে দাগ কাটা passage মুখস্ত করে জীবনের সুন্দর সময় নষ্ট করে। কি দুর্ভাগ্য, মানুষ সৌন্দর্যবোধ থেকে বঞ্চিত থাকবে! এইজন্য এখানে আরম্ভ করেছিলাম। পারিনি—এত ভার কি একলা বইতে পারা যায়? অনেক রকম দুঃখের ভিতর দিয়ে চলেছি। একেবারে কিছু ফল হয়নি বলতে পারিনা। মনের মত হয়নি।

"অন্য দেশের যারা দেখেছে, বলেছে ভাল। শুধু বলেনি, অনুকরণ করেছে। এ তুমি বোধ হয় দেখে থাকবে। ওরা বুঝতে পেরেছে, শিক্ষাটা সমস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িত। শিক্ষাকে যারা বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তারা তাকে পীড়িত করে রাখে। মানুষের মনকে তারা কেটে কেটে বাঁচাবার চেষ্টা করে। এখানে শিক্ষাকে সমগ্র জীবনের সঙ্গে যুক্ত ক'রে—আনন্দের সঙ্গে, উৎসবের সঙ্গে, প্রাণের সঙ্গে, চিত্রকলার সঙ্গে, সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত ক'রে আহ্বান করেছি। মুক্তি এবং আনন্দের স্বাদ দিতে চেষ্টা করেছি। এখানে নূতনত্ব আছে। দেশের লোক জিজ্ঞাসা করে—কি তোমার সিলেবাস্ কি বই পড়, ব্যাকরণ কি পরিত্যাগ হয়—সেগুলি মুখস্ত করতে পেরেছে কিনা এবং কয়টা বাড়ীঘর আছে; —সরস্বতীকে টেনে এনে কারারুদ্ধ করবার আয়োজন বিশেষ লোকের ভাল লাগে। এখানে তা দেখতে না পেয়ে তারা দুঃখ করেছে। আমি বলেছি—দেশের অন্তরে যে বস্তু আছে, সাধনা আছে তা তারা নষ্ট করে ফেলেছে। কাজ যা করবার তা সম্পূর্ণ হয়নি এখানে। সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারিনি, সামর্থ্য নাই। রাষ্ট্রীয় দিক থেকে তুমি আমার কর্মের পরিচয় নিয়ে যদি তাকে স্বীকার করতে পার সুখী হব।"

[২ই মাঘ, ১৩৪৫ ; ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৯]

সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বললেন।

"গুরুদেব,—এবার এখানে আমার নতুন করে আসা। ইতিপূর্বে কয়েক-বার এখানে এসেছি, বোধ হয় দুইবার। কিন্তু আজকের আসার মধ্যে একটা নূতনত্ব আছে। প্রধানতঃ দুই কারণে এখানে এসেছি। এক কারণ, আপনি ডেকেছেন। আর এক কারণ, নিজের মন থেকে আসবার ইচ্ছা এবং প্রেরণা অনুভব করেছি।

"আপনার যে অখণ্ড সাধনা, সেটা সাধারণ মানুষ বা সাধারণ ভারতবাসী যে উপলব্ধি করবে—অন্ততপক্ষে সহজে উপলব্ধি করবে এটা আশা করা অন্যায়। আমিও সেই সাধারণের মধ্যে একজন। সুতরাং আমি যে আপনার অখণ্ড সাধনার মহত্ত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করতে পারব সে দুরাকাঙ্খা আমি করি না, সে উপলব্ধি যখন আসে একদিনে আসে না। সে উপলব্ধি হচ্ছে ক্রমিক এবং সারা জীবনব্যাপী। তবে আমার মনে হয় যদি আমরা চলার পথে চলতে থাকি তা হলে সে উপলব্ধি ক্রমশঃ প্রসারলাভ করবে।

"আপনার প্রাণের মধ্যে একটা বেদনা, একটা অভিমান আছে—হয়ত আছে—যে, আপনার দেশবাসী আপনাকে জানল না, আপনার সাধনা বুঝল না। কিন্তু তার জন্য কি দেশ-বাসীকে আপনার দোষ দেওয়া উচিত? যদি তারা এত সহজে বুঝতে পারত তাহলে তারা ত আপনার সমান হয়ে পড়ত। দ্রষ্টার সম্মুখে যে সত্য প্রতি-ভাত হয় সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা যেমন কঠিন তেমনি সময় সাপেক্ষ। আমরা এইটুকু বলতে পারি, আমরা চলার পথে চলেছি, চলবার চেষ্টা করছি। দ্রষ্টার সত্যকে উপলব্ধি করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আপনার সাধনাকে বুঝবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তা হলে দেশবাসীকে অপরাধী করতে পারবেন না। এটা সর্বদেশে সর্বজীবে (লোকে?) দেখতে পাওয়া যায়—যাঁরা নূতন পথ দেখান, মানুষকে যাঁরা নূতন সত্যের উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করেন, তাঁদের মহত্ত্ব, তাঁদের মূল্য সাধারণ লোকে বুঝে না। বরং সেই সত্যদ্রষ্টা ও সাধক-দের শূলে চড়াবার চেষ্টা করে। সুতরাং আপনার দেশবাসীর যে বিশিষ্টতা আপনি দেখেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেটা শুধু আমাদের লোকের ধর্ম নয়, বোধ হয় মানবজাতির ধর্ম। মানুষের অন্তরে যত দৈন্যই থাকুক না কেন, আমরা যারা আশাবাদী, আমাদের মনে হয়, এই দৈন্য, নীচতা ও মলিনতার অন্তরালে একটা দেবত্ব নিহিত আছে এবং যে সত্য সাধনা আজ দেশবাসী বুঝছে না, একদিন সে তা বুঝবে, বুঝবার চেষ্টা করবে।

"মধ্যে মধ্যে একথা উঠে এবং আমাদের মধ্যে আলোচিত হয়, হয়ত আপনার মনেও উঠেছে—আপনি উপস্থিত না-থাকলে আপনার সাধনার কি হবে। সেদিন কলকাতায় এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমি বলতে চাই—কোন বস্তু বা সাধনা মরতে পারে না যত দিন তার সার্থকতা আছে। আপনি যে জিনিষটা দেশবাসীকে ও মানব জাতিকে বুঝাবার ও শিখাবার চেষ্টা করছেন, যতদিন সেটা তারা না শিখবে, না বুঝবে তত-দিন পর্যন্ত আপনার এই প্রত্যক্ষ বাস্তব সাধনা মরতে পারে না। যে সত্য ও সাধনা নিয়ে আপনার সমস্ত জীবন দাঁড়িয়ে রয়েছে সেদিন ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে সেটা প্রতি-ষ্ঠিত হবে সেদিন শান্তিনিকেতন বাঁচুক বা মরুক তাতে কিছু আসবে যাবে না। যতদিন পর্যন্ত সে সত্য ও সাধনা জাতির প্রাণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হবে ততদিন পর্যন্ত আপনার শান্তি-নিকেতনের ও শ্রীনিকেতনের সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা থাকবেই থাকবে। শুধু তাই নয়, এ রকম সাধনা ভারতের দিকে দিকে স্থানে স্থানে গড়ে উঠবে।

"আমরা যারা রাষ্ট্রীয় জীবনে বেশী সময় ও শক্তি ব্যয় করি, আমরা মর্মে মর্মে আমাদের অন্তরের দৈন্য অনুভব করি। প্রাণের দিক দিয়ে যে-সম্পদ না পেলে মানুষ বা জাতি বড় হতে পারে না, সেই সম্পদ, সেই প্রেরণা আমরা চাই। কারণ আমরা জানি, সে প্রেরণা, সত্যের সেই আভাস যদি প্রাণের মধ্যে পাই তাহলে আমাদের কর্মজীবনের ও বহির্জীবনের সাধনা সাফল্যমণ্ডিত ও সার্থক হবে। আপনার কাছ থেকে সে প্রেরণা আমরা চাই। আমরা হয়ত আজ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমা-দের আদর্শ বড়। আমরা চাই মানুষের ও জাতির পরিপূর্ণ জীবন। আমরা চাই আমাদের দেশে প্রত্যেক নর-নারী আমাদের অখণ্ড জাতি সব দিক দিয়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হউক। এই যাত্রার পথে, এই সাধনার পথে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা একটা সোপান মাত্র। আমা-দের সম্মুখে যে আদর্শ রয়েছে, যে স্বপ্ন আমাদিগকে বিভোর করে রেখেছে সে অতি উচ্চ। সেই স্বপ্নকে ও আদর্শ-কে আমরা কতটা বাস্তব জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পারব জানি না। তার জন্য যতটুকু শক্তি আছে নিজে-রাই জানি না। ব্যক্তিগত শক্তি ও যোগ্যতা যতটা থাকুক না কেন আমরা মস্ত আদর্শ সামনে রেখে চলতে চেষ্টা করছি। সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাস আছে, আমাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ক্ষমতা যতটুকু হউক না কেন, আমরা যে-পথে চলেছি সেটা সত্যের পথ। আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের চেয়ে বেশী শক্তি ক্ষমতা ও যোগ্যতার অধিকারী হবে। আমাদের যে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকবে তা তারা শোধরাতে পারবে, সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজ করবার চেষ্টা করছি।

আপনি জাতিকে—শুধু জাতিকে কেন, সমগ্র মানব সমাজকে আদর্শের পথ দেখিয়েছেন,—শুধু দেখিয়েছেন তা নয়, মানুষকে সেই পথে চালাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তাই বাণীর বা সাহিত্যের সাধনায় আপনার চেষ্টা পর্যবসিত হয় নাই শুধু ভগবানের উপাসনায় আপনার সাধনা পর্যবসিত হয় নাই, অন্তরের আদর্শকে আপনি বহির্জীবনে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এইটুকু আপনার চরণে নিবেদন করতে চাই—এই আদর্শ আমাদেরও জীবনের আদর্শ, কারণ এটা আমাদের জাতির আদর্শ। আমরা আমাদের জীবনে তা সফল করতে পারি না পারি সেই আদর্শকে আমরা অন্তরে রেখেছি বাহিরে রেখেছি এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করছি, ভবিষ্যতেও করব।

"আমরা যারা সামান্য ভাবে কাজ করতে চেষ্টা করছি আপনার কাছে যে অপরিসীম স্নেহ-উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি ও পেয়ে থাকি এতে আমাদের জীবন বাস্তবিক ধন্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখন আমাদের জীবনে নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন বিপদ-আপদ এসেছে, যখন আমাদিগকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, যখন আমাদের মন নিরুৎসাহে নির্জীব হয়ে পড়েছে তখন দেশবাসীর কাছ থেকে এবং যারা দেশের শ্রেষ্ঠ নেতা ও স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক তাঁদের কাছে কী অপরিসীম স্নেহ ও প্রেরণা পেয়েছি তা স্মরণ করলে মনে হয় আমাদের জীবন ধন্য, সাময়িক বিপদে আপদে কিছু আসে যায় না।

"ত্যাগ বলতে একটা ভুল ধারণা আমরা করি। মনে হয় যেন তার মধ্যে বেদনা আছে, কষ্ট আছে। যেখানে প্রকৃত ত্যাগ সেখানে কষ্ট নেই। বেদনার অনুভূতি থাকলে মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। ত্যাগে যে অনাবিল আনন্দ আছে সে আনন্দ আপনার জীবনে জয়টীকা ধারণ করেছে। সে আনন্দ আমাদের জীবনকে উদ্বুদ্ধ করুক, অনুপ্রাণিত করুক এই আমাদের অন্তরের প্রার্থনা। আপনার কাছ থেকে আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্তে আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। কারণ আমরা জানি আপনার আশীর্বাদ আমরা যতদিন পাব, ততদিন বুঝব আমরা ঠিক পথে চলছি। আপনার আশীর্বাদ আমাদের যাত্রাপথে পরম পাথেয় বলে আমরা সকলে মনে করি।" '(৯ই মাঘ, ১৩৪৫)'।

গুরুদেব প্রসঙ্গে

হাসিরাশি দেবী

যে সময়ে ফ্রক ছেড়ে শাড়ী প'রতে শুরু করেছি, অথচ শাড়ী সামলাবার কেরামতির অভাবে সদা-সর্বদা বিব্রত থাকার অন্ত নাই—সেই সময় থেকেই হাঁটাহাঁটি সুরু হ'ল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে।

সঙ্গে নিয়ে যান আমার দিদি, (প্রভাবতী দেবী সরস্বতী) সূত্রটা ছবি আঁকার; লেখালেখির কসরৎটা তখনও শক্তি আর সাহসের বাইরে! যাও-বা একটু আধটু লিখি, তাও 'ঝড়ে কাঁপা কদলী পত্রের' মত সাহসে আর উৎসাহে, তাই তার সমাপ্তি ঘটে টুকরো টুকরো অবস্থায়—নানা জায়গায়; কারণ, একটা সত্য . আমার মনে সর্বদা কষাঘাত করত' এই কথায় যে কেউ কোথা দিয়ে দেখে ফেললেই বলবে—'এইযে নব যুগের লেখিকা এল'—।

আর তারপরে সে লেখার বিশ্লেষণ! তার সঙ্গে সে কী হাসি!

এ সবের অগ্রণী আমার ছোড়দা—জগৎ ঘটক, এবং বড়দির ছেলে—শ্রীমান প্রভাত।

বলতে দ্বিধা নেই, যে ওদের মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে অকারণেই হৃৎকম্প হত আমার; ভাবতাম—গোপন কথাটা ওরা জেনে ফেললে বুঝি!—

যাইহোক, ঠিক করলাম, দরকার কি অত-শত ঝামেলার মধ্যে যাওয়ার! ছবিই আঁকব।

কিন্তু,—ওদেরই একজন একদিন আমার প্রথম লেখার একটি—'পাপর' নামের গল্প ছাপিয়ে দিলে—সিটী কলেজের ছাত্রদের পরিচালনায় ছোট-দের একটি মাসিক পত্রে,—নাম মিলনী।

সম্পাদনায় নাম ছিল যত দূর মনে হয় পরবর্তী জীবনের বিশেষ পরিচিত ও শ্রদ্ধেয় কবি কৃষ্ণধন দে'-র।

এদিকে দিদির সঙ্গী হ'য়ে ঠাকুর বাড়িতে যাই আর আসি! আমার আঁকা ছবি গুলোরও দু'একখানা শিল্পী-গুরু'কে দেখান দিদি! উনি ভুলগুলো বুঝিয়ে দেন—আর নতুন করে আঁকার উৎসাহ দেন—হাসিভরা কথায়, অপার

সান্ত্বনায়। এমনি ক'রেই কেটে চলল' দিনের পর দিন আর বছরের পর বছর।

আমাদের বসা-দাঁড়ানোর জায়গা, সেই দক্ষিণের টানা বারন্দাটা,—যেটা লম্বায় আর চাওড়ায়—অনেকটা জায়গা দখল করে ছিল এবাড়ির ;—আর এরই প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রাখা কতক-গুলো কাঠের পুরোনো টেবিল চেয়ারের কাছাকাছি একটা ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর একটা তক্তা পেতে, টেবিলের সুবিধা ক'রে নিয়েছিলেন সেই পাঞ্জাবী আর পাজামা পরা, লম্বা—দোহারা গঠনের মানুষটি। পাঞ্জাবীর হাতা ঢিলে, আর পায়ে থাকত' বিদ্যাসাগরী চটি।

সৌম্য তাঁর চেহারা। মুখের ভাষা শান্ত, আর চোখের দৃষ্টিতে তখনও রূপের মধ্যে অপরূপের সন্ধান।

শুনেছি-এই বাড়িতেই একদিন এসে জড়ো হতেন দেশ-বিদেশের চিত্রশিল্পী আর শিল্প-রসিকরা।

অবিভক্ত বাংলার এই সংস্কৃতির পাদপীঠের কাহিনী অনেক আছে, যার সব কিছু আমার পক্ষে জানা বা দেখা সম্ভব নয়,—শুধু দেখেছি তার দুটি দিকের দুটি সূর্যকে, যার একজন অবনীন্দ্রনাথ, অন্যজন রবীন্দ্রনাথ।

আমি যখন শিল্পীগুরুর কাছে গেলাম, তখন তিনি চেয়ারের সেই স্ব-নির্ম্মাচিত টেবিলে পাথরের নুড়ি, ঝিনুক আর ছোট ছোট কাঠের স্বাভাবিক আকৃতিকে অঙ্কুর রেখে তৈরী করেন আকৃতির পর আকৃতি,—আর সেই সঙ্গে কথায় গাঁথেন, তাদের প্রকৃতির পরিচয়,—হয়—"কাটুম-কুটুম।—"

রামায়ণ-মহাভারত নিয়েও অনেক-গুলো ছোট ছবি এঁকেছিলেন ; তবে এক সময়ে জমিদারীর তদারকে গিয়ে যে ত্রিশ-বত্রিশখানা নিসর্গ চিত্র এঁকে এনেছিলেন, সে গুলোর পরে আর দেখা পাইনি।

এগুলো আঁকা জল রংয়ে, কাগজের ওপর, আর লম্বা চাওড়ায়—বেশীর ভাগই আড়াআড়ি ভাবে আঁকা এবং বাইশ থেকে ষোল ইঞ্চির মধ্যে বলে মনে পড়ে।

মনে পড়ে একদিন আমার আঁকা একখানা ছোট ছবি দেখে বেগে ছিঁড়ে দিয়েছিলেন ; কারণ তাতে যে সাদা রংয়ের ব্যবহার ছিল, সে ব্যবহারে তাঁর নিষেধ ছিল।

অবশ্য, আজকের দিনে আঁকতে গিয়ে সেদিনের সঙ্গে তুলনা করলে দেখি—এ পথেও আমরা সাধনার নিষ্ঠা হারিয়েছি! ব্যবহার করছি যথেচ্ছ রং-বেরং বে-পরোয়া ভাবে চলেছে রংয়ের ব্যবহার। তবে যুক্তি-তর্ক হিসাবে বলতে গেলে বলা যায়—ছবি আঁকার আবার নির্দ্দিষ্ট কোনও পাঠ আছে নাকি? স্বাধীন মন নিয়ে শিল্পের প্রকাশ ঘটেছে চিরকাল; এখনই বা তার দিকে চেয়ে চোখ রাঙানো কেন?

কথাটা আবৌক্তিকও মনে হয় না। যাক,—এপর্যন্ত এসে ইতি করছি শিল্পগুরুর প্রসঙ্গে।

এবার বলছি কবিগুরুর কথা—

দিদি (প্রভাবতী দেবী সরস্বতী), রমা-দি' (সৌম্য ঠাকুরের বোন) স্বামী চন্দ্রেশ্বরানন্দ, প্রীতি-গুপ্ত, লীনা দেবী প্রভৃতির চেষ্টায়-বাগবাজারের নন্দলাল বোস লেনের মনীন্দ্র নন্দী টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গড়ে উঠল' সাবিত্রী শিক্ষালয়।

এই সূত্রে ঠাকুরবাড়ির রমাদি-দের অংশে যাতায়াত ঘটতে লাগল বেশী।

আমরা তখন থাকি চোরবাগান লেন'এর পাঁচ নম্বর বাড়িতে।

ঐখান থেকে বার হ'লে সরকার লেন এবং আরও দুই একটা গলিপথ পার হ'লেই পড়তো ঠাকুরবাড়ির পেছন দিকের অংশটা ; যেটা একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল, আর ওর মধ্যে ছিল একটা কপাট দেওয়া দরজা। এই পথেই আমরা যাওয়া আসা করতাম বেশী। এখানেও সামনেই সেই বাগা-নের খানিকটা অংশ! ওখানে তখনও যত্নে-অযত্নে ছিল কতটা ফুলগাছ! যাতে ফুটত দু'ই-চাপা, কেয়া আর টগর। পাঁচীল ঘেঁসে একটা গোলক-চাঁপাও যেন ফুটতো গাছে ব'সে মনে হয়।

যাই হোক,—ওখানে যেতেই রমা-দি বললেন—ওপরে যাবেন প্রভাদি? আপনাদের গুরুদেব পৌঁচেছেন আজ।"

দিদির সঙ্গে আমিও গেলাম। প্রণাম-জানাতেই পেলাম সস্নেহ আশীর্ব্বাদই শুধু নয়, এলোমেলো চুলের গোছা গুছিয়ে দেওয়া। এই সময়ে আমার নতুন নাম রাখলেন চিত্র-লেখা।' (কিন্তু এ নাম আমার পছন্দ হয়নি, ব্যবহারও করিনি, কারণ আমার সবচেয়ে প্রিয়-নাম ছিল দিদির দেওয়া 'হাসিরাশি।')

এরপরে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোয় শুধু নয়,—কলকাতার এপাশে ওপাশে, যেমন প্রশান্ত মহলানবীশের বেলঘরিয়ার বাড়ি—ইত্যাদিতে এসে থাকলেও আমরা যেতাম—ফিরতাম তাঁর অনেক সময় নষ্ট করে। আপত্তি করতেন না।

একবার ইচ্ছা জানাই—

শুনেছি—বড় বড় সভা-সমিতিতে আপনি বক্তৃতা দেন, নিজের লেখা কবিতারও আবৃত্তি করেন ; আমার তো সেখানে থাকার সৌভাগ্য কোনও দিনই হবেনা,—হ'লে শুনতাম।'

উনি বললেন—

—: বেশতো, চলনা আমার সঙ্গে দিন কয়েক ঘুরতে। বেশীদূর তো নয়, চন্দন-নগরে ; ঐখানেই বোটে থাকবো। যাবে? কালই আমার যাওয়া।

আমার উপায় ছিলনা যাবার। বলেছিলাম। উনি কিন্তু আমায়

একেবারে নিরাশ করেননি; বললেন চারটি লাইন—

"আমারে বাঁধবি কেরে,
সে বাঁধন কি তোদের আছে,—
আমি যে বন্দী হ'তে
সন্ধি করি সবার কাছে।"

একবার বললেন

"তোমাকে আমি নিতে যাব শান্তিনিকেতনে। অন্ততঃ পক্ষে তিন-মাসের মত রাখবো নন্দলালের শিক্ষায়—

কিন্তু, কপাল খারাপ আমার নিশ্চয়ই তাই যাওয়া হয়নি: স্বামী মত দিলেন না। চিঠি লিখলাম গুরু-দেবকে। তার উত্তরে উনি যে জবাব লিখলেন,—তার কপি থেকে তুলে দিচ্ছি—

ওঁ শান্তিনিকেতন
উত্তরায়ণ

কল্যানীয়াসু

হাসিরাশি, তুমি আশ্রমে আসতে পারো বা না পারো তাতে কিছু আসে যায় না,—তোমার অন্তরের শ্রদ্ধা তোমাকে অতিক্রম ক'রেও আসতে পারে।

তাকে রেলের টিকিট কিনতে বা সংসারের সম্মতি নিতে হয়না।

তোমাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে তোমার সেই অর্ঘ্য আমি সাদরে গ্রহণ করলুম। ইতি

১৭ই জুলাই, ১৯৩৫
শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গুরুদেবের লেখা আরও একখানি চিঠির পুনরুক্তি ক'রে আমার এ লেখার শেষ করবো। এ চিঠিটা আমার দিদির লেখা চিঠির উত্তর; দিদি জানতে চেয়েছিলেন, উনি আবার কবে কলকাতায় আসবেন?

কিন্তু, এ চিঠির উত্তর তখন পাননি, পরে পেলেন—

শান্তিনিকেতন
কল্যানীয়াসু উত্তরায়ণ

(প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে লেখা)

একসময় ছিল, যখন চিঠি মাত্রেরই উত্তর দেই বলে সুনাম অর্জন করেছি। সেই সুনাম রক্ষা করার দিন ফুরিয়েছে। কেননা, ওটা একটা বোঝা, বা বহন করবার শক্তি আমার নেই: নিরবচ্ছিন্ন কুঁড়েমি করব বলে কোমর বেঁধেছি,—আমার আশা ছেড়ে দাও। যাবার সময় এই বদনাম নিয়ে যাব যে আমি উত্তর দিইনে,—এ সম্বন্ধে নালিশ কর্ছু কোরো যখন তোমারো বয়স ৭৫ হবে। হাতে সময় অল্প, শক্তিও কম, অথচ এখনো কাজ বিশেষ কমেনি—তাই চিঠিপত্র নিতান্ত জরুরি না হ'লে আমার স্বল্পাবশিষ্ট আয়ুকে ভারাক্রান্ত করতে পারিনে।

নিকটে দুই-একজন হিতৈষী আছেন, যাঁদের তরুণ স্কন্ধে আমার চিঠির বোঝা অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছি। তোমরা আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো এবং এই কামনা করো দীর্ঘ কর্ম্মদিনের শেষে আমার বিশ্রাম যেন অব্যাহত হয়। ইতি—

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৫
শুভার্থী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হাসিকে আমার আশীর্ব্বাদ জানিয়ো। বোম্বে রেডিওতে যদি আমার গান করে তবে তাতে আমি আপত্তি করবো না।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা ভাল, যে একবার তিনি তাঁর লেখা একটি গান আমাকে গাইতে বলেন; কিন্তু সাহস ও শক্তির অভাবে—পারিনি। পরে যখন রেডিওতে গাইবার জন্যে প্রস্তুত হলাম ও তাঁকে জানালাম এ চিঠি সেই সময়ের। কিন্তু, আপত্তি জানাল বিশ্বভারতী। সেই থেকে এ চেষ্টা আর করিনি।

এসব চিঠির কিছু বৌঠাকুরাণীর (প্রতিমা দেবীর) কাছে পাঠিয়েছিলাম, এবং কিছু রবীন্দ্র ভারতীতে দিয়েছি। কিছু চিঠি হারিয়েছে,—এবং দিদির চিঠিও দিদি আমারই হাতে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন।

আজ, দীর্ঘদিন পরে এই স্মৃতি-চারণের পথে পদার্পণ করতে হল ডঃ উমা রায়ের ইচ্ছায়। এজন্য তাঁরই কৃতিত্বকে আমি স্বীকার করছি।

রবীন্দ্রনাথের জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবনবেদ

অমরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

শান্তি-গহ্বর থেকে রবীন্দ্রনাথ কতখানি বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন, কতখানিই বা নিজেকে অনাবৃত ক'রতে পেরেছিলেন, কীভাবেই বা তিনি আস্তিক্যের আনন্দ অনুভব করেছিলেন এবং ক'রতে গেয়েছিলেন—এ নিয়ে যথেষ্ট ভাববার অবকাশ আছে। ভাবতে গেলেই ভাবনা আবোপ-দুষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এ ক্ষেত্রে সুস্থ, নিরপেক্ষ চিন্তা এবং যথেষ্ট পরিমিতি বোধ (Sense of proportion) অপরিহার্য।

রোমান্টিকতা, আত্মান্বেষণ এবং রূঢ় বাস্তবাদ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এবং জীবনবোধে পরস্পরবিরোধী প্রভাব রেখেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে অনেক সময় মনে হয়। কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের নিয়ত অসম-দ্বন্দ্বে, সভ্যতার নাভিশ্বাসে, মূঢ় ম্লান মুখগুলির বিষণ্ণতায় পীড়িত তাঁর জীবনবোধের নিশ্চিত আশ্রয় কী? Concrete humanism? অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং সংগ্রাম? না, নিবেদ প্রাপ্তি? Abstract humanism? "আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে, না, "দাঁড়াও মানহীনা ঐ মানবীর দ্বারে/বলো, ক্ষমা করো"? বহির্জগতে যিনি বিচিত্ররূপিনী, অন্তর্জগতে যিনি একাকী, সেই রহস্যময়ীর রহস্যময়তাকে ঠিক কীভাবে তিনি দেখেছেন, দেখতে চেয়েছেন এবং দেখতে পেরেছেন? সেই রহস্যময়ীর রহস্যময়তা তাঁর অস্থির জীবনসমুদ্রে কী কখনও কোনও রূপান্তর গ্রহণ করে নি? কোনও বিবর্তন?

সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথের আস্তিক্যবাদের স্থির ভূমি আত্মার আস্বাদন। অন্তর্মুখীনতাই তাঁকে বহির্জগতের বিচিত্র রূপ এবং দ্বন্দ্ব-কোলাহল হলাহল থেকে সরিয়ে বড়ো বেশি ক'রে, একান্ত করে বার বার টেনেছে বিশ্বাসের রহস্যময় গহ্বরে। কখনও কখনও ভিতর থেকে বাইরে তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত হ'লেও বাহির থেকে অন্তরে, অন্তর থেকে অন্তরতমে অনুপ্রবেশের ব্যাকুলতা ও নাদ তাঁর মূল প্রেরণা। অন্তরতমকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা আবর্তিত। ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছে জীবনবোধ।

"হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে/যাহা কিছু সব আছে আছে—।" তাই "আপনাকে জানা আমার ফুরাবে না।,'

"মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুন হাতে / সরল জীবনে। এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বেরে করেছো চিহ্নিত।"—

এই 'প্রবঞ্চনায়' কখনও কখনও তিনি জড়িয়ে পড়েছেন ব'লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে। মূল সূত্র কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায় নি। প্রত্যাবর্তনের অক্লান্ত প্রয়াসে নিজের গভীরে ডুব দিয়ে দিয়েই তিনি খুঁজতে চেয়েছেন বিশ্বাসের শেকড়। "ডুবারো না নদীরে সমীরে।" "এ নৈরন্ধ্য মাঝারে কবি/ধর্ম (?) হতে নিয়ে এসো বিশ্বাসের ছবি।" "Truth can not afford to be tolerant when it faces positive evil"—তাঁর কাছ থেকে এ ধরণের কথা কখনও শোনা যেতে পারে। কিন্তু মানবস্বভাব ও সত্য ত' এক নয়। সত্যকে কে চাইল, কে চাইল না, কে কীভাবে ব্যাখ্যা করল বা বিকৃত করল, তাতে সত্যের কিছু যায় আসে না। সত্যের যাতায়াতের মেজাজখানি তরুণ রবীন্দ্রনাথ আভাসে ধরেছিলেন :—

"তরাপালে চলে যায়,
কোনও দিকে নাহি চায়
ঢেউ গুলি নিরুপায়
ভাঙে দুধারে।

সুখ-দুঃখের ঢেউগুলি 'নিরুপায়' কেন?

এই **জীবন—জিজ্ঞাসা** অসংখ্য দ্বন্দ্বের, অসংখ্য প্রকৃতি-বিকৃতির সামান্য বিশেষে উদ্বেলিত হয়েছে। Concrete থেকে ক্রমান্বয়ে Abstract এ যাওয়ার নাম Progress বা প্রগতি। প্রগতি সম্পর্কে এই ধরণের ধারণা যখন তাঁর ভেতরে দানা বাঁধে, তখন মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ থেকে তিনি ছিটকে বেরিয়ে আসেন অন্তরের অন্তঃস্তলে। এতাদৃশ অনুভূতির রাজত্বে lull চলে, বিক্ষিপ্ততাও কিছুটা অনিবার্য। কিন্তু রেশ থেকে যায়। তাই মাঝে মাঝে তাঁর জীবন ভাবনা আশ্রয় ক'রেছে "বিচিত্ররূপিনীতে," এমন কি "দুঃস্বপনের তলে।" এই বিক্ষিপ্ততার কারণ এই যে, অসীমের অনুভূতি দানা বাঁধে বিন্দু বিন্দু ক'রে কঠিন ও তরলের তারতম্যে, মনোজগতে উচ্চতা ও নৈচত্যের বৈচিত্র্যে, হ্রাস-বৃদ্ধির চড়াই-উৎরাই-পথে। অন্ততঃ পক্ষে এমন চলে সেই বিন্দুতে একেবারে সমাহিত না হওয়া পর্য্যন্ত, যে বিন্দুতে সমান্তরাল রেখা মিলিত হয়—সেই অসীমে। অসীমের আভাস রবীন্দ্রনাথের জীবন-জিজ্ঞাসার স্ফুলিঙ্গ। শব্দ ব্রহ্মে একীভূত হওয়া তাঁর আস্তিক্যবাদের ভূমি। "দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।" কার্লাইল-এর Music of the being,, স্পেন্সারের 'Sphere of music', কীটসের "heard melodies are sweet, those unheard are sweeter," উপনিষদের শব্দব্রহ্ম, অনাহত ধ্বনি, রবীন্দ্রনাথের শব্দহীন-সুর," "অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ।" এটাই তাঁর **জীবন-**

নাথ এমনি দুই বিপরীত বিন্দু মধ্যে দোদুল্যমান থেকেছেন—বাস্তবতার পরামর্শ এবং ক্ষণপরে প্রাচীন ভারতের সৌম্যধ্যলোকে প্রত্যাবর্তন।

'অনুষ্টুপ' সাহিত্য বিষয়ক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় এই পত্রিকার ১৩৭৯র সপ্তমবর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায় 'রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই লোক?' এই জিজ্ঞাসাচিহ্নিত শিরোণামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো। জনৈক 'অচেনা মিত্রের' কলমে। লেখকের বক্তব্যের সার সংকলন করে দিচ্ছি। কারণ রচনাটি সুদীর্ঘ।

উনবিংশ শতাব্দীর সম্ভ্রান্ত অনেক প্রখ্যাত মুৎসুদ্দিপরিবারের অন্যতম এক মুৎসুদ্দি পরিবারে রবীন্দ্রনাথের জন্ম।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর একজন নিষ্ঠাবান মুৎসুদ্দি, একজন অধ্যবসায়ী নীলকর, ইংরেজ উপনিবেশের একজন সমর্থক। এই ইংরেজ সৃষ্ট মুৎসুদ্দির প্রধান কাজ ছিলো ইংরেজ শাসকের সহযোগীতা করা, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধীতা করে ভারতীয় সাধারণ মানুষের সামিল তারা কখনো হ'ন নি। রবীন্দ্রনাথের যৌবন বয়সে অন্ধ ইংরেজ ভক্তি, পরিণত বয়সে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ বোঝা সত্ত্বেও কখনো প্রত্যক্ষ সংঘাতে মুখোমুখি না হওয়া, সর্বদাই 'তৃতীয়পক্ষের দূরত্ব রক্ষা করে যাওয়া তাঁর শ্রেণীচরিত্রের স্বাভাবিক ধর্মকেই প্রকাশ করেছে। 'তিনি অত্যন্ত বেশি রকম নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের মানুষ, ভারতীয় ও ইংরেজ এই উভয়ের থেকেই সমদূরত্বে অবস্থিত। হিজলী জেলে বন্দী নিধাতনের প্রতিবাদের ভাষায় অথবা জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রথম স্মৃতিসভায় ভাষণে এই দূরত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। লেখকের সিদ্ধান্ত 'ভারতীয় জনগণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বে তাঁর অবস্থান জনগণের বিপরীত শিবিরে' ইংরেজের সঙ্গে তাঁর আচরণগত নীতি প্রধানতঃ 'দু নৌকায় পা দিয়ে চলা'র নীতি। এই প্রসঙ্গে রমাঁ রলাঁর উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে—'এই জন্যই তাঁর মনে সবসময় দোদুল্যমান অবস্থা, এইজন্যই তাঁর ভূমিকার অর্ধসমাপ্তি, পরিকল্পিত ধর্ম মাঝপথে বর্জিত, অনুশোচনা, বিরাগ, আন্দোলিত হওয়ার উত্তেজনা, অনেক অর্থহীন উক্তি এবং অবিরাম খণ্ডিত হওয়া।' [কালান্তরের পথিক রমাঁ রলাঁর : প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত]

এই প্রবন্ধের লেখকের মতে আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর এই গা বাঁচানো নীতি লক্ষ্য করা যায়। রলাঁর আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর এই গা-বাঁচানো নীতি লক্ষ্য করা যায়। রলাঁর আন্তর্জাতিকতা রাজনীতিকে বর্জন করে নয়, রাজনীতিকে মিলিয়ে নিয়ে। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের আন্তর্জাতিকতা নিরপেক্ষতারই ছদ্মবেশ। কারণ যথার্থ অর্থে জাতীয়তাবাদী হলে বৃটিশের সঙ্গে তাঁর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠতো। বস্তুতঃ রাশিয়া ভ্রমণের ফলে ইংরেজের শোষণের স্বরূপ, দেশের জনগণের অবস্থা, নিজের স্ববিরোধ ও সীমাবদ্ধতা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪১ জীবনের এই শেষ দশকে অবিরাম সংঘাত চলেছিলো তাঁর মধ্যে, কিন্তু কখনই এই সংঘাতকে অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

প্রবন্ধের শুরুতে আছে—

প্রথম —: 'রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় দুর্বলতা ও পিছুটানকে তাঁর কবি মানসিকতার অবদান বলে ক্ষমা করতে আমরা রাজী নই।'

দ্বিতীয় —: 'রবীন্দ্রনাথকে শ্রেণী জাতি দেশের উর্ধ্বে এক বিদেহী অস্তিত্ব বলে মেনে নিতে আমরা রাজী নই। রবীন্দ্রনাথকে ভারতবর্ষীয় জমিদার শ্রেণীভুক্ত একজন মানুষ হিসাবে আমরা দেখবো।"

উপসংহারে আছে—

'.....রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ মহামহোপাধ্যায়রা যেহেতু ভূমা ও প্রকৃতি চেতনার ধ্যানে বিলীন হওয়ার সাধনায় নিমগ্ন সেহেতু আমাদের মতো অর্বাচীনদেরই হাত লাগাতে হয় বাধা হয়ে'।

রবীন্দ্রদ্রোহীদের আলোচনা এই সামান্য নিদর্শনটাকে সংগ্রহ করতে পেরেছে। অপরদিকে পদ্মানদীর ওপারে পূর্ববাংলায় ১৯৪৮ এর পর থেকে রবীন্দ্রচর্চার অতিউৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশের বিশ্বভারতীর প্রকাশনা বিভাগ রবীন্দ্রশিষ্য প্রমথনাথ বিশী সেই কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যিনি যৌবনে সবচেয়ে বেশী রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন মধ্য বয়সে যিনি সর্বদা রবীন্দ্রবিদ্রোহীদের মদৎ দিতেন, বিদেশী সাহিত্যজ্ঞও হবার অহমন্যতায়, রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতেও যিনি বিদেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন উক্তি করেছিলেন যার বিরুদ্ধে দেশে প্রবল আপত্তি উঠেছিল, ['দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত নীরোদচন্দ্র চৌধুরী লিখিত 'দুই রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ, শিবনারায়ণ রায় লিখিত এবং ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'গেটে ও রবীন্দ্রনাথ' নামক প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তাঁরাও বৃহত্তর বিশ্বের পটভূমিকায় এই বাঙালী কবিকে অনেক অপদার্থ প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন।] সেই বুদ্ধদেব বসুর অবস্থা অনেকটা 'ক্ষুধিত পাষাণে'র মেহের আলির মতো। মুখে সর্বদা 'সব্ ঝুটা হ্যায়' অথবা 'সব তফাৎ যাও' বললেও তিনিই সবচেয়ে বেশী সৃষ্টিক্ষমতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ দ্বারা আচ্ছন্ন। অনেক প্রতিবাদযোগ্য উক্তি করলেও বৈদগ্ধ্য এক কবি প্রতিভার গুণে তাঁর সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহ্য এবং অনুভূতিগম্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অপরদিকে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণী 'মেড্ ইজি"

রচনা করে পাঠকমনে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রবেশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশা এবং তাঁর মৃত্যুর পর এতগুলো বছর পার হয়ে গেলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি দিনের দিন খারাপ হয়েছে। বঙ্গবিভাগ, উদ্বাস্তু-সমস্যা, বেকার সমস্যা, জনজীবনে বিপর্যয়, দারিদ্র, অর্থনৈতিক সমস্যা, গণতন্ত্রের প্রহসন, আমলাতন্ত্রের স্বৈরাচার, শিক্ষা ব্যবস্থার মান নেমে যাওয়া, পশ্চিমবঙ্গের জনবিস্ফোরণ, সর্বত্র অসাধুতা এবং দুর্নীতি আমাদের জীবনের পরিবেশকে দূষিত করেছে। এই পরিবেশ রবীন্দ্রনাথকে চিত্তে ধারণের অনুকূল নয়। তিনি বড় বেশী প্রসন্নতা, আনন্দ, মাধুর্য্য, শান্তি, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের কবি। কাজেই তাঁর সঙ্গে আমাদের আপাততঃ জেনারেশন-গ্যাপ' অনেকদিন ধরে শুরু হয়ে গেছে।

কিন্তু বঙ্গ-বিভাগের পর পূর্ব-বাংলার পরিস্থিতি কি প্রতিকূল ছিলনা? দারিদ্র, অশিক্ষা, জঙ্গীশাহীর স্বৈরাচার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কি ছিলো না সেখানে? সবচেয়ে বড় কথা সরকারী ফতোয়া জারী করে সেখানে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো কারণ তিনি 'হিন্দু এবং ভারতীয়।' সরকারী ফতোয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করে বাংলা ভাষা ও বাংলার সংস্কৃতিকে পঙ্গু করা।

বদরুদ্দীন উমর 'রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব-পাকিস্তানের সংস্কৃতি' ['নবজাতক' ৬ষ্ঠ বর্ষ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যা'] প্রবন্ধে একথা উল্লেখ করেছেন—'এই উদ্দেশ্যের সাথে ১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষা বিরোধী প্রচেষ্টা ওতঃপ্রোত যোগসূত্রে জড়িত'। 'আপনারা এখন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখুন' এমন হাস্যকর ফতোয়া জারি হয়েছিলো সরকারী মহল থেকে। বদরুদ্দীন উমর তাঁর প্রবন্ধে এমন আশংকা প্রকাশ করেছেন যে কালক্রমে রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সরকারী আদেশ বলে নিষিদ্ধ হবে। কিন্তু সেই সর্বনাশা দিন আসার আগেই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো।

অথচ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আপাত দাক্ষিণ্যে প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্র রচনাবলী, ঐ বছর থেকে বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রসদন। গলিকা অপ্রাহিত, যানবাহনের অযোগ্য বস্তী ও পুরানো বাড়ী পরিকীর্ণ ব্যবসা বাণিজ্যের কুৎসিত ছাপমারা রাস্তার নাম হয়েছে রবীন্দ্রসরণি। জনবহুল সেতুর নাম রবীন্দ্রসেতু, নগর কলকাতার অনেক নৈপথ্য লীলার কেন্দ্রস্থল ঢাকুরিয়া লেকের নাম রবীন্দ্র সরোবর। রবীন্দ্র সংস্কৃতি এবং বর্তমান কলকাতার কুৎসিত জীবনযাত্রার সঙ্গে যে অসংগতি রয়েছে তারই ট্র্যাজিক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে এই স্থানগুলি।

অপরদিকে পূর্ব-বাংলার প্রাকৃতিক পরিবেশ রবীন্দ্র সংস্কৃতি গ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল। এদেশের বিশাল নদী আদিগন্ত মাঠ, সবুজের সমারোহে বাস করে তখন আর রবীন্দ্রনাথকে জীবনের বিপরীত মেরু বলে মনে হয় না, তাঁকে অতি সহজেই পরিবেশের সঙ্গে আপন করে নেওয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব-বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির পরিবেশ সম্ভবতঃ এমন অপরিচ্ছন্ন, দীন চেহারার নয়। উনিশশো একাত্তরের গৃহযুদ্ধের সময়ে পূর্ব-বাংলার একজন কবির সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছিলো। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গে আত্মগোপন করেছিলেন। পেশায় তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর কাছেই জেনেছিলাম পূর্ব-বাংলার অধ্যাপকদের আর্থিক অবস্থা এখানকার তুলনায় অনেক ভাল। এই বদান্যতার মূলে রয়েছে আমেরিকা, সে কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু এখানে এই প্রসঙ্গের উল্লেখ এই কারণেই প্রয়োজন হল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই পায়েন শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সংস্কৃতির বীজ নতুন প্রজন্মের মনে বপন করে দিতে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থভুক্ত, বেতন না পাওয়া অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ যে পরিবেশে লেখাপড়া করান তা অনেকাংশে স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। পুরনো স্কুল ও কলেজগুলোর অন্ধকার প্রকোষ্ঠে, বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, নোটবই পড়ে অথবা নকল করে যারা কোনমতে পরীক্ষা তরণী পার হতে চায় তাদের কর্ণকুহরে অর্থভুক্ত শিক্ষকগণ রবীন্দ্রনাথের কোন্ মর্মবাণী পৌঁছে দিতে সক্ষম হবেন?

রবীন্দ্রনাথকে জাতির জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূতকরবার মত যেমন পরিবেশ নেই স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবাংলায় তথা কলকাতায় তেমনি রবীন্দ্রনাথকে জাতির জীবনের একীভূত করে তোলার অন্তরায় ছিল আরো কিছু।

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যের প্রতি একদল ঈর্ষাপরায়ণ বাঙালী তাঁর জীবদ্দশায় রোষের বেঁধে রেখেছিলেন তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে। কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতিরা তাঁদের অনুগামীদের ছড়িয়ে রেখে গেছেন বাংলা দেশে। সজনীকান্ত, মোহিতলাল মজুমদারের মরা নিয়ে তারা আজো বেঁচে আছেন!

দ্বিতীয়তঃ জন্মসূত্রে পৈত্রিকধর্ম ব্রাহ্ম হওয়ায় শেষজীবনে নিজেকে 'ব্রাত্য' বলে ঘোষণা করলেও ব্রাহ্ম সমাজ তাঁকে নিজেদের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করে থাকেন, তাঁর সমালোচকগণ তাঁকে ঋষিজ্ঞান করে তাঁর সাহিত্যে 'ভূমা' 'আনন্দ', 'অমৃত,' সীমা-অসীম প্রভৃতি খোঁজেন বা এইসব বিশেষণ ব্যবহার করে থাকেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এক জাতীয় রচনায় এইসব দুর্বোধ্য

কথার আধিক্য আছে। এই ব্রাহ্মত্বই সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর একটা নৈতিক দূরত্ব সৃষ্টি করেছে, সত্যেন্দ্র যাকে বলেছেন 'ব্রাহ্মমরালিটি' সুনীল-গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আধুনিক কবিদের প্রধান লক্ষ্য ক্রীডম্ অব্ সেক্স'। রবীন্দ্রকচি এইসব আধুনিকদের অবচেতন মনে মূর্তিমান নিষেধাজ্ঞা রূপে পীড়ন করে। এই বন্ধন বুদ্ধদেব বসুও অনুভব করেছিলেন। তাঁর বন্দীর বন্দনা' আধুনিক আর্তি এই কারণে কবিদের একাংশের রবীন্দ্রবিরোধীর মনস্তাত্ত্বিক কারণ হ'ল এই। বিচ্ছিন্ন করার দায়িত্ব তাদের।

তৃতীয়তঃ বিশ্বভারতী নামক অচলায়তন সদৃশ প্রতিষ্ঠান রবীন্দ্রনাথকে আড়াল করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দিনের পর দিন।

চতুর্থতঃ রবীন্দ্রনাথকে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের যে বৃহৎ অংশ সর্বপ্রকার সাহিত্যরস বর্জিত হয়ে যে ভাষায় এবং যে পদ্ধতিতে রবীন্দ্র সাহিত্য সমালোচনা করে এসেছেন শুধুমাত্র অর্বাচীন ছাত্রদের জন্য, রবীন্দ্র মেড ইজি রচনা করেছেন নতুন প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথকে তুলে ধরতে না পারার ব্যর্থতার দায়িত্ব তাদের আছে। সরকারী কলেজের অধ্যাপক ডি লিট্, উপাধিপ্রাপ্ত একজন খ্যাতনামা রবীন্দ্রকাব্য সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উক্তি করেছেন 'রবীন্দ্রনাথ একজন প্রথম শ্রেণীর শৃঙ্গার রসিক ছিলেন। এই ধরণের ভাষার অনেক কদর্থ করার সুযোগ রয়েছে।

চতুর্থতঃ নীরোদচন্দ্র চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির মতো পাশ্চাত্য সাহিত্যবেত্তাগণ বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে খাঁড় করিয়ে তাঁকে হেয়, অপদস্থ, বামনতুল্য প্রমাণিত করার অনর্থক চেষ্টা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা অনেক অনেক প্রতিভাধর কবি-শিল্পী-নাট্যকার ঔপন্যাসিক বিশ্বে রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে তুলনা অনর্থক। জন্মদাতা পিতার অক্ষমতার কারণ কেউ তাঁর পিতৃত্ব অস্বীকার করে? রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সংস্কৃতির জনক। বাঙালীর অস্বীকার করার এক বিজাতীয় মনোভাব স্বাধীনতাপূর্ব যুগ থেকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মন অধিকার করেছিল। স্বাধীনতা পাবার পর থেকে ইংরেজের শাসন করার মনোভাব ইংরেজীর শাসন করার প্রবণতায় পরিনত হয়েছে। হাতে কবচ মাদুলী ধারণ করেন, বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়েন, গৃহে সুবচনী করেন, এমন আস্তিক ও অকুণ্ঠিত বাঙালী পিতামাতা সন্তানকে বাংলা ভুলিয়ে দিতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। নীরোদচন্দ্র চৌধুরী, শিবনারায়ণ রায়, বুদ্ধদেব বসুদের মতই উগ্র বিপ্লবপন্থী তরুণেরা স্বদেশীয়তা অস্বীকার করে থাকেন। একথা সত্য উপনিবেশিক প্রতিফলন সভ্যতার যান এক বড় মনীষীর মধ্যে যেসব অসঙ্গতি অনিবার্য ভাবে আসা স্বাভাবিক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তার ঘটেছে। কিন্তু কার্যকারণ সূত্রের বিবেচনা না করে রবীন্দ্রমূর্তির নাসিকা ছেদনের অপমান একটি জাতির অপমান অথবা ঐতিহ্যের অবমাননা একথা আমরা বিস্মৃত হই অনায়াসে।

অথচ পূর্ববাংলার শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী কবি ও সাহিত্যিকগণ উনিশশো আটচল্লিশ থেকে রবীন্দ্রসংস্কৃতির নব জীবনের কাছে নিযুক্ত আছেন শুধুমাত্র জাতীয়তাবোধ তথা বাঙালী সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

বদরুদ্দীন উমর বলছেন—

"এ দেশের সাংস্কৃতিক জীবনও আজ পঙ্গুদশা প্রাপ্ত। যে কোন দেশের সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং পঙ্গুত্ব তার সামগ্রিক জীবনকে আচ্ছন্ন করতে বাধ্য। তার দেশপ্রেম, আত্মসম্মানবোধ এবং গৌরবচেতনা সব কিছুই তার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে অবিচ্ছিন্ন। এজন্য সাংস্কৃতিক জীবনকে পঙ্গু এবং বিধ্বস্ত করতে সমর্থ হলে পরোক্ষভাবে সে সমাজের সামগ্রিক জীবনকে পঙ্গু ও বিধ্বস্ত করার কাজ অনেকখানি সফল ও দ্রুততর হয়। এখনকার রবীন্দ্রবিরোধিতা এবং বাংলা ভাষা সরলীকরণের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানবাসীর সামগ্রিক জীবনকে এইভাবে বিধ্বস্ত করারই এক সূক্ষ্ম দূরদর্শী পরিকল্পনা।"

(নবজাতক ৬ষ্ঠ বর্ষ—পঞ্চম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩৭৭)

আনিসুর রহমান বলেন—

"……সেক্সপিয়ার হোমার সার্বদেশী কবি। তাঁদের সার্বজনীনতা আমাদের নিকট আবেদনশীল হলেও রবীন্দ্রনাথকে সেই নিরিখে বিচার করা চলে না, কারণ রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হিন্দু এবং আমরা বাঙালী মুসলমান, বাঙালী কথা ও সম্পর্কটি এখানে সাধারণ (common)। কথাটি আরেকটু কঠিন ভাষায় বলে এই দাঁড়ায় যে ইচ্ছে করলে আমি আমার মুসলমানত্ব পরিত্যাগ করতে পারি কিন্তু বাঙালীত্ব পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের নিজেদের কবি।"

(পূর্বোক্ত পত্রিকা)

সৈয়দ মাহ্‌বুবুর রশিদ বলেন—

"……তবে যে কোন সত্যিকার সাহিত্যামোদী শুধু বাংলার কেন সমগ্র বিশ্বেরই সৃজনশীল লেখকের লেখা পড়বেন। তবে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী, তাই তাঁর সাহিত্যের সবটুকু মূল্যবোধ আমাদের পক্ষে সহজ, সেজন্য রবীন্দ্রচর্চা আমরা বেশী করব, এতে আমাদের দেশপ্রেমের সন্দেহ প্রকাশ করার কোন অধিকার নেই।"

(পূর্বোক্ত পত্রিকা)

সামসুর রহমানের মতে—

"……'কী করে ভুলবো' যে

ভাষায় আমরা বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করি, শত্রুর সঙ্গে কলহে মাতি, প্রিয়তমাকে প্রেম নিবেদন করি, কোনো মানবীর পাষাণ-প্রতিম হৃদয়কে দ্রব করার মনোহর চক্রান্তে রাত জেগে যে ভাষায় পত্রের ফাঁদ পাতি, এমন কি যে ভাষায় প্রবন্ধ লিখে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করি তা' গ্রন্থিল ও বর্বর হয়ে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথেরই পৌরোহিত্যে? সুতরাং যাঁর সামনে আমরা বরাবর অধমর্ণের ভূমিকাই পালন করে এসেছি তাঁকে সম্মান করার ব্যাপারে যদি বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করি তবে বিশ্ববাসীর নিকট আমরা অত্যন্ত খর্ব হয়ে যাবো।'

('নতুন করে রবীন্দ্রচর্চা:' 'রবীন্দ্রনাথ' সম্পাদক আনিসুজ্জামান।)

সন্জীদা খাতুন লিখেছেন—

"……সমগ্র দেশে জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটা ধোঁয়াটে ধারণার সৃষ্টি করে, বহুকালগত ঐতিহ্যকে অস্বীকারের প্রবণতা এবং একটা বিজাতীয় জগাখিচুড়ি সংস্কৃতিকে অনুকরণ করবার হীন প্রবর্তনা দেবার সুশৃঙ্খল চেষ্টা থেকেই এই অবস্থার উদ্ভব। জাতির জীবনে এর চাইতে বড় দুর্দিন কি হতে পারে যখন আপন ঐতিহ্যকে স্বীকৃতি দিতেও দ্বিধা—নিজের জন্ম কোন সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নিয়ে সে সম্বন্ধেও সন্দেহ সংশয়।'

(রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শ্রোতা: পূর্বোক্ত গ্রন্থ)

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি পূর্ববাংলার কবিদের কাছ থেকেও পাওয়া যায়—

"তিনি নন জন্মদাতা, অথচ তাঁকেই
পিতা বলে
জেনেছি আজন্ম, তাই সুমুখ
কালের অনুরাগে
সমর্পিত তাঁরই কাছে।"

(পিতা: শামসুর রহমান)

সিকান্দার আবু জাফর 'রবীন্দ্রনাথ' নামক সুদীর্ঘ কবিতায় স্বীকার করেছেন—পারেনি কখনো যেতে সমস্ত আঁধারে'। তথাপি তাঁর উপসংহার—

আমাকে বেষ্টন করে আছো
অবিশ্বাস্য অদৃষ্টের মতো,
আমাকে আচ্ছন্ন করে আছো
প্রতি মুহূর্তের বর্জনের প্রয়াসে
ধিকৃত
অনিবার্য অভ্যাসের মতো॥

ফজল সাহাবুদ্দীনের 'সাবেকি পৃথিবী' থেকে—

সাবেকি পৃথিবী আর আমাদের
ছায়াচ্ছন্ন রক্তের ভিতরে
জলন্ত বৈশাখ এক উজ্জীবিত
নিউন মন্দির কিংবা মেঘে মেঘে
পাখি উড়া ঝড়ে।

নেশন কী

(রবীন্দ্রনাথের লেখা হইতে উদ্ধৃতি)

নেশন ব্যাপারটা কী, সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেঁনা এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে দুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরাজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দরূপেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থবৈধ-ভাববৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ন্যাশনাল কংগ্রেস' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাসভা' ব্যবহার করিয়া থাকি—কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালি-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিখ-জাতীয়, যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে—ভারতবর্ষের সর্ব-জাতীয় বুঝায় না। মান্দ্রাজ ও বম্বাই 'ন্যাশনাল' শব্দের অনুবাদ-চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ন্যাশনাল সভাকে মহাজনসভাও সার্বজনিক সভা নাম দিয়াছেন—বাঙালি কোনো-প্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নাম দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়—সেই প্রভেদে বাঙালির আন্তরিক ন্যাশনালত্বের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়, অন্য অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেষ আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসি সর্বজন' শব্দ 'ফরাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

মহাজন শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহা-জাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশন শব্দের পূর্বে

আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্ষুদ্র মহাজাতি' বলিয়া হাস্যভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটা ও ইংরাজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরাজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেঁনা বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন' ছিল না। ইজিপ্ট - চীন প্রাচীন কাল্ডিয়া 'নেশন' জানিত না। আসিরীয়, পারসিক ও আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যকে কোনো নেশনের সাম্রাজ্য বলা যায় না।

রোম-সাম্রাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই সকল টুকরা বহু শতাব্দী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে নানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি ও রাশিয়া সকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্তু ইহারা নেশন কেন? সুইজর্ল্যাণ্ড তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল? অস্ট্রিয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না?

কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভুলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আসিয়াছে। নেশন হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় খাটে নাই। যে সুইজারল্যাণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারো অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উর্ধ্বে, একথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ন্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই অধিকারের ভিত্তি কী, কোন লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে?

অনেকে বলেন জাতির অর্থাৎ race-এর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা কৃত্রিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্তু, জাতি মিশ্রন হয় নাই য়ুরোপে এমন দেশ নাই। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, একথা সকলেই জানেন। কে টিউটন, কে কেল্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতন্ত্রে জাতিবিশুদ্ধির কোনো খোঁজ রাখে না। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ওই কথা খাটে। ভাষার ঐক্যে ন্যাশনাল ঐক্যবন্ধনের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে এক করিবেই এমন কোনো জবরদস্তি নাই। য়ুনাইটেড স্টেট্‌স্ ও ইংল্যাণ্ডের ভাষা এক, স্পেন ও ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে সুইজর্ল্যাণ্ডে তিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তবু সেখানে এক নেশন। ভাষা অপেক্ষা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বড়ো; ভাষা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সমস্ত সুইজর্ল্যাণ্ডের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, একথাও ঠিক নয়। প্রুসিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্‌স্ ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন ধর্মমতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেস্টাণ্ট, য়িহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেঁনার মতে সে বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে—তাহার যেমন দেহ আছে তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনপটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক সীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাসাধনের একটা প্রধান হেতু সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীস্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া

দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। সুগভীর ঐতিহাসিক মন্থনজাত নেশন একটি মানবিক পদার্থ, তাহা একটি মানসিক পদার্থ, তাহা ভূখণ্ডের আকৃতির দ্বারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি ভাষা বৈষয়িক স্বার্থ ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান নেশন নামক মানস পদার্থ সৃজনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী?

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা—যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিত মতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমানে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্য, মহত্ত্ব, কীর্তি, ইহার উপরেই ন্যাশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীত কালে সর্বসাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বসাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প—ইহাই জনসম্প্রদায় গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমানে ত্যাগস্বীকার করিয়াছি আমাদের ভালবাসা সেই পরিমানে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব সে বাড়িকে আমরা ভালবাসি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, 'তোমরা যাহা ছিলে আমরা তাহাই, তোমরা যাহা আমরা তাহাই হইব।' এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ন্যাশনাল গানস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ ভবিষ্যতের আদর্শ—একত্রে দুঃখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা—এই গুলিই আসল জিনিস, জাতি ভাষার বৈচিত্র্যসত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়, এক্ষেত্রে মাসুল খানা স্থাপন বা সীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে দুঃখ পাওয়ার কথা এইজন্য বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে দুঃখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগদুঃখস্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অতীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে—সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের অধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কী রহিল? মানুষ, মানুষের ইচ্ছা, মানুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত—তাহার হস্তে নেশনের ন্যাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে—কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়তো এই নেশনদের পরিবর্তনকালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখিনা। এখনকার পক্ষে এই নেশন সকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্যক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে—এক আইন, একপ্রভু হইলে স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তারকার্যে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া ব্যাপ্তলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারো একক চেষ্টার অতীত।

যাহা হউক, রেনাঁ বলেন—মানুষ জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংকল্পমনা ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র সৃজন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি বিশেষের ত্যাগস্বীকারের দ্বারা এই চরিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে সাচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রবীন্দ্রনাথ ও স্বদেশ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

স্বজাতি বিষয়ক এমন কোন সভা-সমিতি ছিলনা যেখানে রবীন্দ্রনাথ যেতে অস্বীকার করতেন। সেকালে তাঁর গান ও কবিতার মধ্যে বা ভাষণ-অভিভাষণে সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যেত। যেমন :—

"জাগ রে নিশান বাজ্ রে বিষাণ
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়ে হাওয়ার বিজয় নিশান
ঘুচবে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।"
ইত্যাদি—

১৩১২ সালেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে স্বাদেশিকতার ঢেউ বহেছিল অনেক আগেই। পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে প্রথম ভারতীয় ব্যাঙ্ক ইউরোপীয় প্রথার অনুকরণে এদেশে স্থাপন করেন (The Union Bank)। তিনি আরও দুই তিনটী স্বদেশী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের জনক ছিলেন—যদিও কোনটী দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মেলার প্রথম অধিবেশনের জন্য গান রচনা করেন—'জয় ভারতের জয়' ইত্যাদি। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে-মাতরম্' রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীতরূপে গাওয়া হ'ত। এ ছাড়া গণদাদার রচিত 'লজ্জায় ভারত যশ গাহিব কি করে মা' বা বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত "মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি।" প্রভৃতি তখনকার দিনে হিন্দু মেলা বা স্বদেশী মেলায় গাওয়া হত।

হিন্দুমেলা স্থাপনের প্রায় আট বৎসর পরে বাংলা ১২৮১ সালে তখনকার বালক রবীন্দ্রনাথ একটী কবিতা লিখে নাম দিলেন 'হিন্দুমেলার উপহার'। তার একটী অংশ এইরূপ—

"ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
কেনরে ভারত কেন তুই হায়,
আবার হাসিস্। হাসিবার দিন
আছে কি, এ ঘটনা এ ঘোর দুঃখে?"

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—শিক্ষারম্ভে তাঁর কেবল মনে পড়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' ইত্যাদি। তার পরে পূর্ণ সতর বৎসর ধরে কবি করেছিলেন নিরন্তর সাহিত্যসৃষ্টি—এই সাধনায় একটী মুহূর্ত্তও তিনি অবহেলায় বা আলস্যে ক্ষেপণ করেননি। স্বভাবসিদ্ধভাবে তাঁর মনে জেগেছিল স্বদেশপ্রীতি, বাঙালী জাতির প্রতি, ভারতবাসীর প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা।

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের মধ্যে গর্ব্বিত শাসকের প্রতিনিধি Lord Lytton ১৮৭৭ সালে দিল্লী সহরে দরবারের নামে রাজসূয় যজ্ঞের সূচনা করেন। ফলে দেশে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়—কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু স্থির থাকতে পারেননি—তাঁর কণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল—

"পৃথিবী জুড়িয়া বাজিছে বিষাণ
শুনিতে পেয়েছি ওই
সবাই আসিছে লইয়া নিশান
কইরে বাঙালী কই।"

ইংরাজী ১৮৮১ সালে সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম রাজ-নৈতিক প্রবন্ধ লেখেন "চীনে মারণের ব্যবসা—আফিম"—প্রকাশিত হয় 'ভারতী' পত্রিকায়। এরপরে ২৬শে আগষ্ট ১৮৮৪ সালে 'সাবিত্রী' লাইব্রেরীতে তাঁর লিখিত ভাষণ 'হাতে কলমে' পাঠ করেন। (Theory and Practice)। তদানীন্তন তথাকথিত মডারেট নেতাদের আবেদন নিবেদনের ব্যর্থ-নীতিকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখেছিলেন

"ভিক্ষালব্ধ সম্মানের তাজ না হয়

সে এক শুভদিনে পুণ্যমুহূর্ত্তে নগ্নপদে 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। সেদিন ছিল বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন—সমগ্র অখণ্ড বঙ্গদেশ বিদেশী শাসকের আইনের বলে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। সেদিনও সারা দেশে আলোড়ন আন্দোলনের বন্যা বহে গিয়েছিল। সকলের সঙ্গে এক ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ভেদবুদ্ধি ভুলে কবি একই সুরে গেয়েছিলেন সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বরচিত গীত—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক
হে ভগবান। ইত্যাদি

বোধ হয়, পরবর্তীকালে জালিন-ওয়ালা বাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা বঙ্গবিভাগ বাঙালী কবির মনে এক অভূতপূর্ব্ব বেদনার সৃষ্টি করেছিল। দেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমতালে বিচলিত হয়ে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত রাখী-সঙ্গীত।

সেদিনের অপরাহ্নে আপার সার্কুলার রোডের ময়দানে ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বিখ্যাত জননেতা অসুস্থ আনন্দমোহন বসুর বাংলা অভিভাষণ উদাত্ত ও সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করেন কবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তারপরে যে বিশাল শোভাযাত্রাটী বাহির হয় তার পুরোভাগে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ছিলেন কবি রবীন্দ্র নাথ। তখনই সহস্রকণ্ঠে—গীতধ্বনিতে মুখরিত হল কবিরই বিরচিত সঙ্গীত—

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
ততই মোদের বাঁধন টুটবে।" ইত্যাদি

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে স্বদেশের হিতকামনায় রাজনৈতিক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। সে যুগে স্বদেশ ও

মাথায় পরিলাম, কিন্তু কৌপীন ত ঘুচিল না, এইরূপ বেশ দেখিয়া কি প্রভুরা হাসে না।"

সেই বৎসরশেষে বোম্বাই সহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। এর পরেও কবি রবীন্দ্রনাথ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জিবনী' পত্রিকায় সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন কয়েকটি। শিক্ষিত দেশবাসীর নিকট তা চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল।

প্রতিবৎসরের হিন্দুমেলা কেবল বাংলাদেশেই আবদ্ধ ছিল প্রথমে। পরে প্রতি বৎসরান্তে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ত দেশের এক প্রান্তিক সহর থেকে অন্য প্রান্তের সহরে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে এই কলকাতায়। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'

—নিজে গেয়ে উদ্বোধন করেন জাতীয়সভা তখনকার বীডন পার্কে। পরবৎসর কয়েকটি সামাজিক প্রবন্ধও রচনা করেন রবীন্দ্রনাথ।

১৮৯০ সালে আবার জাতীয় কংগ্রেসের কলিকাতায় অধিবেশন। রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তরবঙ্গের জমিদারীর সদর কাছারী শিলাইদহে অবস্থান করছিলেন। সংবাদ পেয়ে ছুটে এলেন কলকাতায়। এবার কিন্তু গাইলেন ঋষি বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরম' সংগীত—কি প্রশংসনীয় হয়েছিল সেবারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সভাপতি স্যর ফিরোজশাহ মেটাকে কলিকাতাবাসীরা যে সংবর্ধনা জানান তার কর্তৃত্ব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

তখনকার কালে কবির জীবন ধীরে ধীরে নব নব রূপে বিকশিত হচ্ছিল। গ্রীষ্মে, বর্ষায়, বসন্তে, শরতে, হেমন্তে, শীতে কবির মনে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে-স্রোতধারা বয়ে চলেছিল—কল্লোলিত তরঙ্গিনী সম। আর তার মধ্যে বাঙালীর চরিত্র, বাঙালীর অলস প্রকৃতি—তার উদাসীনতা কবি রবীন্দ্রনাথের মনকে ব্যথিত করে তুলেছিল। কুদ্রকণ্ঠে তিনি ধিক্কার জানিয়ে রচনা করেছিলেন

"ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণ তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন

ইত্যাদি—

বার বার ইউরোপের সংস্পর্শে এসে কবি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জীবনকে দীনতার মধ্যে, কুদ্রতার মধ্যে, নির্জীব অলস দুর্বলরূপে কারাবন্দী না করে ঊর্দ্ধে অনন্ত নীলাকাশে—অনন্তের সন্ধানে অগ্রসর হতে। তিনি বলেছিলেন—'বাঙালীর সে কি প্রাণ, সে কি জীবন চিরলুপ্ত করে আর ধরে রেখনা—তৈল-সিক্ত বাঙালীকে

"শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহহীন লক্ষীছাড়া করে।

ইত্যাদি

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্ত ও বিংশ শতাব্দীর আদিকাল কেটেছে কবির কর্ম-ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে শিলাইদহে যেখানে তাঁর স্বদেশী সমাজের সূচনা। উত্তর ও মধ্যবঙ্গের প্রমত্তা পদ্মা প্রবাহিণীতে বজ্‌রা ভাসিয়ে কবি যেমন প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্য অকুণ্ঠভাবে উপভোগ করেছেন—তেমনি গ্রামবাংলার গরীব চাষীর দুঃখ মোচনে সচেষ্ট হয়েছেন। পুত্র ও জামাতাকে পশ্চিমে পাঠিয়েছেন নূতন প্রথায় কৃষিকার্য্য শিখতে—ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় সুরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথকে উৎসাহ দিয়েছেন সমবায় প্রথায় হস্ত-চালিত তাঁতে বস্ত্র উৎপাদনে কুষ্টিয়া অঞ্চলে। নিজে লক্ষ টাকা ঋণ করে কাঁচা পাটের ব্যবসায় নেমেছেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবির জন্ম—তার ত্রিশবৎসর পর থেকে ১৯০৯-১৯১০ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে কবির কাব্য-গানে যে সুর বেজেছিল তার মধ্যে স্বদেশানুরাগ যথেষ্ট ছিল। তাঁর জীবনবেদের যে অপূর্ব্বগতি—তাতে স্বদেশপ্রীতির বীজ উপ্ত ছিল।

এমন কি শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম স্থাপনকালে তিনি সবচেয়ে বেশী যাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি খ্রীষ্টান পাদরী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-যিনি বার-বার রাজদ্রোহ অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছেন তাঁর দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধ রচনার জন্য।

পরিনত বয়সে বিশ্বকবি মহাত্মা-গান্ধীর সংস্পর্শে এসেছিলেন 'জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন কয়েকবার। ১৯৩১ সালে অসুস্থ শরীর নিয়ে হিজলী ও চট্টগ্রামে অবরুদ্ধ বন্দীদের প্রতি নির্ম্মম নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। বজ্রসম সুকঠিন রাজশক্তির বিরুদ্ধে তিনি ভাষাজননীর মাধ্যমে অগ্নিবর্ষণ করেছেন।

তবে একটা কথা—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। সেকথা তিনি খুব সহজ করেই বলেছিলেন যেমন—'আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নিরন্তর দেশপ্রেমের চর্চা করেছি দেশের লোককে বাদ দিয়ে'। তৎকালীন দেশের কথা ভাবতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন পল্লীবাসী কোন জায়গাতেই নেই। কেউ জমিদার, কেউবা বড় ব্যবসায়ী—আর তথাকথিত দেশদরদীর মুখে যাঁরা শুধু জোগাচ্ছেন—তাঁরা প্রায় সকলেই আইন ব্যবসায়ী।

প্রমথ চৌধুরীর লেখা 'রায়তের কথা' ১৩৩০ সালের বৈশাখে 'ভারতী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধ কবির কাছে যথার্থ মূল্য বহন করে এনেছিল। কবি বার বার বলেছেন স্বদেশের অবস্থা ঠিক মতো বুঝে নিয়ে সমুচিত ব্যবস্থা করা উচিত। নিজের জীবনে জমিদারি অভিজ্ঞতা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন—

"প্রমথ বলছে, জমি চাষ করে

যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে তা হবে জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়,—যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? জমি যদি—খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই তা হলে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই, যে লোক চাষ করে না কিন্তু যার আছে টাকা অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই।"

অর্থাৎ কবি তখনই দেখেছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যে সে ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে জমিদারকে তাড়িয়ে মহাজনকে কায়েম করা হবে।

আধুনিক কালে সমাজবাদী রাষ্ট্রে জমিদারী বিলুপ্তি ঘটেছে কিন্তু মহাজনের অস্তিত্ব বজায় রয়েছে—তার অত্যাচার অনেক সময়ে—প্রজারই অমঙ্গল সাধন করছে। কার্য্যতঃ তাই হয়েছে। মহাজনের রাহুগ্রাসে অনেক প্রজা বা কৃষক আজও গৃহহীন, সম্মানহীন। একথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে প্রজার দুঃখে। যদিও মুখে আমরা সমাজবাদের বুলি কপ্‌চে যাই।

প্রকৃতির রোষে অজন্মা ঘটলে কৃষককে রাজ-দরবারে শাস্তি পেতে হয় বাকী খাজনার দায়ে—মহাজনের ঋণ শোধ করতে হয়। আরও কত কি। একথা ঋষি বঙ্কিম তাঁর সুবিখ্যাত 'বাংলার কৃষক' প্রবন্ধ পুস্তকে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। সিভিলিয়ন রমেশচন্দ্র দত্তও লিখেছেন। রামমোহন কেবল মাত্র জমিদার-প্রজার সম্বন্ধ উল্লেখ করেছেন। দেশে, বহু দুর্বল রায়তের অর্থনৈতিক উন্নতি যতক্ষণ না ঘটে, ততক্ষণ আর তার বাঁচবার অন্য কোনও উপায় নেই। এই ছিল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বক্তব্য।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' নামক একটী রূপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি বলেন—

"মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকার মনুষ্যত্বের অধিকার। নানামন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানাবিধি-বিধানে এই কথাটাই এ দেশে চাপা পড়ে থাকেনি।"

আত্মকর্তৃত্বের দাবিত্ব অপরিসীম। জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্যে তাই তিনি 'পোলিটিক্যাল' মুক্তির চেয়ে—সত্যিকার মুক্তি সাধনার দাবিত্বের কথা উত্থাপন করেছেন। অনেকের মতে আত্মকর্তৃত্বের সাধনাই ছিল তাঁর রাজনীতি চিন্তার সিদ্ধান্ত।

তাইত দেখি, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন হাজার হাজার বাংলার তরুণ ও যুবক বিনাবিচারে শুধু বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলখানায় বা অন্তরীণবাস নয় সুদূর রাজপুতনায় বন্দীশিবিরে আবদ্ধ তখন তাদের নির্য্যাতন লাঘব করার জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছেন—ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংগঠনের সভাপতির দাবিত্ব ভার। —তিনি নিজে ছুটে গিয়েছেন কর্তৃপক্ষের কাছে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ পাঠরত ছাত্র-যুবকদের সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য, আবার তাদের মুক্তির জন্য আবেদন করেছেন দিল্লী-সিমলার রাজদরবারে। বিনাবিচারে আবদ্ধ অবস্থায় মেদিনীপুরের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান নবজীবন ঘোষ এবং সন্তোষ গাঙ্গুলী যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন কবি স্থির থাকতে পারেননি; ব্যথিত চিত্তে তাদের কথা ভেবে অপটু শরীরে C. F. Andrews সহ সিমলা রওনা হয়ে গিয়েছিলেন—যদি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন—শোকসন্তপ্ত পরিবারদের সান্ত্বনা দিয়েছিলেন।

রাজনীতির এত কথার পরেও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার নিজস্ব বিশেষ অনুভূতি বা উপলব্ধির প্রেরণা ছিল। 'সাম্রাজ্যিক ঐক্য' অপেক্ষা 'সামাজিক ঐক্য'—রাষ্ট্রগত স্বরাজের তুলনায় 'সামাজিক স্বরাজ'কে তিনি বেশী কাম্য মনে করতেন। তিনি বলতেন জনসাধারণের বৃহৎ স্বার্থকে কখনও তুচ্ছ করা চলে না। আগেকার দিনে সেই স্বার্থরক্ষার ভার ছিল সমাজের উপর। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :—

"আমাদের জন্মগ্রামকেই আমরা জন্মভূমি বলে জানতাম। আর তার মধ্য থেকে সমাজ—আপনার দাবিত্ব পালন করে গেছে। মনে রাখা দরকার, য়ুরোপের রাষ্ট্র বিশ্বাস য়ুরোপেরই নিজস্ব অর্জন। অপর পক্ষে, আমরা না পারি আমাদের সমাজের—বহুকালের প্রতিষ্ঠা ভূলতে—না পারি সত্যিকার আধুনিক রাষ্ট্র ভাবনা জাগিয়ে তুলতে।" ইত্যাদি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র

ডঃ সরোজ কুমার দাস

'সে আজ অনেকদিনের কথা—বোধ হয় ১৯১৫ সালের জুলাই-আগস্ট মাস—যখন কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন তলার "ফিলিসফি সেমিনার" ঘরে একটি সৌম্যদর্শন, শান্তসংকল্প, স্থিতধী যুবককে দেখিলাম নিবিষ্টচিত্তে অধ্যায়নরত একান্তে। পূর্ব্বাগত আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও নবাগত "ফিলিসফি অনার্স"-এর ছাত্রটি সম্পর্কে অনন্যসুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিশ্বাবত্তা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীর কথা, সর্ব্বোপরি স্বামী বিবেকানন্দ-অনুপ্রাণিত জীবন-দর্শনের অনুগত্য-স্বীকৃতির অপূর্ব্ব এক কাহিনী শুনিয়াছিলাম। যে কারণেই হউক সেদিন এক অপ্রত্যাশিত আকর্ষণ অনুভব করি এবং দ্বিধাশূন্যচিত্তে সুভাষচন্দ্রের বসিবার আসন সমীপে যাই। সেখানে গিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র গভীর অভিনিবেশমগ্ন পাঠক মুহূর্ত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন স্মিত-হাস্যমুখে—সাধারণ সামাজিক কর্ত্তব্যানুরোধে নিশ্চয়ই। অভাবিত এই পরিস্থিতিতে কথঞ্চিত অপ্রস্তুত বোধ করিয়া বলিলাম—"সেমিনারের এই বৎসরের কর্ম্ম-সচিবের কর্ত্তব্যানুরোধে আপনাকে জানাইতেছি আমাদের সেমিনারের সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাশয়ের একটি নির্দ্দেশ। তিনি এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে যাঁহারা সেমিনার ঘরে বসিয়া পড়িবেন তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন কি গ্রন্থটি পাঠ করেন, কোন্ অধ্যায়ের কত পৃষ্ঠা—এ সমস্ত তথ্য নিজ নামসহ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া রাখেন, এই সেমিনার-গৃহিয়ানে"। নিঃশব্দ সম্মতি-সূচক মস্তকান্দোলনে স্বীকৃতি দান করিয়া পুনরুপবেশন করিলেন। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইলাম কি গ্রন্থটি অত অভিনিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলেন। তারপর ৩৪ বৎসর পরে যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে দর্শন বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদে বৃত হইয়া 'সেমিনার' ঘরে যাই তখন কৌতূহলবশতঃ সেমিনারের সেই গ্রন্থখানিতে দেখি লেখা রহিয়াছে "এ স্টাডি অফ স্পিনোজা" বাই "জেম্‌স্ মার্টিনো।"

তারপর আরম্ভ জীবন-সংগ্রামের সেই চমকপ্রদ ঘটনাবলী, যার সম্মিলিত প্রভাবে একটি একটি দুর্যোগপূর্ণ, দুঃসহ পরিস্থিতি হইতে আর একটিতে ক্রমান্বয়ে চলিয়াছেন সুভাষচন্দ্র। প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অপসারণ, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্ (আই, সি, এস্) পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ড গমন ও সসম্মানে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, আই-সি-এস্ পদত্যাগ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের "চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার" পদ-গ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব ও তদনুযায়ী কারাবরণ, কারামুক্তি এবং শেষ পর্য্যায়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হওয়া (১৯৩৮)—এই সমস্ত তথ্যমূলক ঘটনাপঞ্জী তাঁর "আত্ম-জীবনী"তে যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে স্থির হয় যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বিশ্বভারতী" সংলগ্ন শ্রীনিকেতন শিল্প ভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার কলিকাতায় স্থাপনা করিতে হইবে এবং সেটির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন নব-নির্ব্বাচিত কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসু। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ শারীরিক অসুস্থতার জন্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁর ভাষণটি সভায় পঠিত হইয়াছিল। এই ভাষণের শেষাংশে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান ব্যক্তিদের মতামত উল্লেখ করিয়া কবিগুরু বলেন "দেশের বিরোধীবৃত্তি অনেক সময় এই বলে আস্ফালন করে যে—

"আমি যে কর্ম্মমন্দির রচনা ক'রেছি আমার জীবিতকালের সঙ্গেই তার অবসান। এ কথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা ক'রে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কিনা, এর মধ্যে ত্যাগের সকল পূর্ণ হ'য়েছে কিনা।" রবীন্দ্রনাথের ভাষণে উল্লিখিত আক্ষেপ লক্ষ্য করিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে শান্তি-নিকেতন ও শ্রীনিকেতন শ্রীরবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের পর বর্ত্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়তো ইহার বর্ত্তমান আকার (শান্তিনিকেতন) স্থায়ী না হইতে পারে কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ 'ভিন্ন আকারে' চিরস্থায়ী হইবে" (এই উদ্ধৃতি ও প্রবন্ধের শেষাংশের সমস্ত উদ্ধৃতিই শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ "রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক" হইতে গৃহীত। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এই ঋণ স্বীকার করিতেছি)।

ইহা অনস্বীকার্য্য যে বর্ত্তমান যুগে পল্লী সংস্কারের যেসব উদ্যোগ চলিতেছে, তার পরিকল্পনা ও কর্ম্মে রূপদান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই ছিলেন প্রধান উদ্ভাবন-কর্ত্তা ও

পথিকৃৎ। সুভাষচন্দ্রের এই শিল্পভবন-উদ্ঘাটন-সম্বন্ধীয় বক্তৃতায় একটি ব্যক্তিগত স্মৃতি কথার উল্লেখে এই বিষয়টির আংশিক সমর্থন পাওয়া যায়। সুভাষচন্দ্র বলেন যে প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে (১৯১৫) তিনি কতিপয় বন্ধুসহ রবীন্দ্রনাথ-সকাশে গিয়াছিলেন, দেশ-সেবার সক্রিয় কর্ম্মসূচীর নির্দ্দেশ-গ্রহণার্থে। তখনও দেশে নানাবিধ বিরোধী ভাবধারার সংঘাত চলিতেছিল। কবিগুরুর নিকট হইতেও তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণী। কিন্তু কবি সেদিন বলিয়াছিলেন গ্রাম-সংগঠনের কথা। সেই সব তরুণেরা প্রবীণ কবিগুরুর এই নীরস, নিরুত্তাপ আলাপ-আলোচনায় সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু স্বীকার করিলেন অকুণ্ঠচিত্তে যে যতই দিন যাইতেছে তততই কবিবরের সেই উপদেশের মর্ম্ম সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেছেন।

ইহার পর ২১শে জানুয়ারী ১৯৩৯ কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র কবিগুরু-সন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে আসেন। রাষ্ট্রপতির যথাযোগ্য সম্মান শান্তি-নিকেতন ও বোলপুরবাসীদের নিকট হইতে লাভ করিলেন। জওহরলালও শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন; হিন্দী-ভবন উদ্ঘাটনের জন্য এবং তিনদিন (২৯-৩১ জানুয়ারী, ১৯৩৯) উত্তরায়ণে ছিলেন কবিসদনে। কবির আশ্রমে ভারতের এই দুই অসাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার একটি স্মরণীয় ঘটনা মনে রাখিতে হইবে। কারণ ঐ সময়েই মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক মনোনীত সীতা-রামিয়া পরবর্তী কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী হইয়া পরাভূত হন ; এবং এই পরাভব মহাত্মাজী তাঁরই পরাভব জ্ঞান করিলেন। তদনুযায়ী নূতন প্রেসিডেন্টের সহিত মহাত্মাজী অসহযোগ ঘোষণা করিলেন। এতৎসত্ত্বেও সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎকার মানসে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওয়ার্দ্ধা যাত্রা করিলেন।

ক্রমশঃ উপচীয়মান কবিগুরু-সান্নিধ্য ও পারস্পরিক অনুরক্তির নিদর্শন দেখি যখন রবীন্দ্রনাথ "তাসের দেশ" নাটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করিলেন এই নাম-ভূমিকায়—"কল্যাণীয় সুভাষচন্দ্র ! স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম" (মাঘ, ১৩৪৫।।১৯৩৯)। এটি সর্বজন্ স্বীকৃত যে "তাসের দেশ" নাটিকার মর্মবাণী "ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা," অর্থাৎ জীবনের সব ক্ষেত্রেই যে প্রবীণ ও নবীনের সংগ্রাম তারই অকুণ্ঠ-স্বীকৃতি কবির এই খেদোক্তিতে। তদানীন্তন রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুভাষ-চন্দ্রের সহিত কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের যে অনমনীয় মতবিরোধ—তার উপরেও করেছিল সম্ভবতঃ ছায়াপাত কবির এই ব্যঞ্জনাপূর্ণ উক্তি।

"মহাজাতিসদনে"র পরিকল্পনা, ভিত্তিস্থাপনা ও দ্বারোদ্ঘাটন—এই ত্রিপুটীপর্ব্বেই হ'ল রবীন্দ্রনাথ—সুভাষ-চন্দ্র-সংবাদের শেষ অধ্যায়। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদে আসীন হইয়াই সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় একটি স্থায়ী কংগ্রেস ভবনের পরিকল্পনা রচনা করেন এবং এই গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে "সুভাষ কংগ্রেস-ফাণ্ড" নামে একটি তহবিল প্রবর্ত্তন করিলেন (১ই এপ্রিল, ১৯৭৩)। এই সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কর্ণ-গোচর হইলে একটি পত্রে তিনি সুভাষচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"তোমাদের সং-কল্পিত কংগ্রেস-ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক। সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তভাবে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।"

যাহা হউক পরিকল্পিত এই কংগ্রেস —ভবন নির্ম্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন সেণ্ট্রাল-এভিনিউ-এর উপর একখণ্ড জমি দান করিলেন (২৪শে আগষ্ট, ১৯৯৬)। ইহার অনতিকাল মধ্যেই সুভাষচন্দ্রের সহিত কংগ্রেস দলের ধূমায়মান বিরোধ প্রকটাকার ধারণ করিল। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কলিকাতা অধিবেশন—সভায় সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্ট-পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলেন (এপ্রিল, ১৯৩৯)। এই ঘটনায় বাংলাদেশে যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায় তার সংবাদ রবীন্দ্রনাথ "দেশনায়ক" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষ-চন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে উদ্যত হইলেন। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে সুভাষচন্দ্র তথা বাংলাদেশ এবং ভারত-বাসীদের উদ্দেশ্যে যাহা কবিগুরু লিখি-য়াছিলেন তাহার "সেই অপ্রকাশিত ভাষণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয় কিন্তু তখন উহা প্রকাশ করা হয় নাই" কারণ "কংগ্রেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া আপনাদের সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চন্ত যে তাঁহা-দের কর্ম্মপদ্ধতির সমালোচনা তাঁহাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ [পরোক্ষভাবে] কংগ্রেস পক্ষীয়দের সমালোচনা। আমাদের মনে হয় কবির সুহৃৎ ও বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্খীদের পরামর্শে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় নাই"(শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনা হইতে উদ্ধৃত ॥ রবীন্দ্রজীবনী ৪র্থ খণ্ড ১৮১পৃঃ)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই অকথিত ভাষণে (সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্যে) যে সব সারগর্ভ উক্তি করেন তাহা হইতে কিয়দংশ প্রাসঙ্গিক বোধে এখানে উল্লিখিত হইল :—

"বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের

হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষাকর্ত্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট আত্ম-বিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্ব্বলতা বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থ-নীতিতে কর্ম্মনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে পাড়ে তালের মিল নেই।.....

এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান্ পুরুষের দক্ষিণ-হস্ত যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতি-কূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।.....

বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখ্‌লুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারা দুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করেনি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূর-বিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চরিত্র-শক্তি-কেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চা-রিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর.....

আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন, ভূগর্ভে ভবিষ্য-তের প্রতীক্ষা ক'রছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান্ ফলবান্ ক'রবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরলতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত ক'রতে হয়। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।.....

বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অধি-নায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়ে-ছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলা-দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্ব্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ ক'রেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

সুভাষচন্দ্রের প্রতি কবির এই মনোভাব যদিও সেই প্রবন্ধাকারে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়নি যথাসময়ে, তথাপি এই মনোভাব একটি জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রকাশমাহাত্ম্য লাভ করেছিল এবং সেটি ছিল "মহাজাতি-সদন"-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উৎসব অনুষ্ঠানে। মহাজাতি-সদন এই নামটিও কবিপ্রদত্ত। সেই অনু-ষ্ঠানের উদ্বোধন ভূমিকায় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়া-ছিলেন "গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—বিশ্ব-কবি; আমাদের স্বপ্ন মূর্ত্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা যে সমস্ত, চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে—তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমনি আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে! গুরুদেব! আজিকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা মহাজাতি-সদনের ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ-চেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবনকেন্দ্র হয়ে মহাজাতি-সদন নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্ব্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।"

কবি তাঁর প্রতিভাষণে যে প্রত্যুত্তর দেন তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালী জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্র-

শক্তির নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য্য এবং সৌন্দর্য্য, কর্ম্ম-সিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্ম-নিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা, এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নব প্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এক প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে, সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্ত্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক!"

সুভাষচন্দ্রের চরিত্র শক্তির এই মূল্যায়নের পর কোনও টীকা-টিপ্পনীর অবকাশ থাকে না। অতএব তাহাতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য।

তুমি আমাদেরই লোক

শ্রীকৃষ্ণকান্ত দত্ত

রবীন্দ্র মানস ভূমা, অনন্ত, অসীম ও সুদূরের পিয়াসী। কিন্তু সীমার বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করেই তিনি অসীমের দিকে হাত বাড়িয়েছেন। সীমার বন্ধনকে কখনও অস্বীকার করেন নি তিনি। বৈরাগ্য সাধনে যে একান্ত ব্যক্তিগত মুক্তি সে মুক্তির প্রতি কবি একান্ত অনীহ। অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে অবস্থান করেই কবি মুক্তির স্বাদ লাভ করবেন এই ছিল তাঁর প্রার্থনা।

মূলত তিনি কবি। তাঁর কর্মময় বিচিত্র জীবন অনুধ্যান করলে আমরা দেখব কর্মক্ষেত্রে কল্পনা বিলাস বা ভাব-বিলাস থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত। সেখানে তিনি বাস্তবতার কঠিন ভিত্তির উপরেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে তাঁর সম্বল তাঁর আদর্শ এবং মানবতার উপর অসীম বিশ্বাস।

কবির কর্মক্ষেত্র সাধারণ মানুষের মধ্যে কম ব্যাপৃত নয়। সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন তাঁর জমিদারির কাজকর্ম তদারক উপলক্ষে। গ্রামের লোকদের সহজ সরল জীবনযাত্রা কবিকে মুগ্ধ করেছে। তাঁদের সঙ্গে মিশে, তাঁদের সুখ দুঃখের খবর নিয়েছেন। তাঁর সাধ্যমত তাঁদের অভাবের, দুঃখের প্রতিকারের চেষ্টা তিনি হৃদয় দিয়ে করেছেন। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃস্মৃতিতে লিখেছেন—"১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তখনকার দেশ নেতারা কলকাতা এবং বড় বড় শহরেই এই আন্দোলন নিয়ে মেতে রইলেন। কিন্তু তখন বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের কথাই বাবার বেশী করে মনে হতে লাগল। তিনি অনুভব করলেন কেবল আন্দোলন করলেই হবে না ভিত থেকে কাজ শুরু করার সময় হয়েছে। এই সময় পাবনা কনফারেন্সে তাঁকে যখন ডাকা হল, এই কথাই তিনি দেশবাসীকে জানালেন তাঁর ভাষণে, কেউ যখন কিছু করলেন না তখন তিনি নিজে, তাঁর ক্ষমতার মধ্যে যেটুকু করতে পারেন সেই কাজে নেমে গেলেন।"

এই কাজ কবির নিজের পরিকল্পনামত অবহেলিত সাধারণ গ্রামবাসীদের উন্নতির জন্য নিয়োজিত হল। কর্মক্ষেত্র হিসাবে তিনি তাঁর জমিদারিকেই বেছে নিলেন। প্রজারা মামলা মোকদ্দমা করে অনেক অনেক অর্থব্যয় ক'রে অনেক সময় সর্বস্বান্ত হয়ে যান, যাতে এই দুর্ভোগ ও দুর্যোগ তাঁরা সহজে এড়াতে পারেন সেই জন্য নির্বাচিত গ্রামপ্রধানের সাহায্যে তাঁদের নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করে দেন। এই বিচারে অসন্তুষ্ট হয়ে কেউ আদালতে যেতেন না। গেলে গ্রামবাসীরা তাঁকে সমাজচ্যুত করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাসাধারণ এই ব্যবস্থার সুফল উপলব্ধি করতে পারলেন। এতে তাঁদের অশেষ উপকার সাধিত হয়েছিল। তারা অহেতুক ঝামেলা ও অর্থব্যয় থেকে রেহাই পেয়েছিলেন।

প্রজাদের সহযোগিতায় তিনি তাদের শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থাও করেছেন। তাঁর জমিদারির বিভিন্ন গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। পাতিসরে একটি হাইস্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। যাতায়াতের রাস্তাঘাট ও পানীয়জলের সুব্যবস্থা করলেন। চাষী প্রজারা যাতে অবসর সময়ে কাজ করে কিছু উপার্জন করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর থেকে অভিজ্ঞ লোক এনে তাঁদের তাঁতের কাজ শিখাতে আরম্ভ করলেন, গ্রামের হৃদয়হীন সুদখোর মহাজনেরা

চাষীদের রক্তজল করা রোজগারের প্রায় সবটাই গ্রাস করে। এর প্রতিকারের জন্য তিনি টাকা ধার করে সেখানে একটি ব্যাঙ্ক খুললেন। সেই ব্যাঙ্ক থেকে চাষীরা চাষের কাজের জন্য প্রয়োজন মত ধার নিতেন। ব্যাঙ্ক নামমাত্র সুদ নিত। পরে কবি যখন নোবেল পুরস্কার বাবদ পাওয়া সমস্ত টাকা তিনি এই ব্যাঙ্কে জমা দেন চাষীপ্রজাদের সুবিধার জন্য। এই ব্যবস্থায় প্রজাদের যে কি অশেষ উপকার হয়েছিল তা কল্পনার বিষয়।

আমাদের 'গণ্যমান্য দেশবরেণ্য নেতারা যখন দেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে বড় বড় শহরে বসে শুধু মাথা ঘামাচ্ছেন, আর জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিচ্ছেন তখন কবি লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে দেশগঠনের ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। পল্লীসংগঠনের মধ্যেই যে দেশের প্রকৃত স্বাধীনতার ও মঙ্গলের বীজ উপ্ত আছে সে কথা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর সৃজনশীল মন চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যে শিক্ষা আনন্দহীন, যে শিক্ষাব্যবস্থায় দেশ-প্রেমের উন্মেষ হয় না, যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হয় না সেই শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতা তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। সেই জন্য যখন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হল তিনি সোৎসাহে নিজেকে তার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই বুঝলেন উদ্যোক্তারা নতুন কিছু করতে চান না কেবলমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকল্প একটা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে চান; তখনই তিনি নিজেকে তার থেকে আলাদা করে নিলেন। নিজের পরিকল্পনামত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। শিক্ষাকে জীবনমুখী করবার জন্য খেলাধুলা, সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, চারুকলা, সেবামূলক কাজ প্রভৃতি তার অঙ্গীভূত হল—কর্মমুখী করবার জন্য শ্রীনিকেতনে তৈরী হল বিশ্বভারতীর পল্লী সংগঠন বিভাগ। এইসব কর্ম প্রচেষ্টার মধ্যে কবির যে বাস্তববোধ ও দেশপ্রেম রয়েছে বর্তমান কালে তার তুলনা মেলে না।

অভিজাত ধনী পরিবারের সন্তান তিনি, তিনি আক্ষেপ করেছেন সাধারণের জীবনের শরিক হয়ে তাদের আনন্দ বেদনার পরিচয় নিতে তিনি হয়ত যথার্থ ভাবে পারেন নি।

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার/
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি
জীবন যাত্রার" কিন্তু যেটুকু তিনি মিশেছেন তার ফলশ্রুতিও কম নয় কোন অংশে। সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার কথা তাঁর পরিণত বয়সের কাব্যধারার মধ্যে দুর্লভ নয়।

"চাষী খেতে চালাইছে হাল
তাঁতী বসে তাঁত বোনে, জেলে
ফেলে জাল।
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র
কর্মভার
তারিপরে ভর দিয়ে চলিতেছে
সমস্ত সংসার"

এই সংসার যথের ধনি যাঁদের হাতে সেই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের কবি দেবতার আসনে বসিয়েছেন কর্মদেবতা রূপে।

"তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাহার লেগেছে দুই হাতে
তারি মতন শুচি বসন ছাড়ি
ধূলার পরে"

এই সাধারণ শ্রমজীবি সম্প্রদায়ই যে সভ্যতার ধারক ও বাহক সেকথা কবি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, তাঁদের জয়গান গেয়েছেন, সব দম্ভ আস্ফালন একদিন শেষ হয়ে যায়, বেঁচে থাকে শুধু তাঁরা যাঁরা কাজ করে, তাঁরাই ইতিহাস সৃষ্টি করে, এই কর্মীদেবতাই

"দুঃস্বপ্ন দিবসরজনী
মন্থিত করিয়া তোলে জীবনের
মহামন্ত্রধ্বনি।"

এই সব সাধারণ লোকদের জয়গান তাঁর কাব্যমধ্যে কম কম নেই।'

এই প্রসঙ্গে এ কথাটিও স্মরণ যোগ্য ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এই দেশের উন্নতি বিধান করতে গেলে কৃষিকেই বনিয়াদ হিসাবে গ্রহন করতে হবে। আমাদের রাষ্ট্র-নায়করা আজ পর্যন্ত সেই সত্যকে স্বীকার করতে পারলেন না। কিন্তু ঋষি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সেই সত্য ধরা পড়েছিল অনেক আগেই। তিনি তাঁর পুত্রকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিষ্টার করিয়ে আনেন নি, তখনকার দিনের অভিজাত ধনী পরিবারের সকলেই যা করতেন। তিনি পুত্রকে বিদেশে পাঠিয়ে আধুনিক কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী করিয়ে এনে তাঁকে সেই কাজেই নিয়োজিত করেছিলেন। খ্যাতি অর্থ বা প্রতিপত্তির মোহ তাঁকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারেনি।

'পরিচয়' কবিতায় কবি বলেছেন:—

"মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি-তোমাদেরই লোক,
আর কিছু নয়
এই হোক শেষ পরিচয়"

কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও বলি তুমি আমাদেরই লোক, তুমি শুধু ভাবুকদের নও, শুধু দার্শনিকদের নও, শুধু কাব্যবিলাসীদের নও, তুমি আপামর সাধারণ লোকের দরদীকবি। আমরা যেন তোমাকে আমাদের একান্ত আপন বলে গ্রহন করতে পারি, আর কামনা করি নানা সমস্যায় জর্জরিত, উদ্‌ভ্রান্ত সমাজ 'রবিরশ্মির উদ্ভাসিত আলোকে সঠিক পথের নিশানা লাভ করুক॥

বিপ্লবীর দৃষ্টিদীপে রবীন্দ্রনাথ

নিকুঞ্জ সেন

বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, 'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা শুনাল বিশ্বময়।' সেদিন রবীন্দ্রনাথের দিকে পরম বিস্ময়ে তাকিয়েছিল সমগ্রদেশ। কেননা, তারা ত জানত না কি গভীর বিশ্বাস ছিল রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের এই বিপ্লবীদের প্রতি। বিপ্লবীরাও মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল রবীন্দ্রনাথকে। তারা জানত রবীন্দ্রনাথই তাদের অব্যক্ত বেদনার ভাষা।

সারা অন্তর দিয়ে বিপ্লবীদের ভালবেসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাই বিপ্লবের পথে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর অভিযাত্রীদের বলিষ্ঠ পদধ্বনি যেমন আনন্দ দিয়েছে তাঁকে আবার তেমনি তাদের প্রতি রাজদণ্ডের নিষ্ঠুর প্রহার বেদনায় ভরে তুলেছে তাঁর চিত্তকে। রাত্রির অন্ধকারে রবীন্দ্রনাথই ছুঁড়িয়েছেন তাদের পথের আলো। বলেছেন, 'সব আশাজাল যবে যখন উড়ে পুড়ে, আশার অতীত দাঁড়ায় তখন ভুবন জুড়ে'। বিপ্লবীরা তাঁর এ আশার বাণী শুনে জয় করেছে নৈরাশ্যের অন্ধকারকে, জয় করেছে পথের বাধাবিঘ্নকে, পথ চলতে চলতে শুনেছে 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তুই একলা চলরে।' একলাই সে পথ চলেছে। দুর্যোগের রাত্রিতে, দুর্গম অভিযাত্রায় রবীন্দ্রনাথই তার একমাত্র সাথী।

এই মন নিয়েই ১৩৩৮ সালের ২৫শে বৈশাখ, (ইংরেজী, ১৯৩১) বকসা বন্দীশিবিরে অবরুদ্ধ বাংলার বিপ্লবীরা রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করলেন। সেই উপলক্ষে কবিগুরুর কাছে রাজবন্দীদের তরফ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠান হল শান্তিনিকেতনে। তারই উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে
রবির বন্ধন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাধা, সঙ্গীত
না মানিল বন্ধন।
কোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উদ্ধারিল আলোকের কী
অভিনন্দন
মৃত্তিকার ভিত্তিভেদি অঙ্কুর আকাশে
দিল আনি
স্বল্পমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির
মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রানীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যুদিয়ে বিরচি অমর্ত্য নরের
রাজধানী।
'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা
শুনাল বিশ্বময়।
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে
জানিস অক্ষয়।

মনে আছে রবীন্দ্রনাথের এ লেখা যেদিন বকসা বন্দীশিবিরে বন্দীদের হাতে পৌঁছল সেদিন তাদের মনে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক রাজবন্দী সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল কি গভীর ভালবাসা তাদের জন্য সঞ্চিত আছে রবীন্দ্রনাথের অন্তরাত্মায়। তাদের মনে সেদিন প্রশ্ন জেগেছিল, এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বিপ্লবীদের এমন চোখে দেখেছেন কে? এমন দরদ দিয়ে তাদের অন্তর ভরে তুলেছেন কে?

এর বহুবছর আগে আর এক উপলক্ষে ভারতবর্ষের এক মহান বিপ্লবীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ; বলেছিলেন, "অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" অরবিন্দ ছিলেন সেদিন সারা ভারতবর্ষের বিপ্লবযজ্ঞের হোতা। তাই অরবিন্দকে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তিনি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন সারা ভারতের বিপ্লবীদের। অরবিন্দকে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ আত্মার বাণী-মূর্তি বলে অভিহিত করেছিলেন সেদিন। বলেছিলেন :

"দেবতার দীপহস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।
বন্ধন পীড়ন দুঃখ অসম্মান মাঝে
হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর
বাজে
আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান—
মহাতীর্থযাত্রীর সঙ্গীত, চিরপ্রাণ
আশার উল্লাস, গম্ভীর নির্ভয়বাণী
উদার মৃত্যুর।"

বিপ্লবীদের সম্পর্কে যখন অনেকের মনে জেগেছে সন্দেহ, দ্বিধা উঠেছে তাদের পথচলার ধারা নিয়ে, তখন রবীন্দ্রনাথই তাদের তপস্যার অন্তর্গূঢ় সত্যটি আবিষ্কার করে তা জগৎসমক্ষে প্রকাশ করেছেন।—বিপ্লবীরা পথ চলতে গিয়ে আলোর বদলে কখনও হয়ত জেলেছে আগুন আর সেই আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছে তাদের বুকের পাঁজর। কিন্তু তবু তারা তাদের যাত্রাপথ পরিত্যাগ করেনি। "তাঁদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ-নিবেদন আজ নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে, কিন্তু তার ত নির্ভীক মনে চিরদিনের মত প্রমাণ করে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে।"

যে ঐশ্বর্য্যের বলে আপনাকে অনায়াসে বিলিয়ে দিয়ে দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় বিপ্লবীদের মনের সে ঐশ্বর্য্যের একান্ত নিষ্ঠার

সঙ্গে খুঁজে বেরিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। খুঁজে তিনি পেয়েছেন-ও। সেই জন্যই তাঁর কণ্ঠে যখন বিপ্লবীরা শুনতে পায়—

'ঘুমায়ো না আর কেহ রে
ছিন্নপণ্ড ছিন্ন করিয়া
ভাও ভরিয়া দেহরে'—তখন তারা বুঝতে পারে ক্রমে তাদেরই মনের কথা। আবার যখন তারা শোনে

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই—তখন কি এই ভয়কে জয় করে নিঃশেষে আপনাকে বিসর্জ্জন করবার অধীর আগ্রহে তারা চঞ্চল হয়ে ওঠে না?

যুগে যুগে এই ভয় ভাঙ্গানোর গানই গেয়ে গেছে দেশের বিপ্লবীরা। গেয়ে গেছে ফাঁসীর মঞ্চে, রণক্ষেত্রে, শত্রুর সান্নিধ্যে। তাঁরা উপলব্ধি করেছে:

জীবন সঁপিয়া জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়;
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়।

নিঃশেষে প্রাণ বলি দেওয়ার তপস্যায় সিদ্ধ না হলে ত এ ভয় ভাঙ্গানোর গান গাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিপ্লবীরা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথকে তাঁরা এমন আপন করে নিতে পেরেছে। মনে আছে একদিন দীনেশ গুপ্ত বলেছিল 'রবীন্দ্রনাথই' আমার গীতা, কেননা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে গীতার মর্ম্মবাণীকেই খুঁজে পাই আমার নিজেরই ভাষায়। তাইত শুনি:

"চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার
ওরে সেত নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।"

যত শুনি ততই অমৃতের অধিকার লাভের জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন সুখের রাজ্য পায় হবে, বিশ্রাম ও শান্তির মোহানিদ্রা কাটিয়ে মৃত্যুকে জয় করবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্প জাগে পথ চলার প্রতিটি পদক্ষেপে।

এই ব্যাকুলতা দেখেছি ভারতের নবপঞ্জরী সব বিপ্লবীদের মধ্যেই। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বৈকুণ্ঠ শুক্লের কথা। গয়া সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসীর প্রতীক্ষায় তিনি দিন গুনছেন আর বুকের সেখে বন্ধী শ্রীবিভূতি লাহাগুপ্তকে অনুরোধ করছেন রবীন্দ্রনাথের 'মরণ মিলন' আবৃত্তি করে শোনাতে। বৈকুণ্ঠ শুক্ল ছিলেন মুজফ্ফরপুর জেলার অধিবাসী।' বাংলা তিনি ভাল বুঝতেন না, কিন্তু, রবীন্দ্রনাথকে তিনি বুঝেছিলেন। বিভূতিবাবু আবৃত্তি করে গেলেন।

আমি যাব যেথা তব তরী বয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি তাঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘনঘোর মেঘোদয়
দূর ঈশানের কোনে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎবহ্নি জ্বালাময়
তবে উন্নত ফণা বিকাশে,
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

এইভাবে একদিকে বীর তাপসদের মৃত্যুঞ্জয়ী অভিযাত্রা আর অন্যদিকে তিল তিল জীবন উৎসর্গের নীরব সঙ্কল্প এই মন্ত্রে আলোর প্রদীপ হাতে, আশার বাণী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিপ্লবীদের এমন অক্ষয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

বিপ্লবীরা মুক্তি পিয়াসী। সে মুক্তি ত শুধু পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি নয়। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি। কুসংস্কার, মিথ্যাচার, অন্যায় ও উৎপীড়নের হাত থেকে চিরদিনের জন্য মানুষের মুক্তি। অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে মুক্তির এ আস্বাদ গ্রহণ করবার সঙ্কল্প চির তাদের। সে মুক্তি ত আনবে না সংশয়কে অস্বীকার করে:

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার
নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে
আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে রূপে, রসে,
গানে।
তোমার আনন্দ রবে তার
মাঝখানে।

বিপ্লব জীবনের এই নিগূঢ় সত্যটিকে এমন করে মনের মাধুরী মিশিয়ে কে এত সহজে ব্যক্ত করতে পারতেন এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া।

দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের অভিপ্রায়ে বিপ্লবীরা যে পথ গ্রহণ করেছেন সে পথই সত্যিকারের পথ কিনা এ বিচার রবীন্দ্রনাথ করতে বসেন নি। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন বিপ্লবীদের সঙ্কল্প সাধনের একাগ্রতায়। এই সঙ্কল্প সাধনের উদ্দেশ্যেই বিপ্লবীরা পথ চলবে:

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে ধরে উন্নত দুর্দ্দিন
চিত্তে ধরে আশা অন্তহীন।

অন্তহীন এ দুর্গম পথে পথ চলার সাথী যদি কেউ না থাকে তবে একাই তোমার পথ চলতে হবে—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না
আসে
তুই একলা চলরে।"

এইত বিপ্লবীর পথ চলার মন্ত্র।

"পেছনে যে আছে তারে ডেকে
নাও
নিয়ে যাও সাথে করে,
যদি কেহ নাহি আসে একা চলে
যাও
মহতের পথ ধরে—"

পেছনে যারা রইল তাদেরও

আহ্বান জানাতে হবে। তবে তাদের জন্য অপেক্ষা করা চলবে না। যদি সে আহ্বানে কেউ সাড়া না দেয় তবু তোমায় এগিয়ে যেতে হবে—শ্রান্তি ক্লান্তিহীন পথে নিঃসঙ্গতাই হবে তোমার সাথী।

"—মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।"
কোন দিকে লক্ষ্য করলে চলবে না তোমাদের, পেছনপানে চাইলে হবে না। সম্মুখে তরঙ্গক্ষুব্ধ অন্তহীন সমুদ্র। পেছনে ঝড়ের গর্জন। এরই মধ্যে পাড়ি ধরতে হবে :

"তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাঁহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল।—"
ঝড় যদি ওঠে তবু-ও, মৃত্যু যদি
আসে তবু-ও।

"বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

পথ চলতে চলতে ঝড়ের সমুদ্রে পাড়ি জমাতে জমাতে বিপ্লবীরা শোনে রবীন্দ্রনাথের ঐ আহ্বান—চলার পথের নিশানা তাদের স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

"রক্তে-রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরুতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে
পরাণ দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।"

আঘাত-সংঘাতের দোলায় দুলতে হলে বেশটা হওয়া চাই সৈনিকের। বিলাস-ব্যসন আজ নয়। সৈনিকের বেশে আজ রক্ত-রাঙা পথে তার অভিযাত্রা :

"আঘাত-সংঘাত মাঝে দাঁড়াইনু
আসি।
অঙ্গদ, কুণ্ডল, কণ্ঠী, অলঙ্কাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। নাও হস্তে তুলি
নিজহাতে তোমার অমোঘ শরগুলি
তোমার অক্ষয় তূণ, অঙ্গে দীক্ষা
দেহ রুদ্রগুরু।"

অঙ্গে দীক্ষা গ্রহণ করে বিপ্লবী ধরবে সৈনিকের বেশ। তারপরে সুরু হবে তার সংগ্রাম :

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয়জাল,
এই স্তূপস্তূপীকৃত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা। ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাতকালে, এ জাগ্রত ভবে
এই কর্ম্মধামে।"

এই কর্মধামকে, এ বিরাট সংসারকে পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। দুঃখ-আঘাতে দীর্ণ এই সংসারকে স্বীকার করেই তার পথ-চলা। বিপ্লবীরা তাই কান পেতে শোনে—

"কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল? কোন অন্ধ কারাগারে
জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়?"

তারা জানে :

"—ক্ষীতকায় অপমান
অঙ্কমের বক্ষরক্ত করিতেছে পান
লক্ষমুখ দিয়া; বেদনারে করিতেছে
পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে
কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ
অন্ধকার।"

এই দরিদ্র, শূন্য, কষ্টের সংসারেই জন্মগ্রহণ করেছে সারাদেশের বিপ্লবীরা; আর সংসারের সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধেই তাদের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়ী হতে হলে :

নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া
ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে করিনা শঙ্কা। দুর্দ্দিনের
অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি।

সম্মুখে ঐপথ, যে পথে চলেছেন বিপ্লব-পথের পুরোযাত্রীরা। অন্তহীন সে-পথের বাঁকে বাঁকে বাধার পাহাড়, বাঁকে বাঁকে দুঃখের ঘনঘটা।

পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা
পথে পথে গুপ্তসর্প, গূঢ়ফনা
• • •
মৃত্যু তোরে দিবে হানা
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা।
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ
এইতোর রুদ্রের প্রসাদ।

এই আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে, রুদ্রের এই প্রসাদকে কেন্দ্র করেই নির্ভয়ে সে পথ চলেছে—পথ চলেছে ঝড়ের উন্মত্ত তাণ্ডবে, রাত্রির গহন অন্ধকারে। মৃত্যু থেকে অমৃতলোকে এই যে অন্তহীন পথযাত্রা এ পথযাত্রায় কোন ছেদ নেই, ক্লান্তি নেই। এই দুরদুর্গম পথে একদিন পড়েছে যাদের পায়ের চিহ্ন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিরদিনের জন্য তাদের আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। তিনি দেখেছেন যারা এমন অনায়াসে লোভ ভয়, রাজভয়, আর মৃত্যুভয় জয় করতে পারে তাদের সাধনা কত গভীর, তাদের তপস্যা কত অন্তঃগূঢ়। এই কারণেই তাদের অন্তর্যামী সে ঐশ্বর্য্যের তিনি সন্ধান করেছেন, যে-ঐশ্বর্য্য অক্ষয়, যে ঐশ্বর্য্য বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্যের অতীত। এই ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই হয়ত তিনি এদের সম্বন্ধে একদিন বলতে পেরেছিলেন :

ভৈরবের আনন্দেরে দুঃখেতে জিনিলকেরে
বন্দীর শৃঙ্খল ছন্দে মুক্তের কে দিল
পরিচয়।

একলা রাতের অন্ধকারে পথ চলতে চলতে পথেহারা যে পথিক বলে ওঠে 'একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।' তাকে আশ্বাস দিয়ে কবি বলেন :

—আপনারে দীপ করি জ্বালো
দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে
হবে আলো,
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের
বিঘ্ন করি দূর,
জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে
আনিতে হবে সুর।

(২৯৬ পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

হেটো বই-হেটো ছড়ায় ঐতিহাসিক উপাদান

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

একদা ভারতবর্ষে যে কোন জায়গায় বিশেষ কোন ঘটনা ঘটলে, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সেই ঘটনা নিয়ে ছোট্ট আকারের ছড়ার বই বের হত। এই সব বই কোন দোকানে পাওয়া যেত না। পত্র পত্রিকায় বিজ্ঞাপন থাকত না। পুস্তক সমালোচনার জন্য হেটো বই কোন সংবাদপত্র অথবা সাময়িক পত্রের সম্পাদকের কাছে পাঠানো হত না। বইয়ের লেখকেরা কে ভালো বললো আর কে মন্দ বললো এ-কথা বোধ হয় চিন্তা করতেন না। এমন অনেক বই বেরিয়েছিল, যার মধ্যে সে দিনের বহু নামকরা এবং ক্ষমতাশালী ধনী-ব্যক্তি, যাদের সমাজের প্রতি মঙ্গল বোধ ছিল না, সেই সব লোকের নাম-ধাম উল্লেখ করে ছড়া লেখা হয়েছিল। ফেরিওয়ালারা এই সব বই হাটে-বাজারে,ইস্টেশানে, গলি-গলি ঘুরে বিক্রি করত। হাটুরে ফেরিওয়ালারা ছড়াকেটে সমাজের হাটহদ্দ প্রকাশ করত। যাকে বলে, হাটের মধ্যে হাঁড়ি ভাঙতো। তার আগে অর্থাৎ যখন আমাদের দেশে মুদ্রা-যন্ত্র আসেনি সেই সময় সমাজের অনাচারের কথা প্রকাশ করা হতো জনসমাগম বহুল হাটের মাঝে। এই এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি লেখা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাঙালী সমাজের কথা আলোচনা-কালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় হাটে হাঁড়ি ভাঙা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

"একটা হাঁড়িতে সিন্দুর মাখাইয়া 'লুইয়ের হাঁড়ি' বলিয়া তাহার স্থাপনা করা হইত। লুইপাদ একজন প্রসিদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্য্য ছিলেন। তাঁহার প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা এখনও পশ্চিম ও দক্ষিণ রাঢ়দেশে প্রবল আছে। এই হাঁড়ি বসাইয়া লুইপাদের পূজা হইত। একটা খাসী বলিদান দিয়া তাহারই নাড়ীভুঁড়ি ঐ হাঁড়িতে পোরা হইত। খানা-পিনা শেষ হইলে, অভিযোক্তা তাহার অভিযোগের কথা বর্ণনা করিতেন। তাহা শুনিয়া ঐ হাঁড়ি হইত। প্রায়শঃ লাম্পটের অভিযোগই করা হইত। পত্নী, ভগিনী, কন্যা, কাহারও সহিত ঘরের বাহির হইলে, নর-নারী উভয়ের বিরুদ্ধে হাঁড়ি স্থাপনা হইত। তাহার পর এই নাড়ীভুঁড়ি পূর্ণ হাঁড়ি মাথায় করিয়া হাটের দিনে একটা কেন্দ্রস্থ বড় হাটে উপস্থিত হইতে হইত। হাট যখন জমজমা চলিতেছে, তখন হাটের মধ্যস্থলে কুৎসা কীর্ত্তন করিয়া আছাড়, মারিয়া হাঁড়ি ভাঙ্গা হইত। হাঁড়ি ভাঙ্গিলেই লম্পট নর-নারীর আর কুত্রাপি আশ্রয়ের স্থান মিলিত না, তাহারা সকলে অস্পৃশ্য 'ঠেকো' হইয়া থাকিত। একটা মজার প্রবচন এই উপলক্ষে প্রচলিত ছিল। 'হাটল হাটে হাঁড়ি,/ছড়াল কুচ্ছার ভুঁড়ি ও নাড়ী,/দূর দূর ছোঁড়া ও ছুঁড়ী।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত লেখা থেকে সেকালের একটি সমাজ-চিত্র পাওয়া যায়।

সেকালে একশ্রেণী কবি যেখানে কদর্যরুচি তাঁদের চোখের সামনে ধরা পড়তো, সেখানেই তাঁরা প্রতিবাদ করতেন। অধিকাংশ বইতে লেখক ও কবির নাম থাকতো না।

একদিকে তাঁরা সত্যনিষ্ঠ মানুষের জয়গান, অপর দিকে স্বার্থান্ধ, লোভী ও ক্ষমতা পরায়ণ মানুষের চক্রান্তের কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরতেন। যেমন আবদুর রশিদ খাঁ লিখিত বই (১৯০১ সালের নোয়াখালীর মোকদ্দমা, মহাত্মা পেনেলের বিচার)। সেকালে ইংরেজ বিচারপতি পেনেলকে নিয়ে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। বিভিন্ন সংবাদপত্রে ওই সময় প্রায় প্রতিদিন পেনেল সাহেবের সংবাদ প্রকাশিত হত। পেনেল সাহেবকে নিয়ে কয়েকটি হেটো বই ও ছড়ার বই লেখা হয়।

সেকালের বহু হেটোবই-হেটো ছড়ার লেখা যায়, লেখক ও কবিরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সমাজের নানা অনাচারের বিরুদ্ধে অভিনব উপায়ে অন্যায়ের প্রতিকারের চেষ্টা করেছিলেন। এই কারণে হেটো বই, হেটো ছড়াগুলির বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্ময়ের রচনা হিসাবে বিশিষ্ট মূল্য আছে। অধিকাংশ বইয়ের ভাষা সরল। ছড়াগুলির প্রাণস্পন্দ লোকজীবনের প্রতি গাঢ় অনুরক্তি। অখ্যাতনামা কবিদের কবিত্বশক্তি নিতান্ত মন্দ ছিল না। সব মিলিয়ে চটি বইগুলি একশ্রেণী পাঠকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হত। অনেকে আদালতের চাঞ্চল্যকর মামলার নথিপত্র বাংলায় অনুবাদ করে চটি বই ছাপিয়ে ছিলেন। কোন কোন প্রকাশক সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ পুনর্মুদ্রিত করে হেটো বই বের করেছিলেন।

এক শ্রেণীর অল্প পুঁজির ব্যবসায়ীদের উৎসাহে এই ধরণের হেটোবই প্রচুর ছাপা হয়েছিল। হেটো ছড়ার ক্রেতা যথেষ্ট ছিল। এক বৃহৎ জনমণ্ডলীকে এই ছড়ার বই ক্ষণিক হাস্যরসে পরিতৃপ্তি করত। ক্ষুদ্র চটি বইগুলিকে সাধারণ মানুষ তুচ্ছ জ্ঞান করত না। জনসাধারণের মনে দাগ কাটতো। শুধু যে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের ছড়া ছাপা হত তা নয়। বহু বেদনার কাহিনীও ফেরিওয়ালারা বিক্রি করত। হাসি ও অশ্রুর মুক্তাবিন্দুর ছড়ার

মালা নিয়ে ফেরিওয়ালারা পথে পথে ঘুরত। সেকালের বহু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক পটভূমিকায় ছড়া রচিত হয়েছিল। সেই হেটোছড়া সাধারণ মানুষ সাদরে গ্রহণ করত। সেকালে এখন অনেক বই বেরিয়েছিল, যার মধ্যে উল্লেখ ছিল সে দিনের বহু ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির নাম, যারা বহু নোংরা ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। হেটো কবিরা নোংরা লোকের নাম-ধাম উল্লেখ করে ছড়ার বই বের করেছিলেন। সেই সব ব্যক্তিদের গোপন কথা দশের কানে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল হেটো ছড়ার উদ্দেশ্য। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, হেটো বই ও হেটো ছড়া হাটে হাঁড়ি ভাঙতো। গোপন দোষ সাধারণের সামনে প্রচার করত। যে সব কথা সংবাদপত্রে লিখতে সাংবাদিকেরা দ্বিধা করতেন, সেই সব কথা লিখে তিরস্কার করতে হেটো ছড়ার কবিরা সঙ্কোচ বোধ করতেন না। এই কারণেই সেকালে যারা ডুবে ডুবে জল খেত, সমাজে সমাজপতি সেজে এবং গোপনে নানা পাপ কাজে লিপ্ত থাকতো, এমন সব জাঁদরেল জীবেরা হেটো ছড়াকে ভয় করতো। সেকালের এক হেটো কবি লিখেছিলেন :

মিষ্টি কথায় কাজ হ'ল না গোল্লায় গেছে দেশ,
'চাবুক' হাতে নিয়েছি তাই দেখবো এবার শেষ।
বচন দিয়ে বাগ মানেনা কানে দিয়েছে তুলো,
কিল চড়েতে সাড়া জাগেনা পিঠে বেঁধেছে কুলো।
ভারত জোড়া রেসের খেলা মারতে হবে বাজি,
লাগাও চাবুক ফিরবে এবার দেশের মত পাজি।

হেটো কবিরা বহু সামাজিক বিষয় নিয়ে ছড়া লিখেছিলেন যেমন :

মেয়ের বিয়ে উলু দিয়ে গিন্নী বাজায় শাঁখ,
কর্ত্তা অমনি লাফিয়ে উঠে বলেন থাক থাক।
কিসের আমোদ গিন্নী তোমার সর্বনাশটি হল,
বরের পণে চোদ্দপুরুষের ভিটে বন্ধক প'ল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই মাসের কারাদণ্ডের আদেশ উপলক্ষে 'সুরেন্দ্রের কার্ম্মবাস বিবরণ' বইটি ১২৯০ সনে (ইং ১৮৮৩ সালে) ঢাকা থেকে ছাপা হয়েছিল।

সন ১৩২৪ সালে জলপাইগুড়ি থেকে ছাপা হয়েছিল 'লুটের বিবরণ'।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েক-জন হেটো বই—হেটো ছড়ার লেখক ও গান লিখে ছোট ছোট চটি বই বের করেছিলেন। একটি গানের বইতে বলা হয়েছিল :

ও ভাই বল দেখি চরখা হাতে করে তোমার লজ্জা কি ?
(তোমার) ধরম করম সব গিয়েছে, নেংটা হলো বউমা কি ?
দু মন পাটের টাকায়, দুখান কাপড় না হয়,
শীতে কাঁপে মনস্তাপে স্বদেশী সবায়,
এ দুঃখ দূর করতে চরখা নিতে বুঝা মনে ভাব কি ?

দেশের কোন স্থানে প্রাকৃতিক দুর্বিপাক ঘটলে ওই সব ঘটনার ফলে অসহায় মানুষের দুর্গতির কথা হেটো কবিরা বই ছাপিয়ে দশজনকে জানাতেন। ওই সব ঘটনার মধ্যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঝড় প্রভৃতি দুর্যোগের কথা নিয়ে বই লেখা হত। এই সব হেটো ছড়ার বই ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহের কাজেও লাগতে পারে। হেটো ছড়ার বই থেকে বাঙালীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যেমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উপাদানও গ্রহণ করা চলে।

জাতীয় শিক্ষক সূর্য সেন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডঃ আশা দাস

তাঁকে কেন্দ্রবিন্দু করে সেদিন চট্টগ্রামের বিপ্লবী যুব সমাজ এক আদর্শে ও উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিপ্লব মাষ্টারদার বিপ্লবী জীবনেরই ধারাবাহিক চিত্রাবলী। যদি বলা যায় মাষ্টারদাকে কেন্দ্র করে তাঁর সংগঠিত যে বিপ্লবীদল তাঁদের সমষ্টিই হল মাষ্টারদা তাও যেন সবটা বলা হয় না। বিপ্লবীদল হল বিপ্লবের দেহ। কিন্তু মাষ্টারদা হলেন দেহাতীত এমন কিছু যা নইলে দেহ অচল অর্থাৎ এই বিপ্লবের আত্মা বা প্রাণবিন্দু। প্রাণকে বাদ দিলে যেমন হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণ-মন সবই অচল অক্ষম, মাষ্টারদাকে বাদ দিলেও তেমনি চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লব আকাশ কুসুম কল্পনা। অস্ত্রশিক্ষা, বীরত্ব প্রদর্শন, অর্থ সংগ্রহ বিদ্রোহের বাহ্যিক চিত্র। সংগঠন ও প্রস্তুতি, জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান, ঠিক সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অতি সঙ্কটজনক মুহূর্তেও বৈপ্লবিক নির্দেশ দানে মাষ্টারদার অপরিহার্য ভূমিকা তাঁকে নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। ক্ষীণকায়, দুর্বল দেহ মানুষটি শারীরিক নয়, মানসিক শক্তির জোরে বিপ্লবের পথে অটল ছিলেন। X ray-র মত তিনি মানুষের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পেতেন। অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে প্রতিটি বিপ্লবীর আকাঙ্খা রুচি, মেজাজ ও ভাবাবেগ তিনি বুঝতে চেষ্টা করতেন। হতভাগ্য পরাধীন দেশে জন্ম গ্রহণ করলেও একটা বিরাট জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ও সুপরিচালনা করার মত সাংগঠনিক শক্তির অধিকারী তিনি ছিলেন। কিন্তু কোনদিন কেউ তাঁর মধ্যে আত্মপ্রচারের সামান্যতম প্রচেষ্টাও দেখতে পায়নি। তিনি ছিলেন নেপথ্যচারী; নৈর্ব্যক্তিক প্রতিষ্ঠাই তাঁর ব্যক্তিত্বের মূল কথা। নেতৃত্ব ও পরিচালনার ব্যাপারে নিজের নাম যাতে প্রকাশ না পায় এ ব্যাপারেও তিনি বিশেষ সচেতন থাকতেন। অন্তরের প্রকাশ হওয়ার, নাম ও যশোলাভের পথ তিনি করে দিতেন, কিন্তু সকল ব্যাপারই নিজেকে অপ্রকাশিত রেখে চলতেন। নেতৃত্ব-সুলভ অহমিকা বা ক্ষমতার দম্ভ তাঁর আচরণকে মুহূর্তের জন্যও কালিমালিপ্ত করতে পারেনি।

তিনি ছিলেন মানুষ তৈরীর একজন নিপুণ কারিগর। চট্টগ্রামের সাধারণ লোকেরাও বলত—'সূর্যসেন ইচ্ছা করলে হাজার হাজার গণেশ ঘোষ অনন্ত সিং তৈরী করতে পারেন'। বহু প্রতিভাকে এক বৃন্তে ধারণ করে একটি মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করার মত আশ্চর্য সাংগঠনিক শক্তির তিনি অধিকারী ছিলেন। তাঁর সংগঠনিক প্রতিভা ঐক্য সূত্রে যে তরুণমতি কিশোর ছাত্র ও যুবকদের স্বল্প সময়ের মধ্যে একটা অগ্নিময় আদর্শে তিনি অনুপ্রাণিত করেন। একা শ্মশানে ঘুরে কিশোরদের মনোবল পরীক্ষা করতেন। যুবকদের সঙ্গে জীবন মৃত্যু সম্পর্কে গভীর তত্ত্ব পূর্ণ আলোচনা করতেন। বলতেন—জন্মেছি যখন মৃত্যু তো অনিবার্য। মরবই যখন, তখন, সার্থক মৃত্যু বরণই শ্রেয় নয় কি? কোটি কোটি মানুষের দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের পথে যে মৃত্যু আসবে তাই আমরা বরণ করব'। তরুণ কর্মীদের বিপ্লবী চরিত্র গঠনের জন্য আনন্দমঠ, বিবেকানন্দের রচনা, পথের দাবী, ক্ষুদিরাম, বাঘাযতীন, ডি, ভ্যালেরার জীবনী পড়তে দিতেন। লোকনাথ বল ও অনন্ত সিং-এর নেতৃত্বে ব্যায়ামাগার ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় শরীর চর্চাতে খেলাধূলার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল। পারিবারিক বন্ধন, মাতা পিতার স্নেহ-ডোর, জীবনের মায়া সব ছিন্ন করে সংগঠিত হল একদল মৃত্যুপাগল কিশোর যুবক। বিপ্লবী দলের প্রয়োজনে একটি গোয়েন্দা বিভাগও খোলা হয়। পুলিশের চালচলন ও কাজকর্মের উপর নজর রাখা। বড় ইউরোপীয়ান অফিসারদের যাতায়াত, হাবভাবের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এই বিভাগের বিপ্লবীদের কাজ। কর্মীদের তিনি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে নিয়েছিলেন। ইংরেজের পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর সন্দেহ চক্ষুর অন্তরালে ছিলেন শ্রীপশুপতি চৌধুরী প্রমুখ একদল বিপ্লবী যাঁরা নীরবে, নিভৃতে মাষ্টারদার মহান ব্রতকে সার্থকতার পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। মাষ্টারদা কোন সভাসমিতিতে এঁদের যেতে দিতেন না, জনগণের কাছেও এঁরা ছিলেন একেবারে সাধারণ লোক, ঘরের সুবোধ ছেলে। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের বর্তমান লিখিত ইতিহাস সমূহ এঁদের কাজের যথার্থ মূল্যায়ন করতে না পারলেও, এঁরাই বিদ্রোহের প্রকৃত ইস্পাত স্তম্ভ।

সংগঠনের প্রয়োজনে 'মন্ত্রগুপ্তি' রক্ষা করেছেন কঠোর সঙ্গোপনে। যাকে যতটুকু কাজের দায়িত্ব দিতেন সে কেবল ততটুকুই জানত। সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তিনি কোন দিন কাউকে জানতে দেননি। চট্টগ্রাম বিপ্লবের বিশ্বস্ত সৈনিক যাঁরা তাঁদেরই একজনের অভিমত-চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস একক-ভাবে কারো পক্ষে রচনা করা অসম্ভব, কারণ এর সর্বাঙ্গীন ইতিহাস প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কেউ জানে না। দলীয় সংগঠনকেও তিনি এক নূতন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহের অন্যতম পন্থা ছিল ডাকাতি।

মাষ্টারদা বিপ্লবী চরিত্রে নীতিবোধের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিলেন। বললেন—ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের ফলে কর্মীরা স্বার্থত্যাগের দীক্ষিত এড়িয়ে চলে। নৈতিক কারণে এটা গ্রহণযোগ্য নয়, তাছাড়াও ডাকাতিতে এত হৈ চৈ হয়, যে আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে যায়, ফলে লক্ষ্যে পৌছাতে বাধা আসে। সুতরাং আর ডাকাতি নয়, এবার ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে হবে নিজেদের আপনজনের কাছ থেকে'। মাষ্টারদার নির্দেশিত এই তহবিল গড়ে উঠেছিল দলের প্রত্যেক কর্মীর আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ ও স্বর্ণালংকারে—ধনীদরিদ্র সকল কর্মীর নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় ও দানে।

সুচিন্তিত রণকৌশল তাঁকে বৈপ্লবিক নেতার সুমহান আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। একদিকে সুসংগঠিত সুদৃঢ় বৃটিশ রাজশক্তি, আর একদিকে মুষ্টিমেয় বিপ্লবী যুবক মাতৃভূমির প্রতি পরম মমতাই যাদের একমাত্র সম্বল। মরণ পাগল এই যুবশক্তিকে সুসংগঠিত করে সুচিন্তিত ও অপরাজেয় রণকৌশলের সাহায্যে শিক্ষক সূর্যসেন চট্টগ্রামের বুক থেকে সমগ্র ভারতব্যাপী এত বড় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ ও শক্তিমত্তাকে চরম আঘাত হানলেন। একই দিনে একই সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণের এই যে সুপরিকল্পিত ও দুর্জয় রণ-কৌশল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার পূর্ব নজির বিরল। এই সুপরিকল্পিত আক্রমণের পরিণতি: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উইল্‌কিনসন পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়েছে। বিপ্লবীরা ধূম স্টেশনে একখানি মাল গাড়ীকে লাইনচ্যুত করে পথ অবরোধ করেছে, ৩৪ মাইল দূরে লাক্সকোট টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, চট্টগ্রাম-গ্রামী কলিকাতা মেইলেরও গতিরোধ করেছে। পুলিশ আর্মারী ও অস্ত্রাগার দখল হয়েছে, শহরের শেতাঙ্গ সমাজ এই হঠাৎ আক্রমণে ভয়ে আতঙ্কে পলায়নোদ্যত সহর সম্পূর্ণ অরক্ষিত সরকারী মহলে সর্বত্র ভয়, ও অনিশ্চয়তা, পুলিশ বা মিলিটারীর কোন তৎপরতা কোথাও নেই। এই কর্ম-সূচীকে সার্থক রূপদানে শিক্ষক সূর্যসেনের অনন্য সংগঠন প্রতিভা ও দুর্জয় রণনীতির পরিচায়ক। তারপরেও দেখা গেছে জালালাবাদ যুদ্ধে ৬০ জন যুবক ও কিশোর সেদিন ইস্টার্ণ রাইফেল্স বাহিনী ও সুর্মাভেলী বাহিনীকে অবিরাম ও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণে পর্যুদস্ত করেছে। কর্নেল ডেলামিথের বিপুল বাহিনীও রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে কিন্তু সেনাপতি লোকনাথ বলের প্রচণ্ড বিক্রমে ও সাহসে এই বিপুল সশস্ত্র বাহিনী পরাজিত হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর কোয়েপাড়া গ্রামের দলের একান্ত সহায়ক বিনয় সেনের আশ্রয় কেন্দ্রে রচিত সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের দ্বিতীয় কর্মসূচীও প্রমাণ করে তাঁর রণ-নীতি কী গভীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিচক্ষণ-তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। ১৮ই এপ্রিল সাফল্যের স্বর্ণশিখর আরোহণ করার পর যদি হঠাৎ তাঁর দলের দুজন নেতা অন্তর্ধান না করতেন এবং শহর থেকে সংবাদ সংগ্রহে প্রেরিত বিপ্লবীরা যদি ব্যর্থ না হতেন তবে হয় ত পৃথিবীর বুকে চট্টল সশস্ত্র বিপ্লবের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হত। কিন্তু কী হতে পারত সেটা ইতিহাসের বিচার্য বিষয় নয়, যা ঘটেছে তাই নিয়েই ইতিহাস। মাষ্টারদার প্রত্যাশা ছিল চট্টগ্রামের সফলক্ষেত্রে দেশের অগ্নি শিশুরা যে রণডঙ্কা ধ্বনিত করবে সারা ভারতের প্রান্তরে প্রান্তরে তা ছড়িয়ে পড়বে। এখানের বিপ্লবী কর্ম-প্রেরণায় ঢেউ দূরদূরান্তরের সমধর্মী বিপ্লবী প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগাবে। আর তারই পরিণতি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে একদিন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করবে।

মাষ্টারদার জীবনের ঘটনাবলীই সাক্ষ্য দেয় তাঁর কর্মকৃতি কেবল চট্টগ্রামেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবের পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। আসাম ও বেনারসের বিপ্লবী নির্মল সেন ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মাতা বহন ক'রে নিয়ে গেছেন সুদূর ব্রহ্মদেশে।

সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতা তাঁর চরিত্রের আর একটি বিশেষ দিক। চট্টগ্রাম বিদ্রোহের চরম ক্ষণ নির্বাচনে সেই বিচক্ষণতা প্রকাশ পেয়েছে, ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশব্যাপী আইন অমা-ন্যের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় মাষ্টারদাও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করলেন যদি আমরা এ সময় চুপচাপ বসে থাকি তবে পুলিশের সন্দেহ হবে নিশ্চয় আমাদের কোন গোপন দুর-ভিসন্ধি আছে, তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঘোষনা করলেন ২১ শে এপ্রিলের পর তাঁরা সত্যাগ্রহ করবেন। সরকারী কর্মচারী-দের বিভ্রান্ত করে ১৮ ই এপ্রিল রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা ইংরেজ সর-কারের অধীনতা পাশ থেকে চট্টগ্রামকে স্বাধীন করবার সঙ্কল্প নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। একই মুহূর্তে আক্রান্ত হল—১। নিজাম পল্টনস্থ সরকারী অস্ত্রাগার ২। রেলওয়ে অক্সিলিয়ারী বাহিনীর অস্ত্রাগার।

৩। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস।

৪। রেললাইন।

চট্টলার শ্যামল উপত্যকায় সেদিন যে শোনিতাপ্লুত ইতিহাস রচিত হয়ে-ছিল সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার সময়োচিত সিদ্ধান্ত ও সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম তার গতি-পথকে সাফল্যের দ্বারে উপনীত করে দিয়েছিল।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানের পর পুলিশ যখন চট্টগ্রামের প্রতি ঘরে ঘরে নারী-বৃদ্ধ-শিশু নির্বিশেষে সকলের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের ঝড় তুলেছে তখনও তাদের দৃষ্টি অন্যত্র কেন্দ্রীভূত করার জন্য তিনি চট্টগ্রামের বাইরে কয়েকটি কাজে মনোনিবেশ করেন। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট ডুনো এবং ঢাকার পুলিশ সাহেব এলিসনকে হত্যা এই সার্থক পরিকল্পনার অন্তর্গত। চট্টগ্রামের এক গুপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র হতে তিনি এই পরিকল্পনাকে রূপ-দান করেন।

তাঁর সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে দক্ষতা চট্টগ্রামকে একবার বিরাট দাঙ্গাহাঙ্গামার হাত থেকেও বাঁচিয়েছিল। সেবারে চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেসের একটি নির্বাচনে সূর্যসেন মনোনীত সকল প্রার্থীই জয় লাভ করেন, পরাজিত নেতারা হাঙ্গামা করে এই গ্লানির প্রতিশোধ নিতে চাইল। ফলে মাষ্টার-দা মাথায় গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হলেন। বিপ্লবীরাও মাষ্টারদার রক্তপাতের প্রতিশোধ গ্রহনে সঙ্কল্পবিকর। দু'পক্ষের পরস্পর রোষাগ্নির মধ্যে সমস্ত চট্টগ্রাম সহরে একটা বড় রকমের দাঙ্গার আশঙ্কা দেখা দিল। সেদিন সেই সঙ্কট মুহূর্তে সূর্যসেনের সময়োচিত সিদ্ধান্ত একটি জেলাকে এক বিরাট আত্মক্ষয়ী সংঘর্ষের কবল থেকে রক্ষা করে। আহত সূর্যসেন দৃঢ়কণ্ঠে চট্টগ্রামের তরুণ সমাজকে সম্বোধন করে বললেন—"আজ এই সঙ্কটমুহূর্তে প্রকৃত শত্রুকে চিনে নিতে ভুল করো না। নিজেদের মধ্যে পরস্পর শত্রুতার সংগ্রামের শক্তি পঙ্গু হবে। তাতে শত্রুপক্ষেরই সুবিধা। আমাদের প্রকৃত শত্রুর বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও। তাতেই আমার রক্তের প্রকৃত প্রতিশোধ গ্রহন করা হবে।' তাঁর এই সময়োচিত সিদ্ধান্ত চট্টগ্রামকে এক অবাঞ্ছিত রক্তস্নানের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে।

[ক্রমশঃ]

শহীদ কানাইলাল

রণজিৎ কুমার সেন

একটি অকুতোভয় প্রাণ ও একটি নির্ভীক চরিত্রের জীবন বলতে যা বোঝায়, শহীদ কানাইলাল ছিলেন তাই! স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ছিল তাঁর জীবন-পাথেয় আর গীতা ছিল তাঁর অন্যতম প্রেরণা। সে-যুগে তরুণ বাঙালীর উদ্দেশে বজ্রকণ্ঠে হাঁক দিয়ে স্বামীজী বলেছিলেন: 'মানুষ হও, বীর হও। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর তোমার একমাত্র উপাস্য দেবতা হলো স্বদেশ-জননী। তোমার চারদিকে যেসব অসংখ্য দরিদ্র, অশিক্ষিত ও ম্লানমুখ লোক রয়েছে, তাদের সেবাই ভগবানের সেবা, তোমার আসল ধর্ম। তোমার জীবন তোমার নিজের সুখের জন্যে নয়, তোমার জীবন হলো মাতৃ-পূজার বলি। আজ তোমার দেশ চায় সেই বলি।'

স্বামীজীর আদর্শে সেদিন তরুণ বাঙালীদের মধ্যে একদল ছেলে নিজেদের উৎসর্গ করলো সমাজের কাছে। তখন পর্যন্ত দেশের কাজ বলতে সমাজ সেবাই বোঝাতো। সেদিনের সমাজ-কর্মে উৎসর্গীত তরুণদের বিশেষতম একজন ছিলেন কানাইলাল দত্ত। যেমন ছিলেন সত্যাশ্রয়ী, তেমনি ছিলেন দেশব্রতী; তাই বিশ্বাসঘাতক আর দেশদ্রোহীদের কখনও তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি, ক্ষমা করতে পারেন নি কারাগার জীবনে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে। বললেন: 'এই জেলের ভিতর বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যা ক'রে আমরা এমন একটা আদর্শ রেখে যাবো, যাতে ক'রে এদেশে আর কোনো বিশ্বাসঘাতকের জন্ম না হতে পারে।'—তাঁর আর সত্যেন্দ্রনাথের রিভলবারের গুলিতে একসময় প্রাণ দিল নরেন গোঁসাই। রাজসাক্ষী হয়ে দলের কথা ফাঁস করে তাদের বিপ্লবী কেন্দ্রকে পুলিশের চোখে মেলে ধরবে নরেন গোঁসাই, এটা ছিল কানাইলালের কাছে অসহ্য। তাই তার জবাব হলো রিভলবারের গুলি।

বিচারে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে দাঁড় করানো হলো তাঁকে। জজ প্রশ্ন করলেন: 'এই পিস্তল তুমি কোথা থেকে পেলে?'

কানাইলাল বললেন: 'ক্ষুদিরামের আত্মা এসে আমাকে দিয়ে গেছে।'

পুনরায় জজ জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারো?'

এবারও কানাইলাল নির্ভিক কণ্ঠে বললেন: 'সে-প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় নরেনকে হত্যা করেছি, এর মধ্যে আর দ্বিতীয় কেউ নেই।'

জজের বিচারে ফাঁসির হুকুম হলো কানাইলালের। ১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর। চিরহাস্যময় কানাইলাল কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করে হাসিমুখে

গিয়ে দাঁড়ালেন ফাঁসির মঞ্চে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'য়ে গেল। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্লচাকীর পর দেশের কাছে কানাইলাল সেদিন যে অমর আদর্শ রেখে গেলেন, আজও তার তুলনা নেই।

তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিন। পিতার কর্মস্থল বোম্বাইতে তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয় মারাঠা ছেলেদের সঙ্গে হেসেখেলে। বালাকাল থেকেই তিনি ছিলেন গরীবদের প্রতি সমব্যথী ছিলেন, তেমনি ছিলেন সমদর্শী ও দৃঢ়চেতা। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডুপ্লে কলেজে পড়বার জন্যে কানাইলাল আসেন চন্দননগরে, এবং 'সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়' নামে এখানকার একটি সমাজসেবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯০৫ সালে হঠাৎ দেশের মধ্যে যে নতুন ভাবের জোয়ার আসে, তার তরঙ্গ এসে চন্দননগরকেও এক-সময় ভাসিয়ে নেয়। লর্ড কার্জন বাঙালীর সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে এসময়ে বাংলাদেশকে আইনের সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত করলেন! এই বঙ্গভঙ্গ রোধ করবার জন্যেই প্রথম সেদিন দেখা দেয় স্বদেশী আন্দোলন। রাখীবন্ধন উৎসব করে এবং দেশাত্মবোধক গানে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করে রবীন্দ্রনাথ সেইদিন এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন। পার্কে, ময়দানে, সংবাদপত্রে কার্জনবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি। সমিতির বন্ধুদের সঙ্গে কানাইলাল পথে পথে শোভাযাত্রা করে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে বিলেতী বর্জনের কথা প্রচার ক'রে বেড়াতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তরুণ বাঙালীর মনে দেশোদ্ধারের এক নতুন সঙ্কল্প জেগে উঠলো। বাঙালীর সমাজসেবার মধ্যে সেই প্রথম এলো রাজনৈতিক চেতনা। প্রকাশ্যে পুলিশের লাঠি আর বেয়নেটও তখন সারাদেশে উদ্যত হয়ে উঠতে দেরী হলো না।

কানাইলালের গুরু ছিলেন ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়। তাঁর পরিচালনায় কয়েকজন বন্ধুসহ কানাইলাল দেশ-বিদেশের ইতিহাস আর রাজনীতি আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, অস্ত্রচালনা এবং বন্দুক ছোড়াতে অল্পদিনেই পারদর্শী হয়ে উঠলেন। কানাইলালের ভয়ে চটকলের মাতাল সাহেবরা সতর্ক থাকতো। শ্রীঅরবিন্দের 'বন্দেমাতরম' আর বিপিনচন্দ্রের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকা দুটি কানাইলালের মনকে যেন তখন অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল।

সে সময়ে বাঙালী হিন্দু ছেলেদের মুখে মুখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি ছড়িয়ে পড়ায় ইংরেজ শাসকেরা সচকিত হয়ে উঠলেন, লক্ষ্য ক'রে দেখলেন মুসলমান ছেলেরাও উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলনে এসে যোগ দিচ্ছে। ফলে এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে বিভেদ সৃষ্টি ক'রে শাসনকার্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, তার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন ইংরেজ-শাসকেরা। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের পক্ষে এই সরকারী চাল বুঝতে অসুবিধে হলো না। সুতরাং তাঁরাও উঠে পড়ে লাগলেন শাসকের বিরুদ্ধে লোকের মনকে বিপ্লবের দিকে আকর্ষণ করতে।

ইতিমধ্যে খবরের কাগজে দুটি সংবাদ চোখে পড়লো। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন সাহেবকে এবং কুষ্টিয়াতে পাদ্রী হিকেনবোথামকে লক্ষ্য ক'রে কারা গুলি ছুড়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে তখন স্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

কলকাতায় বারীন ঘোষদের গুপ্ত-সমিতি তখন খুব জাঁকালো। কানাইলাল চন্দননগরের সম্পর্ক ত্যাগ ক'রে চ'লে এলেন কলকাতায় মুরারীপুকুর বাগানের আড্ডায়। গুপ্ত এই বোমার আড্ডায় এসে তিনি বিপ্লবের কাজে তৎপর হয়ে উঠলেন। কিছুদিনের মধ্যে তাঁকে পাঠানো হলো চট্টগ্রামে কুলীদের নিয়ে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে। সেখানকার কাজ সেরে আবার ফিরে এলেন কানাইলাল মুরারীপুকুর বাগানে। বরিশালেও তখন বিপ্লবের আগুন জ্ব'লে উঠেছে।

সেই একই সময়ে কিংস্‌ফোর্ড সাহেবকে হত্যা করবার জন্যে ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে পাঠানো হলো মজঃফরপুরে। কিন্তু কিংস্‌ফোর্ডের বদলে ভুল করে তাঁরা হত্যা করলেন দুজন ইংরেজ মহিলাকে। গ্রেপ্তার হলেন প্রফুল্ল চাকী। নিজের রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করলেন প্রফুল্ল চাকী আর ফাঁসিতে প্রাণ দিলেন ক্ষুদিরাম।

মুরারীপুকুর বাগানের বোমার কারখানা তখন পুলিশ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছে। হাতকড়ায় বন্দী তখন বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমেন্দ্র ঘোষ এবং আরও অনেকে। এই বোমার কারখানার দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল গোপীমোহন দত্ত লেনে। এখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় কানাইলালকে। সঙ্গে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও নরেন গোঁসাই। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এই বিপ্লবীদের মন্ত্রগুরু। সেদিনের এই বোমার মামলা আজ ঐতিহাসিক ঘটনা।

কারাগারে পুলিশের অনেক চেষ্টায় বিপ্লবীদের দল থেকে একজন রাজসাক্ষী হলো, সে আর কেউ নয়, নরেন গোঁসাই। বড়লোকের ছেলে, চরিত্রেও কিছু গলদ ছিল, হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় এসে পড়েছিল বিপ্লবীদের সংস্পর্শে। বারীন ঘোষ ভুল করেছিলেন তাঁকে দলে নিয়ে। সেই নরেন গোঁসাইই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুভয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এই বিশ্বাস-ঘাতকতাকে বরদাস্ত করতে পারলেন না কানাই-

লাল। তার ফলে যা হবার তাই হলো। কানাইলালের রিভলবারের গুলি পৃথিবী থেকে চিরদিনের মতো সরিয়ে দিল নরেন গোঁসাইকে। ফাঁসি হলো কানাইলালের। ১৯০৮ সালের ১০ ই নভেম্বর একটি অকুতোভয় নির্ভিক প্রাণ ফাঁসির দড়ি গলায় পরে ক্ষুদিরামকে স্মরণ ক'রে হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন বাংলার মাটি থেকে।

আজকের সাহিত্য

নাট্যকার মন্মথ রায়

একটা যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের এই সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। অস্তিত্বের সঙ্কটের মধ্যে আমরা দিন কাটাচ্ছি। খাদ্য সঙ্কট, বস্ত্র সঙ্কট, যানবাহন সঙ্কট, ভেজালের বিষ, কালোবাজার, মজুতদারী, মুনাফাবাজি, শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সরকারী ও বেসরকারী কর্মক্ষেত্রে ধর্মঘট ও লক্-আউটের হিড়িক, প্রশাসনে দুর্নীতি সব কিছু মিলে সমাজকে নরক যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছে। ধর্ম ও নীতিগত মূল্যবোধগুলি জাতীয় জীবনে ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, রক্তাক্ত বিপ্লবের ছায়া নেমেছে। আজ এই সময়েই আমাদের সাহিত্য সম্মেলন বসেছে এবং বলা বাহুল্য সমাজ থেকে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। কাজেই সাহিত্যিকের দায়-দায়িত্ব এই অস্তিত্বের সঙ্কটে অবশ্যই আলোচ্য।

অথচ প্রাক স্বাধীনতা যুগে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশকর্মীরা এক হাতে গীতা আর এক হাতে বোমা নিয়ে আত্মত্যাগে মেতে উঠেছিল। সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের দরিদ্র নারায়ণ সেবার কর্মযজ্ঞে, ঋষি অরবিন্দের মহাজীবনের অগ্নিমন্ত্রে, নেতাজী সুভাষ-চন্দ্রের দুর্দমনীয় মুক্তি কামনায় তাঁদের সামনে ছিল স্বাধীন ভারতে উজ্জ্বল সূর্য্যের দিব্যালোক। স্বাধীনতার সেই সূর্য্য উঠেছে, কিন্তু কালোমেঘে ঢাকা পড়ে গেছে আজ।

স্বাধীনতার ছাব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত হ'ল কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ভোরও এখনও আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। বরং দেখছি, ধনী হয়ে যাচ্ছে আরও ধনী, গরীব হয়ে যাচ্ছে আরও গরীব। এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধনলাভ এতই বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের কাছে দেশ নেই, দেশবাসী নেই, দেশাত্মবোধ নেই, বিবেক নেই, মনুষ্যত্বও আর নেই। এরই ফলশ্রুতি কালোবাজার, মজুতদারী, মুনাফাবাজী এবং ভেজাল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতেও এরা হাত করেছে এবং দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া বৃদ্ধিতে অতিষ্ঠ শ্রমিক ও কৃষক এবং মধ্যবিত্ত সমাজের বেতনাদি বৃদ্ধির দাবীতে এত আন্দোলন, এত ধর্মঘট, এত বিক্ষোভ। অতিরিক্ত নোট ছাপিয়ে সরকার এই অসন্তোষ দূর করতে গেলেও মুদ্রাস্ফীতি তার অপরিহার্য অশুভ ফল। এই পাপচক্র একটা নিদারুণ অর্থনৈতিক সমস্যা।

এর ওপর রয়েছে ভয়াবহ বেকার সমস্যা। শিক্ষা-দীক্ষা সত্ত্বেও সহস্র সহস্র বেকার যুবক কর্মহীন হয়ে জীবন যন্ত্রণায় জর্জর। পেটের ক্ষুধা কোন বাধা মানেনা। ক্ষুধার্তের কাছে ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া বৃথা এবং এই নিদারুণ পরিস্থিতিতে মহাজীবনের আদর্শ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষের চিত্তাহিত জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হতে চলেছে। এই অন্ধকারে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে। ধর্ম, ন্যায় ও নীতি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সবারই আজ এক চিন্তা, অর্থ। এবং এই অর্থই অনর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদ্য পরলোকগত চারণকবি বিজয়লালের একটি কবিতা বার বার মনে পড়ছে :—

"উন্মত্ত অসুর আজ ধরনীরে করেছে নরক,
সেবার মুখোস পরা রক্ষকেরা হয়েছে ভক্ষক।
অর্থ হলো সর্বগ্রাসী, বিশ্বগ্রাসী লোভ দাবানল,
নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় মানুষের সমস্ত মঙ্গল।
প্রাণের মহিমা কোথা? জীবনের চিতাভস্ম পরে,
কাকনের জয়ধ্বজা দিকে দিকে উড়ে গর্ব্ব ভরে।"

এই যুগ সন্ধিক্ষণে আজ বঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তত্রিংশ অধিবেশনের উদ্বোধন ক'রে সমবেত সাহিত্য সেবীদের স্বাগত জানিয়ে এই কামনা রাখছি :—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।"

এবং প্রার্থনা করছি, আমাদের শুভবুদ্ধি ফিরে আসুক। আমরা যেন এই সঙ্কট অতিক্রম করে জয়যুক্ত হই। আমি আবার বলছি আমাদের সাহিত্য আজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে থাকতে পারেনা। জীবননিষ্ঠ সাহিত্যের আজ কি ভূমিকা হবে, সাহিত্যের আজ কি জীবন দর্শন হবে—আজ এই সাহিত্য সম্মেলনে তার আলোচনা বা দিকদর্শন হবে—এ আশা রাখছি। সাহিত্য মানুষ গঠন করে, সমাজ গঠন করে, জাতি গঠন করে। সাহিত্যই আজ নতুন সমাজের জমি তৈরী করবে, মহাজীবনের আদর্শ দেবে। ভারতকে আবার মহাভারত করবে।

(৩৭তম বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে নাট্যকার মন্মথ রায়ের উদ্বোধনী ভাষণ)

দিল্লীর কড়চা

কালীকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

দিল্লির কথা সবাই শুনতে চান। কারণ এখন যা অবস্থা তাতে সবারই টিকি বা টাক দিল্লীতে বাঁধা বা বন্ধক দেওয়া। অর্থাৎ স্বার্থ। স্বার্থ প্রাণের, স্বার্থ মানের। আর আছে দিল্লির সম্বন্ধে কিছুটা মোহ। বোধ হয় তারই রূপক অভিব্যক্তি "দিল্লি-কা-লাড্ডু-যো খায়া অওর যো নেই খায়া"—পস্তাচ্ছে সবাই। পস্তাতেই হয়। সত্যিকারের লাড্ডুর চলনও সত্যি সত্যি দিল্লিতে খুবই—সবরকম ক্রিয়াকর্মে, শুভাশুভ অনুষ্ঠানে, গৃহপ্রবেশে, বিপণ্যারম্ভে, নববর্ষে বা দেওয়ালী উৎসবে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধ-বাসরে দিল্লীর অপরিহার্য্য অর্ঘ্য সত্যিই লাড্ডু। এবং তা খেলেও পস্তাতে হয় কারণ তা হয় দাঁতের নয় জাঁতের যন্ত্রনা আনে—না খেলেও পস্তাতে হবে অপাঙক্তেয় থাকার মর্মবেদনায়।

কাজেই মনে পড়ছে দিল্লির সম্বন্ধে অনেক মজাদার কথা। সম্পাদক মশাই আমার উপর ভার দিয়েছেন—'দিল্লির কড়চা' পরিবেষণ করবার জন্ত। মনে হয় বিশেষ ক'রে এইজন্তে যে আমাদের এই সুবিশাল দেশ, পৃথিবীর এই বৃহত্তম গণতন্ত্র, যার জন্তে আমাদের গর্ব্বের সীমা নেই এবং কথাটা আমরা বিশ্বের বিখ্যাত বিখ্যাত লোক ও বিখ্যাত বিখ্যাত জাতির কাছ থেকে কেবলি শুনে আসছি এবং অসীম গর্ব্ব অনুভব ক'রছি। সেই দেশের আটান্ন কোটি লোকের জীবন শুধু নিয়ন্ত্রিত নয় প্রচণ্ড ভাবে প্রভাবিত ক'রছে দিল্লি—কি ভাবে—কতখানি এবং কেনই বা, তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সমাজ ও দেশের কাছে সেটা একটা দরকারী তথ্য। এই ভেবেই সম্পাদক মশাই আমাকে ভারটা নিতে অনুরোধ ক'রেছেন।

কেউ হয়ত বলবেন আমরা অতি সাধারণ দরিদ্র ছাপোষা মানুষ—কি হবে আমাদের দিল্লির কথা জেনে। গ্রামে ঘরে দূরে একান্তে আমাদের জীবন কি ভাবেই বা দিল্লি প্রভাবিত ক'রবে? আমি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি, ক'রবে। গ্রামে থাকেন কেরোসিন তেল ত' চাই। কোনও সভাসমিতি উৎসব অনুষ্ঠানে হ্যাজ্যাগ্ জ্বালাবার জন্ত নয়। সূর্য্য ডুবলেই দুটো হারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়ে'ত নিতে হবে—রান্না বান্না, খাওয়া দাওয়া এবং তার চেয়ে বেশী জরুরি ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা কিংবা রোগীর শুশ্রূষা কিংবা এদিক ওদিক যাওয়া আসার জন্ত। আমাদের নিজেদের দেশে যথেষ্ট কেরাসিন তেল কোন দিনই জন্মায় না। কাজেই পৃথিবীর যে সব দেশ আমাদের তা' দিতে পারে তাদের সঙ্গে ব্যবস্থা করা, এবং আপনার কাছ পর্য্যন্ত নিয়মিত পৌঁছে দেওয়ার জন্ত আমি আপনি সবাই দিল্লীর দিকে চেয়ে আছি। তাদের যে ব্যবস্থা হ'চ্ছে ও হবে তার দোষ ত্রুটী নীতি বা দুর্নীতি আপনার মনের উপরেও প্রভাব বিস্তার ক'রবে—বিতৃষ্ণার, বিরক্তির, বিক্ষোভের। আপনি সহরে থাকেন, শিক্ষিত মানুষ। আগে আগে বহুপ্রশংসিত অনেক বিদেশী ছায়াছবি দেখেছেন, দেখতে ভালওবাসেন। বেশ কিছু বছর ধ'রে এখন আর সে রকম ছবি আসছেনা—আসা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে। একটা হতাশায় আপনার মন আচ্ছন্ন। দিল্লী থেকে সঞ্চার ও প্রসারণ মন্ত্রকের একটা ঘোষণা যে এবার ফিল্ম ফ্যাইন্যান্স কর্পোরেশন একটা নতুন নীতি গ্রহণ ক'রেছে যে বাইরের দেশের বাছাবাছা ফিল্ম তারা কিনবে এবং ভারতের বহু স্থানে তাদের নিয়মিত প্রদর্শণ হবে। স্বভাবতঃই আপনি পুলকিত। গত ১৫ই আগষ্ট দিল্লীর লালকেল্লার প্রাঙ্গনে একটা টাইম ক্যাপস্যুল মাটীর অনেক নীচে পুঁতে দেওয়া হ'য়েচে—ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত স্বাধীন ভারতের অগ্রগতির ইতিহাস ও তার সঙ্গে জড়িত বহু মনীষী, চিন্তাবিদ্ ও কর্ম্মীর নাম এবং বহুরকম বৈজ্ঞানিক জিনিষের নমুনা সেই

ক্যাপস্থলের মধ্যে রাখা হ'য়েছে ভবিষ্যতের মানুষের জন্য। প্রখ্যাত আমেরিকান জ্যোতিষী জেনি ডিক্সনের ভবিষ্যাদ্বাণী যদি অভ্রান্ত হয় তবে ১৯৮০ সালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে এবং তা' হবে ভীষণতম পরমাণবিক অস্ত্রের যুদ্ধ; যাতে সারা বিশ্বের লোকসংখ্যার দশভাগের একভাগ হয়ত মাত্র জীবিত থাকবে। ধরুন সেই সারা বিশ্বের মাত্র আটত্রিশ কোটী ধ্বংসোত্তর জীবিত মানুষের মধ্যে যদি আপনি একজন হন তখন সেই লালকেল্লার টাইম ক্যাপস্যুলই হবে অতীতকে জানবার এবং জানাবার আপনার একমাত্র উপায়। কিন্তু সেই ক্যাপস্থলের মধ্যে অনেক মিথ্যা ও বিকৃত সত্য নাকি স্থান পেয়েছে শাসক গোষ্ঠীর নিজস্ব স্বার্থে। তাই ১লা মে অর্থাৎ কিম্ব "মে দিবসে" এইবার কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসারদের কনফেডারেশন আর একটী টাইম ক্যাপস্যুল ভূ-প্রোথিত ক'রছেন এবং তার মধ্যে থাকবে এই স্বাধীনতা অর্জ্জনের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আঠাশ বৎসর ধ'রে শাসকগোষ্ঠীর অপরিমেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের এবং অযথা, অনাবশ্যক রাশি রাশি কথার বাজে খরচার ইতিহাস। বঞ্চনার দলিল, ধাপ্পার দলিল, মিথ্যার দলিল, জালিয়াতির দলিল। কেমন লাগছে? মনে হ'চ্ছেনা তবে বোধ হয় দেশে গণজাগরণ আসছে—সত্যিকারের সাম্যবাদ আসছে। আশায় যেন বুক ভ'রে উঠছে না? দাঁড়ান, দাঁড়ান। গণতন্ত্রও আছে, মিসাও আছে—ডি,আই, আরও আছে। বিচার পদ্ধতিও আছে—মিসা, ডি, আই আর-এ ধরা হাজার হাজার যুবক যুবতী ও কচি ছেলে মেয়ে অসহায়তার যূপকাষ্ঠে দেশময় জেলে জেলে আটকানো বিনাবিচারে বিনাপ্রমাণে কয়েক বছর ধ'রে বন্দী। বেশী উত্তেজিত হবেন না এখনি। আপনি একজন ক্রীড়ারসিক। ভারতীয় ক্রিকেট টিম আমন্ত্রিত হ'য়ে বিদেশে সফরে যাবার ক্লিয়ারেন্স অর্থমন্ত্রক দিল্লী থেকেই দেবে তবেই তারা যেতে পারবে কারণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রশ্ন। কতজনের দল যাবে-যাদের নেওয়া হ'লো এবং যাদের বাদ দেওয়া হ'লো তা আপনার মনোমত হ'ল কি? কিন্তু দুঃখ ক'রে লাভ নেই—সব নির্ব্বাচন ও চেষ্টা এর পরেও চূড়ান্ত কৃপাবং দিল্লীর অর্থমন্ত্রকের হাতে। তেমনি কোনও বিখ্যাত বিদেশী খেলোয়াড়দের দলকে আমাদের দেশে আমন্ত্রণ ক'রে আনা ও তাদের পাওনা অর্থের কতখানি বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্ত্তিত ক'রতে দেওয়া যেতে পারবে সেও দিল্লীর অনুমোদন সাপেক্ষ—সে শর্ত্তে তারা রাজী না হ'লে আর তাদের আসা হলো না এবং আপনার নিরাশা।

দিল্লী এখন শুধু একটা শহর নয়। আসলে দিল্লী একটা শহরই নয়। যেমন শহর নয় ক্যানবারা, ইসলামাবাদ, ওয়াশিংটন, ওটাওয়া। এগুলি শহর নয়, জনপদ নয়, নগরী নয় এবং গ্রামও' নয়ই। দিল্লী একটা এ্যাবসট্র্যাকশান—একটা আইডিয়া—একটা এপিসেন্টার-অথবা একটা কন্ট্রোল টাওয়ার। তার চিত্ত রিক্ত, হৃদয় নির্দ্দয়, মস্তিষ্ক শুষ্ক। তাই মানসিং রোডের পুনর্বাসন মন্ত্রকের বাড়ীর সামনে আজ তিনবছর ধ'রে প্রায় দু'হাজার পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পড়ে আছে। অনাহারে, অখাদ্য আহারে, বসন্ত কলেরায়, গাড়ি চাপা প'ড়ে কত যে মরেছে, পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে এবং সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপে বাধ্য হ'চ্ছে অথচ তারই কাছে রাষ্ট্রপতি ভবনে এবং ফাইভ ষ্টার হোটেলে প্রায় প্রতিদিনই ব্যাঙকুয়েট বা ভোজ উৎসবে রাশি রাশি মহার্ঘ খাদ্যবস্তু ফেলে ছড়িয়ে অপচয় করা হচ্ছে। দক্ষিণের প্রত্যন্তসীমায় রামেশ্বরম ধনুষ্কোডির রেললাইন যে উদ্বেলিত সমুদ্রগ্রাসে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার পুনর্নির্মাণ হবে কিনা—কবেই বা হবে, কতখানি হবে—জানে দিল্লী। উত্তুঙ্গ হিমালয় শীর্ষে-ভূস্বর্গ কাশ্মীরে হজরৎবালের পবিত্র কেশ হঠাৎ অন্তর্হিত; তার পুনরুদ্ধার দিল্লীর দায়িত্ব। দক্ষিণ আমেরিকার চিলিতে সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যুত্থান হ'য়ে এখন যে শাসন-ব্যবস্থা স্থাপিত হ'লো তাকে স্বীকৃতি দেওয়া চ'লবে কি চ'লবেনা—আগে দিল্লীর কথা শুনে ব'লতে হবে—তার আগে নয়। ব্রহ্মদেশের মণিপুর রাজ্যের কোনও উপনির্ব্বাচন বা ভারত মহাসাগরের জনহীন দ্বীপের 'ডিয়েগো গার্সিয়ার' সামরিক গুরুত্ব জানবার ও তাদের সম্বন্ধে একটা মতামত গঠন করবার জন্য দিল্লীর দিকে চেয়ে থাকতে হবে। বোম্বাইয়ের কাছে আরব সাগরের গভীরে "সাগর সম্রাট" সমুদ্রের তলদেশে পেট্রোলিয়াম তেলের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছে। তার পরিমান কত এবং ভবিষ্যৎ কি দিল্লীর কাছ থেকে জেনে আমাদের স্বস্তি। খুব উচ্চমানের মিহি ও সুগন্ধি বাসমতী চাল আরব দেশের লোকেদের খুবই প্রিয় হ'য়ে উঠেছে এবং তা রপ্তানিও করা হবে প্রচুর পরিমানে—বিনিময়ে আমাদের অতি প্রয়োজনীয় তেলের দাম মিটানো যাবে, দিল্লী থেকে এই সংবাদ যেমনি জানানো হ'লো এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নিরন্ন দেশবাসীর অমনি অস্বস্তি ও অশান্তি। যদিও সে চাল কোনওদিন আমার আপনার রান্নাঘরে ঢুকতো না। যাদের 'কিচেনে' ঢোকে তাদের তখনও ঢুকবে কিলো ১০ টাকা ১৫ টাকা হলেও। এমন কি এই যে "নিশানার" পাতায় আপনারা দিল্লীর সংবাদ প'ড়ছেন নানা পত্র পত্রিকায়, তার আয়ুর নিশ্বাস বায়ু ঐ দিল্লী থেকেই বহুলাংশে আসে—নিউজপ্রিন্টের কোটা এবং ডি, এ ডি পির বিজ্ঞাপনের রূপ ধ'রে।

জ্ঞানোদয়, কর্ম্মোদয়, মনোদয় বা মানোদয় প্রভৃতি অ-রাজনৈতিক জনউন্নয়নমূলক সংস্থা যাই হোক না কেন তার উদ্বোধন, উদ্বহণ বা উৎসর্গীকরণেও চাই দিল্লীর আশীর্ব্বাদ। আমার অভাব অভিযোগ, বিরোধ বিক্ষোভ জানাতেও দিল্লীই আসা চাই।

এখন রাজধানীতে হর্ষ ও বিষাদের দুটী তরঙ্গই চ'লছে। বাংলাদেশের ফিল্ম ফেষ্টিভাল খুবই আকাঙ্খিত আনন্দের তরঙ্গও যেমন তুলেছে—ওরা মেয় ভারতবন্ধের ডাক—সব কটি বামপার্টি সমন্বয়ের এবং প্রস্তাবিত সারা ভারত রেল ধর্ম্মঘটের নোটিস দুই মে ডেকে একটা ভয় ও বিষাদের তরঙ্গও তুলেছে একই সঙ্গে। *

* বিলম্বে প্রাপ্ত।

বিপ্লবীর দৃষ্টিদীপে রবীন্দ্রনাথ (২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

রবীন্দ্রনাথের এ বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা। সেইজন্যই রবীন্দ্রনাথকে যেমন চিরদিন শ্রদ্ধা করেছেন দেশের বিপ্লবীরা আবার তেমনি রবীন্দ্রনাথও চিরকাল ভালবেসে এসেছেন দেশের এই তরুণ তাপসদের।

তিনি দেখেছেন, বছরের পর বছর বহু নির্য্যাতন, বহু দুঃখ, বহু মৃত্যুর উজান ঠেলে সমুখের দিকে যারা পথ চলেছেন তারা ভারতবর্ষেরই এই তাপসের দল। কিন্তু তবু মানবের মুক্তি তীর্থে তার জয়যাত্রা সম্পূর্ণ হল না। অন্ধকারসমুদ্রে আলোকের তপস্যা তার আজো শেষ হ'ল না। প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যতমূল্য সেকি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সেকি আনিবে না
দিন।

ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ

রঙ্গময় শূর

ঢাকার জীবনে অবিস্মরণীয় একটি দিন। ১৯২৬ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শুভ পদার্পণ ঢাকা শহরে। সে কী উন্মাদনা সেদিন। উৎসাহ উদ্দীপনায় ফেটে পড়ছে—শিশু বৃদ্ধ যুবা নর নারী। সেদিন ভোর থেকেই সমস্ত শহরটা রাস্তায় নেমে পড়ছে। আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বিশ্বকবিকে আমরা আপন করে পাব, তাঁর মুখ থেকে অমৃত বাণী শুনব—উত্তেজনায় ছাত্র মহলে অভূতপূর্ব্ব এক প্রাণ বন্যা বয়ে গেল। রাস্তায় তোরণ উঠেছে, নতুন সাজে সজ্জিত ঢাকা, তার অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করবে কবিগুরুর উদ্দেশে।

আমাদের বন্ধুমহলের আনন্দের সীমা নেই সেদিন। বন্ধু মেজর সত্য গুপ্ত কবিগুরুর অভ্যর্থনা সমিতির সেবক বাহিনীর অধিনায়ক। নাগরিক অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারক শ্রীদারদা সেন, সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক শ্রীফনীভূষণ চক্রবর্ত্তী (বর্ত্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত চিফ্ জাষ্টিস্)

এক বিরাট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সেদিন কবিকে গার্ড-এব্-অনার জানালেন ঢাকার প্রবেশ পথে। বাহিনীতে ছিল শত শত সাইকেল-সওয়ার, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, বয়-স্কাউট, বাদ্যভাণ্ড। যে পথে কবিগুরু গেলেন তার দু'পাশে সারিবদ্ধ নরনারী দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। পথে গৃহ শীর্ষে অগণিত দর্শক মালা, ফুল বর্ষণ করলেন তাওয়াল-রাজের জুড়িগাড়ীতে আসীন কবিকে।

শিলাইদহে পদ্মার বুকে বোটে থাকতেই তিনি ভালবাসতেন। এখানে-ও তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল বুড়িগঙ্গার বুকে 'তুরাগ' নামক গ্রীন বোটে। কবির সঙ্গে ছিলেন প্রতিমা দেবী, নন্দিনী, রথীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্র

নাথ ও বিশ্বভারতীর চীন দেশীয় অধ্যাপক মিঃ সিস্।

নর্থব্রুক হলে কবির নাগরিক সংবর্দ্ধনার আয়োজন হল ৭ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে। হলে কয়েক'শ বিশিষ্টদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা হল। কিন্তু সভা সুরু হওয়ার আগেই হাজার হাজার ছাত্র ও শহরবাসী ভেঙে পড়ল সভাস্থলে। যথাসম্ভব সুযোগ করে দিতে হবে তাদের-ও। তাই মেজর সত্যগুপ্তের নেতৃত্বে আমরা স্বেচ্ছা-সেবকরা এই ভিড়ের মধ্যেই ভিতর থেকে সমস্ত চেয়ার লোকজনের মাথার উপর দিয়ে হাতে হাতে বের করে দিলাম। চেয়ারগুলি সমস্ত সরিয়ে দেওয়ার ফলে ঐ হলেই প্রায় তিন চারশ' লোকের জায়গা হয়ে গেল। অধিকাংশ লোক ভিতরে ঢুকে স্থান করে নিয়ে বসে পড়লেন, অনেকে দাঁড়িয়ে পড়লেন বাইরে বারান্দায়। এবার বেশ শান্ত পরিবেশে সভার কাজ সুরু হল। শহরবাসী বিশ্বকবির বাণী শুনলেন পরম শ্রদ্ধায়। তাঁর দর্শন পেয়ে নিজেদেরকে তারা কৃত কৃতার্থ মনে করলেন।

এর পরে বুড়িগঙ্গার তীরে করোনেশান পার্কে বিরাট জনসভা। কবিকে সেখানে আনা হল। খোলা উন্মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পেলেন সূর্য্য তখন অস্তাচল-গামী। এই বিদায় লগ্নে তাঁর কণ্ঠে-ও একটা বেদনার সুর যেন বেজে উঠল। তিনি শান্ত সমাহিত চিত্তে বহুক্ষণ ধরে বক্তব্য রাখলেন। বিশাল জনতা নীরব, নিস্তব্ধ। তন্ময় হয়ে সবাই তাঁর কথামৃতের স্পর্শ যেন অনুভব করলেন আপন আপন চিত্তে।

রোজই কবির সংবর্দ্ধনা চলল নানা প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে। দীপালি সংঘ শ্রী লীলা রায়ের নেতৃত্বে সংবর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ প্রাঙ্গনে। যুব ও ছাত্র সভা হল ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে।

দু'দিন পরে কবি সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা হল কার্জ্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে। বিরাট কার্জ্জন হল সেদিন লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান ছিল না। ঢাকার গণ্যমান্য নাগরিকবৃন্দ ছাত্র-ছাত্রী, ডাক্তার উকিল মোক্তার প্রফেসার কোন শ্রেণীর লোকই বাদ পড়ে নি। সভা মঞ্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য মিঃ ল্যাংলি ও মিসেস্ ল্যাংলি সহ প্রধান প্রধান প্রফেসাররা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দু'পাশে আসন নিয়ে বসেছেন। আমরা হলের দূর প্রান্ত থেকে দেখছিলাম। পরিপূর্ণ হলটি অধীর প্রতীক্ষায় কাল গুনছে। আমরা নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছি মঞ্চের দিকে। এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য উঠলেন কবিগুরুকে আহ্বান জানাতে। চোখের সামনে যে দৃশ্য ভেসে উঠল কোনদিন কল্পনা করিনি এ দৃশ্যের সম্মুখীন হব। মিঃ ল্যাংলি সভায় প্রথামত কবিগুরুর পরিচয় দিতে উঠে মাত্র Ladies and Gentlemen বলে শুরু করেছেন—এই দু'টা কথাই আমাদের কানে গেল। তারপর দেখলাম তাঁর মুখে কথা নেই। তিনি নির্ব্বাক হয়ে গেছেন। ঠোঁটটা শুধু কাঁপছে। পাশে ছিলেন মিসেস ল্যাংলি। তিনি তাঁর স্বামীর অবস্থা বুঝে হাত ধরে একটু নাড়া দিলেন। তাতে যেন উপাচার্য্য একটু সম্বিৎ ফিরে পেলেন। তারপর আবার শুরু করলেন—কিন্তু এবারও দু'টো কথা মাত্র, আবার স্তব্ধ নিথর। শরীর যেন কাঁপছে। অন্যপাশে ছিলেন ডাঃ রমেশ মজুমদার। ডাঃ মজুমদারে বুঝতে বিলম্ব হল না যে ল্যাংলির নার্ভ ফেইল করছে। তিনি টেনে তাঁকে বসিয়ে দিলেন। তারপর কবিগুরু দাঁড়ালেন বিশাল জনসমুদ্রের সামনে তাঁর বক্তব্য রাখতে। আমরা দর্শকরা চোখের সামনে দেখলাম, মনে প্রাণে অনুভব করলাম—কী বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী আমাদের কবিগুরু। এই বিরাট পুরুষের সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তির সামনে একজন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ প্রফেসার, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য নিজেকে যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললেন। দু'টো কথা ফুটল না মুখে। কবির গর্ব্বে আমরা গর্ব্বিত হয়ে উঠলাম। অনুভব করলাম ভারত-বাসীর আসন প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে জগত সভায়।

কবিগুরু বোটেই আছে। ওখান থেকেই তাঁকে নানা অভ্যর্থনা সভায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কবিগুরুর সেবা ও দেখাশুনা করার সব ভার নিয়েছেন সেবার সত্যগুপ্ত ও কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুবর্গ। সকাল থেকে গভীর রাত পর্য্যন্ত পালা করে আমরা এ কর্ত্তব্য পালন করে চলেছি। বোটের মধ্যে শান্তি-নিকেতনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁকে ঘিরে আছেন শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও এসে দেখা সাক্ষাৎ করে যাচ্ছেন। আমাদের মাথায় একটা মতলব এল। আমরা স্থির করে ফেললাম—এ দুর্লভ সুযোগ হারালে আমাদের চলবে না। আলাদাভাবে আমাদের একটা ইণ্টার-ভিউ নিতে হবে কবিগুরুর সাথে। কবিকে একা পাওয়া খুবই দুষ্কর। তবু আমরা যখন সব সময় অতি ঘনিষ্ঠভাবে আশে পাশে থাকছি, সময় বুঝে সে ব্যবস্থা করে নিতে হবে। সে সুযোগ এসে-ও গেল। আমাদের কথাগুলি হবে—আমরা তখন বিপ্লব-পন্থী—দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিপ্লবের পথ-ই আমরা গ্রহণ করেছি। এ কাজ চলেছে অতি গোপনে, গুপ্ত সমিতির মারফৎ। অন্য দিকে দেশ জোড়া চলেছে গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন। প্রকাশ্য রাজনীতির কর্ণধার বর্ত্তমানে গান্ধীজি। তাঁর অহিংসা মন্ত্র জনসাধারণের মনে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আমাদের আদর্শ ও পথের

ঘোর বিরোধী গান্ধীজির এই মতবাদ ও সংগ্রাম পদ্ধতি। বিশ্বের ইতিহাসে পরাধীন দেশের স্বাধীনতার সশস্ত্র সংগ্রাম আমাদের পথ নির্দ্দেশ দিয়েছে। আমরা তাই অভ্রান্ত, অটল এ আদর্শে।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষী ভারত আত্মার মূর্ত্ত প্রতীক, ঋষি, কবি, দার্শনিক, স্বাধীনতার পূজারী—তাঁর কাছ থেকে আমাদের মত ও পথের সমর্থন নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই উদ্দেশ্যে সত্যগুপ্ত একটা সুযোগ নিতে সমর্থ হওয়ায় আমরা জন কয়েক গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লাম। অন্য কেহ তখন উপস্থিত ছিলেন না। আমরা আমাদের মনের কথা তাঁর কাছে উপস্থিত করলাম। বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শের কথা তাঁর অন্তরকে যেন গভীর ভাবে নাড়া দিল। তিনি ডুবে গেলেন ভারত-আত্মার ধ্যানে। বাংলার-দুর্দ্দান্ত যৌবন বাংলার তারুণ্য চিরকালই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক চরম পন্থায় চলে এসেছে,—তিনি আমাদেরকে উপলক্ষ্য করে বাংলার যৌবন দৃপ্ত-দুর্জ্জয় পথ যাত্রাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে দিতে তিনি চিরন্তন ভারতবর্ষের আদর্শ, পৃথিবীর বিভিন্ন বিপ্লবী সংগ্রামীদের কথা অনর্গল বলে যেতে লাগলেন।

গান্ধীজির অহিংস আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি বললেন—এটা তাঁর সত্যাদর্শ, তিনি বিশ্বাস করেন এই পরম সত্য সাধনের পথে যা কিছু এর বিরোধী—অসত্য, অন্যায় তা লুপ্ত হয়ে যাবে—অর্থাৎ দেশের বুকে পরাধীনতার জগদ্দল পাথর, যা অন্যায় অসত্য, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, দেশ-আত্মার শাশ্বত সত্য উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে। এ বড় উচ্চ আদর্শ, দেশের জন সাধারণের মনে এর গভীর রেখাপাত হওয়া সম্ভব নয়। তোমরা—তোমাদের পথে চলতে এর অসম্মান করবে না। তোমরা-ও সত্যাশ্রয়ী। এ পথে জীবন যৌবন সর্ব্বস্ব নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে হতে হবে মৃত্যুঞ্জয়ী। চরম আত্মত্যাগের পথে দেশের দুর্ধর্ষ যৌবনকে আহ্বান করে নিতে হবে সাথে। এ-সত্যে যদি অটল থাকতে পার তা হলেই তোমাদের—উদ্দেশ্য সিদ্ধির স্বর্ণতীরে পৌঁছে যাবে।

নিবিড় ভাবে তাঁর কথা শোনার দুর্লভ সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। বহুক্ষণ ধরে তিনি কত কথা বললেন, আজ তার অনেকটা-ই আমরা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু আজও কানে বাজে বাংলার তারুণ্য ধর্ম্মের জয়গান সেদিন ভেসে উঠেছিল তার কণ্ঠে। আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদ পেলাম। পরম সম্বলের অধিকারী হলাম এ দুর্ধর্ষ পথ চলায়।

কবি বিদায়ের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী। অশ্রুজলে বিদায় দিতে হল অন্তরের দেবতাকে।

গোলকুণ্ডার দুর্গ

দীপেন রাহা

গোলকুণ্ডার দুর্গ।

ভারতের যে কয়টি পুরাণ—ও ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গ আছে তাঁর মধ্যে গোলকুণ্ডার দুর্গ অন্যতম। এই দুর্গ হায়দরাবাদের উপকণ্ঠে অবস্থিত। এই দুর্গ স্থাপনের পেছনে একটা গল্প আছে।

১১৪৩ সালে রাজা প্রতাপ রুদ্র দেবের রাজত্বকালে এক রাখাল বালক রাজাকে অনুরোধ জানায় পাহাড়ের উপর একটা দুর্গ তৈরী করার জন্য। আবার কারো কারো মতে ওই রাখাল বালকই—পাহাড়ের মধ্যে প্রথম হীরার সন্ধান পায়। কাহিনী যাই হোক না কেন, রাজা রুদ্রদেব পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ তৈরী করান। এবং দুর্গটির নামকরণ করেন, গোলকুণ্ডা।

'গোলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে মেষ পালক বা রাখাল বালক আর 'কুণ্ড' শব্দের অর্থ হচ্ছে, পাহাড়। দুটো শব্দ মিলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে, মেষপালকের পাহাড়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গোলকুণ্ডা বলেই এই দুর্গটি খ্যাত হয়। প্রথমে কাঁচা তৈরী হয় অর্থাৎ মাটির। পরে পাথরের দুর্গ করা হয়।

দুর্গ তৈরী করলে কি হবে। অধস্তন রাজা কৃষ্ণদেব দেব শেষ পর্যন্ত দুর্গটি নিজের আয়ত্বে রাখতে পারেননি। ১৩৬৩ সালে বাহমনী বংশের নবাব প্রথম মহম্মদশাহকে চুক্তি অনুসারে দুর্গটি প্রত্যর্পণ করেন। তারপর দুর্গটি কুতুবশাহী বংশের হাতে চলে আসে। এ ভাবে বহু হাত বদলে শেষে পড়ে দুর্ধর্ষ ঔরঙ্গজেবের হাতে। ঔরঙ্গজেব গোলকুণ্ডার ধন দৌলতের কথা শুনে প্রলুব্ধ হয়ে পড়েন। প্রথমে ১৬৫০ সালে সুলতান আবদুল্লা কুতুবের রাজত্বের সময় তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কুতুবের ছিল না।

তিনি ঔরঙ্গজেবের নিকট আত্ম সমর্পণ করতে বাধ্য হন। শুধু তাই নয় নিজের কন্যাকে ঔরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হন। অধিকন্তু গোলকুণ্ডার অমূল্য ধন সম্পদের অধিকাংশই বিজয়ীর হাতে তুলে দেন।

কথায় বলে, লোভের শেষ নেই। লোভী ঔরঙ্গজেব আবার ১৬৮৭ সালে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করেন। তখন রাজা ছিলেন আবদুল হাসানতানা। এবার কিন্তু দুর্গ দখল করতে ঔরঙ্গজেবকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। সুদীর্ঘ আটমাস ধরে তাকে আক্রমণ চালিয়ে যেতে হয়। পাথরের তৈরী সুদৃঢ় দুর্গ দখল করা সহজ সাধ্য নয়। তাছাড়া দুর্গ ছিল সুরক্ষিত। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মত ধুরন্ধরের পক্ষে উপায় খুঁজে বার করতে বেশী মাথা ঘামাতে হয় না। তিনি লোভ দেখিয়ে হাত করলেন দুর্গের অন্যতম দ্বাররক্ষী সেনাপতি আবদুল্লাখান পান্নীকে সেনাপতি পান্নী দুর্গের পূর্ব দিকের ফটকগুলো আগলাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক গভীর রাত্রে তিনি দরজা দুটো খুলে দিলেন। অজস্র শত্রু সৈন্য ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ে দখল করে নিল দুর্গ। লুটপাট করে নিল দুর্গের সম্পদ। বন্দী করল রাজা আবদুল হাসানতানাকে। ঔরঙ্গজেব রাজাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দৌলতাবাদের দুর্গে আটকে রাখলেন চৌদ্দ বছর। এই বন্দী দশায় রাজার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে কুতুবশাহী প্রভুত্ব শেষ হয় এবং মোগল প্রভুত্ব কায়েম হয় পূর্ণভাবে গোলকুণ্ডার উপর।

কথায় বলে 'হাতী মরলেও লাখ-টাকা দাম।' গোলকুণ্ডা দুর্গের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। সেই ধন সম্পদ হীরকখনি নেই' রাজা রাজরাও নেই কিন্তু বিরাট দুর্গটি এখনও মাথা উঁচু করে তার ঐতিহ্য ঘোষণা করছে। শেষ হয়ে এখনও যা অবশিষ্ট আছে, তা দর্শনার্থীদের বিস্ময় সৃষ্টি করে। দেশ বিদেশের বহু টুরিষ্ট এই দুর্গটি দেখতে যান।

এই দুর্গ সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী। যেমনি বিরাট শক্ত তেমনি উঁচু। এর সীমানা এককালে পাঁচ মাইল অবধি বিস্তৃত ছিল। নয়টি বিরাট বিরাট ফটক। এ সব লোহার ফটক ও তার খিল দেখলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। কারা এসব দরজা খুলতো ও বন্ধ করত? কত শক্তিশালী ছিল তারা? মোট জানালা ছিল বাহাত্তরটী। প্রত্যেকটি দরজার একটি করে নাম ছিল, যেমন: কতে দরজা। মোতি দরজা, নতুন দুর্গের দরজা, জমালি দরজা, বনজারি দরজা, পতন চেক দরজা, বাহমনী দরজা ইত্যাদি। এ সব দরজা ভেঙ্গে ঢোকা মানুষের সাধ্যাতীত ছিল। ঔরঙ্গজেব প্রথমে হাতির সাহায্যে ভেঙ্গেছিলেন দরজা। দ্বিতীয় বারে অবশ্য বিশ্বাস ঘাতক পান্নী দরজা খুলে দিয়েছিল। বালা হিসার দরজার কাছে সিঁড়ির বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে জোরে হাততালি দিলে এখনও হাততালির পরিষ্কার অনুরণন শব্দ কানে আসে। মনে হয় দুর্গের ভেতর থেকেই যেন হাততালি দিয়ে আসছে।

বালা হিসারের ফটকের উল্টো-দিকে উঁচু দেয়াল। এই দেয়ালের আড়াল থেকে শত্রুদের গতিবিধি লক্ষ্য করত সৈন্যগণ। শত্রুদের ঘায়েল করার জন্য ব্যবস্থাও ছিল। বালা হিসারের ফটকের উপরে বাইরের আলিসার মাঝখানে একটি বড় গর্ত বা ফুটা ছিল। শত্রু প্রবেশ কালে তাদের গায়ের উপর এই গর্তের ভেতর দিয়ে গরম তেল ও গলা-সিসা ঢেলে দেওয়া হত।

বালা হিসার একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য জিনিষ। দুর্গের উপর অবস্থিত। এর মধ্যে কয়েকটি প্রাসাদ আছে, যেমন, কুতুবশাহী প্রাসাদ, দরবারে আম, দরবারে খাস, দিওয়ানে আম, দিওয়ানে খাস ইত্যাদি। এখানে রাজা আমীর ওমরাহ নিয়ে সভা করতেন।

বালা হিসার থেকে বড়দরি অর্থাৎ সাধারণ দরবারি হলে যেতে হলে তিরশ সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে হয়। বড়দরি তেতলা বাড়ী। এখানে কুতুবশাহী রাজারা দরবারে বসতেন। এই বড়দরির ছাতের উপর একটি রাজাসন ছিল। এখানে বসে রাজা ত্রিশ মাইল অবধি খোলা বিস্তৃত দৃশ্যাবলী দেখতেন, উপ-ভোগ করতেন। এই বারশা চার'শ ফিট উঁচু ও সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দু' হাজার মাইল উপরে। 'সাধু রামদাসের বন্দী শালা বড়দরির মধ্যে এখনও তাঁর স্মৃতি চিহ্ন রয়েছে। অবশ্যই এ রাম দাস শিবাজীর গুরু রামদাস নন। রাজা আবদুল হাসান তাহার রাজত্বের সময় তিনি ছিলেন একজন তহশীলদার। মন্ত্রী মদান্নার ভাগিনেয় ছিলেন। রাজার কোপে পড়ে বন্দী হন। তিনি বন্দীশালায় নিজের হাতে হনুমান, নবগ্রহ ও রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি তৈরী করেছিলেন। তিনি ভদ্রাচলমে রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন ও রামনবমীর দিনে ভক্তরা রামমন্দিরে পূজা দিতে আসেন এবং অনেকে এখানেও আসেন। বন্দীশালাটি খুবই সুরক্ষিত। তবু কেউ কেউ বলেন, রামদাস দৈব বলে নাকি অদৃশ্য ভাবে পালিয়ে যান।

বালা হিসারে ঢুকে ডান দিকে মোড় ফিরলে চোখে পড়ে স্নানের চৌবাচ্চা এবং তারই দক্ষিণে নাগিনা বাগান। এখানে স্নানের জন্য গরম ও ঠাণ্ডা জলের ব্যবস্থা ছিল। মাটির তৈরী পাইপ দিয়ে জল আসতো চৌবাচ্চায়। বিশেষ উপায়ে রাণীদের স্নানের জন্য জল গরম করা হত। রাজ পরিবারের

মৃত মহিলাদের দেহ কুতুবশাহী কবরে নেওয়ার আগে এখানে স্নান করিয়ে নেওয়া হত। এই নাগিনা বাগের বাঁ দিকে সরু রাস্তা ধরে গেলে একটি দালান চোখে পড়ে। এই দালানটি রাজাদের দেহরক্ষীদের আবাস।

এই আবাসের কাছেই একটি দোতলা ইটের বাড়ী। এই দালানে ছিল মন্ত্রী আকর্কানা ও মাদান্নার দপ্তর।

বড়ি বাউলি অর্থাৎ বড় কূয়া বা জলাধার। এখানে ক্রমাগত জলধারা বইতো। এরই কাছে দু বারান্দাওয়ালা একটি বাড়ী ছিল। ওখানে বসে রাজা প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতেন। আর একটু এগিয়ে গেলেই দুর্গের নালা চোখে পড়ে। পাঁচ মাইল দূর দুর্গ থেকে নালা টেনে আনা হয়েছে দুর্গ। এই নালার সাহায্যে দুর্গের ভেতরে বাগানে জল সরবরাহ করা হয়। এসব দেখলে মনে হয় সেকালের কলাশিল্প, কারুশিল্প স্থাপত্য বিদ্যা, কারিগরী বিদ্যা ইত্যাদি কম উন্নত ছিল না। ঐতিহাসিক প্রাসাদ, মসজিদ্ মন্দির ও দুর্গগুলো দেখলে প্রকৃষ্ট প্রমান পাওয়া যায়।

---

*হায়দরাবাদের আগের নাম ছিল ভাগ্যনগর। রাজা মহম্মদ কুলি কুতুবশার রাণীর ভাগ্য নামে রাখা হয়েছিল ভাগ্যনগর।

পাটনার ডায়েরী

অনুপম রায়

সরকার-অচল-করা আন্দোলন আজ এক মাস অতিক্রান্ত, অগ্নিগর্ভ বিহারে ছাত্র সংগ্রাম কমিটি দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন আজ দিনোত্তর দিন উন্নতির পথে। যতই দিন এগিয়ে চলেছে গণ-আন্দোলনে পরিবর্তিত ছাত্র-আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে চলেছে, শহরের মোড়ে মোড়ে বসেছে অনশনরত ছাত্র, শিক্ষক বুদ্ধিজীবীরা। বিহারের মহিলারাও, আজ আর পিছিয়ে নেই। তারাও যোগদান করছে সম্মিলিত ভাবে এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে, আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সংগ্রামে নেমেছে ডাক্তার ও আইন জীবীরাও। সবার মুখেই একভাষ—"এ লড়াই বাঁচার লড়াই" যতদিন না আমরা বাঁচার মত অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারব,—ততদিন চলবে আমাদের সংগ্রাম, যদি প্রয়োজন হয় আমরা চালিয়ে যাব আমাদের এই আন্দোলন 'হয় মৃত্যু, নয় জয়' পর্যন্ত। এ-দুর্নীতির বিরুদ্ধে, আজ সবাই একে অপরকে আহ্বান জানাচ্ছে,—এস আজ আমরা সবাই সম্মিলিত ভাবে আমাদের ভাইয়েদের রক্তেরাঙা এই আন্দোলনকে সার্থক করে তুলি।

পর্বত প্রমাণ দুর্নীতি ও আকাশ-ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য যখন বিহারকে গ্রাস করতে চলেছিল তখনই আরম্ভ হয়েছিল নতুন যুগের ছাত্রদের এই আন্দোলন। ভুল হবে যদি আমরা সেই অন্ধ বিশ্বাসে থাকি যে, কোন রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনকে পরিচালিত করছে, কারণ আমরা ভাল ভাবেই জানি যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলি আর যাই থাকুক এমন ভাবে সাধারণ মানুষকে একটি আন্দোলনে একটি বাঁচার সংগ্রামে যোগদান করাতে পারবে না। মানুষ যখন ক্ষুধায় ও পুঁতিগন্ধময় সমাজ ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত হয় তখন আপনা থেকেই এই আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। যেমন আমরা দেখেছি গুজরাতে। হয়ত বা এই আন্দোলনকে মৌখিক সমর্থন জানিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দল বাহবা কুড়াতে পারে। যেমন করে চলেছে, আবার অনেক দল শাসক দলের চাটুকার রূপেই কাজ করে চলেছে, অবশ্য ছাত্র সমাজ সর্তক দৃষ্টি রেখেছে এই চাটুকার দলগুলির উপর। ভয় হয়, মীরজাফর জয়চন্দ্রের এই দেশে এই চাটুকারদের জন্য,—যারা ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে রেখেছে অনেক, অনেক গণ-আন্দোলনকে নষ্ট করে দিয়ে। তাই এই গণ-আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে হলে সাবধান হতে হবে ছাত্র সমাজ কে ও যারা এগিয়ে এসেছেন—এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক মীরজাফর জন্ম নিয়েছে, আজ যে আন্দোলন বিহারকে জাগিয়ে তুলেছে, কাল হয়ত সে সারা ভারতবর্ষে আলোড়ন সৃষ্টি করবে, তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন কোন মীরজাফর মাথা চাড়া দিয়ে না উঠতে পারে।

১৯শে মার্চের রক্তাক্ত আন্দোলন আবার তাজা রক্তেরাঙা হয়ে উঠল ১২ই এপ্রিল গয়ায়, B. S. F. এর অটুট নিশানায় গুলিবিদ্ধ করে মায়ের কোল শূন্য করে প্রায় ৫০ জনের। সরকারী মতে অবশ্য মাত্র ৮জন, সহস্রলোক নিঃশব্দে গ্রহন করেছে—C. R. P. র নিষ্ঠুর প্রহার, হতাহতের কোন হিসেব নেই। ভাবতেও অবাক লাগে, B. S. F. এর বাপটে পাকিস্তানী সৈন্যরাও ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল, সেখানে শতাধিক রাউণ্ড গুলিতে মাত্র ৮ জনের প্রাণ নিতে পারল নেই B. S. F. কদের মাসেই কি স্বনামখ্যাত B. S. F.

এর এত অবনতি, তা অবশ্যই সম্ভবনা B. S. F. এর জওয়ানরা নিশ্চয়ই তাদের জেনারেল কস্তমজীর কথামত ফুলমালা দিয়ে আন্দোলনকারিদের স্বাগত জানায়নি, ভীত সন্ত্রস্ত শাসকগোষ্ঠি আজ দিগ্‌বিদিকশূন্য তাই যা মুখে আসছে তাই বলে যাচ্ছে। কখনো বলতে বলতে খেই হারিয়ে ফেলছে।

বিহারের নারী সমাজে যাদের কয়েক বছর আগেও এক হাত লম্বা ঘোমটা দেখা গিয়েছে, তাঁরাও আজ এগিয়ে এসেছে একটি সুষ্ঠ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে। অনশনরত অবস্থায় রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসতে কোন দ্বিধাবোধ করেনি। পাঁচ বৎসরের দুধের শিশুরাও আজ অনশনরত। আজ এরাও বুলেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় না, তাই হয়ত গয়ায় B. S. F. এর অটুট নিশানায় গুলীবিদ্ধ করেছিল নয় বৎসরের বালক সঞ্জয় কুমারকে। আজ এরাও বুঝতে পেরেছে যে এ লড়াই বাঁচার লড়াই।

যুগ যুগ ধরে পর্দার আড়ালে থাকা বিহারের নারী-সমাজ এক অভিনব দৃশ্য দেখাল ১৮ই এপ্রিল পাটনা সিটির রাস্তায়। মহিলা সমাজ দ্বারা পরিচালিত এক মাইল দীর্ঘ এই মিছিল ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা থেকে শুরু করে পাঁচ বৎসরের শিশুরাই যোগদান করেছিল। অপূর্ব আনন্দে এগিয়ে এসেছিল স্কুল, কলেজের ছাত্রী ও শিক্ষিকারা; রন্ধন শালা ছেড়ে গৃহিনীরাও বেরিয়ে এসেছিলেন, প্রায় পাচ হাজার মহিলা শুধুমাত্র পথ পরিক্রমাই করতে বের হননি, যুবতীদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এসেছে উদাত্ত ও উদ্দাম চিত্তের বিভিন্ন ধরণের শ্লোগান। অভূতপূর্ব এই সংগঠন ৪২ এর আন্দোলনকেও হার মানিয়ে গিয়েছে। এতদিন আমরা কলকাতা শহরকেই মিছিলের শহর জানতাম, কিন্তু আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে, শাসক যন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে, এই নারী সমাজ। তাই আজ এরাও সরকারী অফিসগুলির যন্ত্র বিকল করার জন্য ধর্ণা দিয়ে চলেছে পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। অহিংস পন্থার এই গণ অভ্যুত্থান বিহারে আজ নারীদের অবলা নাম ঘুচিয়ে সবলা করতে সমর্থ হয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ন্যায্য দাবীর বিরুদ্ধে আজ আর এদের কোন ভয় নেই। কোন রাজনৈতিক দল আর যাই থাকুক বিহারে মহিলাদের, ঘরের মেয়েদের আন্দোলনে এমনভাবে নামাতে পারবে না।

একদিকে বিহারে সর্বত্রই ধর্ণা সত্যাগ্রহ, অনশন সবই অব্যাহত আছে, ফলে বিকল হয়ে চলেছে শাসনযন্ত্র, অন্যদিকে বিচলিত শাসকগোষ্ঠি। গদীর মায়া ছাড়তে নারাজ, গফুর ছাড়তে চাইলেও দিল্লী ছাড়তে নারাজ, দিল্লী ছাড়লে—পরাজয় কিন্তু গুজরাতে যেমন পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল বিহারেও তা অসম্ভাবী, তবুও গফুর সাহেব ১৪ জন মন্ত্রীযুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনে ব্যস্ত। এটাও নিশ্চয়ই দিল্লীর ব্যবস্থা। কারণ বর্তমানে গফুর সাহেবের কিছু করার ক্ষমতা আছে বলে আমাদের জানা নেই। অন্যদিকে বিতাড়িত মন্ত্রী ও বিক্ষুব্ধ সদস্যরা বারবার হুমকী দিয়ে চলেছে যে আমাদের "corrupt" ছাপ মেরে তাড়িয়ে দেওয়া কেন? আমাদের তাড়াতে হলে তোমাদের ও বেরোতে হবে। কারণ তোমরা আমাদের থেকে কোন অংশে কম নও। আমরা এর ব্যবস্থা গ্রহণে বদ্ধপরিকর। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভাবেই শাসক গোষ্ঠীর ভিতর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। দিল্লীর আদেশ তারা মানতে নারাজ, আমরাও আশা করছি ফল খুব শীঘ্রই পাব। যেমন পাচ্ছি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কংগ্রেস নেতা শ্রীমহামায়া প্রসাদের দলত্যাগে। তিনি জনগণের উপর পুলিশী অত্যাচারকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন কিন্তু আমরা জানি, আজকের ঘটনা সেই ঘটনাকেও লজ্জিত করে দিয়েছে।

পরিস্থিতি যে ভাবে এগিয়ে চলেছে—তা যদি আর কিছুদিন এইভাবেই চলে তাহলে শুধুমাত্র বিহারেই নয় সমগ্র ভারতবর্ষেই ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে। শাসকগোষ্ঠিকে এখনো বোঝা উচিৎ যে বন্দুকের গুলিকে আর জনতা ভয় করে না। ওরা মরতে যখন শিখেছে তখন আর মুষ্টিবদ্ধ করে গণআন্দোলনকে থামান যাবেনা। তাই এখন দরকার নিজেদের ঘুন ধরা বাঁশগুলির পরিবর্তন করা, এখনো সময় আছে, আর দেরী করলে হয়তো বা ঐ ঘুন ধরা বাঁশ নিজেদের মাথারই ভেঙ্গে পড়বে।

সমাজতন্ত্রের মুখোস পরা আর চলবেনা। শাসক গোষ্ঠীর হয়ত আর জানতে বাকি নেই (অবশ্য চোখ কান যদি কিছু খেকে থাকে) যে ছাত্র সমাজ আজ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, বিহারে নিজেদের ভাগ্য নির্ধারনের অভিযানে।

এগিয়ে চলেছে সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অকুণ্ঠ সমর্থনকে মূলধন হিসেবে সংগ্রহ করে, তাই এ সংগ্রাম বাঁচার সংগ্রাম—এ আন্দোলন থামার আন্দোলন নয়।*

---

* বিলম্বে প্রাপ্ত।

নিখিল বঙ্গের মাতা দেশবন্ধুজায়া বাসন্তীদেবীর তিরোধানে নিশানার শ্রদ্ধাঞ্জলি ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায়ে দেশবন্ধুর পাশে শক্তির আধাররূপে তদানীন্তন "নিখিল বঙ্গের মাতা" বাসন্তী দেবীর দেশসেবা, ত্যাগ, দুঃখবরণ এবং নেতৃত্বের তুলনা বিরল। এক যুগব্যাপী কি নশস্ত্র আর কি নিরস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামী, সবাই তাঁর অজস্র স্নেহাশিস ও নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করে নিজেকে ধন্য বোধ করেছেন। সুভাষচন্দ্র তো তাঁকে সাক্ষাৎ মা বলেই জ্ঞান করেছেন এবং তাঁর উপদেশ নির্দ্দেশকে তাঁর ঐতিহাসিক স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে অমূল্য সম্পদ বলেই গ্রহণ করেছেন।

বাসন্তী দেবীর পরলোকের ডাক পরিণত বয়সে এলেও বাংলা—তথা ভারতের বহু দেশপ্রেমিক আজ নতুন করে মাতৃহারার মর্মবেদনা অনুভব করছেন। তাঁর তিরোধানে স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের স্বর্ণময় যোগসূত্র যেন আজ বিচ্ছিন্ন। আজ যুক্ত করে বঞ্চিত নিপীড়িত অসহায়ের আকুল আকুতি, "লোকমাতা বাসন্তীদেবী, তোমার মত আত্মাকে আজ বাংলা—তথা-ভারতের বড় প্রয়োজন।"

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিশানা মাতৃসমা বাসন্তীদেবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে!

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েদ কর্তৃক ১২/সি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ স্থিত নিউ বিশ্বনাথ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CENTRAL LIBRARY

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

15th May 1974

NISHANA
Phone : 44-1460

Regd. No. RN—246/8/7
Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from :

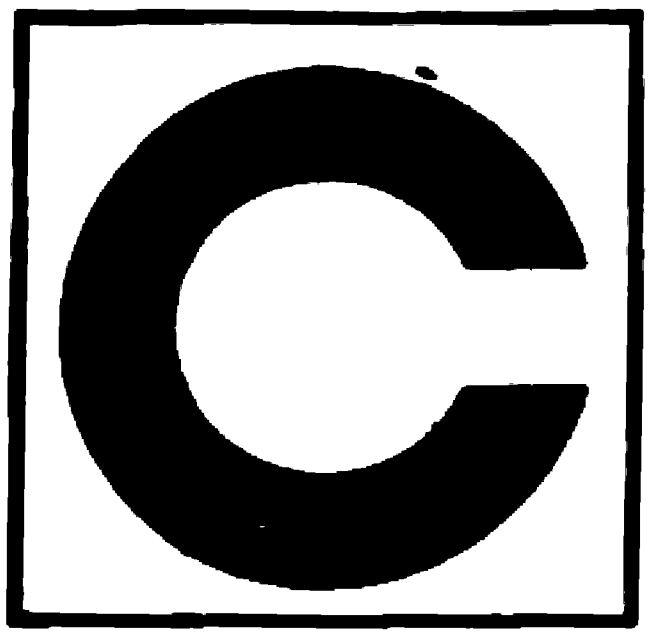

Gram : GOLEATHERS

Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

20H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, SILK & HANDICRAFTS

CENTRAL LIBRARY

নিশানা

২য় বর্ষ | ১১শ (একাদশ) সংখ্যা | জুলাই ১৯৭৪ | মূল্য ৭৫ পঃ

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

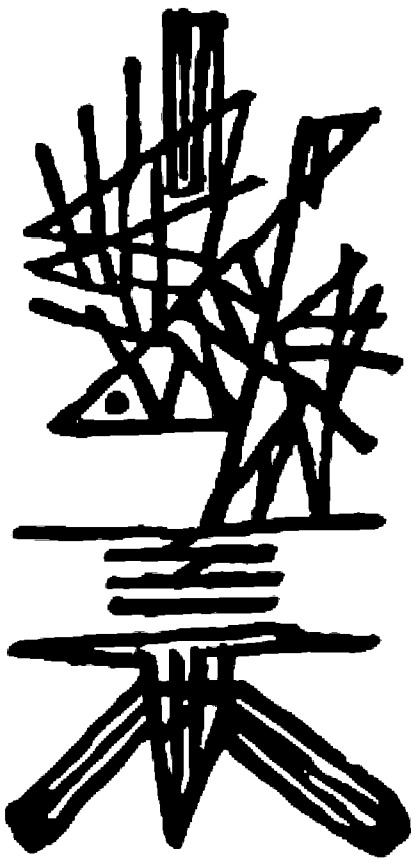

ARTS & PRINTS PVT. LTD.
31 PARK MANSION
CALCUTTA-16

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১। নিউক্লিয়ার টেষ্ট-এ ভারত	...	সম্পাদকীয়	...	৩০৫
২। প্রসঙ্গ ক্রমে	...	শ্রীচাঁদ	...	৩০৭
৩। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু	...	ডঃ ডি, এম, বসু, সৌজন্যে	...	৩০৮
৪। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	...	নিকুঞ্জ সেন	...	৩১০
৫। জাতীয় শিক্ষক সূর্য সেন	...	ডঃ আশা দাস	...	৩১১
৬। বুদ্ধদেব	...	অংশুমান	...	৩১৩
৭। উত্তর প্রদেশের চিঠি (১)	...	করুণাময় চক্রবর্ত্তী	...	৩১৪
৮। উত্তর প্রদেশের চিঠি (২)	...		...	৩১৮
৯। বেথুন স্কুল	...	অমল কুমার মিত্র	...	৩২৪
১০। নানা রঙের দিনগুলি	—	রসময় শূর	...	৩২৮
১১। কম্যুনিষ্ট রণকৌশলের একটি দিক	...	মণিত রায়	...	৩৩১

সম্পাদকমণ্ডলীঃ

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ স্মৃতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী

"প্রভাতসূর্য, এসেছে রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে—
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারি হোক জয়।"

—রবীন্দ্রনাথ

'নিশানা' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যগণকে প্রতিমাসে দুটি পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৌল ও সময়োচিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হবে। বক্তব্য বিষয় সরস ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ECONOMIC AFFAIRS

INDIA'S PREMIER ENGLISH ECONOMIC MONTHLY

Now on its 19th year of continuous publication

Editor HIMANSU ROY

Deals with advanced economic theory and topical economic problems. Discussion of India's planned economy is its primary objective. Read throughout the world.

Subscription :

Annual : Inland Rs. 20·00

Foreign US $ 6·00

For further information

Manager

ECONOMIC AFFAIRS

10, Galiff Street, Block-5,

Suite-64 Calcutta-700003

নিশানা

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ : ১লা জুন, ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

নিউক্লিয়ার টেষ্ট-এ ভারত

রাজস্থানের বারমার জেলার মরু বালুতলে অনুষ্ঠিত 'নিউক্লিয়ার—টেষ্ট'-এর সফলতা ভারতীয় নিউক্লিয়ার প্রযুক্তি বিদ্যার একখানি সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচক। যাদের গভীর মনীষা, গবেষণা এবং কর্মকুশলতা এই অপূর্ব সফলতার মূলে, সেই ভারতীয় নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকার কৃতজ্ঞতায় ভারত চিরঋণী হয়ে রইল।

যে প্রক্রিয়াতে মাটির ৩৩০ ফুট নীচে এই বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে—Implosion Device—এতে করে কোন অবাঞ্ছিত "রেডিয়েশন ফলআউট" মাটির উপরিতল বা বায়ুমণ্ডলকে দূষিত করতে পারে না। শক্তির দিক থেকে হিরোশিমা নাগাশাকী বিধ্বংসী এটম বোমার চাইতে-ও কম শক্তিসম্পন্ন এ বারমার নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ। বর্তমান নিউক্লিয়ার শক্তিধরদের আয়ত্বে যে সব এটম তথা নিউক্লিয়ার বোমা আছে তাদের শক্তি এর তুলনায় অন্যূন কয়েক সহস্রগুণ বেশি। তাদের আনুষঙ্গিক ক্ষেপন-কৌশলও সুদূর পাল্লার এবং বহুমুখী।

সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য, বিকল্প শক্তিসন্ধানে ও নিউক্লিয়ার শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ—যথা পাওয়ার উৎপাদন, পোতাশ্রয় নির্মাণ, অপরিহার্য যোগাযোগের পথে দুর্ভেদ্য বাধা সমূহ অপসারণ ইত্যাদি এবং জল-স্থল-অন্তরীক্ষে যান-বাহনের ক্ষেত্রে তেল পরিচালিত ইঞ্জিনের পরিবর্তে নিউক্লিয়ার শক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি। জগদ্ব্যাপী তেলের দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যতা হেতু-ও এই বিকল্প নিউক্লিয়ার শক্তি সন্ধানে সারা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীকুল মাথার ঘাম পায় ফেলছেন। নিউক্লিয়ার যুগে নিউক্লিয়ার শক্তিউৎসকে উপেক্ষা করে বাঁচার উপায় নেই। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, অগ্রসর অনগ্রসর সকল দেশের পক্ষেই একথা প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে ভারতীয় নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীরা অনেক পূর্বেই এ-সফলতা অর্জন করতে পারতেন, তা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। কিন্তু না হওয়ার চাইতে দেরিতে হওয়াও ভাল। কাজেই আন্তরিক কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রেই নিউক্লিয়ার-শিল্পবিপ্লব-এর সূচনাতে ভারতীয় অনুপ্রবেশ-কে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাবেন।

কিন্তু বাহির বিশ্বের বিরূপ প্রতিক্রিয়াই ভারতকে সোচ্চার 'অভিনন্দন' জানাচ্ছে। তার কারণ বোঝাও শক্ত নয়। প্রধানতঃ অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদের একটা সহজাত ধর্ম হল—সামরিক শক্তির এবং ব্যবসা বাণিজ্যের মনোপলি ও সম্প্রসারন সংরক্ষন। ওটার বিরুদ্ধে কোন চ্যালেঞ্জ আসলেই তারা দিগবিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন এবং তার বিনাশ সাধনে তৎপর হন।

নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারতের সম্ভতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ শান্তিপূর্ণ শিল্প বিপ্লবের যে সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে, তাতে নিউক্লিয়ার বোমা সজ্জিত বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যবাদীরা স্বাভাবতই চঞ্চল হয়েছেন। কারণ তাঁরা একাধারে সাম্রাজ্য এবং শিল্পের উভয়ের উপর মনোপলি রক্ষা করতে চান। শিল্প হাতছাড়া হয়ে গেলে এটম বোমা, নিউক্লিয়ার সাবমেরাইন বা ICBM—মিসাইলের কি মূল্য থাকে!

ভারত আজ পাওয়ার পলিটিক্স্-এ প্রতিযোগী না হয়ে নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান শিল্পোন্নয়নে প্রয়োগ করলে, সুপার পাওয়ারদের শোষনের বাজার সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারে। শিল্পোন্নয়নে নি-শক্তির প্রয়োগ যুগান্তকারী শিল্পবিপ্লবের দ্যোতক। অগ্রসর দেশগুলো বোমবাজীতে মশগুল থাকলে, নি-বিজ্ঞানাশ্রিত শান্তিপূর্ণ প্রকল্প নিয়ে আজকের অনগ্রসর দেশগুলো-ও তাদের ডিঙ্গিয়ে যেতে পারে। ২য় মহাযুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় দুই সুপার পাওয়ারের মারণাস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসরে জার্মান ও জাপানী শিল্পোন্নয়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের অত্যাশ্চর্য উন্নতি তুলনীয় নিদর্শন। দুই সুপার পাওয়ার-ই কিন্তু উক্ত দেশ দুটোকে কাঠকাটা আর জলটানা ছাড়া সকল শিল্প থেকে বঞ্চিত করে নিয়েছিল। রকমারি নিউক্লিয়ার অস্ত্রের প্রতিযোগিতার সীমাহীন অপচয় বহন, এবং তার সমতালে নিউক্লিয়ার শিল্পোন্নয়ন সাধন দুই সুপার পাওয়ারের পক্ষেও অসম্ভব হল। তখনও নিউক্লিয়ার শক্তির শিল্পোৎপাদনে প্রয়োগ অজ্ঞাত ছিল, শিল্প বিপ্লবের সুযোগ-ও তাত্ত্বিক গবেষণার মধ্যেই অন্তর্নিহিত ছিল, কিন্তু আজ নিউক্লিয়ার শিল্প-বিপ্লব জগৎকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। নিউক্লিয়ার শক্তি জগতের কল্যাণে, অভাব মোচনে, উন্নততর জীবন রচনায় প্রযুক্ত হবে, না, বিশ্ব ধ্বংসের কাজে প্রযুক্ত হবে, এ প্রশ্নের উত্তর আজ দিতে হবে ক্ষমতা পাগল সুপার পাওয়ারদেরকে। রাজস্থানের পরীক্ষা নিরীক্ষাতে আজ প্রমাণ হচ্ছে ইচ্ছা করলেই ভারত নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করতে পারবে। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজের কারণেই সে ওপথে এগোবে না। সুদূর ভবিষ্যতেও সে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি করবে কি না এ প্রসঙ্গ আজ অবান্তর।

নিছক তর্কের খাতিরেও যদি বলা যায়, এটম বম্ব তৈরী হল—তাইলেই কি তার জটিল পরিবহন সমস্যা মিটে যাবে? তদুপরি 'ডিটারেন্ট', (বা বাধা দেবার যে সব অত্যাধুনিক কৌশল) আবিষ্কার হয়েছে, তা রপ্ত করতে অবাধ সুযোগ পেলেও, ১০/১২ বছর যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া নবতর আবিষ্কারের কথা-ও উপেক্ষনীয় নয়। সর্বোপরি খরচ বহনের কথা। ভারতের মত দরিদ্র দেশগুলো, ইচ্ছা

থাকলেও, নিছক অর্থাভাবের দরুণই রচনাত্মক প্রয়োগ ছেড়ে এটম্ শক্তির ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ অবলম্বনে বিরত থাকবে। 'নি'-সম্ব্-এ অধিকারী দেশগুলো তা ভালভাবেই জানে। কিছু সমালোচক, যেমন আমেরিকা ও বৃটিশ সংবাদপত্রসমূহ, বলছেন, অনাহার অর্দ্ধাহার ক্লিষ্ট অনগ্রসর ভারতবর্ষ কোন সাহসে 'নিউক্লিয়ার বম্ব্' তৈরীতে মন দিল। শুধু প্রেষ্টিজের প্রশ্নেই কি ?

পাল্টা প্রশ্ন জাগে, ভারতে খাদ্যাভাব বস্ত্রাভাব বলেই কি এই নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই সরকারী আমেরিকা ভারতকে যাবতীয় সাহায্যদান হতে বঞ্চিত করেছিল ? কেনাডা আণবিক চুল্লীর জালানি সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া হল ভারত প্রশিক্ষণ চুক্তি ভঙ্গ (!) করেছে ; এটমিক শক্তির শান্তিপূর্ণ প্রয়োগ পরিহার করে বম্ব্ তৈরীর কাজে কেনাডা-নির্মিত এটম চুল্লীর ভস্মরাশি পাচার করেছে। রাজভক্ত কেনাডা কার গোপন স্বার্থে এত গলাবাজি করছেন, তাও ভাববার কথা।

চীনের অন্যতম প্রখ্যাত এটম বিজ্ঞানী আমেরিকাতে শিক্ষা দীক্ষা নিয়ে নিজের দেশে এটম বোমা তৈরী করেছেন। তা নিয়ে তো সম্প্রতি কোন গলাবাজী নেই। মার্কিণ পাওয়ার পলিটিক্স্-এর দৃষ্টিতে বিশেষ করে অপর সুপারপাওয়ারের বিরুদ্ধে বন্ধুরাষ্ট্র চীনের মূল্য সমধিক।

বৃটেনের এটমবোমা আমেরিকার অভিনন্দন এবং সহযোগিতা অনায়াসে লাভ করেছিল। কিন্তু ফরাসী এটমবোমা আজো মার্কিণের গাত্রদাহ হয়ে আছে। N A T O-এর অঙ্গ হয়েও সে রেহাই পায়নি। সমগ্র জগৎকে সদা ত্রস্ত রেখে দুই সুপার পাওয়ার-এর মধ্যে নিউক্লিয়ার বম্ববাজীর মনোপলি সীমাবদ্ধ রাখাই ছিল রুশ-মার্কিণ পাওয়ার পলিটিক্স্এর নীতি। ঐ মনোপলি রক্ষার গরজেই নন্-প্রলিফারেশন চুক্তির উৎপত্তি। এ চুক্তির একটা নৈতিক ভিত্তি থাকতো, যদি সুপার পাওয়ার-দ্বয় নিজেদের এটম বোমার অস্ত্রাগার সমূলে বিনাশ করতে প্রস্তুত থাকতেন। তা যখন হল না, তখন ফরাসী এটম পাওয়ার নীতি সুপার পাওয়ারদ্বয়ের বিশ্বধ্বংসী নীতির বিরুদ্ধে মুখের মত জবাব বৈ কি ! চীনের এটম বম্ব-ও এই নন প্রলিফারেশন চুক্তিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শিয়েই। সম্প্রতি ফরাসী নিউক্লিয়ার গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা ভারতকে অভিনন্দন ও সহযোগিতা দানের আশ্বাস দিচ্ছে।

ভারতীয় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের অপর অনুযোগ সমালোচনা হল যে, তার উদাহরণ দেখে আরও পাঁচটি দেশ, ইজরায়েল তার মধ্যে একটি, আশু নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঘটাবে। এঁরা কি কারো উদাহরণের অপেক্ষা রাখেন ?

তদুপরন্তু, ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তিরক্ষার চিন্তায় নিউক্লিয়ার পাওয়ার-দের চোখে ঘুম নেই !···সে শান্তি রক্ষার দায়িত্বেই পাকিস্তানে একাদিক্রমে ২৫ বছর ধরে মার্কিণ এবং প্রায় দশ বছর ধরে চীন অস্ত্র সরবরাহের প্রতিযোগিতা করে চলেছে। উভয়েই নিউক্লিয়ার অস্ত্রে মহাশক্তিধর। তবু, নাহতেই ভারতীয় এটম বম্ব এর ভয়ে এঁদের হার্টফেল করার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে !

জাপানের কথা একটু স্বতন্ত্র। এটম চুল্লী রচনায় জাপানের অবস্থা খুবই উন্নত, নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পন্ন সামুদ্রিক পরিবহন প্রকল্পেও জাপান পৃথিবীর অন্যতম অগ্রসর দেশ। তারা ইচ্ছা করলেই এটম বম্ব তৈরী করতে পারবে। জার্মানদেরও সেই অবস্থা। যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে অসহনীয় চাপ সৃষ্টি করে, তারা নিজেদের অবলুপ্ত আর্মি, নেভি, বিমান বাহিনী যেমন আদায় করে নিয়েছে, এটমবম্ব-ও তেমনি নেবে। চিরশত্রু চীনের সঙ্গে মিতালি করতে জাপানের সময় লাগলো না। চীনেরও তো এটম-বম্ব আছে। ভারতীয় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ দেখে সে এত বিহ্বল হল কেন।

ভারতীয় এটম-শক্তি পরীক্ষার অন্যতম প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্যসংস্থা—ভারতকে সাহায্যদানে বিরত হবে কিনা ?

প্রথমে নানামাত্রিক ভীতি প্রদর্শন সোচ্চার হলেও আশু সুস্থতর নীতি অবলম্বনের পূর্বাভাসও দেখা যাচ্ছে। সাহায্যের নামে লগ্নি কারবার নির্ভরযোগ্য বাজারকে সাধারণত অবজ্ঞা করে না। তাছাড়া নিউক্লিয়ার অস্ত্রধারী চীন বা ফরাসীর সঙ্গে কারকারবার তো পরম উৎসাহেই চলেছে। কাজেই ভারতের বাজারেও প্রতিযোগিতামূলক ভাবেই লগ্নী কারবার শুরু হবে।

ভারতীয় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের সব চাইতে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে পাকিস্তানে। জনাব ভুট্টো ঘোষণা করেছেন "ঘাস খেয়ে থাকবো, গাছের পাতা খেয়ে থাকবো, তবু এটমবোমা তৈরী করবই।" কানাডা পাকিস্তানকে সম্প্রতি পরমাণু প্রকল্পে প্রভূত ঋণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও ইউরেনিয়াম জালানি সরবরাহ করছে। পাকিস্তান এই প্রকল্প তৈরীর কাজ ইতিপূর্বেই শুরু করেছে। ইউরানিয়াম চর্চার কাজ চলেছে ডেরা গাজি খানে, প্লুটোনিয়াম তৈরীর জন্য যে ভারি জলের প্রয়োজন তার জন্য একটি প্রকল্পও তৈরী হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী করতে কৃতসংকল্প হওয়াতে কানাডা তার উৎসাহ বর্দ্ধনে মনোনিবেশ করছে ; আর ভারত নিউক্লিয়ার বোমা তৈরী করবে না, এই আশ্বাস পেয়েও ভারতকে নিউক্লিয়ার গবেষণামূলক সাহায্যদান বন্ধ করেছে। পাওয়ার পলিটিক্স্ এমনই রহস্যজনক।

একথাও অনস্বীকার্য যে, রাশার গাঁটছাড়া বন্ধন ছিন্ন করে না নিলে ভারতের শান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়ার শিল্প-বিপ্লবের অভিযান নানা কৃত্রিম উপায়ে বাধা প্রাপ্ত হবার আশঙ্কা বহন করবে-ই !

প্রসঙ্গক্রমে

শ্রীচাঁদ

১৮ই মে। সকাল ৮টা পাঁচ মিনিট। ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দিন-ক্ষণ। ভারত ভূতলে তার পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বশক্তি-ধরদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করে জানিয়ে দিয়েছে, বিশ্বশক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়ে সত্যিকার স্থায়ী বিশ্বশান্তি আনার জন্য সে পূর্ব আকাশের দিগন্তে উদিত হয়েছে। দরিদ্র, অবহেলিতের মধ্যেও যে অনন্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন এ সত্যও তাদের গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

অসম্ভবকে সম্ভব বলে স্বীকার করে নেওয়ার প্রথম ধাক্কা কেটে যাবার পর বিচলিত, প্রতিক্রিয়া-চঞ্চল হয়ে উঠেছে শক্তিধরগণ। পাকিস্তান দিশাহারা। চীন নির্বাক। সম্ভাবনায় উৎসাহিত অনুন্নত ও উন্নতকামী দেশগুলো। আনন্দিত ভারতবাসী। গর্বিত তারা তাদের বৈজ্ঞানীকদের অপূর্ব প্রতিভায়, সাফল্যে।

কায়েমী স্বার্থে আঘাত লাগলে ক্ষুব্ধতা ক্রুদ্ধতায় পরিণত হয়। তার রূঢ় বাস্তবের ভ্রূকুটিতে ক্রোধ স্তিমিত হয়ে আসে। নতুন "balance of power"-এ নিজেদের স্থান সুনির্দিষ্ট করে নেবার জন্য প্রতিযোগিতা চলে নতুন শক্তিকে স্বীকার করে নিয়ে। ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণ "balance of power"-এ বদল বদল ঘটিয়েছে। ভারতের প্রতি উষ্মাটা গঠনগতমাত্র। এ জাতীয় উষ্মা একদা চীনের ভাগ্যে ঘটেছিল, ঘটেছিল বাংলাদেশের জন্মক্ষণে। আজ উভয়ই স্বীকৃত। শক্তিধরগণ কর্তৃক সমাদৃত। যারা আজ ভারতকে সাহায্য দান বন্ধ করে জব্দ করতে চায় তারাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবে তাকে সাহার্য্য ও তার সঙ্গে সহযোগিতা করতে। একদেশ অপর দেশকে নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করে না। গোটাটাই "বাণিজ্য"। অদূর ভবিষ্যতে পারমানবিক শক্তি খুলে দেবে ভারতের রপ্তানি-আমদানির প্রশস্ত দোর। বৃটেন ও জাপানকে বাণিজ্য করে খেতে হবে। তারা ভারতকে স্বাগত জানালো বলে। চীন ক্ষুন্ন। ওটাই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের নীট লাভ। অতএব কানাডারও।

অনেকে বলে বেড়ান, ভারতের "brain drain" ঘটছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারত জানলো, যা ব্রেন দিয়ে বিদেশে বেরিয়ে গেছে তা "brain soil"। অথবা এমন brain প্রাচুর্য ভারতের রয়েছে যে, যতই সে তা দান করে ততই তার দান করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। দান ভারতের ঐতিহ্যও!

বুদ্ধিজীবিগণ রাজনীতির গণ্ডী মেনে চলতে চায় না। এটা কোন কোন দেশের পক্ষে বিব্রতিকর। সোভিয়েত ইউনিয়নের একাদেমী অব সায়েন্সের ২৫০তম বার্ষিক সম্মেলন কোন কারণ দেখানো প্রয়োজন মনে না করে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। বেসরকারী মহলের এক খবরে প্রকাশ, সোভিয়েত ডিক্টেটরগণ গত পঞ্চাশ বছর ধরে বুদ্ধিজীবীদের যে ভাবে নিগৃহীত করে চলেছে সেখানে তার প্রতিবাদের ঝড় উঠবার আশঙ্কায় সম্মেলনটি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু আর কতকাল?

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের রকম সকম দেখে শ্রীমতী বিনোবা ভাবেজীর শরণাপন্ন হয়েছেন। ভাবেজী বাণী দিয়েছেন, "তুমি আমাকে মারতে এসে যদি আমি হিংসার আশ্রয় না নি তাহলে একে বলা হয় মহান।"

ভারতের জনগণ মহান হোতে চায় না। চায় মানবিক মর্যাদা।

শ্রীমতীকে কিছু বললেই নাকি বলেন, "মোকাবেলা করব।" মোকাবেলাটা নিজের সঙ্গে করলে হয় না? দেবী কি ছিলেন, কি হয়েছেন, কি হচ্ছেন পরিষ্কার হয়ে যেত।

তবে তিনি যে অমন ভাবে মোকাবেলা করবেন কম্যুনিষ্ট চক্রান্ত সোসিয়ালিষ্ট চূড়ামণি তা বুঝতে পারেন নি। বুঝতে পারলে অমন কানমলা খেয়ে বিনাশর্তে রেল ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিতে হোত না। রাজনীতির ব্যাপার। কে জানে হয়ত প্রত্যাহার করে নেবার জন্যই ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল। নইলে পর পর বেশ কটা বড় গোছের ধর্মঘটের অপমৃত্যুর মুখে এতবড় একটা ধর্মঘটের ডাক দিতে পারে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি? অত ঘেঁষাঘেঁষি ঘষাঘষির পরও রেল তথা রাজনৈতিক নেতারা বুঝতে পারলেন না, শ্রীমতী গণতন্ত্রে গভীর বিশ্বাসী, তবে কোন কারণেই গদি ছাড়তে রাজী নন! সংখ্যা লঘিষ্ঠ হয়েও তিনি দীর্ঘকাল গদি আকড়ে পড়েছিলেন। তিনি হীব নন, উইলী ব্রাণ্টও নন; নেহরু কন্যা। ফলে জিনিস পত্রের দাম বাড়ার কারণেও তার আশঙ্কায় জনগণ চাপ সৃষ্টি করে রেল ধর্মঘটীদের উপর। বেচারীদের ঘরে বাড় বাড়ন্ত তার উপর চাপ ও নেতাদের অনিশ্চয়তা। তবু এঁরা অভিনন্দিত হবার যোগ্য।

পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া উপভোগ্য। সিটু বলে এ-আই-ইউ-টি-সি বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। ফার্ণানডেজ সাহেব বহাল তবিয়তে জেল থেকে বেরিয়ে

কমরেড ভাঙ্গের চোখের জল মুছিয়ে বলছেন, ছি ছি, সে কী কথা, আক্কো নয়!

কমরেড কিন্তু বলে যাচ্ছেন, কে বলেছে হার হয়েছে? সব কটা দাবিই তো মেনে নেওয়া হয়েছে। আর তাছাড়া জাতীয় মজুরি বোর্ড বসল বলে।

এন সি সি আর এস নেতৃবৃন্দ জানাচ্ছেন, কে বলেছে আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সংগ্রাম চলছে, চলবে।

লেনিন এদের জন্য বিধান দিয়ে গেছলেন, careerists and charlatans deserve only the heaviest punishment.

কিন্তু প্রয়োগ করবে কে? কয়েক সহস্র রেলকর্মী চাকরী হারিয়ে হা হা করে বেড়ালে নেতাদের কি এসে যায়!

• • •

গণতন্ত্রে আস্থাশীল জাতীয়তাবাদী নেতা পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার উইলী ব্রাণ্ট পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগ ইচ্ছা প্রণোদিত। প্রমাণিত হয়েছে তার ব্যক্তিগত Aide পূর্ব জার্মানীর একজন প্রথম শ্রেণীর গুপ্তচর রূপে কাজ করে গেছেন।

চীন সোভিয়েত সম্পর্কে প্রায় প্রত্যহ যা বলে আসছে তা দেখছি উপেক্ষা করার বিষয় নয়। অবশ্য আমাদের আশঙ্কার কারণ নেই। তাঁর কাছে কী বা আর গোপন করার আছে!

• • •

ভারত মহাসাগরে চীনের কোন বেরোবার পথ নেই, বন্দরের সুবিধা নেই, সামরিক ঘাঁটিও নেই। তবে আরবসাগর ও বঙ্গোপসাগরে তাদের সাবমেরিণদের চলাফেরা করতে দেখা যায়। স্বার্থের তাগিদে তানজানিয়া ওমান ও দক্ষিণ ইয়েমেন-এর সঙ্গে তার খুব মিতালি। দার-এস-সালাম এ তার একটি ছোটখাট নৌ-ঘাঁটি আছে। শীঘ্র সে ভারতের উপর দিয়ে ভারত মহাসাগরে I C B M পরীক্ষার জন্য পাঠাবে। এ ঘাঁটি এ কাজে সাহায্যে আসবে।

ভারত মহাসাগরে তার দুর্বল সামরিক ক্ষমতার জন্য সে চায় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি হোক। সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস ও নিপাত যাক।

"আন্তর্জাতিকতাবাদ"-এর অপূর্ব প্রগতি। "দুনিয়ার মজদুর এক হোক!"—আহা বেচারা মার্কস!

অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু

ডি, বসু সৌজন্যে (রেডিও বক্তৃতা অবলম্বনে)

অনুবাদক, অংশুমান

১৮৯৪ সালের পয়লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতায় তাঁদের পৈতৃক বাসভবনে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ভারতীয় রেলওয়ের একজন অ্যাকাউন্টান্ট।

স্কুলে তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠিদের কাছে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। ১৯০৯ সালে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন এবং যোগ্যতা বিচারে পঞ্চমস্থান অধিকার করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের I. Sc. B. Sc. এবং M. Sc. (১৯১৫) পরীক্ষার সবকটিই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পাস করেন।

স্যার আশুতোষ মুখার্জী তাঁকে নবগঠিত ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স-এ লেকচারারক্রপে যোগদানের অনুরোধ জানান। ১৯২১ সনে তিনি রীডার হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। পরিসংখ্যানের ওপর তাঁর বিখ্যাত পেপারটি, যা বর্তমানে তাঁর নামাঙ্কিত, ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার কিছু পরেই তিনি ফ্রান্স ও জার্মানীর উদ্দেশ্যে যাত্রা দেন। এর ফলে তিনি ম্যাডাম কুরী ও আইনষ্টাইনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর, তিনি ১৯২৭ সনে পদার্থ বিদ্যার প্রফেসর হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় যোগ দেন। ১৯৪৪ সনে তিনি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪৫-এ তিনি পদার্থবিদ্যার খয়রা প্রফেসর হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন এবং ১৯৫৬ সালে এই পদ থেকে অবসর নেন এবং তাঁকে প্রফেসর এমেরিটাস সম্মানে ভূষিত করা হয়। বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য হিসাবে

তিনি শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং ১৯৫৯-এ সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁকে সম্মান সূচক ডক্টর অফ সায়েন্স ডিগ্রী প্রদান করে। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকের মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৫৮ সালে তিনি ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির একজন ফেলো নির্বাচিত হন। ক্যালকাটা ম্যাথামেটিকাল সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল সায়েন্স একাডেমি, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স (১৯৫৮–৬১) এবং আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে তিনি কাজ ক'রে গিয়েছেন।

অধ্যাপক বসুর বিজ্ঞানের বিভিন্ন-শাখায় গভীরভাবে প্রবেশ করার বিস্ময়-কর ক্ষমতা ছিল। একজন আধুনিক মানুষের পক্ষে সকল বিষয়েরই কিছু কিছু জানা এবং নিজস্ব বিষয়ের সব কিছু জানা অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু পদার্থবিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপক বসুর জ্ঞান সেই সেই বিষয়ের যে কোন গবেষণাকর্মীর জ্ঞানের মতই গভীর ছিল।

১৯৫৯ সাল থেকে অধ্যাপক বসু ইণ্ডি-য়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টি-ভেশন অফ সায়েন্স-এ জাতীয় অধ্যা-পকের ইউনিটটির অধীনে কয়েকটি প্রকল্পের প্রত্যক্ষভাবে তদারকি করে-ছেন। তার মধ্যে একটির বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যেটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবন থেকে হিলিয়াম গ্যাসের প্রসেসিং ও সংগ্রহ। হিলিয়াম গ্যাসের আমদানী যে কোন দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা ও মহাকাশ বিজ্ঞানে উক্ত গ্যাসের ক্রম-বর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রকল্পটি জাতীয় গুরুত্ব অর্জন করেছে।

এখন আমি সংক্ষেপে অধ্যাপক বসুর কর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি, যে কাজটি তাঁকে একজন কিংবদন্তীর নায়কে পরিণত করেছে।

বিংশ শতাব্দী কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্ব-বিজ্ঞানের এই দুটি মহান আবিষ্কারের জন্য উল্লেখযোগ্য। এটি একটি আশ্চর্য্য যোগাযোগ যে বসু এবং আইনষ্টাইন দুজনেই এই উভয় ক্ষেত্রেই বিরাট অবদান রেখেছেন এবং এই দুটি ক্ষেত্রই ক্লাসিকাল চিন্তাধারা থেকে আমূল অপসারণ সূচিত করে। ক্লাসিকাল পদার্থবিদ্যার বৈশিষ্ট্য হল অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাসমূহ, কঠোর নিয়তিবাদ (Determinism) ও পরম কালের অপরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ। এই জগতে তরঙ্গ এবং কণাসমূহের মধ্যেকার পার্থক্য নিখুঁত ও পরিষ্কার। আলো, শব্দ এবং প্রবাহ তরঙ্গ বর্গের অন্তর্ভুক্ত, ইলেক্ট্রন, পরমাণু, অণু এবং অন্যান্য বস্তুসমূহ কণা-বর্গের অন্তর্ভুক্ত।

১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্ক একটি সূত্রের প্রস্তাব করেন যেটি অলোক নিঃসরণ-কারী উত্তপ্ত বস্তুর তাপমাত্রার ওপর কীভাবে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের তীব্রতা নির্ভর করে, তা সফলভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। এইসূত্রে উপনীত হতে তাঁকে ধরে নিতে হয়েছিল যে আলোক নিঃসরণ কোন অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা নয়—এটি ঘটে উল্লম্ফনের মাধ্যমে যাতে প্রতিবারে নির্দ্দিষ্ট পরিমান শক্তি নির্গত হয়, কিন্তু আলোক একবার নিঃসারিত হলে পর তা তরঙ্গাকারে প্রবাহিত হয়। বিচ্ছিন্ন উল্লম্ফনের মাধ্যমে আলোক নিঃসরণের এই ধারণা ক্লাসি-কাল চিন্তাধারার সাথে বিচ্ছেদসূচক এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্মদাতা। ১৯০৫ সালে আলোকের সামনে উন্মুক্ত ধাতব পাত থেকে ইলেকট্রনের নির্গমন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনষ্টাইন প্রস্তাব রাখলেন যে আলো-কে কণাসমূহের এক সমষ্টিরূপেই বিবেচনা করতে হবে। সুতরাং আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের এই দ্বৈতবাদী উভয় সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়লাম—আলো তরঙ্গ এবং কণা এই উভয়ের মতই আচরণ করছে।

১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ আলোক-কে এক বাতিল বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের পরিবর্ত্তে এক শুদ্ধ কণা হিসাবে বিবেচনা ক'রে প্ল্যাঙ্কের সূত্রটি নূতন ভাবে নির্ণয় করেন! প্ল্যাঙ্কের সম্বন্ধসূত্রে উপনীত হবার জন্য তাঁকে কণাসমূহের অপ্রভেদনীয়তা (indistinguish-ability)-র ওপর ভিত্তি ক'রে এক নূতন ধরনের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের প্রবর্ত্তন করতে হয়। এছাড়াও তিনি ধরে নেন যে ক্ষুদ্রতম আধার (Rece-ptacle) যে কোন সংখ্যক কণাকে জায়গা দিতে পারে—সনাতন ভারতীয় পরিবারের আতিথেয়তা যেমনটি আর কি। কণাসমূহের অপ্রভেদনীয় তার ধারণাকে রক্ষা করে এর দুবছর পর ইটালির পদার্থবিদ ফার্মি বলেন যে আধারটি হয় একটি মাত্র কণাকে জায়গা দেবে অথবা একটিকেও নয়—এবং তাঁর পরিসংখ্যানকে বলা হয় ফার্মি পরিসংখ্যান। এই বিশ্বের যাবতীয় সত্তা (entity)-কে দুটি বর্গে ভাগ করা যায়—যেগুলি সত্যেন্দ্রনাথের পরিসংখ্যানের নিয়ম মেনে চলে তাদের বলা হয় হয় বোসন, এবং যেগুলি ফার্মি পরিসংখ্যান মেনে চলে তাদের বলা হয় ফার্মিয়ন। বোসনের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরদিন বেঁচে রইবেন।

১৯২৪-এ কণাসমূহের অপ্রভেদনীয়-তাকে ধারণা করা ছিল একটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার—বাস্তবিকই এটি হল "চিন্তার জগতে সংশ্লিষ্টিকতার চরমতম বিকাশ।" এর প্রায় তিন বছর পরে হাইজেনবার্গ অনিশ্চয়তার তত্ত্বের প্রস্তবনা করেন যা সত্যেন্দ্রনাথের ধারণাকে ব্যাখ্যা করে।

যখন থেকেই আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেন, যাতে অভিকর্ষের বলকে ক্ষেত্ররূপে ধারণা ক'রে দেশ (space)-এর জ্যামিতিতে সংস্থাপিত করা হয়েছিল, তখন থেকেই তিনি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের উদ্ভাবনের প্রয়াস চালিয়ে আসছিলেন যা কিনা অভিকর্ষ এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক বল এতদুভয়কেই একটি কাঠামোর মধ্যে বাঁধবে। এই কারণে তিনি একটি সমীকরণ হাজির করেন যাতে ছিল ৬৪-টি entity. সত্যেন্দ্রনাথ এই কাজের গুরুত্বে ভীত হন নি এবং এই ৬৪টি entity বের করার একটি সুচারু পদ্ধতি প্রদান করেন।

অধ্যাপক বসু একজন অসংখ্য গুণাবলী সমন্বিত মানুষ, তিনি একজন পারদর্শীর মতই এব্রাজ বাজাতে পারেন এবং সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর সমঝদারিত্ব অনেক বিশেষজ্ঞের চাইতেও গভীর। তিনি জ্ঞানের সকল শাখাতেই আলোচনা করতে ভালবাসেন এবং তাঁর ড্রয়িং-রুম সব ধরণের শৃঙ্খলার মানুষকেই আকৃষ্ট করে। দেশজ ভাষার মাধ্যমে জনগণের কাছে বিজ্ঞান প্রচারের জন্য তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকাশ খুঁজেছে। এই বিশ্বের প্রতি তাঁর সর্ববস্তু আলিঙ্গনকারী প্রেমের জগতে এমন কি বিড়ালেরও নিজস্ব স্থান ছিল এবং স্বর্গে যদি বিড়ালের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত না হত, তবে তিনি যুধিষ্ঠিরের মতই স্বর্গবাসের সুযোগ ত্যাগ করতে ইতস্ততঃ করতেন না। স্পষ্টাস্পষ্টি কথা বলায়ও তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। একবার তিনি এদেশে পরিভ্রমণকারী একজন প্রসিদ্ধ রাশিয়ান বৈজ্ঞানিককে অত্যন্ত সরল ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিনা—এই প্রশ্নের নেতিবাচক উত্তরের ভাষাও ছিল তেমনই দ্ব্যর্থহীন। তাঁর হিউমার-বোধ, বিনয়, আত্ম-সমালোচনা এবং সৌজন্য তাঁকে একজন আধুনিক মানুষের পরিবর্তে বরং তাঁকে অতীতের একজন ঋষিপ্রতিম পুরুষ ক'রে তুলেছে। জীবনকে তিনি তার বহু বিচিত্র স্তরের মধ্য দিয়ে দেখেছেন তার সহাস্য সূর্য্যলোক ও ক্রন্দনবিধুর মেঘমালাকে।

১৯৭৪ সালটি বসু সংখ্যায়ন বৎসর রূপে উদ্‌যাপিত হবার জন্য নির্দ্ধারিত হয়েছে। এই বৎসরের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে বসু সংখ্যায়নের ওপর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ এতে অংশ গ্রহণ করেন। এর অত্যল্পকাল পরেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, কিন্তু কেউ ধারণাও করতে পারিনি যে তাঁর অসুস্থতা এত গুরুতর যে তাঁর জীবন দ্রুত অবসিত হয়ে যাবে। সেই বিষাদময় মুহূর্ত্তটি এল ১৯৭৪-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিকুঞ্জ সেন

বাণিজ্যযুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের নিজস্ব শিল্পের অগ্রগতিকে প্রতিহত করে এদেশে ইংরেজের অবাধ বাণিজ্যের পথটিকে প্রশস্ত করা। তা না করতে পারলে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য জগৎ নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। ইংরেজ একথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করছিল যে শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠালাভ না করতে পারলে ইংলণ্ডের ধ্বংস অনিবার্য্য, কেননা চাষের জমির সেখানে এত অভাব যে সেখানকার অধিবাসীদের জন্য খাদ্য বিদেশ থেকে আমদানী করতেই হবে এবং সে খাদ্য আমদানী করতে হবে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে। এই কারণেই ভারতের প্রতি এত লুব্ধদৃষ্টি ইংরেজের এবং এই কারণেই ভারতবর্ষে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করবার ব্যাপক পরিকল্পনা ইংরেজ গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের শিল্পসম্ভার গড়ে তুলতে হলে বিরাট অর্থের প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখান থেকে এই বিরাট অর্থ ইংরেজশক্তি আহরণ করতে পারে। তাই আর কালবিলম্ব না করে তারা ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করবার ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। শুধু গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় নি, তাকে কাজে রূপায়িত করতে গিয়ে কোন কাজকেই তারা হেয় মনে করে নি। নরহত্যা, শিশুহত্যা থেকে সুরু করে অবাধ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের ভয় দেখিয়ে তারা তাদের দুরভিসন্ধিকে চরিতার্থ করেছে।

Mills History of British

(৩৩৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জাতীয় শিক্ষক সূর্য সেন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ডঃ আশা দাস

অস্বাভাবিক অনুভূতি প্রবণতাই সূর্য সেনকে চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাঙলার সাধারণ লোকের কাছে স্বপ্নের মানুষে পরিণত করেছিল। তারা সেদিন ভাবত সূর্য সেন অদৃশ্য হওয়ার মন্ত্র জানেন, তিনি যাদুকর। তাঁকে ধরার জন্য পুলিশ বৎসরের পর বৎসর কত চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে, পুলিশ বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে তিনি নিরাপদে বের হয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছেন কেউ টেরও পায়নি। তিনি কখনও ঘোমটা মাথায় দিয়ে সেজেছেন গৃহ বধূ, কখনও টোডা মাথায় চাষী, কখনও ধূলি ধূসরিতকায় নেংটি পরা পাগল বা ভিখারী আরো কত কী! তাঁর অনুগামীরা পরিহাস করে বলত—মাষ্টারদা আপনি এত দুর্বল শরীর যে বিপদে পড়লে ছুটে পালাতেও পারবেন না, আবার গায়ের জোরে পুলিশ মেরে নিরাপদও হতে পারবেন না। আপনি না জানেন ঘোড়ায় চড়তে, না জানেন সাইকেল চালাতে। সাঁতার কেটে বড় নদী পার হওয়ার শক্তিও নেই, আপনি খুব তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে যাবেন।' মাষ্টারদা কোন জবাব না দিয়ে কেবল হাসতেন। ভবিষ্যতে দেখা গেল বীর যোদ্ধারা সবাই একে একে ধরা পড়েছেন। কিন্তু মাষ্টারদা তখনও পলাতক জীবন যাপন করে, বিপ্লবী সংগ্রামকে অবিসংবাদী নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।

একটি আদর্শ বিপ্লবী চরিত্র যা হওয়া উচিত এক কথায় বলা চলে সূর্যসেন ছিলেন তাই—শুধুই তাই। একেবারে খাঁটি ও সার্থক একজন বিপ্লবী। তিনি সংস্কারক নহেন, অহিংস অসহযোগীও নহেন আবার কেবল অহিংস মন্ত্রের অনুধ্যানও করেননি। জাতির জীবনে যুগযুগান্তর ধরে জমে উঠা স্তূপীকৃত আবর্জনা সম্ভার অপসারণের জন্য আগেই প্রয়োজন পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন। এই প্রয়োজনে তিনি হিংসাকে আশ্রয় করেন। আবার প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আপোস মীমাংসা করে সন্ধি স্থাপন করা তাঁর কাজ নয়। সর্বপ্রকার জাড্যতা, জড়তা ও হৃদয় দৌর্বল্যকে তিনি ঘৃণা করেছেন, মিথ্যা ও অসত্যের বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিদীপ্ত কণ্ঠ কোন অবস্থাতেই স্তব্ধ হয়নি। অন্যায় করা আর অন্যায় সহ্য করা কোনটাই তাঁর ক্ষমা পায়নি। গতানুগতিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য তিনি রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথকেই বরণ করেছেন। এই চলার পথে কোন প্রকার দয়ামায়া, মোহ, স্নেহ, প্রেম ভালবাসা তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও পথ-ভ্রষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু তা হলেও কেবল রক্তস্রোত বইয়ে দিয়ে যাওয়া বা কেবল ধ্বংস করাই তাঁর জীবনের শেষ কথা নয়। ধ্বংসের তূর্যধ্বনি করেই তিনি সংগ্রামে অবতীর্ণ হননি, নূতন সৃষ্টির নবজাত তৃণাঙ্কুরটিকেও মাতৃমমতায় বক্ষে ধারণ করেছেন। বর্তমান কালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মহাসিন্ধুর ওপারে ভাবী যুগের সূর্য-প্রভাতের সুন্দর স্বপ্নে তাঁর দু চোখ মগ্ন থাকত। সেই সুদিনের প্রত্যাশায় বর্তমানের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। কোমলে—কঠোরে, ভালবাসায়-অনীহায় তিনি এক বিচিত্র পুরুষ। জীবন আর মৃত্যু দুই-ই এক ছিল এই মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের কাছে। সাফল্যে ব্যর্থতায়, সুখে দুঃখে, জীবনে মৃত্যুতে সব অবস্থাতেই হৃদয় অকম্পিত, ধৈর্য অবিচলিত। তিনি ছিলেন কর্তব্যে দৃঢ়িষ্ঠ, আদর্শে একনিষ্ঠ এবং সংকল্পে দুর্জয়।

নিয়মানুবর্তিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ছিল তাঁর সার্থকতার একটি চাবিকাঠি। প্রয়োজনীয় কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করতেই হবে। কোন কারণেই বিরত হওয়া চলবে না। কেবল কাজ আর কাজ, সমগ্র জীবনব্যাপী এক নিরবচ্ছিন্ন কর্মস্রোত যেন বয়ে চলেছে, কোথাও এতটুকুও কর্মবিরতি বা অবসর যাপনের ফাঁক নেই। বিপ্লবীদের বলতেন—'কর্মজীবনে কর্ম সমাপ্তিই হল অবসর।' কাজের যোগ্যতা বিচার করে নিয়ম-নিষ্ঠার প্রতি আনুগত্য দেখে তবেই কোন কর্মীকে তিনি সামনের আসনে বসাতেন। বয়সের প্রবীনতা বিচার করে নয়। নিয়মানুবর্তিতার প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য তিনি শুধু অনুগামী-দের কাছেই প্রত্যাশা করেননি, নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও এবং আচরণেও তার নিদর্শন রেখেছেন। জালালাবাদের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে দেখা যায় সর্বাধি-নায়ক সূর্যসেন একজন সাধারণ সেনানীর ন্যায় সেনাপতির আদেশের প্রত্যাশায় পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

অস্বাভাবিক অনুভূতি প্রবণতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে দিয়েছিল এক অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। আজীবন রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথে চলতে চলতে তিনি এক অস্বাভাবিক মানসিকতা লাভ করেন। এই মানসিকতা তাঁকে এক অনন্য-সাধারণ তৃতীয় চক্ষুর অধিকারী করে। শ্রবণ, দর্শন, মনন সর্বেন্দ্রিয়কে সদা সতর্ক, সজাগ, সক্রিয় রাখার পরিণতি স্বরূপ তিনি এক উন্নত মানসিক স্তরে উপনীত হন। সবাই যা দেখে, যা শোনে, যা অনুভব করে তাঁর দেখাশোনা ও বোঝা ছিল তদ-তিরিক্ত কিছু। দূরাগত মৃদু শব্দ, পাখীর ডাক ও পাখার ঝটপটানি ও নানা শব্দের ইঙ্গিত বুঝে নিতে তাঁর একটুকুও বিলম্ব হত না। গাঢ় অন্ধকারেও মানুষের চলাফেরার প্রকৃতি ও অভিসন্ধি বুঝতে পারতেন। এই

প্রশ্ন আসতে পারে মাষ্টারদা কি যথার্থই সার্থক বিপ্লবী? ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ত ভারতবর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি দিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে বলা যায়—দেশমাতৃকার দাসত্ব শৃঙ্খল মোচনের জন্য যে মহাযজ্ঞের আয়োজন তিনি করেছিলেন তাতে বহু মূল্যবান প্রাণ বলি গেছে, কিন্তু বিপ্লবের আগুনে যে মশাল তিনি জ্বালিয়ে গেলেন সে আলোয় ভাবী যুগের মানুষ পথ চিনে নিয়েছে, কেবল তিন দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কবল থেকে চট্টগ্রামকে পৃথক করে রেখে 'প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী জাতীয় সরকার' গঠন করাতেই এই বিপ্লবের শেষ নয়, এই বিদ্রোহের চরম সার্থকতা হল এ বিপ্লব ভারতের জনগণকে, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায়কে নূতন প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। এই বিপ্লবের শিক্ষা—গভীর দেশপ্রেম, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, বলিষ্ঠ নীতিবোধ এবং কঠিন শৃঙ্খলা। তাঁর অন্তিম আকাঙ্ক্ষা—'বিপ্লবের আগুনে যে মশাল জেলে রেখে গেলাম তা যেন কোন দিন নিভে না যায়।' ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের উত্তর ইতিহাস সেই আকাঙ্খা পূরণ করেছে।

মাষ্টারদার সংযম ত্যাগনিষ্ঠা ও কৃচ্ছ্রতাসাধনের কোন তুলনাই হয় না। এই ভোগবিলাস বৈভবের রাজ্যে তিনি যেন সমুদ্রে ভাসমান একটি হিম শৈলের মতই একক ও নিঃসঙ্গ। স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর মহানায়ক সূর্যসেন ছিলেন সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী। চাঁদা সংগ্রহ, ডাকাতি, বিপ্লবী ছেলেদের ব্যক্তিগত দান এবং চট্টগ্রামের স্বদেশ প্রেমিক মা-বোনদের স্বেচ্ছাকৃত দানে দলের বিপুল তহবিল তিনি সংগঠন করেন। কিন্তু এই সংগ্রহ থেকে কোন দিন একটি পয়সাও তিনি নিজের জন্য ব্যয় করেন নি। ১৯৩০ সালের ১৬ই এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত শিক্ষক সূর্যসেন প্রাইভেট টিউশনী করেছেন। এই টিউশনির টাকায় নিজের ব্যক্তিগত অবশ্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সমাধা করে আরো কত গরীব দুঃস্থ ছেলেকে পরীক্ষার ফিস, বই-র টাকা, স্কুলের বেতন জুগিয়েছেন তার হিসেব নেই। একবার মাইনের টাকা যা পেয়েছেন সব দান করে দিয়ে দু'দিন কেবল চা খেয়েই কাটিয়ে দিলেন; এ সময় তাঁর হাতে একটি পয়সা এমন কি ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত ছিল না। তবুও দলের তহবিল থেকে একটি পয়সাও তিনি গ্রহণ করেন নি। সেদিন তাঁর অনুগামী কোন বিপ্লবীর অভিযোগ ছিল—আপনার নিজের টাকা ফুরিয়ে গেলেও, কাজের টাকা তো আছে। আপনার জীবনের থেকে সে টাকার দাম তো বেশী নয়। সেখান থেকে নিলেন না কেন? তিনি বলেছিলেন—কাজের টাকা তো কাজের জন্যই। সেটাকা তো আমি ব্যয় করতে পারিনে। আমাদের আদর্শ হচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়া। তাঁর এই উক্তি স্মরণ করিয়ে দেয় মহান সম্রাট নাসীরউদ্দিনকে যিনি প্রজাদের রাজকরকে রাজার কাছে প্রজার গচ্ছিত ধন বলে মনে করতেন। স্বয়ং সম্রাট স্বহস্তে কোরান নকল করে সেই অর্থে জীবিকা নির্বাহ করতেন; কিন্তু রাজকরের একটি পয়সাও নিজের জন্য খরচ করতেন না। একই ত্যাগ, একই সংযম ও স্বনির্ভরতার আদর্শ সূর্যসেনকেও মহানায়কের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

আদর্শের আহ্বানে ছিন্নকন্থা পরিহিত রাজপুত্র বিষয়বিরাগী হয়ে অমৃতলোকের সন্ধানে বের হয়েছিলেন। এ ভারতের আরো কত কত রাজা, মহারাজা এক মুহূর্তে রাজসিংহাসন রাজবৈভব ছেড়ে শান্তরসাশ্রিত তপোবনের কুটিরে অধ্যাত্মচিন্তায় নিমগ্ন হয়েছেন। এই সর্বত্যাগী বিপ্লবীর জীবনেও দেখা যায় জীবনের এক পরম মুহূর্তে বাসরকক্ষের মধুরতম আহ্বান উপেক্ষা করে ভোগের দ্বারপ্রান্ত থেকে চরম নিস্পৃহতার অচঞ্চল চরণে তিনি ফিরে গেলেন। মহাযোগীর মত শপথ গ্রহণ করলেন—ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করে আজীবন দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য সংগ্রাম করবেন। ভারতের ইতিহাস জানে জীবনের শেষ রক্ত বিন্দুটিও এই মহৎ যজ্ঞে তিনি সমর্পণ করে গেছেন। তাঁর সাহচর্যে কত চোর সাধু হয়েছে, কত খুনী গুনী হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের তপোবনে যেমন ভারত ইতিহাসের চরম অভিপ্রায়টির উজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছিল, তেমনি পরাধীন ভারতের সর্বোত্তম শিক্ষকের বিপ্লবী প্রতিভার স্পর্শে 'সাম্যাশ্রম'-এর দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। সে আশ্রমের শিক্ষায় সে দিন বাঙালীর বিপ্লবী আত্মা ও চিত্তাভিব্যক্তির প্রবাহ অপ্রকাশের গুহা থেকে মুক্ত হয়ে স্থির লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হয়েছে।

(৩২২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বুদ্ধদেব
অংশুমান

বিশ্বমানুষের কল্যাণব্রতে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ ক'রে দেবেন, তাঁর জীবনের কোন অংশই তিনি আর নিজের জন্য রাখবেন না, এইরূপ একটি প্রেরণাই বুদ্ধদেবের ভিতর সম্ভবতঃ কাজ করেছিল। এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে যা-কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল, তিনি তাদের সব কিছুকেই নির্মম ভাবে নির্মূল করার আয়োজন চালিয়েছিলেন। মানুষ যদি তার আপন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্ভাবনায় আস্থা রাখে এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অনুশীলন চালানোতেও আগ্রহ দেখা দেয় তার, এবং যে আগ্রহ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণই সংগত, তখন হয়ত তার ইচ্ছা যাবে পৃথিবীতে কোন একটি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যাওয়া। যার ফলে লোকে তাকে তার মৃত্যুর পরও চিরদিন একজন খুব বিশাল প্রতিভাবান শিল্পী, কবি, দার্শনিক বা চিন্তাশীল মনীষীরূপে অর্ঘ্য নিবেদন করবে। ফলে তখন সে হয়ত চাইবে সাধারণের পক্ষে দুর্বোধ্য কঠিন পরিভাষার কোন দর্শন রচনা ক'রে তুলতে বা সুন্দর কল্পনার সাহায্যে কোন একটি মহৎ কাব্যসৃষ্টি করতে, বা যদি তাও না পারে তবে নিদেনপক্ষে সমালোচক হিসাবে প্রথিতযশা হতে। ফলে তখন সেই বাসনাকে সার্থক ক'রে তোলাই তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে। তখন জগতের মানুষের দুঃখকেও সে ব্যবহার করবে নেহাৎই তার শিল্প, সাহিত্য সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে; জগতের মানুষের অপরিসীম বেদনা আর ব্যর্থতা আর হতাশা আর বিক্ষোভ তখন আর তাদের জন্য তাকে আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা জোগাবে না। কিন্তু আলবার্ট সোয়াইৎজার, যিনি ইউরোপ থেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্বাসিত করেছিলেন গহন আফ্রিকার রোগ-দুঃখ পরিকীর্ণ প্রান্তরে, তিনিও যদি আত্মগৌরবের জন্য তা-ই করতেন, তবে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেরা কী কিছুমাত্র উপকৃত হত? সেই কারণেই বুদ্ধদেবকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের বাসনাকেও ধ্বংস করতে হয়েছিল, তিনি চেয়েছিলেন পরিপূর্ণ নির্ব্বাণ।

আমরা নিজেদের জীবনের কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে নিজের জন্য রাখতে পারি এবং বাকী অংশটুকু দান করতে পারি বিশ্ববাসীকে। আমরা যখন কবিতা লিখি, বা শিল্পসম্ভোগ করি, বা তুরীয় ধ্যানে ব্রহ্মাস্বাদ উপভোগ করি, তখন আমরা নিজের জীবনকে নিজেরই জন্য ব্যবহার করছি মাত্র। কিন্তু যখন আমরা পরহিতের জন্য চিন্তা করি, বা পথিপার্শ্বে অবনত হয়ে কুষ্ঠরোগীর সেবায় প্রবৃত্ত হই, তখন আমাদের নিজস্ব জীবন বিশ্বমানবের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে একথা আমরা বলতে পারি। বুদ্ধদেব চেয়েছিলেন তিনি তাঁর সম্পূর্ণ জীবনই মানব কল্যাণ চিন্তায় সঁপে দেবেন।

বুদ্ধদেব একথাও জানতেন যে মানুষের নিকট ঈশ্বর বা পরলোক সম্বন্ধীয় কোন কথা উত্থাপন করাটা একেবারেই বৃথা, এমনকি ক্ষতিকারকও। কারণ এর দ্বারা মানুষের কৌতূহলকে তার জীবনের মূল সমস্যাবলীর থেকে দূরে সরিয়ে আনা হয় মাত্র। সকল মানুষের প্রতি ঈশ্বরের যে নির্দেশ অধিকাংশ মানুষ সেই নির্দেশের একটি অক্ষরও পালনে আগ্রহ না দেখিয়ে তখন ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয় বা পরলোকের রহস্য নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ে। মানুষ স্বভাবতঃই দায়িত্ব এড়াতে চায়, কেননা দায়িত্ব এড়িয়ে পলায়ন করতে না জানলে সুখে থাকা যায় না। এর দ্বারা যে জগতে প্রতিনিয়ত আর্ত্ত মানুষের হাহাকার ধ্বনিত হচ্ছে, সেই জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাত্র, তার কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের নির্দেশ হল: যেখানেই দেখবে দুর্বলের ওপর শক্তিমান তার শক্তির হস্তে অত্যাচার চালাচ্ছে সেখানেই অত্যাচারিতের পাশে গিয়ে দাঁড়াও, যেখানেই দেখবে মানুষ লাঞ্ছিত হচ্ছে মানুষেরই হাতে সেখানেই ছুটে যাও, লাঞ্ছিত মানুষের বেদনার প্রতিকার করতে। যেখানেই দেখবে ক্ষুধিত নিরন্ন জনতা দীর্ঘ দিনের উপবাসে ধুঁকছে সেখানেই তাদের মুখে আহার্য্য তুলে দেবার বন্দোবস্ত কর, পথিপার্শ্বে যদি দেখ কোন মানুষ ব্যাধি-যন্ত্রনায় কাতরাচ্ছে তবে বুঝতে পারবে সেখানে তোমার সেবা-শুশ্রূষার হাত প্রসারিত করার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ যেহেতু স্বভাবতঃই সুখে থাকতে চায় তাই অপরের দুঃখের বোঝাকে আপন স্কন্ধে টেনে নেওয়াকে সে পাগলামি ব'লে ভাবে। মানুষ তাই ঈশ্বরের নির্দেশকে উপেক্ষা ক'রে একাকী ঈশ্বরের অনন্ত আনন্দকে ভোগ করতে চায়। বুদ্ধদেব তাই সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছিলেন, কেননা তিনি ভেবেছিলেন ঈশ্বরকে স্বীকৃতি দিলে জগতের কোন কল্যাণ হবে না। ভারতবর্ষের মানুষ একদিন নিজেরা সুখে থাকবার জন্য কর্মফল ও পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে এই জীবনে মানুষের দুঃখভোগ—এইরূপ এক অদ্ভুত থিওরী আবিষ্কার করেছিল। এই থিওরীতে গভীরভাবে বিশ্বাস রাখলে মানুষ হিসাবে অপর একটি দুর্দশায় পতিত মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যের যে দায় থাকে তাকে স্বচ্ছন্দে এড়িয়ে চলা যায়, বিবেকের উৎপীড়ন একটুও সইতে হয় না। কেননা তার নিজেরই পাপ যদি মানুষকে অপরিসীম দুঃখ কষ্ট যাতনার ভিতর টেনে নামায়, তবে

তাকে দুর্দশা থেকে উদ্ধারের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয় নিরর্থক। কেননা কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বিশ্ব-বিধানের নিকট থেকে এই শাস্তি তার প্রাপ্য। সুতরাং কেউ যদি স্বেচ্ছাব্রতী হয়ে তার ক্লেশভোগকেই লাঘব করতে চায়, তবে সে বিশ্ববিধান-কেই আঘাত করবে মাত্র। এই সব খিওরীর প্রচারকরা ভুলে যান যে, তাঁদের মতে ঈশ্বর মানুষের পাপের শাস্তিস্বরূপ দুঃখের ভিতর নিক্ষেপ করেন, তাঁরই প্রেরিত পুরুষেরা এসে পৃথিবীর সকল মানুষের মধ্যে আবার সেই ঈশ্বর কর্তৃক দণ্ডিত মানুষদের প্রতিই সর্বা-পেক্ষা অধিক করুণা প্রদর্শন ক'রে থাকেন। অপরাধীর অপরাধের জন্য যখন দণ্ডবিধান করা হয় তখন তার পিছনে স্পষ্ট যে উদ্দেশ্য থাকে তা হল নিয়ত যাতনার মধ্য দিয়ে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলা এবং সেই সাথে এই আশাও পোষণ করা যে, অপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠলে অপরাধ-প্রবণ মানসিকতাকে সে আপনা থেকেই পরিত্যাগ ক'রে চিরদিনের মতোই শুদ্ধ হয়ে উঠবে। অন্য যে কোনরূপ উদ্দেশ্য নিয়েই অপরাধের শাস্তিবিধান করা হোক না কেন, তাদের সবকটিই ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং ঈশ্বর যদি পাপী মানুষকে শুদ্ধচিত্ত ক'রে তোলার জন্য তাকে অশেষ দুঃখভোগ। করান (ঈশ্বর যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের সাথে তুলনায় প্রাজ্ঞতায় অপকৃষ্ট না হন, তবে তিনি এই একটি মাত্র উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই কাজ করবেন, প্রতিশোধাত্মক হিংস্র বাসনা নিয়ে নয়), তবে তিনি নিশ্চয়ই এটা চাইবেন মানুষটির শাস্তি-ভোগের প্রাক্কালটুকু অন্ততঃ যেন নিরবচ্ছিন্ন যাতনার ভিতর দিয়ে অতি-বাহিত হয় এবং যতদিন না তিনি উপলব্ধি করবেন যে তাঁর চিত্তের পাপ-মুক্তি ঘটেছে ততদিন পর্য্যন্ত সেই মানুষটির দুঃখভারকে লাঘব করার চিন্তা তিনি তার মনেও ঠাঁই দেবেন না, এবং সেই সাথে তিনি এও দেখবেন যে অপর কোন মানুষ যেন মানুষটির প্রতি বেদনাবোধ ক'রে তার দুঃখকে ঝরিয়ে দিতে না পারে। কেননা যথানির্দ্দিষ্ট শাস্তিভোগের পূর্ব্বেই, তার অপরাধের ভার লাঘব হবার পূর্ব্বেই, যদি কেউ এসে তাকে মুক্তি দেয় তবে সে মানুষটিরই চরম ক্ষতিসাধন করবে মাত্র। কেননা ঈশ্বর তাকে চির-কালের মতোই সৎ, শুদ্ধ ও পবিত্র ক'রে তুলবার জন্য যে আয়োজন করে-ছিলেন, সেই আয়োজনকেই তা তলে তলে আঘাত করবে মাত্র এবং ঈশ্বরের দিক থেকে তাকে পুনরায় আঘাত করবার প্রয়োজন দেখা দেবে। অথচ দেখা যায়, কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে এসে এই সব মানুষের দুঃখ-ভার লাঘব করবার জন্যই সর্বাধিক ব্যগ্রতা দেখান, এবং অনেক ক্ষেত্রে লাঘব করেও থাকেন। সুতরাং পূর্ব্ব-জন্মের পাপের ফলেই বর্ত্তমান জীবনে লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন লাভ,—এই খিওরী কী আর টেঁকে?

উত্তর প্রদেশের চিঠি

করুণাময় চক্রবর্ত্তী

(১)

শেষ পর্য্যন্ত সকল সন্দেহের অবসানে উত্তর প্রদেশে "ভোটের" মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে জয়ী হয়ে গদীয়ান হলো কংগ্রেস।

বহুচর্চ্চিত ভোট পর্ব্বের ফলাফল বহুগাজীকে মুখ্যমন্ত্রীত্বের পদে বহাল করেছে সত্য; কিন্তু জনসাধারণের কাছে এর কোন মূল্যই নেই। বুদ্ধিজীবি জনসাধারণ ধরে নিয়েছে যে এ গণতান্ত্রিক ভোট যুদ্ধ একচেটিয়া পুঁজিবাদ আর বনেদী-জোতদারের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের ভূশুণ্ডি বাহিনীর নয়া রাষ্ট্রীক পুঁজিবাদ ও পঞ্চায়েত প্রধানদের লড়াই। পঞ্চায়েত প্রধানের জায়গায় 'নয়া কুলাকস' (!) আখ্যাটাই হয়তঃ এদের মর্য্যাদা (!) দিবে সত্যি-কারের! ভোটের নামে দুপক্ষই যখন দেশ-সমাজ-রাজনৈতিক মূল্যবোধ, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক নিষ্ঠার প্রয়োজনটা শিকায় তুলে দুর্নীতির চরম পথটার নজীরে 'জাত-রক্তের' হিসেবটা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তখন শ্রীমতী গান্ধীর সমাজতন্ত্রের চমৎকারিতটা নীল আলোর স্পর্শে যেন সত্যি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল!

গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্যে দুপক্ষেরই সে কি মনমাতানোর ভাষণ! কিন্তু ভোটদাতা এবার নীরব নিস্পৃহ! ভোটের সংখ্যাই তার প্রমাণ। শহরে বুদ্ধিজীবিদের কাছে এর কোন মূল্য নেই—অবশ্য গ্রাম্য কিষানরা আজো

বৃহৎ জোতদারদের বশংবদ। তাছাড়া অভাব যে তাদের নিত্যসহচর! তাই যে মোল্লার দৌড় যেদিকে—সেদিক থেকেই তার ওজনটা হয়েছে ভারী! রাজনৈতিক বিচারের প্রশস্ত জমিন আজো এখানে তৈরী হয়নি। এ লড়াইয়ের ফলাফল বিচারে রাজনৈতিক গবেষণার কোন মুসাই নেই—না আছে কোন তাৎপর্য!

কংগ্রেসের এ জয়ের সংকেতে 'নিশানা' দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিল অনেক আগেই। 'নিশানা'র ভাষায় উত্তর প্রদেশের এ সংগ্রাম দুই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ক্ষমতা দখলের রাজনৈতিক লড়াই। এখানে নেই কোন রাজনৈতিক উন্নততর আদর্শ। জনতাকে ফাঁকি দিয়ে গদী দখলের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মধ্যেই আজ দুই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের এ লড়াই। এরই মধ্যে জনতার একশ্রেণী বিভ্রান্ত, অপর শ্রেণী বীতশ্রদ্ধ হয়ে দর্শক-মাত্র!

তবুও ভাববার বিষয় একটু আছে বৈকি! বিরোধী শক্তির এত উচ্ছ্বাসের মধ্যেও কেন এ পরাজয়?

উত্তর প্রদেশের ভোট পর্বে শ্রীচরণ সিং যেন সত্যিকারের প্রতিনিধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র আর ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের (!)। সমাজ-বাদী রাজনারায়ণ সিং আর মুস্লিম মজলিশের নেতাদের সাথে যুক্তফ্রন্ট করে শ্রীচরণ সিং সাক্ষাৎ গণতন্ত্রী হয়ে দাড়িয়েছিলেন কংগ্রেস নিধন-উৎসবে! গ্রামীন জোতদারদের সংযোগে কিষান-দের উপর শ্রীচরণ সিংয়ের প্রভাব যে জোড়দার এতে সন্দেহের অবকাশ নেই এতটুকু! সমাজবাদ আর মুস্লিম অসম্প্রদায়িকতা (!) মিলে শ্রীচরণ সিংয়ের 'কোমর কাছা' দৌড়ের স্পীড-ও ছিল যথেষ্ট। জনসংঘ-ও আগে থেকেই shadow cabinet তৈরী করে একক প্রচেষ্টায় মন্ত্রীত্ব দখলের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রণক্ষেত্রে নেমে এসেছিল, কংগ্রেস কমিউনিষ্ট তথা বামপন্থীর মোর্চ্চার বিরুদ্ধে। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা গেল শ্রীচরণ সিং পূর্ব্বের তুলনায় ভোট-পেয়েছেন কম। (যদিও সংযুক্ত সমাজ-তন্ত্রী আর মুস্লিম মজলিশের মিলিত ভোট পূর্ব্বের চেয়ে বেড়েছে) জনসংঘ ও ১৯৬৭ সনের তুলনায় আসন পেয়েছেন কম। কংগ্রেস-কমিউনিষ্টদের মিলিত সমঝোতার কাছে শ্রীচরণ সিং, জনসংঘের এ পরাজয় দক্ষিণমুখী আত্মঘাতী নেশ উত্তর প্রদেশে একটা অঘটন-ঘৈকি! বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধী যেখানে নীতিগতভাবে একটা ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে চলছেন। বস্তুতঃ উত্তর প্রদেশের এ লড়াই বাহ্যতঃ ত্রিমুখী হলেও গুণগতভাবে দ্বিমুখী বললে ভুল হবে না। কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট সরকারী গাটছড়ার বিরুদ্ধে বি, কে, ডি-জনসংঘেরই বিরোধী শক্তির লড়াই। যদিও জনসংঘ শেষ পর্যন্ত আলাদাই ছিল—তবুও যেখানে কোন আদর্শগত মৌলিক পার্থক্য নেই সেখানে লড়াই-টাও নীতিহীন ক্ষমতা দখলের প্রস্তুতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জনতা এটা উপলব্ধি ঠিকমত না করতে পারলেও তামাসা দেখেছে অবশ্যই। জনসংঘ আর শ্রীচরণ সিং মোর্চ্চার মধ্যে কোন আদর্শগত পার্থক্য নেই বল্লেই চলে।

তাছাড়া শ্রীচরণ সিং কৃষি ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীলদের পথ প্রদর্শক বলেই পরিচিত। শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশে নয় এ ব্যাপারে সমগ্র দেশেই তার সুনাম (!)। শাসন ব্যবস্থায় শ্রীচরণ সিং একজন জবরদস্ত-লোক বলে পরিচয় দিলেও বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার কিছু কিছু পরিকল্পনা বুদ্ধিজীবি শিক্ষিত সমাজে অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল। এছাড়াও খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয়করণ ব্যবস্থায় মৌলিক বিরোধীতাও যেন তার প্রকৃত রূপটা প্রকাশ করে দিয়েছে। ভ্রষ্টাচার বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে শ্রীচরণ সিংয়ের উচ্চারে স্বভাবতই একটা প্রশ্ন জেগেছে যে স্বাধীন ভারতে একজন প্রদেশ মন্ত্রী হিসেবে শ্রীচরণ সিং-ও ত গত বিশ বছর কংগ্রেসী আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। কোথায়; একবারও ত দেখা যায়নি ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে তার উচ্চার! কংগ্রেস তিনি ছেড়েছেন আদর্শগত বিরোধে নয়; লোভের আতিশয্যে! জনসংঘের একটা ভিৎ আছে উত্তর প্রদেশে। আর, এস, এস বাহিনীর প্রেরণা ছাড়াও ছোট বড় ব্যবসা-য়ীরাই যেখানে জনসংঘের স্তম্ভ সেখানে আশা করা গিয়েছিল যে জনসংঘ একটা ভাল score করবে এ প্রদেশে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও হয়নি। কংগ্রেস ইলেকশন লড়েছে strategic role নিয়ে। ধর্ম নিরপেক্ষ-তার ছত্রছায়ায় হিন্দু-মুস্লিম-হরিজনদের আলাদা (!) করে যার যার সীমায় প্রার্থী দিয়ে ইলেকশনের ফলাফলটা বের করে নিয়েছে নিজেদের অনুকূলে। কিষাণ ভোটের সহায়ক হওয়ায় তার স্বপক্ষে ছিল কমিউনিষ্ট। তাছাড়া শুধু টাকাই নয় কংগ্রেসের সহায়ক হয়েছে আমলাতন্ত্র ও দলগত সংগঠন দুইই। কিন্তু বিরোধী শক্তির মধ্যে জনসংঘ ছাড়া আর কারো দলগত সংগঠন বলতে কিছুই নেই এদেশে। শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত Image টাকে সামনে রেখে; দল ও নীতির উর্দ্ধে বড় বড় কথার জাহাজ ছেড়ে দিয়ে Election-এ জয় লাভ হয় না। নিজের ব্যক্তিত্ব জাঁকিয়ে যদি কোথাও তা সম্ভব হয়—সেটাকে accident বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে।

দলহীন—কর্মসূচীহীন অবস্থাটা বাদ দিলেও পরাজয়ের আরো কারণ আছে! বিংশ শতাব্দীর এ জাগরণের যুগে আজো যাঁরা গণতন্ত্রকে শুধুমাত্র

গদী দখলের হাতিয়ার রূপেই ব্যবহার করতে চান, যারা জনতার কাঁধে ভর করে একমাত্র নিজের Imageটাকে দেখাবার নীতিহীন নেশায় মশগুল হয়ে পাগলপ্রায় হয়ে উঠেন, তারাই আজকের মৌলিক গণতান্ত্রিক বিচার-শালায় গণতন্ত্রের প্রকৃত হত্যাকারী! শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকু হাতে পাওয়ার আশায় গণতন্ত্রের বিচার থেকে political democracyকে, গণতন্ত্রের আর্থিক সমবণ্টন নীতির আদর্শ থেকে সরিয়ে নিয়ে জনতার সামনে দেশপ্রেমিক মোহন্তরূপে দেখা দেওয়ার সুচতুর প্রচেষ্টা টা শুধুমাত্র গণতন্ত্র বিরোধীই নয়—বিপ্লব বিরোধীও। আজকের সচল দুনিয়ায় গণতন্ত্র তথা বিপ্লব বিরোধের এ নমুনা-টাই হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রধান যন্ত্র। বিপ্লব—বিদ্রোহের ফাঁকা বুলি, দেশপ্রেমের চোস্ত তথা selected শব্দ প্রয়োগেই হচ্ছে অসুস্থ দেশবাসীকে আরো বিভ্রান্ত করবার অপূর্ব্ব কৌশল। জনসংঘ, বি, কে, ডি জনসাধারণের কাছে রেখেছিলেন শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতি দমনের আশ্বাসন, সস্তায় গম দেবার অলীক পরিকল্পনাহীন কথাবার্তা। কিন্তু কোন সুস্থ বাস্তব দৃষ্টিভংগী ছিলনা ওদের প্রস্তাবে। কেবলমাত্র জাতীয় ঐতিহ্যের মুখরোচক কথাবার্তা আর রক্তের কৌলিন্য প্রচারে আজ যে দেশের মানুষ মোহিত হয়না উত্তর প্রদেশের ইলেকশন তারও একটা প্রমাণ। এ ছাড়া পরোক্ষে এরাও সমাজবাদের দোহাই দিয়ে আচরণে প্রকাশ করেন যেন প্রাক্তন জমিদারদের বংশ রক্ষা ছাড়াও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুঁজিবাদ তথা মালিক শ্রেণীর এরাই রক্ষা কবচ! মুখোসের আড়ালে এদের প্রকৃত রূপটাকে ধরে নেওয়া কঠিন বলেই হয়ত জনতা এদের কথাবার্তায় উৎসাহ দেখায় নি, ততটুকু যতটুকু ছিল এদের প্রচেষ্টা। যুদ্ধকালীন ব্যবসায়ীকে প্রতিযোগীতায় মুনাফার আশায় এরা যেমনি গোমাংস সাপ্লাইয়ের ঠিকাদারী নিতে পারেন, ঠিক তেমনি যুদ্ধ শেষেই গোহত্যা নিবারণ সমিতির সভাপতি হয়ে গোবধ বন্ধ করার আন্দোলনের নায়ক হয়ে এরা জেল খাটতেও পারেন। কাজেই জনতা এ সমস্ত জট পাকানো চারিত্রিক মহিমার জ্যামিতিক বিচার থেকে দূরে থাকতেই ভালবেসেছে। অবশ্য বিভ্রান্তি আছেই, থাকবেও। এক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধী সত্যি ধুরন্ধর। সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়েছেন তিনি,—কিন্তু গড়ে ওঠা পুঁজিবাদকে খতম করার কোন পন্থাই নেই তার কাছে, না আছে কোন চেষ্টা। শ্রীমতী গান্ধী জানেন যে আপোষ রফার রণনীতিতে কোন মতবাদকেই খতম করা যায় না—, পরন্তু জংলী চারাগাছের মতই জংগল বেড়ে চলে। তাই সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের আড়ালে নিজের Image-টাকে ধরে রেখে শাস্ত্রীয় বচনের মাধ্যমেই বাজীমাৎ করতে চেয়েছেন তিনি। তাই পরিকল্পনাহীন (unplanned) রাষ্ট্রীয়করণের পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের নামে নয়া পুঁজিবাদ তথা রাষ্ট্রিক পুঁজিবাদকে আওতায় এনে, খাস্ত রাষ্ট্রীয় করণের লৌকিক প্রচেষ্টাকেও বাঁচিয়ে রেখে, কৃষিক্ষেত্রে Levy system লাগিয়ে, আমলাতান্ত্রিক দাপটে সমাজতন্ত্র নিয়ে আসার আশ্বাস দিয়ে জনতার সামনে দাঁড়িয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। সমাজতান্ত্রিক প্রকোষ্ঠে নয়া পুঁজীতন্ত্রের এ অকাল বোধনের তাৎপর্য্য হয়ত আজো ধরা পড়েনি জনতার কাছে। তাই দক্ষিণ পন্থার ক্ষমতা দখলের দুই প্রতিক্রিয়াশীলদের এ সংগ্রামে সূক্ষ্মতর তথা Refined modified approach এরই জয় হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন আজ একটা দু পক্ষের এ রণহুংকারের মধ্যেই কী শোনা যাচ্ছেনা ফ্যাসিজীমের পদধ্বনি!

উত্তর প্রদেশের ইলেকশন তথা রাজনৈতিক কর্ম্ম যজ্ঞে বামপন্থীদের ভূমিকা সত্যি নির্জীব। ভারতবর্ষের রাজনীতির মৌলিক ভিত্তি বামপন্থা পরিবেশের অনুকূলে থাকলেও বার বারই দক্ষিণপন্থী জুজুদের জয় হয়েছে এখানে। অথচ এদেশের মানুষের ন্যূনতম আয় পৃথিবীর যে কোন দেশের শ্রমজীবি বা কিষাণের তুলনায় কম। এদেশের কিষাণ সম্প্রদায় আবাহমান কাল থেকেই গ্রামীন আধাসামন্তবাদী নীতির জগদ্দল পাথরে নিষ্পেষিত। এ দেশের শিল্পি-সাহিত্যিক-শিক্ষক সম্প্রদায় অর্দ্ধভুক্ত; শ্রমজীবি মজদুর এদেশে একশ্রেণীর দয়ার পাত্র। ব্যক্তি-কেন্দ্রীয় সমাজ ব্যবস্থায় এদেশের মানুষ 'কোন একজন মানুষ হিসেবে' আর্থিক উন্নত স্তরে পৌছুবার সুযোগ পেলেও সমাজ, সম্প্রদায় বা শ্রেণীগত ভাবে সাধারণ মানুষের ভবিষ্যত আজও রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক 'মঠাধীশ'-দের অন্ধ কুবরীতেই বন্ধ।

যদিও এদেশের ইতিহাস মানব সমাজের অগ্রগতির পথে বার বার দিয়েছে নতুনের সন্ধান, তবু নিজের ঘরে মার খেয়ে আজ বিভ্রান্ত ভারতবাসী। সমাজের কুলীন 'মোহন্ত'দের দাপটে আজও এদেশের জনতা নিষ্পেষিত নির্যাতিত। সাধারণ ভারতবাসীর সত্য নিষ্ঠার অভাব ছিলনা কোনদিন, কিন্তু অভাব ছিল জাতির নাড়ী বিচারের প্রকৃত বৈদ্যরাজের। সত্যি কথা বলতে বাধা নেই,—এটা ভারতবর্ষ; বুদ্ধিজীবি এদেশে জাতীয় প্রয়োজনে লাগেনি বা লাগবার সুযোগ পায়নি; বরং পণ্য দ্রব্যের মতই তারা আজও ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু! এমন একটা বিষম পরিস্থিতির মধ্যেই বামপন্থা রাজনৈতিক আদর্শ জাতীয় জীবনে নিয়ে আসে সজীবতা, প্রাণস্পন্দন। অথচ ভারতবর্ষে তা আজ নেই—

উত্তরপ্রদেশ, সে ত আরো পিছনের সারিতে!

বামপন্থা সর্ব্বত্রই গতিশীল।

নিজস্ব জীবন বোধ— যা সমাজকে নিয়ে চলে প্রগতির পথে। ব্যক্তি থেকে সমষ্টির প্রতি তারা আকর্ষণ, একক থেকে সামাজিক উৎকর্ষই তার চেষ্টা,—গোষ্ঠীপ্রেম নয় দেশ-প্রেমই বামপন্থার রাজনৈতিক আদর্শের মূলধন। পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় সময়ের সাথে জাতীয় আদর্শের ঐক্যসূত্র স্থাপনে সমাজকে বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে চলাতেই বামপন্থা রাজনীতির নিষ্ঠা। গতিশীল জীবনকে ব্যক্তির যূপকাষ্ঠে ঝুলিয়ে না রেখে সামাজিক উন্নততর কল্যাণে নিয়োজিত করাই বামপন্থা চিন্তাশীলতার ধর্ম। এখানেই আর জাগতিক জীবনবোধ, স্বীকৃতি নেয় সমাজতান্ত্রিক জীবনাদর্শকে! কিন্তু আজকের ভারতবর্ষ এ আদর্শের কাছে ভিখারী! যদিও এ দেশের সকল পরিবেশই তার অনুকূলে। আজকের ভারতবর্ষে সমাজের 'ধন-পশুরাই' মহান দেশপ্রেমিক! এদের চক্রান্তেই আজ দেখা দিয়েছে গোষ্ঠী-কেন্দ্রীয় নীতি। এদেশের শিক্ষিত অথচ যুব সমাজের বেকারী, ভূমিহীন আধপেটা কিষাণের আর্ত্তনাদ, শ্রমিক শ্রেণীর নির্যাতিত জীবন তথা সমাজের সকল স্তরের জীবনবোধের বিকৃত রূপায়ন আজ বামপন্থা বিপ্লববাদকে আহ্বান করতে পারতো—যদি না বাম-পন্থী রাজনীতির পুঁথিগত কুচক্র তথা সংগ্রাম বিমুখতা থেকে মুক্ত থাকতো। সংগ্রামের নামে হঠকারিতা এবং জাতীয় প্রয়োজন মুহূর্ত্তে সংগ্রাম বিমুখ মনো-বৃত্তিই আজ বামপন্থী রাজনীতির চরম ব্যর্থতাকে ডেকে এনেছে ভারতবর্ষে আর দুর্ব্বলতার পূর্ণ-সুযোগের সমন্বয়-কালীন সদ্ব্যবহার করে নিচ্ছে দক্ষিন-পন্থা রক্ষনশীল সম্প্রদায়। উত্তর প্রদেশের সাধরণ জনতার বেশির ভাগই ভূমিহীন কিষান। জোতদারদের জোয়ালে এরা চরমভাবে পর্য্যুদস্ত। বেকারী আজ উত্তর প্রদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে; শাসন ব্যবস্থার ভ্রষ্টাচার আজ সামাজিক জীবনে হয়ে উঠেছে পীড়াদায়ক—আদর্শের না আছে সুসংগঠিত প্রচার, না আছে হদিশ (!)।

দলগতভাবে আলাদা থাকলেও দক্ষিণপন্থীরা সর্ব্বত্রই জোটবদ্ধ। রাজ-নৈতিক কলাকৌশলে দক্ষিণপন্থা গোষ্ঠী তাদের সংরক্ষনশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বজায় রাখার রণকৌশলে বিপ্লবের নামাবলী গায়ে বিপ্লব বিরো-ধিতায় সুদক্ষ। প্রয়োজনে দেশের প্রগতিশীল বামপন্থা দমনে এরা বিদেশী স্বার্থও কাজে লাগাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে দেশের প্রতি আত্মীয়তাবোধ এদের কিছুই থাকে না। অথচ বামপন্থী দেশপ্রেম তার জমিন পেয়েও, সচল হয়েও অচলের গা ঘেঁষে চলেছে এ দেশে। প্রয়োজন মুহূর্ত্তে দক্ষিণপন্থা মায়ার কাছে আবদ্ধ হয়ে দেশ ও আদর্শের পরিপন্থী কাজেও কুণ্ঠাবোধ করে না এতটুকু! এক কথায় ভারত-বর্ষ থেকে বামপন্থা দেশপ্রেম আজ বিলুপ্তির পথে এবং তারই বিকৃতরূপ বামপন্থা-গদীপ্রেমকে মোহিত করে তুলেছে ভোট পর্ব্বের মাধ্যমে! তাই বড় বড় আদর্শের কথা যতই বলা হোক না কেন, আজকের ভারতবর্ষে দক্ষিন আর বামের লড়াইটা হচ্ছে গদী নিয়ে কাড়াকাড়ির লড়াই মাত্র! উত্তর প্রদেশে বামপন্থীদল আছে সত্য; কিন্তু কোন আদর্শ আছে মনে করলে ভুল হবে। উত্তর প্রদেশে বরাবরই রাজনীতি একটা পেশা। আর দশজন ব্যবহার জীবির মতই রাজনীতিকে একদলসুযোগ সন্ধানীর জীবিকা বলে ভুল হবে না। চরিত্রগত ভাবে একজন বামপন্থীকে এখানে আর একজন দক্ষিণ পন্থী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার সুযোগ নেহাৎই কম। সংগ্রাম বিরো-ধিতা দক্ষিনপন্থীর সহজাত ধর্ম হলেও এ দেশে সংগ্রাম বিমুখতাটা হ'চ্ছে বামপন্থীর নিয়মিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কিছু একটা করতে হবে তাই বক্তৃতায় বেঁচে থাকতে চান ওরা। আদর্শগত ভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপকে গ্রহন করবার মত সচেতন নেতৃত্ব আজ উত্তর প্রদেশে নেই; সংগঠন ত দূরের কথা। নতুবা আজ যদি একটা সুস্থ বামপন্থী রাজনৈতিক দল থাকতো এদেশে তাহলে উত্তর প্রদেশের এ উর্ব্বর জমিন ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠতে পারতো বিপ্লবী আদর্শের ছত্রচ্ছায়ায়—ইলেকশন পর্ব্বের মাধ্যমেই। এর প্রমাণ শত-করা ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েছেন বিরোধীদল, কিন্তু শতকরা ৩৪ শতাংশ-তেই কংগ্রেস হ'ল গদীয়ান। অথচ উত্তর প্রদেশের মানুষ বিরোধীদল সমূহকেই ধরে নিয়েছে বামপন্থী-শক্তি। এ পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন গোরখ-পুরে জর্জ ফার্ণাণ্ডেজের কথাটা সত্যি মনে রাখবার মত। ফার্নাণ্ডেজ দুঃখ করে বলেছেন আমরা ভুল করেছি; আমরা 'সংগঠন করিনি' ইত্যাদি। উত্তর প্রদেশের ভোটপর্ব্ব হয়ত ওদের চোখ ধীরে ধীরে খোলবার সাহায্য করছে। সে যাহোক শতকরা ৬২ শতাংশ ভোট পেয়েও বিরোধী দলের জনসংঘ ভারতীয় ক্রান্তিদল যদি দাবী করেন যে তারা দল হিসেবে সুসংগঠিত তা হলে সেটাও ভুল। কেন না ভোটের ব্যাপারে সরকার বিরোধী ভোট যা পড়েছে জনতার পক্ষ থেকে তার মূল কথা "দারিদ্র মুক্তির দাবীর মধ্যে ও প্রাদেশিকতা প্রান্তীয়তা তথা জাতি বর্ণ-ইত্যাদির ছোঁয়াচে দুষিত! মূল্য-বৃদ্ধি কালোবাজার, বেকারী ভেদাল বিরোধের সাথে ন্যূনতম অন্নবস্ত্রের দাবীটা জনসাধারনের শ্রেয়স্কর দাবী হলেও দুর্নীতির রাজনীতিতে ভোটের কাংগাল তথাকথিত নেতৃত্ব প্রকৃত-

দাবীকে ছাপিয়ে অনৈতিক উদাহরণে জাতি বর্ণকে টেনে এনে জনতার মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টিতেই নিজেদের জয়ের পথটা সুগম করে নিয়েছেন। এক্ষেত্রে সব দলই সমদোষী বলে মিথ্যে হবে না আজ। বুদ্ধিজীবিরা হয়ত এখানেই অভাব বোধ করছেন সুস্থ বামপন্থী রাজনৈতিক আদর্শ তথা দলের। এখানে সাধারণ মানুষ হয়ত সব সময় দল না দেখে ব্যক্তিও দেখে। কিন্তু ব্যক্তি মাহাত্ম্যের চেয়ে আদর্শগত নিষ্ঠার প্রতি সকল মানুষই শ্রদ্ধাশীল। তাই বাঁচার দাবী মেটাবার সংগ্রামে মানুষ চায় নেতৃত্ব। অথচ উত্তর প্রদেশে বামপন্থীদের অকর্মণ্যতা তথা নির্জীব আদর্শহীন কলাকৌশলের ফল স্বরূপ সরকার বিরোধী দক্ষিণপন্থীরাই তার সুযোগটা নিয়েছে ষোলকলায়। জনসংঘের দলথাকলেও শ্রীচরণ সিংয়ের মধ্যে জবরদস্ত সরকার-বিরোধী নেতৃত্বের আওয়াজ পেয়ে সাধারণ কিষাণ—মজুর, এমন কি শিক্ষিত সম্প্রদায়ও ঐদিকেই ঝুঁকে পড়লো। এখানেই বামপন্থী রাজনীতির দুর্বলতার সুযোগ নিলেন শ্রীচরণ সিং।

দক্ষিন পন্থী আর বামপন্থী কলহের সুযোগ নিয়েছেন পুরোমাত্রায় শ্রীমতী গান্ধী। উত্তরাধিকার সূত্রে দক্ষিন-পন্থী রাজনীতির অংশীদার সরকারী কংগ্রেস, সময়ের অনুকূলে নিজের খোলসটা পালটে নিতে দ্বিধা করেনি এতটুকু। তাই রক্ষণশীলতার শাড়ী বদলে শ্রীমতী গান্ধী আজ জনসাধারনের সামনে রেখেছেন সমাজবাদের শ্লোগান; কমিউনিষ্টদের বগলে রেখে। নির্জীব পরিকল্পনাহীন বামপন্থীদের বাদ দিলে জনসংঘ-ভারতীয় ক্রান্তিদলের দক্ষিন পন্থীদের তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে শ্রীমতী গান্ধীকে নিশ্চয়ই প্রগতিশীলা মনে হবে। তাই নিজে একজন সুদক্ষা দক্ষিনপন্থী হয়েও ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে অপর দক্ষিনপন্থীদের সংহার করেছেন—বামপন্থী না হোক একজন সুযোগ সন্ধানী (!) রূপে নিজেকে প্রকাশ করে। আদর্শগতভাবে রক্ষন-শীল দক্ষিনপন্থী আর প্রগতিশীল বামপন্থীর নৈতিক লড়াইয়ে আদর্শহীন চতুর দক্ষিনপন্থীরা বামপন্থীর বেশে যে ভাবে ক্ষমতা দখল করে নেয়, শ্রীমতী গান্ধী উত্তর প্রদেশে ঠিক সেই পন্থার আশ্রয় নিয়েই নিজেকে এবং নিজের দলকে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজ্যের শাসনযন্ত্রে। আর বামপন্থী মোর্চার তিন শরীক নিজেদের আত্ম-কলহে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদেরই কবর তৈরী করতে দ্বিধা করলো না একটু। এতে আবার প্রমান হ'ল যে ইলেকশন ঐক্য আর আদর্শগত ঐক্য এক নয়। যতদিন বামপন্থী রাজনীতিতে আদর্শ-গত ঐক্যসূত্র তৈরি না হচ্ছে, ততদিন বার বারই এমনি অবস্থার সৃষ্টি হবে ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর, দুর্ভোগ উত্তর-প্রদেশবাসীর যে, প্রয়োজন মুহূর্তেও তারা পেলনা সত্যনিষ্ঠ নেতৃত্ব। দুর্নীতির মন্ত্রধারক সকল দলের রাজ-নৈতিক 'মোহন্তরাই' আজ তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রা। কিন্তু মিথ্যার এ নীতি-হীন চালবাজী আর কতদিন চলবে, ভোট পর্ব্বের আংগিনায়। দুর্নীতির অরাজকতা ধ্বংস না হলে শুধু উত্তর প্রদেশ কেন, ভারতবর্ষই যে ধ্বংস হয়ে যায়।

উত্তর প্রদেশের চিঠি

(২)

ইলেকশনের শহীদ—

উত্তর প্রদেশের ইলেকশন বা ভোটযুদ্ধ শেষ হয়েছে। কংগ্রেস জিতেছে। কেউ বলছেন নকল ভোটে নকল গড় তৈরী করেছে কংগ্রেস, কেউ বলেছেন সরকারী আমলাতন্ত্র সক্রিয় হয়ে কংগ্রেসের জয়ের পথ সুগম করেছে। নানা মুনির নানা মত। চৌমাথা বা পানের দোকানের রাজনৈতিক মোহন্তদের মতামতের কোন মূল্য না থাকলেও সরল জন-সাধারণের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয় এসব লঘু চিন্তা। তাই উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসের এ বিজয় জনতার মাঝে তেমন কোন সাড়া জাগাতে পারেনি—অন্ততঃ আপাতঃদৃষ্টিতে এটাই লক্ষণীয়। রাজনৈতিক দিক থেকে জনতা বিভ্রান্ত হলেও উত্তর প্রদেশের ভোট পর্ব্বের আশু লাভ উঠাচ্ছে মুনাফা-খোর কালোবাজারীর দল। এ ব্যাপারে সরকারী নীতি ওদের আরো লাভের পথকে সহজ করে তুলছে। চাল-গমের বাজার দর হাওয়ার মত উড়ে চলছে, কেরোসিন থেকে শুরু করে যে কোন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সকাল-সন্ধ্যায় বেড়ে চলেছে।

সিমেন্ট আজ আর দেখা যায় না,—তবে কালোবাজারীতে সব কিছুই পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া এর মধ্যেই

শুরু হয়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট। সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্ত্তন মুনাফাখোর তথা কালোবাজারীদের কাছে হয়ে উঠেছে লোভনীয়। সরকারী রেশনিং এর দোকানসমূহে আজ আর পরিমিত দ্রব্যের সংস্থান নেই—নেই অর্থে পাওয়া দুষ্কর। সেখানেও যে কালোবাজারীর চোরগোপ্তা কাজ করছেনা তার কোন সুস্থ যুক্তি নেই। এছাড়া খাদ্যনীতি সম্বন্ধে উত্তর প্রদেশ সরকারের হালের সিদ্ধান্ত অসাধু ব্যবসায়ীদের কাছে লুফে নেবার মতই মনে হচ্ছে! উত্তর প্রদেশ সরকার ঘোষণা করেছেন যে সাতাশটী জেলায় তারা রেশনিং-এ গম সাপ্লাই করবেন না। গমের খরিদ মূল্য আর বিক্রীর মূল্যে সরকার এ ক্ষেত্রে বোধহয় লোকসান দিতে রাজী নন্। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, একটা প্রদেশের সরকার যদি তার শাসন-ক্ষেত্রের এক্তিয়ারভুক্ত এলাকায় খাদ্য-শস্য দিতে না পারেন, তবে তার অকর্ম্মণ্যতার জন্য টিকে থাকার অধিকার আছে কিনা? দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ্যে সরকারী এ ঘোষণায় আজ কালো-বাজারীকে প্রোৎসাহন দেওয়া হ'ল কিনা? সরকার প্রকাশ্যে তার Levy system-এর ব্যর্থতা স্বীকার করে জোতদারদের কাছে নৈতিক ও কার্য্যতঃ পরাজয় মেনে নিলেন কিনা? সবটা সত্য হলে জনতার পক্ষ থেকে আজ যদি দাবী উঠে এ সরকারের পদত্যাগের, তবে তা মেনে নেওয়াই হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কিন্তু তা হবার নয়—হবে না। উত্তর প্রদেশ সরকার জানেন যে দু একটা রাজনৈতিক পার্টী এর বিরুদ্ধে ভাষন দিবে, দু একদিন 'বন্ধ' ঘোষনা করবে, দু চার জন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি সরকারী নীতিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে চায়ের টেবিলে। ব্যস এখানেই শেষ। নতুবা নির্লজ্জ বেহায়ার মত একটা গণতান্ত্রিক সরকার যখন সাতাশটা জেলায় তার ভোটার-দের ন্যূনতম সুরক্ষার দাবী এড়ানোর ঘোষণা করেও গদী আঁকড়ে রইল, তখনই বুঝে নিতে হবে যে এর পিছনে রয়েছে—এক বিরাট ষড়যন্ত্র! ইলেক-শন ফাণ্ডে টাকা নিলে ভোটযুদ্ধে জয়লাভের পুরস্কার দিতে হবে নিশ্চয়ই! তাই আজ সাতাশ জেলায় জোতদারদের পরোক্ষে 'মুক্ত বাজার' স্বীকার করে কালোবাজারী মুনাফাখোরদের রাজত্ব সৃষ্টি করবার রাস্তাটা তৈরী করে দিলেন সরকার। সাতাশ জেলার সকল অপকর্মের ঢেউ অচিরেই বাকী শহরে গ্রামেও নিয়ে আসবে মূল্য বৃদ্ধির প্লাবন। জনতা সেই প্লাবনে ভেসে যাবে; অন্ধকারে আছড়ে পড়বে রাস্তায় অলিতে গলিতে! সরকারী চক্রান্তে জোতদার মুনাফাখোরদের বাড়িয়ে দেবার এ সহজ রাস্তায় উত্তর প্রদেশে ইলেকশন পর্ব্বের শেষ ফল শূন্যের অঙ্ক এসে চেপে বসলো জনতার পেটে। জনতা আজ বিভ্রান্ত—। তারা আজ ইলেকশনের শহীদ!

একই সংগে বলা চলে যে—কংগ্রেস জিতেছে সত্য, কিন্তু কংগ্রেসের হয়েও যেন আজন লেগেছে উত্তর প্রদেশে! কংগ্রেসের এ বিজয় যাত্রাতেও একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল উত্তর প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলে শাসক কংগ্রেসের ভরাডুবি। একথা খুবই সত্যি যে পূর্ব্বাঞ্চলের সাধারণ জনতার স্বাভাবিক আয় পশ্চিমাঞ্চলের তুলনায় কম। দৈনিক জীবন যাত্রার 'মান' পশ্চিমাঞ্চলের চেয়ে নিম্নস্তরের। পূর্ব্বাঞ্চলের গ্রাম্য কিষাণ সমাজ বেশীর ভাগই ভূমিহীন এবং মুষ্টিমেয় জোতদারদের শোষণের সহজ শিকার। কিন্তু এ নিয়েও ত কংগ্রেস এতকাল জিতেছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জুজুর প্যাচে সবাইকে বশ করে এতদিন বেঁচে রয়েছে কংগ্রেস। কিন্তু আজ কী হ'ল? মূল্য বৃদ্ধির চাপ আছে; খাদ্যনীতির ব্যর্থতা আছে; শাসন যন্ত্রের ভ্রষ্টাচার আছে। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়াতেই যদি কংগ্রেসের পরাজয় হয়ে থাকে তবে মানতে দ্বিধা হবে না যে পূর্ব্বাঞ্চল এগিয়ে চলছে নিজের পায়ে চলবার শক্তি নিয়ে। কিন্তু প্রকৃত সত্য তা নয়। পূর্ব্বাঞ্চলের জোতদার সম্প্রদায়ের গুরুদেব পণ্ডিত কমলাপতি ত্রিপাঠী আজ দিল্লীর দরবারে বন্দী। বহু-গুণাজীকে আশীর্ব্বাদ দিয়ে বহু কষ্টে সবর রাজধানীতে পাঠি দিয়েছেন তিনি। হয়তঃ আশা ছিল আবার ফিরে আসবার। কিন্তু অবিশ্বাস্য বহুগুণাজী তার সে পথে প্রথমেই দিলেন কাঁটা। হয়ত বা দিল্লীর ইশারাতেই উত্তর প্রদেশের ইলেকশনে পণ্ডিতজীর শ্রীমুখ হয়েছিল তালাবন্ধ! সত্যি আশ্চর্য্যের যে, ইলেকশন পর্ব্বে পণ্ডিতজীকে দেখা গেল রাজ্যের রাজনৈতিক সক্রিয়তার মধ্যে! এছাড়া ইতিমধ্যেই স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে এটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে যে পণ্ডিতজীর পুত্র স্ত্রী লোকপতিজীর বিরুদ্ধে কংগ্রেস আজ পার্টী বিরোধী চক্রান্তের দোষে অভিযুক্ত। লোক-পতিজী একজন নির্ব্বাচিত এম, এল, এ। তাছাড়া মন্ত্রী হবার সুখস্বপ্নও তাঁর ছিল, অথচ তাঁর বিরুদ্ধেই এ কুৎসা! সত্যিই ত বরদাস্তের বাইরে! তাই পণ্ডিত লোকপতির ভাষণ 'তিনি এবং তার পিতার বিরুদ্ধে পার্টী বিরোধী বা ইলেকশন বিরোধী কার্য্যকলাপ প্রমাণিত হলে তারা দুজনেই পদত্যাগ করবেন।' পদত্যাগ করুন আর নাই করুন, পার্টী বা ইলেকশন বিরোধী কার্যাবলী প্রমাণিত হোক আর নাই হোক, তার এ উক্তিই ত' প্রমাণ করে বহুগুণাজীর সক্রিয়তা পণ্ডিতজীকে কোথায় ঠেলে দিয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পণ্ডিতজীর নির্ব্বাসন যেন সত্যিই রাজনৈতিক সন্ন্যাস নেবার পথে এগিয়ে নিচ্ছে তাঁকে। লোকপতিজীর

উক্তিতে স্বভাবতই আজ ভাবতে হয় যে সেদিনের সম্রাট শাজাহান আজ কোথায়! ভাবতে হচ্ছে উত্তর প্রদেশের ভোট যুদ্ধের আর এক জন শহীদ কে? বহুগুণাজী, তুমিই কী আওরংগজেবের.....।

পণ্ডিতজীর অনুপস্থিতিতে আজ উত্তর প্রদেশে পূর্ব্বাঞ্চলের জোতদারদের নেতৃত্ব নিয়েছেন শ্রীচরণ সিং। তাই পূর্ব্বাঞ্চলে কংগ্রেসের পরাজয়কে আদর্শগত ভাবে না দেখে যদি দল বদলের গণতান্ত্রিক (!) পদ্ধতিতে বিচার করা যায় তবেই দেখা যাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিক্রিয়াশীলের লড়াইয়ের জমজমাট অবস্থাটা! এতে জনতার কোন লাভ নেই—। তারা সেই তিমিরেই!

পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক নির্ব্বাসনকে কেন্দ্র করে নিশানায় বহু পূর্ব্বেই সতর্ক করা হয়েছিল তার ভবিষ্যত সম্বন্ধে। দেখা যাক আরও কতদূর যায়!

উত্তর প্রদেশের ইলেকশন ও বাংগালী সমাজ

বাংগালীদের রাজনৈতিক সচেতনতা এবং সাংস্কৃতিক মান সম্বন্ধে বাংলার বাইরে অবাংগালী মহলে একটা বিশেষ স্থান ছিল বরাবরই। অতীতে নিঃসন্দেহে বহির্বংগের প্রত্যেক জায়গায় বাংগালী সমাজ একটা সম্মানিত আসনের অধিকারী ছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে অবাংগালী সমাজও শিক্ষা এবং রুচির দিক থেকে যথেষ্ট উন্নত হওয়ায় ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা দিয়েছে সত্য, কিন্তু তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর প্রতি এখনও তারা শ্রদ্ধাশীল। যদিও অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থের প্রভাবে আজকাল শ্রদ্ধাটা গুপ্ত হিংসায় পরিণতি লাভ করছে, তথাপি বলা চলে যে বাংগালীর স্থান এখনও আছে বাংলার বাইরে—, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে। বাংগালী শিক্ষাবিদ, আইনজীবি, ডাক্তার এবং কিছু রাজনৈতিক কর্মীর দান উত্তর প্রদেশের সামাজিক জীবনেও বিশেষ ভাবে স্বীকৃত। আজকের দিনেও ব্যক্তিগত ভাবে অনেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রেখে 'মান মর্যাদার' আসনে বিশেষ ভাবে সম্মানিত। তবে সমাজ হিসেবে বাংগালীরা আজ নিশ্চয়ই ঠাকুরদাদার 'দই' খাবার কাহিনী আর তারই সুগন্ধের আহ্বানের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চাইছেন। এককথায় বহিঃবংগে সমাজ হিসেবে বাংগালীরা আজ নিমজ্জমান।

বাংগালীদের জীবন বাংলার বাইরে আজ গতিহীন। এ জন্যে যে সংস্থাই দায়ী হোকনা কেন, একথা বল্লে মিথ্যে হবে না যে বাংলার বাইরে বাংগালীদের মধ্যে আজ সেই মানসিকতা বা উদারতা নেই। সমাজের চেয়ে ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে থাকার আকাংখাটাই আজ প্রবল। তাই অতীতের ন্যায় আজ আর গড়ে উঠেছে না জন কল্যাণকর দৃষ্টিভংগী নিয়ে সামাজিক সংস্থা। বাংগালী যুবকরা আজ হয় রাজনৈতিক দলের খন্নরে নতুবা···। অথচ এক উত্তর প্রদেশেই যে পরিমাণ বাংগালী বাস করেন, বিভিন্ন শহরের সংগে যোগাযোগ করে বা সূত্র রেখে যদি একটা সংস্থা তৈরী করা যেত; তাহলে বাংগালী সমাজ পরিবর্ত্তিত অবস্থার মধ্যেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে পারতেন। অতীতে ব্যক্তি মর্য্যাদা ঘিরে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখা হতো। অথচ আজকের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠনের জন্যই যেখানে ব্যক্তির ও সমাজের মর্য্যাদা সেখানে নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে গুণগতভাবে বাঁচিয়ে রাখতে হলে,—তার পরিধিকে আরো বড় করে দেখা উচিৎ। কিন্তু আজকের বাংগালী সমাজ সেখানে পরাজিত। তাই তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল অবাংগালী সমাজের দৃষ্টিভংগীও দিন দিন পরিবর্ত্তিত হয়ে একটা অন্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে আজ বাংগালীর সংখ্যা যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও, তাদের কোন রাজনৈতিক মর্যাদা নেই প্রদেশ রাজনীতিতে। এলাহাবাদ, লাখনৌ, কানপুর, গোরখপুর, মীরাট এবং বারাণসী শহরে বাংগালীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবার মত যথেষ্ট সংখ্যা এবং সম্পদ আছে। একমাত্র বারাণসী শহরের মোট জন সংখ্যার প্রায় ৳ শতাংশ বাংগালী। একথা অবশ্যই সত্য যে আজকের বাংগালী সমাজ বেশীর ভাগই অর্দ্ধভুক্ত চাকুরী জীবি—। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মী ও বিশেষ গুণী ব্যক্তিরাও ত-আছেন। অথচ ভাবতেও বিস্ময় লাগে যে উত্তরপ্রদেশে বিধান সভায় ৪২৫টী সভ্য আসনের মধ্যে একজনও বাংগালী নেই। গত বছরে প্রখ্যাত বিপ্লবী শচীন বক্সী মুশায় ছিলেন, —সেটাও জনসংঘের রণকৌশলে। গণতান্ত্রিক যুগে কোথাও বাঁচতে বা বাঁচাতে হলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা নেবার প্রয়োজন আছে। একটা স্কুল বা মন্দির স্থাপন করে ব্যক্তি হিসেবে 'যুগ যুগ জীও'র জয়জয়কার শোনা যেতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠার অভাবে ভবিষ্যতে এ ব্যক্তি-মর্য্যাদার কোন মূল্যই থাকছে না। কিন্তু সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বাংগালী সমাজে মস্তিকের ক্ষুদ্র আয়তনে এমন সমস্ত বৃহৎ জটীল সমস্যার বা নীতির জট পাকানো হয়, যে শেষ পর্য্যন্ত তার সমাধান সূত্রকে বের করার পূর্ব্বেই 'বিড়াল ছানা বস্তা থেকে বেড়িয়ে পড়ে'—অর্থাৎ শেষ ফল শূন্যের অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায়। এক সংগঠন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনে যে পরিমাণ ঐক্যবোধ থাকা প্রয়োজন, তা থেকে বহির্বংগের

বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের বাংগালী সমাজ আজ অনেকটা দূরে। নতুবা এবারে বারাণসী শহরের অক্ষিণীক্ষেত্রে বাংগালী যুবক মাইনিং ইনজিনিয়ার দেবব্রত মজুমদার সোসালিষ্ট-পার্টির প্রার্থী হিসেবে বাংগালী সমাজের সামনে নিজেদের প্রার্থী নির্ব্বাচনের যে সুযোগ দিয়েছিলেন, বহুদিন বাংগালী সমাজ এ সুযোগ আর পাবে কিনা সন্দেহ। সাতাশ বছরের যুবক শ্রীমজুমদার বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বজন স্বীকৃত ছাত্রনেতা। নিজের সংগ্রামীর মনোবৃত্তি বা চরিত্রের জন্য বাংগালী-অবাংগালী সবারই স্নেহভাজন তিনি। কমিউনিষ্ট-জনসংঘ, BKD-র ধনদৌলত আর বর্ণচোরা রাজনৈতিক চালবাজীর বিরুদ্ধেও শ্রীমজুমদার যে লৌহদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তা প্রশংসনীয়। এটা দেখতেও আনন্দ হয় যে কিশোর ছাত্র সমাজ, সে বাংগালী হোক আর অবাংগালীই হোক, তারা শ্রীমজুমদারের পক্ষে বিনা প্রাচুর্য্যে প্রাণিপাত পরিশ্রম করেছে।

এটাও প্রমাণ হয়েছে যে দেশের যৌবন আজ চায় সংগ্রামী নেতৃত্ব। এখানে হিন্দু-মুসলমানের তফাৎ নেই, নেই বাংগালী—অবাংগালীর বিভেদ। তারুণ্যের প্রতীক শ্রীমজুমদার যদি নগণ্য ভোটের ব্যবধানের পরাজয়কে সহজ রূপে গ্রহন করে আদর্শগতভাবে জনসেবার মাহাত্ম্যে এগুতে পারেন তবে আশা করা যায় বারাণসীর নাগরিক সমাজ আগামীকাল তার ললাটেই জয়ের তিলক এঁকে দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। পরাজয় দুঃখের হলেও সংগ্রাম বিমুখতাকে প্রশ্রয় দেয় না নিশ্চয়ই। আদর্শ বিপ্লবী চরিত্রের এটাই মূলকথা। শ্রীমজুমদারকে ভেবে দেখতে হবে—ভাবতে হবে বহিঃবংগের বাংগালী সমাজকে। কেননা যে পরিমাণ অবাংগালী ভোট পেয়ে মজুমদার পরাজিত হয়েছেন ঠিক সেই অনুপাতে বাংগালী ভোটটা যদি তার সংরক্ষিত হ'ত তাহলে ভোটের ফল হয়ত বা সৃষ্টি করতো অন্য ইতিহাস। এখানেই বাংগালীদের ভাববার বিষয়—। সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের মধ্যেই গণতান্ত্রিক-যুগে বাঁচার পথ সৃষ্ট হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনে চাই নিজেদের মধ্যে ঐক্য সূত্রস্থাপনের যোজনা, এবং অন্যকেও আপন করার উদারচেতা কর্ম্ম-সূচী। এখানে ভুল করলেই যে ছন্দপতন।

এদের ফাঁসী হয় না কেন?

সম্প্রতি উত্তর প্রদেশে মুকোজ, ইনজেকশানের কেলেঙ্কারী চরম পর্য্যায়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই প্রায় পঁচিশজন রোগী মুকোজ ইনজকশনে বাঁচতে চেয়ে অতি করুণভাবে মৃত্যুর কোলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। উত্তর-প্রদেশের স্বাস্থ্যবিভাগ তথা ড্রাগ কণ্ট্রোল কাগজে কলমে জোর তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন। কোম্পানীর মালিক পক্ষ না কি এর মাঝেই তালাবন্ধ করে পলায়ন করেছেন।

উত্তর প্রদেশের, রুগ্ন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রিগ্রাম জায়সোয়াল মশায় অন্তর্দাহে হাসপাতালে শয্যাশায়ী অবস্থাতেই ঘোষণা করেছেন নিজের মন্ত্রীপদ থেকে ইস্তাফার কথা। নিজেকে বিভাগীয় মন্ত্রী হিসেবে দোষী সাব্যস্ত করে সকল অপরাধ শিরোধার্য্য করে নিয়েছেন! মুকোজ ইলেকশন কেলে-ঙ্কারীর খবরটা যে কোন সভ্য দেশের পক্ষেই কলঙ্কজনক এবং শিহরণ জাগাবার মত। কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়ের পদ-ত্যাগের ঘোষণাটকি হাস্যোদ্দীপক নয়? বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নেবার মত ক্ষমতা নেই এদেশের শাসক গোষ্ঠীর। তারা জানেন যে তাদের ছত্রছায়াতেই অসামাজিক শক্তি সমূহের চারাগাছ—বেড়ে উঠেছে নিরাপদে। কালোবাজারী—মুনাফা-খোর, দুর্নীতিগ্রস্ত মাথাভারী—আমলাতন্ত্র তাদেরই পোষাকুকুর। এদের শাস্তি দেবার মত সৎ সাহস মন্ত্রীগোষ্ঠীর নেই। তাই পদত্যাগের ভেকি দিয়ে সহজ সরল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার নীতিগত চক্রান্তকারী পথটা এরা অতি সহজে মেনে নেন। এদের পদত্যাগে দেশবাসীর কী লাভ? এদের পদত্যাগে কী বাজারের ভেজাল কমে যাবে?

কালোবাজারী মুনাফাখোরের দল নিশ্চয়ই তাদের অসাধু ব্যবসা ছেড়ে 'রাম নাম জপে' বন্ধী মহারদের ইহকাল পরকালের পথ প্রশস্ত করতে নেমে যাবে না। বরং এ সমস্ত জাতীয় সমস্যাজনিত প্রশ্নে মন্ত্রীদের পদত্যাগে সরকারী শাসন ব্যবস্থার দুর্ব্বলতাটাই প্রকাশ হয়ে পড়বে এদের সামনে—যার যোল আনার লাভটুকু ওঠাতে এরা কুণ্ঠা বোধ করবে না এতটুকু। অতএব অলীক ভেকিবাজী ছেড়ে, বিভাগীয় তদন্ত নামক ধোঁকাটির বাহানা ছেড়ে শ্রীজায়সোয়ালজী যদি সত্যি দেশের কল্যাণ চান তবে এদের প্রকাশ্যে ফাঁসীর দাবী নিয়ে এগিয়ে আসুন। দুচার জন ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার হবেন, দুচারজন ছাপোষা কর্ম্মচারী সাসপেণ্ড হবেন বা হচ্ছেন। কিন্তু সমস্যার সমাধান কী এতেও সম্ভব? শাসন ব্যবস্থাকে সুস্থ রাখতে হলে মাঝে মাঝে নির্ম্মম হতেই হবে। একজনের প্রতি 'চরম শাস্তি'-তে যদি সমগ্র দেশ উপকৃত হয় তবে ভয় কোথায়?

উত্তর প্রদেশের সাধারণ জনতা আজ এতবড় একটা অমার্জনীয় অপ-রাধের খবর নিয়ে মাতামাতি করছে না সত্য, কিন্তু দেশের নৈতিক বুনি-য়াদকে যদি শক্ত করে গড়ে তুলতে হয়, দেশের মানুষের কল্যাণই যদি সরকারের কাম্য হয় তবে জনকল্যানের হিতকর পথটাই সরকারকে তুলে ধরতে

হবে সমাজের কাছে। জনতা সেখানে নীরব, সেখানে জনগণের সরকারের নৈতিক ধর্ম এটাই। অতএব রাজনীতির কুটচক্রে ভাতৃঘাতী বক্তৃতার লহরী নাছেড়ে, পদত্যাগধ্বনিত ভেদ্কির আশ্রয় না নিয়ে, যদি সমাজ-কল্যাণের সত্যিকারের পথে সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হনসরকার, তা হলে হয়ত ভোট-যুদ্ধে ভোট ভিক্ষার উদাহরণ সৃষ্টি না করে তুলে গদী পাওয়ার সহজ পথটাও পরিষ্কারহবে উঠবে সরল ভাবে। উত্তরপ্রদেশ সরকারের সামনে আজ এ সহজ পথ খোলা, প্রশস্ত। তাই য়ুকোজ ইনজেকশন কেলেঙ্কারীতে প্রকৃত দোষীদের বের করে নেহেরুজীর অতীত দিনের স্বপ্নকে আজ বাস্তবে রূপায়িত করতে পারেন উত্তর প্রদেশ সরকার। নতুবা, আগামীকাল জনতার মাঝ থেকেই প্রশ্ন উঠবে, অতি স্বাভাবিক ভাবেই যে এদের ফাঁসী হ'ল না কেন? এ প্রশ্নে যে গণরোষ থাকবে, সরকারী শাসন যন্ত্র তা দমনে হয়ত বিফলও হতে পারেন। তাই সময়ে ব্যবস্থা নেওয়াই বিচক্ষণতার পরিচয়। শালিগ্রামজী পদত্যাগ করুন, কিন্তু জাতীর কর্তব্য এড়িয়ে নয়!

জাতীয় শিক্ষক সূর্য্য সেন

(৩১২ পৃষ্ঠার পর)

দলীয় নেতৃত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েও তিনি ছিলেন নিরভিমান নেতা। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামে কত কূটনীতি, কত ছলনা ও কলা কৌশলের আশ্রয় তাঁকে নিতে হয়েছে তার হিসেব নেই। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের আরো একটি দিক ছিল সেখানে তিনি শিশুর মতই সরল ও নিরভিমান। এজন্যই অতি অকপটে তিনি বলতে পেরেছেন—'সমকালীন বিপ্লবীরা সবাই নানা দিক দিয়েই আমার চেয়ে যোগ্যতর। তবুও তারা আমায় নেতারূপে স্বীকার করে নিয়েছে, এতে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হয়েছি। আমার মধ্যে ওরা কি দেখেছে বা কি পেয়েছে জানিনে, কিন্তু আমি ওদের সহকর্মীরূপে পেয়ে ধন্য মনে করি।' এ সহজ স্বীকৃতি তাঁর মৌখিক বিনয় প্রকাশ নয়, এ তাঁর অন্তরের গভীর উপলব্ধির প্রকাশ।

মানবতাবোধ তার চরিত্রের একটি অন্যতম দিক। জীবনের প্রতিটি কাজে তা প্রতিফলিত হয়েছে। নিছক মানবতাবোধ তাঁকে সার্থক বিপ্লবী করে তুলেছিল। কেবল রক্তঝরা পথের ভয়াবহ কাঠিন্য নয়, হৃদয়ের কোমলতা, সজীবতা আর স্নেহমমতায় ভরপুর একটি হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। ফেরারী জীবনেও কারো অসুখের সংবাদ শুনলে নিজের জীবন-ভয় তুচ্ছ করে চলে যেতেন তার পাশে আর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করে দিতেন। নিজের দু'মুঠি অন্নের ব্যবস্থা, প্রার্থীর চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তাও বানচাল হয়ে গেছে কতবার। দলের ছেলেদের ও অনুগামীদের দুঃখ অসুবিধা এবং দেশমাতৃকার পরাধীনতার বেদনা চিরকাল তাঁকে ভাবিয়েছে। জনগণের কাছে তিনি ছিলেন হৃদয়বান স্নেহশীল একটি মানুষ। স্কুল কলেজের কিশোররা মা বাবার কাছ থেকে এসে বিপ্লবীদলের আশ্রয় গ্রহণ করত। এই গৃহহীন বালকদের তিনি নিজের স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দিতেন। ছেলেরাও জানত তারা মাষ্টারদার কাছে মাতা-পিতার স্নেহ পাচ্ছে। মাষ্টারদা প্রয়োজনের সময় নিজেই আগে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবেন, নিজে পিছিয়ে গিয়ে কখনও ছেলেদের এগিয়ে যেতে দেবেন না। এই বিপ্লবী মানুষটি যে কত বড় স্নেহশীল ছিলেন তাঁর নিকট সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা সবাই তা জানতেন। জীবনে এমন বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন তিনি হয়েছেন যখন বিপ্লবী সূর্যসেনের বৈপ্লবিক সত্তা এবং বিপন্ন প্রাণের প্রতি পরম মমতা হয়ে মিলেমিশে কেমন একাকার হয়ে গেছে। দলের ছেলেদের কাছে তিনি ছিলেন মাতৃপিতৃ রূপ, তাদের প্রাণের প্রিয়, তাদের মনের দেবতা। অন্তরের পরম মমতার বন্ধনে তাদের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। মুখ দেখে তিনি ছেলেদের মনের কথা বুঝে নিতেন, তাদের মুখ ফুটে বলতে হত না। মানুষকে ভালবাসতেন বলেই মানুষের অতি সামান্য গুণেরও তিনি স্বীকৃতি দিতেন। একসময় তাঁর নির্দেশে ডাকাতি দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পরিবর্তে কর্মীদের নিজের নিজের বাড়ী হতে ব্যক্তিগত সংগ্রহ নীতি গৃহীত হয়। দলের তহবিলে মাবোনের গহনা, বাবার ব্যাঙ্কের টাকা পারিবারিক সঞ্চয় একে একে জমা হতে লাগল। বীরেন দে দলের বিধবা বিপ্লবী, গরীব বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দু'বেলা অন্নসংস্থান করা

কষ্টকর। সে কোথায় পাবে ব্যাঙ্কের টাকা আর মায়ের গয়না। কিন্তু তাই বলে মাষ্টারদার এই বিরাট দানযজ্ঞের তার কোন অর্ঘ্য সমর্পিত হবে না? সে বসে থাকবে দানযজ্ঞের প্রত্যন্তে নির্বিকার দর্শক হয়ে? একদিন বীরেন এসে দাঁড়াল মাষ্টারদার সামনে, হাতের মুঠোয় তার মায়ের দুগাছি রুপোর চুড়ি। বীরেনকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে স্নেহ কোমলকণ্ঠে মাষ্টারদা বললেন— তোমার এ দান অমূল্য এর থেকে শ্রেষ্ঠদান আর কিছু নেই। রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধভিক্ষুর কাছে দীনা ভিখারিণী মেয়ের পরিধেয় বস্ত্রটিই ছিল শ্রেষ্ঠদান। দেশমাতৃকার বন্ধন মোচনের বিপুল যজ্ঞায়োজনে সেদিন বীরেনের মায়ের রৌপ্যচুড়িদু'গাছি মাষ্টারদার কাছে সেই মহাপ্রাণতার মূল্যই বহন করে এনেছিল।

তরুণ জীবনগুলিকে স্বাধীনতার বেদীমূলে উৎসর্গ করেই তিনি বিরত থাকেননি। জীবন রক্ষা করার জন্যও কী গভীর আকুলতা ছিল তাঁর মধ্যে। যেন মাতৃস্নেহের অপরিসীম স্নেহ পাবার। তাঁর এই স্নেহস্পর্শ যে পেয়েছে, তাঁর অন্তরের কাছাকাছি যে আসতে পেরেছে, সেই বিপ্লবের হোমাগ্নি শিখায় আত্মাহুতি দিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়েছে।

সমসাময়িক কালে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে যত নেতার আবির্ভাব ঘটেছে শিক্ষক সূর্য সেন তাঁদের মধ্যে অনন্য। তুলনাহীন ব্যক্তিত্বই তাঁর এই অনন্যসাধারণতার কারণ। সূর্য সেনের স্থির প্রদীপ্ত দু'চোখে এমন একটা কিছু ছিল যা তাঁকে সবার উপরে স্থান দিয়েছিল। স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, বিচার, বিবেচনা, ন্যায়নিষ্ঠা সব কিছুর অধিকারী তিনি ছিলেন। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়, অপূর্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েও সহকর্মী বন্ধুদের উপর নিজের মত তিনি কখনও চাপিয়ে দিতেন না। বিপ্লবী দলের একচ্ছত্র নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলেও বিরুদ্ধ মত তিনি শ্রদ্ধাসহকারে শুনতেন, প্রয়োজন বোধে তা গ্রহণ করতেন। অপ্রয়োজন মনে হলে যুক্তি দিয়ে, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য সহকারে তা খণ্ডন করতেন।

কর্মীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ ছিল— 'যে আদর্শকে নিজের মন থেকে স্বীকার করতে পারবে না তা কখনও মানবে না, এমন কি আমি বললেও না। বিপ্লবী চরিত্রে এই গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি তাঁর যুগের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন।

সূর্য সেন জীবনের বিশুদ্ধ পূজারী অনাসক্ত দ্রষ্টা। একটি মুহূর্তের জন্যও জীবনের মায়া তিনি করেন নি। মৃত্যুকে সামনে রেখে মাতৃপূজার অর্ঘ্য সাজিয়েছেন।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং
জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মপ্রতিষ্ঠাই তাঁর চরিত্রের ভিত্তিভূমি। দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য, পরাধীনতা-মুক্ত ভারতকে জগৎসভায় কল্যাণকল্পীর আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর বিপ্লবী জীবন। তাঁর মত মহাপ্রাণের পক্ষে প্রাণ রক্ষাই ধর্ম, প্রাণের বিনাশ সাধন ছিল গৌণ, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের তা একটি উপায় মাত্র। এও যেন মাতৃপূজারই একটি অঙ্গ—

'মৎ কর্মোমি জগন্মাতঃ তবৈব তব পূজনম্' এই কারণেই মৃত্যুভয় মুহূর্তের জন্যও তাঁর অমর আত্মাকে বিচলিত করতে পারেনি। বৃটিশ সরকার যখন তাঁর মস্তকের মূল্য ১০,০০০ টাকা ঘোষণা করেছে তখন বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হয় দেশের বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করার জন্য। মাষ্টারদা সংবাদ পাঠালেন—'আমি দেশের বাইরে যাব না, ইচ্ছা হয় তোমরা যেতে পার।'

পরাধীন জাতির মাতৃমুক্তি পণ কি? ফাঁসীর রজ্জুতে জীবনাহুতি। সার্থক বিপ্লবী তাঁর জীবনবেদের অন্তিম অধ্যায়ে উপনীত হয়ে ভাবতে শুরু করলেন— মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানোর পথ কোনটা, জীবনের প্রতিটি কর্ম প্রতিটি চিন্তা ভাবনা তো স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে উৎসর্গিত হয়েছে, এবার শেষ নিঃশ্বাসটি এটিও যে দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করতে হবে। ফাঁসী, দ্বীপান্তর, আত্মহত্যা—কোনটি বরণীয় এ যুগের দধীচীর জীবনে, বিপ্লবী বাংলার অগ্রগামী পথিক ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করে মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন। তার কারণ ফাঁসীর মঞ্চে আরোহী মৃত্যুপথযাত্রী একজন বিপ্লবী বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত চিত্তে, তেজোদীপ্ত কণ্ঠে গর্বোন্নত শিরে দেশবাসীর কাছে শেষ আবেদন জানাতে পারবেন। বিদেশী শাসকের মুখের উপর বলতে পারবেন —আমরা কি চাই, কেন চাই। বিপ্লবীর এই মৃত্যুবরণ দেশবাসীকে মরণযজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে আহ্বান জানাবে। এ মৃত্যুতে দেশের লক্ষ লক্ষ যুবক ও কিশোর প্রাণে সঞ্চারিত করবে বিপ্লবী উদ্দীপনা সাহস ও স্বদেশপ্রেম! এ মৃত্যুর আঘাতে শাসকেরা ভয়ে কম্পিত হবে, কিন্তু প্রত্যাঘাত করবে কাকে? বিপ্লবী তো তখন মৃত্যুহীন অমর লোকের অধিবাসী আত্মহত্যার পথকে তিনি কাম্য মনে করেন নি, এর দ্বারা বিদেশী স্বৈরতন্ত্রই লাভবান হবে। প্রথম চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ; কিন্তু ক্ষুদিরামের ফাঁসীতে মৃত্যুর প্রেরণা ও শক্তি, সাহস, ও মনোবল বিপ্লবের আগুনকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল। জাতীয় শিক্ষক মাষ্টারদা তাঁর অন্তিম লগ্নে সর্বশেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত দেশের কল্যাণে উৎসর্গ করে জীবনের সর্বদান যজ্ঞ সমাপন করে গেছেন, বাংলার এই বিপ্লবী ঋষির তিরোধানের পর চারিটি

দশক অতীত হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর মানসসত্তার স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আজও হয়নি, তাঁকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন—সূর্যসেনের প্রতিভা ছিল সূর্যের মতই উজ্জ্বল ও বহুমুখী। যে নিভা-প্রসন্নতা, কাঠিন্য ও উদার মমতা তাঁর মনে বিরাজমান ছিল তাঁর মুখমণ্ডলে তাই প্রতিভাত হত। জীবনের সহস্র কুসুমাস্তীর্ণ পথে তিনি কখনও পদক্ষেপ করেন নি, ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া' পথের পথিক ছিলেন তিনি। আমাদের দেশকে ভালবাসতে হবে, দেশকে জাগাতে হলে সূর্য সেনের জীবনবেদ থেকে আবার শক্তি ও আলো সংগ্রহ করতে হবে, তাঁর কর্ম চিন্তা দ্বারা আমা-দের চিন্তাকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। এ কথা আজ বিশেষ করে ভাববার দিন এসেছে।

বেথুন স্কুল

অমল কুমার মিত্র

কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতি জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বিলেতে থাকাকালীন অবস্থাতেই গভীর আগ্রহের সাথে ভারতবর্ষে স্ত্রী-শিক্ষার অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে আসছিলেন। (ভারতীয় মহিলাদের নিদারুণ কষ্ট তাঁর বিশেষ বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মনে করেন—একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই ঘটান যেতে পারে তাঁদের অবস্থার উন্নতি।)

বড়লাট বাহাদুরের কাউন্সিলের আইন সদস্য হিসাবে ১৮৪৮ সালের এপ্রিল মাসে বেথুন ভারতে আসেন। পদাধিকার বলে তিনি কাউনসিল অফ্ এডুকেশনের সভাপতি হন। এখানে কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য—রাম গোপাল ঘোষের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। বালিকাদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনে ইচ্ছুক হয়ে বেথুন রামগোপালকে তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেন। রামগোপাল আন্তরিক ভাবে তাঁকে সমর্থন জানান। বেথুনের উদ্দেশ্যের কথা তিনি তাঁর বন্ধুদের জানান এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার জন্য একদিন তাঁদের নিয়ে আসেন মিঃ বেথুনের কাছে। বেথুন তাঁদের বলেন যে বালিকাদের জন্যে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। রামগোপালের বন্ধুরা তখন এ ব্যাপারে সর্বান্তঃকরণে বেথুনকে সাহায্য ও সমর্থন করতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং এ কথাও জানান যে বিদ্যালয় যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে বিদ্যালয়ে তাঁদের কন্যাদের অবশ্যই পাঠাবেন। রামগোপালকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের জন্যে স্থান নির্বাচনার্থে বেথুন তখন ৫৬ নম্বর সুকিয়া ষ্ট্রীটে অবস্থিত (তখন বাহির শিমুলিয়া নামে পরিচিত) দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জীর বৈঠকখানা গৃহে আসেন। দক্ষিণারঞ্জন সে সময়ে বাড়ীতে ছিলেন না। ফিরে এসে তিনি জানতে পারেন—বেথুন এসেছিলেন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। বেথুনের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও দক্ষিণারঞ্জন প্রথম সুযোগেই বেথুনের কাছে যান এবং তাঁর বৈঠকখানার গৃহটিকে বিনা ভাড়ায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টির জন্য দিতে আগ্রহী হন। শুধু তাই নয়—বিদ্যালয়টির জন্য তিনি তাঁর পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের ব্যক্তিগত পাঠাগারটিকেও দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়টির জন্য একটি স্থায়ী ভবন নির্মাণার্থে মীর্জাপুরে তিনি সাড়ে পাঁচ বিঘার একখণ্ড জমিও দান করার প্রস্তাব করেন। আর দিতে চান নগদ এক সহস্র টাকা। দক্ষিণা-রঞ্জন বাড়ী ফিরে এসে, লিখিত ভাবে তাঁর মনের ইচ্ছে প্রকাশ করে পত্রটি বেথুন সাহেবকে পাঠিয়ে দেন। বেথুন ধন্যবাদের সাথে দক্ষিণারঞ্জনের সব দান গ্রহণ করেন।

বেথুনের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য আর যাঁদের নামে উল্লেখ করতে হয় তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

বিদ্যালয়ের উদ্বোধন

এসব কাজ হয়ে যাওয়ার পর একুশ জন বালিকাকে নিয়ে ১৮৪৯ সালের ৭ই মে তারিখে বেথুন তাঁর স্কুল শুরু করে দেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ছিল খুবই অনাড়ম্বর পূর্ণ। অনুষ্ঠানের উপযোগী একটি ভাষণ দেন বেথুন। সরকারের সাহায্য নিলে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব ঘটে যেতে পারে—সেজন্য সরকারের সাহায্য তিনি নেন নি—সে কথাও তিনি বলেন। কোলকাতার কয়েকজন গণ্য মান্য নাগরিক—যেমন রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ, আশুতোষ দেব এবং প্রসন্ন কুমার ঠাকুরকে তিনি আমন্ত্রণ করেন নি—পাছে তাঁরা বেথুনের কার্য পদ্ধতিকে সমর্থন না করেন বা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিকে নতুন এই বিদ্যালয়টির

ওপর চাপাতে প্রবৃত্ত হন। অনুষ্ঠানটি যাতে একটি জনসভার আকার ধারণ না করে, সেইজন্য ইউরোপীয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদেরও তিনি আমন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি তাঁর ভাষণে "ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল" নামে বিদ্যালয়টিকে অভিহিত করেন।[১]

পাঠক্রম কি ধরণের হবে—সে সম্পর্কে বেথুন বলেন: "এখানে কি ধরণের বিষয় পড়ান হবে—সে সম্পর্কে কিছু না বলে উপসংহার টানা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। আপনারা সকলেই অবগত আছেন—সরকারী বিদ্যালয়গুলি আপনাদের ছেলেদের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। এখানেও এই নীতি অনুসৃত হবে। শিক্ষিতা মহিলাদের সম্পর্কে অনেকে নাক সিটকাতে পারেন—তা আমি জানি। আমরা মেয়েদের কি ধরণের শিক্ষা দেব—সে সম্পর্কে তাঁরা একটা ধারণাও করে নেবেন। তখন খুব সম্ভবতঃ আমিই যোগ দেব ওদের বিদ্রূপের সাথে। তবে বাংলার ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি যে মন্তব্য করেছি তা যদি আপনাদের স্মরণে থাকে তাহলে বুঝবেন—মাতৃভাষার চর্চার প্রতি আমি কি গভীর গুরুত্বই না আরোপ করেছি। ইংরেজী পড়ার কথা এ জন্যই বলি যেহেতু ইংরেজী সাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী সাহিত্য, এবং আমরা আশা করি এ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করার পর শিক্ষিত ভারতীয়রা তাঁদের মাতৃভাষার দেশবাসীর হস্তে তাঁদের অর্জিত জ্ঞান-ভাণ্ডারটিকে অর্পণ করে দিতে পারবেন। তাহলেই বিচার করুন—বালিকাদের শিক্ষার বেলাতেও দশ গুণ জোরের সাথে এই যুক্তিগুলিকে প্রয়োগ করা যায় কি না। বালিকারা তো আর অপরকে পাঠদান করবেন না, নিজেদের গৃহেই তাঁরা তাঁদের শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখবেন। সুতরাং শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বাংলাকেই বুনিয়াদ হিসাবে রাখা হবে; কিছু অতিরিক্ত সুবিধা লাভার্থে কেবল ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ করা হবে, এবং যখন জানব যে পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ভাষাকে চাপান হচ্ছে না কেবল তখনই ইংরেজী পড়াবার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়াও মেয়েদের শিক্ষণীয় আরও হাজারো জিনিস আছে; সেলাই ফোড়াই, সূতোর কাজ, সৌখীন কাজ, চিত্রাঙ্কণ—আরও কত কি, যার সম্পর্কে আমাদের বন্ধু মিসেস রিডস্‌ডেল আমার চাইতে অনেক ভাল বর্ণনা দিতে পারবেন, এবং সেগুলি শেখাবার দায়িত্ব তিনি নেবেন। এ সব জিনিস শিখলে মেয়েরা তাদের ঘরকে সুন্দর করে সাজাবার শিক্ষালাভ করবে এবং অমতিকর অথচ সুন্দর কাজের মধ্যে নিজেদের কর্মব্যস্ত রাখতে পারবে।"

বেথুন প্রস্তাব করেন: যে সব মেয়েদের অনেক দূর থেকে আসতে হয় স্কুলের গাড়ী করেই তাদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা হবে, তারপর স্কুল শেষে আবার তাদের গাড়ী করেই বাড়ী পৌঁছে দেওয়া হবে।[২] সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু বালিকা ব্যতীত আর কাউকে ভর্তি করান হবে না। এবং স্কুলের কাজ চলবে সকাল ৯টা পর্যন্ত। পঠন পাঠন এবং লিখনের কাজে এক-জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিয়োগ করা হয়। হাতের কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেন মিসেস রিডস্‌ডেইল।

উদ্বোধন দিবসে যে একুশজন বালিকা বিদ্যালয়ে আসে, তন্মধ্যে পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কারের ছুটি কন্যা। —ভুবনমালা এবং কুন্দমালার নাম উল্লেখ করতে হয়। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ডালহৌসীকে একটি চিঠি লেখেন বেথুন। চিঠিতে নাম গোপাল এবং দক্ষিণারঞ্জনের সাথে মদন মোহনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন তিনি। বেথুন লেখেন:

"যে তিনজন ভারতীয় তাঁদের সাহায্যের দ্বারা আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের নাম আমি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করতে চাই। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী বাবু রাম গোপাল ঘোষ ছিলেন আমার প্রধান উপদেষ্টা। তিনিই আমাকে আমার প্রথম ছাত্রী সংগ্রহ করে দেন। জমিদার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সাথে পূর্বে আমার কোন পরিচয় না থাকলেও আমার পরিকল্পনার কথা অবগত হওয়ার সাথে সাথে তিনি দশ সহস্র টাকা মূল্যের পাঁচ বিঘা জমির দান নিয়ে আমার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। সংস্কৃত কলেজের অন্যতম পণ্ডিত, মদন মোহন তর্কালঙ্কার, কেবল যে তাঁর দুজন কন্যাকে বিদ্যালয়ে পাঠান তা নয়—প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থেকে ছাত্রীদের পড়াবার দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন এবং অবসর সময়ে, ছাত্রীদের পড়াবার জন্যে, বাংলা ভাষায় কয়েকটি প্রাথমিক পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন।[৩]

এইভাবে জনসাধারণের জন্যে যে বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়, তাতে প্রচুর সংখ্যক বালিকা এসে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। তবে সম্ভ্রান্ত বংশীয়াদের মধ্যে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়া করার প্রথাটি তখনও চালু হয়নি। যাঁরা খুব গোঁড়াপন্থী, তাঁরা বিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দেন। যাঁরা তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন—তাঁদেরও নানা ভাবে বাধা দেওয়া হতে থাকে। ফলে ছাত্রী সংখ্যা কমতে কমতে এক সময়ে সাতে গিয়ে দাঁড়ায়, তবে সুখের কথা—বছর শেষে দেখা যায় সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়ে চৌত্রিশে গিয়ে উঠেছে।

বেথুন তাঁর বিদ্যালয় চালু করার মাত্র পনের দিন পরে রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁর কোলকাতার শোভাবাজার-স্থিত বাড়িতে বালিকাদের জন্যে আর একটি বিদ্যালয় চালু করে দেন।

বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রে বারাসত বালিকা বিদ্যালয়টিকে ঢেলে সাজান হয়। নিবুধিয়া, সুখসাগর এবং উত্তর পাড়াতে কয়েকটি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনও করা হয়। তবে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে বাধা আসতে থাকে। এমন কি বারাসতের কতিপয় ব্যক্তি বারাসত স্কুলের সংগঠকদের অপমানিত পর্যন্ত করতে ছাড়েন না। সরকার এ সব বিদ্যালয়গুলিকে কোন-রূপ সাহায্য করেন নি। এতে দুষ্কৃত-কারীরা আরও পেয়ে বসে। তারা প্রচার করতে থাকে যে সরকার তাদের-ই পক্ষে। বেথুনের যে বিখ্যাত চিঠির কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে তিনি লর্ড ডালহৌসীকে অনুরোধ জানান ভারত সরকার যেন স্থানীয় সরকারকে এবং তাদের মাধ্যমে জেলাশাসক এবং কাউন্সিল অফ এডু-কেশনের কাছে এ মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন যে বেসরকারী এ সব প্রচেষ্টার প্রতি ভারত সরকারের সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। তখন ১৮৫০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে ভারত সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকারের প্রতি এ মর্মে একটি সারকিউলার প্রচারিত হয়। এ সব কারণে বেথুন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টির ফলাফল হয় সুদূর প্রসারী। এই পথ অনুসরণ পূর্বক আরও প্রচেষ্টা চালাবার সঙ্কেত এতে পাওয়া যায়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে বিদ্যালয়টির নামাকরণ করা যায় কি না, কোর্ট অফ্ ডিরেকটর্সকে সে ভাবে বুঝিয়ে বলতেও বেথুন তাঁর চিঠিতে লর্ড ডালহৌসীকে অনু-রোধ করেন! কিন্তু জনসাধারণের গোঁড়া মনোভাবকে কোর্ট তখনও ভয় করত। ১৮৫০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাটকে প্রদত্ত ডেসপ্যাচে কোর্ট এই প্রথম প্রচেষ্টার তাত্ত্বিক সমর্থন করলেও বড়লাটের মাধ্যমে বেথুন যে অনুরোধ করেন—সেটা রক্ষা করতে তাঁরা তাঁদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। "কোলকাতার বালিকা বিদ্যা-লয়টিকে মহারাণীর নামানুসারে নামাকরণ করার মত অবস্থা বর্তমানে আছে" বলে তাঁরা মনে করেন না।৪

প্রগতিশীল বাংলা পত্রিকাগুলি—যেমন সংবাদ প্রভাকর এবং সংবাদ ভাস্কর—বিদ্যালয়টিকে জোরাল ভাবে সমর্থন করতে থাকে। আর কয়েকটি—সম্ভবতঃ প্রাচীন মনো-ভাবাপন্ন যারা—বিদ্যালয়টির বদনাম ছড়াতেই মেতে ওঠে। তবে এতে তেমন কোন অনিষ্ট তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয় না। ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে হিন্দু কলেজের সিনিয়ার ছাত্ররা 'সর্বশুভকরী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এঁরা ছিলেন স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষে। স্ত্রী-শিক্ষার দুই গোঁড়া সমর্থক—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কারের সমর্থনও তাঁরা লাভ করতে সক্ষম হন। পত্রি-কাটির ২য় সংখ্যায় (সেপ্টেম্বর, ১৮৫০, স্ত্রী-শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে মদন মোহন একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। রামচন্দ্র ঘোষাল, রাম গোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশান-চন্দ্র বসু, গুরুচরণ মুখ, রসিক লাল সেন, শম্ভুচন্দ্র পণ্ডিত, তারানাথ তর্ক বাচস্পতি প্রমুখ প্রভাবশালী এবং খ্যাতনামা ব্যক্তিরাও যে তাঁদের কন্যাদের বেথুনের এই স্কুলে পড়তে পাঠিয়েছিলেন প্রবন্ধটি থেকে সে কথা আমরা জানতে পারি। তিনি আরও লেখেন যে বিদ্যালয়টিকে টিকিয়ে রাখার জন্য বেথুন তাঁর নিজের পকেট থেকে প্রতিমাসে সাতশ' আটশ' টাকা এর পেছনে ব্যয় করেছিলেন। মদন মোহন—বিশেষ করে ছোট ছোট মেয়েদের পড়ার উপযোগী করে—বাংলায় তিনটি পুস্তকও রচনা করেন ১৮৪৯ সালে ২টি এবং ১৮৫০ সালে ১টি।

লর্ড ডালহৌসীকে পূর্ব উল্লিখিত সেই বিখ্যাত পত্রটি লিখেই বেথুন সন্তুষ্ট থাকেন না। স্ত্রী শিক্ষার প্রসার করে তিনি সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। ওঁরই চেষ্টায় 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়কের' নবতম একটি সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থটির একটি সংখ্যা পাওয়ার পর, ১৮৫১ সালের ২০শে মার্চ তারিখে, রাজা রাধাকান্ত দেব বেথুনকে একটি অভিনন্দন জ্ঞাপক চিঠি লেখেন। এই পত্রে স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধীদের ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি নিন্দা করেন। মফঃস্বলের বালিকা বিদ্যালয়সমূহে এবং স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি যাঁরা আগ্রহী তাঁদের মধ্যে বিতরণার্থে স্ত্রী-শিক্ষার উপর রচিত তারাশঙ্কর শর্মার উপহার গ্রন্থের পাঁচশ'টি সংখ্যা বেথুন ক্রয় করে নেন। বেথুন ছিলেন কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের সভাপতি। পদাধিকার বলে তাঁকে প্রায়ই বাংলার বিভিন্ন জেলার বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শনে বেরোতে হত, আর কোলকাতার হিন্দু কলেজ ছাড়াও কৃষ্ণনগর কলেজ, ঢাকা কলেজ, হুগলী কলেজ; এবং পাটনা কলেজে তাঁকে পুরস্কার বিতরণ করতে এবং জ্ঞান গর্ভ ভাষণ দিতে যেতে হত। এই সব ভাষণের অধিকাংশতেই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং নব শিক্ষায় শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত যুবকদের স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারে কি কি করণীয় সে সম্পর্কে তাদের দায় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। ১৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগরে প্রদত্ত স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এক

মূল্যবান ভাষণে বেথুন বলেন :— "হিন্দু চরিত্রের পুনর্জীবন ঘটাতে এর পর যে বড় পদক্ষেপ সেটি হচ্ছে আপনাদের মহিলাদের শিক্ষা···আপনাদের মেয়েদের একটা সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে আটক রাখার কথা ভাবতে ভাবতে আপনাদের চিন্তার কাঠামোটা সেভাবেই তৈরী হয়ে গেছে এবং একটি ভাল কাজকে সফল করার পেছনে এটাই একটি প্র্যাকটিক্যাল বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে ···ওর নিজের ভালর জন্যে, ওর নিজস্ব অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমি দাবী করছি—সৃষ্ট জীবদের মধ্যে নারীকে তাঁর যথাযোগ্য আসনে অধিষ্ঠিত করা হোক। ঈশ্বর আপনাদের যেরূপ একটি হৃদয়, বুদ্ধি এবং অনুভূতি দিয়েছেন, নারীদেরও সে সব কিছু দিয়ে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—এবং এগুলো নষ্ট হওয়ার জন্য তো দেওয়া হয় নি···আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছবার পূর্বেই আমাকে এমরলোক ত্যাগ করে চলে যেতে হবে, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আর একটি 'জেণারেসন' বিদায় নেওয়ার পূর্ব্বেই একথা সর্বজনরূপে স্বীকৃত হবে যে যিনিই তাঁর কন্যার শিক্ষাকে উপেক্ষা করেছেন, তিনিই নিজেকে ছোট করেছেন।[৫]

এর পর মার্চ মাসে ঢাকা কলেজের ছাত্রদের সামনেও বেথুন অনুরূপ সুরে ভাষণ দেন। এবার তিনি বম্বের শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি স্যার আরস্কিন পেরীর ভাষণের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করেন। দাদাভাই নৌরজী এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য মহাদেব শাস্ত্রী ওখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যে আদর্শ স্থাপন করেন, তারই ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন স্যার আস্কিণ। ঢাকা কলেজের 'সিনিয়ার' ছাত্রদের বম্বের বন্ধুদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুরূপ কার্য্যে ঝাপিয়ে পড়তে বেথুন তাদের প্রতি আহ্বান জানান। কথিত আছে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর পিতা ভগবান চন্দ্র বসু (তখন ঢাকা কলেজের একজন সিনিয়ার ছাত্র) বেথুনের ভাষণে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁর অনেকখানি সময় ও উদ্যম স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার কল্পে ব্যয় করেন।

নিজস্ব আবাস

দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী মির্জাপুরে যে জমি দান করেন, তারই পাশে দশ হাজার টাকা দিয়ে বেথুন ক্রয় করেন আর এক খণ্ড জমি। কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারের পশ্চিমে বাংলা সরকারের কিছু জমি ছিল। মির্জাপুর তখন সহরের খানিকটা বাইরে পড়ে যাওয়ার দরুণ বেথুন মির্জাপুরের তুলনায় শেষোক্ত জমিটিকে বিদ্যালয়ের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হবে বলে বিবেচনা করেন। বাংলা সরকারের সাথে মির্জাপুরের জমির পরিবর্ত্তে এই জমিটি বদল করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলেন বেথুন।

১৮৫০ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখে নতুন এই জমিটির ওপর বিদ্যালয় গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এদিন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'এটর্নী' বেথুন এবং দক্ষিণারঞ্জনের হাতে জমির দলিলাদি তুলে দেন এবং একটি অশোক বৃক্ষ প্রদান পূর্বক জানিয়ে দেন :"জমিটি হস্তান্তরিত হল। বেথুনের অনুরোধে লেডি লিটলার উৎসব শেষে বৃক্ষ চারাটিকে বিদ্যালয় উদ্যানের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিশেষ একটি স্থানে রোপন করেন। ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের প্রধান কাজটি সম্পন্ন করেন বাংলার উপ-রাজ্যপাল স্যার হাণ্টার লিটলার—ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়। ওঁকে এ ব্যাপারে স্থপতিকারগণ সহায়তা করেন। কাজটি শেষ করে সমবেত সুধীমণ্ডলীর সামনে তিনি তাঁর ভাষণ রাখেন।

'আমরা আগেই দেখেছি—বিদ্যালয়ের নামাকরণে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম ব্যবহার করাটাকে কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর্স ঠিক যুক্তিযুক্ত হবে বলে তখন মনে করেন কি। তাম্র ফলকে একটি এবং রৌপ্য—ট্রাওয়েলে (trowel আর একটি—মোট দুটি স্থানে দুটি উৎকীর্ণ লিপি আমরা দেখতে পাই এবং দুটিতেই 'হিন্দু—ফিমেল স্কুল' —কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ভিত্তি প্রস্তরের গায়ে বসান তাম্র লিপিটির[৬] উৎকীর্ণ-লিপি নিম্নে দেওয়া হল।

মহামান্যা সাম্রাজ্ঞী
ভিক্টোরিয়ার
রাজত্বকালে
কোলকাতার কর্ণওয়ালিস স্কোয়ারে
হিন্দু ফিমেল স্কুলের
ভিত্তিপ্রস্তর
বাংলার উপরাজ্যপাল
মেজর জেনারেল শ্রদ্ধেয় স্যার জন
হাণ্টার লিট্‌লার জি সি বি
কর্তৃক স্থাপিত হয়।
তাঁকে সাহায্য করেন
বাংলার ডেপুটি গ্র্যাণ্ড মাষ্টার
এবং
সে সঙ্গে সমাবর্ত্তন সভার উপস্থিত
অসংখ্য শ্রদ্ধেয় কর্মচারীবৃন্দ
এবং কোলকাতার অধিবাসীবৃন্দ।
বুধবার, ৬ই নভেম্বর।

১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখে মৃত্যু এসে বেথুনের জীবনদীপকে নির্বাপিত করে দেয়। কিন্তু দেখা যায়—মৃত্যুর পূর্বে উইল করে তাঁর কোলকাতার ৩০,০০০ টাকার সম্পত্তি তিনি বিদ্যালয়কে দান করে গেছেন। উইলের প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ

"আমার যে জুড়ি গাড়ী এবং ঘোড়া কোলকাতার ফিমেল স্কুলের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলিকে বিদ্যালয়ের ব্যবহারে আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে তুলে দিয়েছি। কোলকাতাস্থিত আমার জমি জমা, বাড়ীঘর এবং যাবতীয় সম্পত্তি—বর্ত্তমানে যেগুলি ফিমেল স্কুলটির ব্যবহারের জন্যে রাখা হয়েছে—সব কিছুই আমি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

এবং তাদের পরবর্তীদের হাতে তুলে দিচ্ছি, এবং সে সঙ্গে এই অনুরোধ জানাচ্ছি—এগুলি যেন বালিকা বিদ্যালয়টি চিরতরে ব্যবহার করতে পারে। আরও অনুরোধ করছি—স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জীর অবদানের কথা স্মরণ করে তাঁর নামও যেন এ সবের সাথে শ্রদ্ধাভরে যুক্ত থাকে।

১৮৫১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্কুল গৃহের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়—এবং বিদ্যালয়টিকে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। বেথুন বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি এই ভাবেই ঘটে।

১। সে সময়ে বেথুনের স্কুলের কি নাম হবে—সে সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতা ছিল। উদ্বোধন দিবসের প্রাক্কালে "সংবাদ প্রভাকর" বিদ্যালয়টিকে "ভিক্টোরিয়া বাংলা বিদ্যালয়" নামে অভিহিত করে। দুদিন পরে, ১৯৪৯ সালের ৯ই মে তারিখে, এবং তারও পরে—আরও কয়েকটি সংখ্যায়—"ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" নামে বিদ্যালয়টিকে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু এ যে ভুল করে ছাপা হয়েছে—সে সম্পর্কে প্রমাণ্য প্রমাণ রয়ে গেছে। উদ্বোধনী ভাষণে বেথুন সুস্পষ্ট ভাবে স্কুলটির নাম "ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল" রূপে উল্লেখ করেন।

২। গাড়ীর গায়ে লেখা ছিল: "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ" অর্থাৎ: "অতি যত্নের সাথে কন্যা-দেরও লালন পালন করে শিক্ষিতা করে তোলা দরকার।"

৩। এডুকেশান্যাল রেকর্ডস-এর অংশ বিশেষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২—৫৩।

৪। "এডুকেশান্যাল রেকর্ডস্" এর একটি অংশ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬১।

৫। "জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইনষ্ট্রাক্সন" (১লা অক্টোবর, ১৮৫০—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৫১, পৃঃ Xii এবং Xiv)

৬। বেঙ্গল হরকরা এবং ইণ্ডিয়া গেজেট, ৮ই নভেম্বর, ১৮৫০।

নানা রঙের দিনগুলি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রসময় শূর

উপেনবাবুর ছেলেটির বয়স ছিল ৬।৭ বৎসর। আর মেয়েটির বয়স ৪।৫ বছর। আমাদের ঘর ছিল রাস্তার ধারে, রাস্তার দিকে ঘরের প্রধান দরজা; ঘরের পাশ দিয়ে একটি ছোট গলি, সে গলি দিয়ে উপেনবাবুর বাসায় যেতে হয়। এই গলির দিকে একটা ছোট দরজা ছিল। এই ছোট দরজা দিয়েই উপেনবাবুর ছেলে মেয়েরা আমাদের ঘরে যাতায়াত করত। প্রয়োজন মত আমরাও যেতাম। বাইর থেকে এই দরজা দেখা যেত না, কারণ গলির মুখেও একটা দরজা ছিল ওটা বন্ধ থাকলে এই দরজা দিয়ে যাতায়াত কারো নজরে আসার যো ছিল না। ছোট ছেলে মেয়ে দু'টো আমাদের সাথে ভাব জমিয়ে ফেলল। সকাল দুপুর যখন তখন কাকাবাবু কাকাবাবু বলতে বলতে এসে হাজির হত। আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেতাম। ওদের খাওয়ার জন্য কিছু লজেন্স ও বিস্কুট ঘরে জমা রাখতাম। মাঝে মাঝে ওদের হাতে দিতাম। ওদের খুশীর অন্ত থাকত না।

মেজদা এ আস্তানায় বেশীদিন রইলেন না। সপ্তাহ দুই পরে কলকাতার বাইরে গেলেন। আমি একা রইলাম। একা থাকার দরুণ উপেনবাবু আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে সুরু করলেন। আমার সুবিধা অসুবিধার দিকে তাঁর খুব নজর। খাওয়ার ব্যবস্থা আগে নিজেদেরই ছিল। এখন থেকে উপেনবাবু সে

ব্যবস্থা আর রাখতে দিলেন না। নিজের বাসায়ই আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল। আগেও অবশ্যি ভাল কিছু রান্না হলে না খাইয়ে ছাড়তেন না। এমনি করে এই পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। এতখানি ঘনিষ্ঠ হবার পেছনে আর একজনের অবদানও ছিল প্রচুর। তিনি হলেন উপেনবাবুর স্ত্রী—দিদি বলে তাঁকে ডাকতাম। এমন দরদী ও স্নেহশীলা মহিলা নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যেও দুর্লভ। পল্লীতক জীবনে যেখানে একটু আদর যত্ন পেলেই যথেষ্ট মনে হয়, সেখানে দিদি যে অজস্র হয়ে উঠতেন। একটা অহেতুক টানের পরিচয় পেতাম তার প্রতি ব্যবহারে। দিদি লক্ষ্মীপূজা করতেন প্রতি বৃহস্পতিবার, এ পূজায় হাজির থাকতেই হবে—এ দিদি ও উপেনবাবুর অনুরোধ উপরোধ নয়, আদেশ। আর এ আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা ছিল না আমার। প্রায়ই বলতাম—পুলিশের নজরে আছি, কখন কি হয় বলা যায় না, আমার একটা বিপদ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ বিপদ জেনেই আমরা এ-পথে নেমে হয়েছি। কিন্তু আপনারা সংসারী লোক, চাকরী করে পরিবার প্রতি-পালন করছেন। আপনাদের বাসায় যদি পুলিশের হাতে আমি ধরা পড়ি তা হলে পুলিশ রেহাই দিবে না উপেনবাবুকে-ও। এ পরিবার তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং আমার সাথে মেলামেশা খুব কম করা উচিত এবং তা-ও যথেষ্ট সাবধানের সহিত। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বলতেন দিদি—বিপদ হয় যদি হবে। বৃহস্পতিবারে আপনাকে ছাড়া যাবে না। নিরুপায়, আসতেই হতো। নীলু-রাণু-ও যেন পেয়ে বসেছিল, মায়ের মত কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। বার বার বলতে থাকত—আসতে হবে কিন্তু।

স্নেহ-প্রীতি ভালবাসায় ভরা দিনগুলি কাটছিল আনন্দেই। পলাতক জীবনের বিপদসংকুল ভয় ভীতির মধ্যে এরা স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকের স্পর্শ এনে দিত। এ জীবনে বঞ্চনা ছিল প্রচুর। আত্মীয় স্বজনরাও দূর দূর করত। এই অবাঞ্ছিত লোকদের মুখ দেখতে না পারলেই তারা শান্তিতে দিন কাটাতে পাবেন। জীবনে একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। কলকাতায় একটা শেল্টারে আছি। বিশেষ কারণে আমার আপন দাদার সঙ্গে সাক্ষাতের দরকার। তিনি থাকেন দমদম্ তাঁর শ্বশুর মশায়ের বাসায়। শ্বশুর রেলওয়েতে বড় চাকরী করেন। শ্বশুর মশায়ের চেষ্টায় দাদা-ও রেলওয়েতে একটা চাকুরী করছেন। ছদ্মবেশে আমি হাজির হলাম দাদার কাছে, তখন রাত প্রায় দশটা। বাইরের ঘরে বসে দাদার খোঁজ করলাম তিনি তখনই এসে গেলেন। তাঁর চোখে মুখে একটা মিশ্রভাব দেখলাম। একদিকে আনন্দ অনেক দিন পর আমার সাথে দেখা। অপর দিকে বড় আশঙ্কা ভীতি। কেবল যে পুলিশের ভয় তা নয়। তার চেয়ে বড় ভয় সরকারী বড় চাকুরে শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে। বুঝতে অসুবিধা হল না দাদা খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে গেছেন। নিজের ইচ্ছা থাকলেও আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করতে যেন ভয় পাচ্ছিলেন। এত রাতে খাওয়া দাওয়ার কথা উঠল না। দাদার সাথে কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর দাদা বাইরের ঘরেই শোবার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি ভরসা দিলাম আমি যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে এসেছি। বিপদের কোন আশংকা নেই। যাক, ছোট ভাইকে ফেলতে পারেন না, মনে হল নিজের দায়িত্বে রাত কাটাবার একটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

তখন রাত দুপুর। আমি নিশ্চিন্ত মনে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম তখনও আসে নি। হঠাৎ শুনি দাদা আমাকে ডাকছেন। আমি সবই বুঝতে পারলাম। দাদার কাছ থেকে শ্বশুর মশায় খবর পেয়েছেন সুতরাং আর যায় কোথায়। সরকারের মোর শত্রু এই লোকটির স্থান হবে না এ-বাড়ীতে, এক রাতের জন্য-ও নয়। দাদা পরমুখাপেক্ষী, নিজের মতের কোন প্রশ্ন উঠে না। শ্বশুর মশায় যা হুকুম করবেন তাই করতে হবে। বুঝতে পারলাম আমার আসার খবর পেয়েই বাড়ীর ভিতরে তোলপাড় সুরু হয়ে গেছে। দাদার আত্মীয়রা কেউ এসে আমার মুখদর্শনও করলেন না। দাদা মনের দুঃখে কাঁদ কাঁদ স্বরে আমাকে যা বললেন তার অর্থ হল—আমার আর বিলম্ব করা—চলবে না। এখনি বের হয়ে যেতে হবে। আমি যেন দাদাকে সান্ত্বনা দিয়েই বললাম, এ আর এমন কি, আমাদের এ রকমটি হতে পারে এতো জানা কথা। সেজন্য পূর্বেই দাদাকে বলেছিলাম আমার কাজ হয়ে গেলে আমি চলে যেতে-ও পারি। এ সব আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। অবস্থা এমন গুরুতর হবে দাদা বুঝতে পারেননি। খুব আঘাত পেয়েছিলেন তিনি সেদিন—ভাইকে একটা রাতের জন্যও আশ্রয় দিতে পারলেন না, ব্যবস্থা করে-ও বিদায় করে দিতে হল।

ছদ্মবেশটা সাথেই ছিল। সেটা পরে ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম। কলকাতার দিকে ট্রেন পেতে প্রায় ঘণ্টা দুই দেরী আছে। সে পর্য্যন্ত-ও এ-বাসায় থাকা চলবে না। আমি ষ্টেশনে চলে এলাম। ষ্টেশন ছিল খুব কাছে। ষ্টেশনে এসে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আলোকিত জায়গায় স্থান করে নিলাম। দৃষ্টি অত্যন্ত সতর্ক। কেউ কোন মতলবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না,

কোন দিক দিয়ে কোন বিপদের আশংকা যদি দেখা দেয় তার জন্য সদা জাগ্রত নজর রাখছে। মধ্য রাত্রির পর ট্রেন ধরে কলকাতায় চলে এলাম এবং নিরাপদে নিজের আস্তানায় গিয়ে উঠলাম। [ক্রমশঃ]

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (৩১০ পৃষ্ঠার পর)

India যারা পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন কিভাবে ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করে ইংরেজ শক্তি তাদের শিল্পসম্ভার গড়ে তুলেছে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব অর্থাৎ ভারত-লুণ্ঠন সুরু হওয়ার আগে ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য একান্ত নীচু জাতের ছিল। যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে বিচার করলে লাঙ্কাশায়ার ভারতবর্ষের মিলগুলির মধ্যে তারতম্য বড় একটা চোখে পড়তনা; কিন্তু ভারতবর্ষের সুদক্ষ শিল্পীরা যে সূচিশিল্পের পরিচয় দিয়েছিল সমগ্র পশ্চিমদুনিয়ার কাছে তা ছিল বিরাট এক বিস্ময়। শুধু বস্ত্রশিল্পেই নয়, ইংলণ্ডের লৌহশিল্প-ও খুবই নীচুস্তরের ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত সূচি ও রেশমের দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদি অপেক্ষা অর্দ্ধেক কিংবা তার কিছু বেশী দামে বিক্রি করলেও তাতে লাভ থাকত। এতে ইংরেজশক্তির টনক নড়ল। তাই ইংলণ্ডজাত সূতি ও রেশমের বস্ত্রাদি রক্ষা করবার জন্য বৃটিশ সরকার ভারত থেকে আমদানী দ্রব্যের উপর শতকরা ৭৩।৮০ টাকা বর্দ্ধিত কর বসান হল। যদি ইংরেজশক্তি আত্মরক্ষার এ হীন ব্যবস্থা গ্রহণ না করত তাহলে ম্যাঞ্চেষ্টার ইত্যাদি অঞ্চলের সূতিকলগুলি সূচনাতেই বন্ধ হয়ে যেত। এইভাবে ভারতবর্ষের শিল্পকে ধ্বংস করেই সেদিন ইংলণ্ডের শিল্পকে রক্ষা করতে হয়েছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন থাকত তাহলে শিল্পজগতে ইংরেজের এই ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়াতে পারত—ইংলণ্ড যেমন ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর কর বসিয়েছিল ভারতবর্ষ-ও ঠিক তেমনি ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের উপর কর বসিয়ে ভারতে তার প্রবেশ নিষেধ করে আপনাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারত। মিলের নিজের ভাষায় এবার সে কাহিনী শুনুন :

England's industrial supremacy owes its origin to the vast hoards of Bengal and the Karnatik treasure being made available for her use. Before Plassey was fought and won, and before the stream of treasure began to flow to England, the industries of our country were at a very low ebb. Lancashire spinning and weaving were on a par with the corresponding industry in India so far as machinery was concerned, but the skill which made Indian cotton a marvel of manufacture was wholly wanting in any of the Western nations. As with cotton so with iron, industry was in Britain at a very low ebb, alike in mining and in manufacture.

The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A D) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 per cent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 and 80 per cent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been stopped in their outset, and could scarcely have been again set in motion, even by power of steam. They were created by the sacrifice of the Indian manufacture. Had India been independent, she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of self defence was not permitted her, she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms. (Mills'

History of British India: Wilson)

এই ত গেল ইংরেজ কর্তৃক ভারতের শিল্পবিনাশ ও ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করে ইংলণ্ডের ধনভাণ্ডারকে ফাঁপিয়ে তোলার কাহিনী। এ লুণ্ঠনকার্যের ফলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ থেকে যে বিরাট অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়েই সে তার শিল্পবিপ্লবকে সম্ভব করে তুলেছে।

শুধু শিল্পের ক্ষেত্রেই নয় ভারতবর্ষের কৃষককুলকে ইংরেজ যেভাবে লুণ্ঠন করেছে তার কাহিনীও ভয়াবহ।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের মতে হিন্দু ও মোগল আমলে প্রজার নিকট হতে যে ভূমিকর আদায় করা হত, ইংরেজ আমলে তার চেয়ে অনেক বেশি আদায় হতে লাগল। ইংরেজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব পেয়ে ১৭৯৮ সালে কর আদায় করেছিল ২, ৬৮, ০০, ০০০ টাকা। অথচ বঙ্গের শেষ নবাব ১৭৬৪ সালে আদায় করেছিলেন মাত্র ৮১, ৭৫, ২৩০ টাকা। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণভারতের কথা বলতে গিয়ে শ্রীনগায়াম বেঙ্কটর লিখেছেন, "ইংরেজ কর্মচারীরা প্রজার কর বৃদ্ধি করিয়া নির্দ্দয়ভাবে কৃষকের রক্তের শোষণ করিতে লাগিলেন।"

(ক্রমশঃ)

কম্যুনিষ্ট রণকৌশলের একটি দিক

মলিত রায়

মালিক শোষিত, সমাজ বঞ্চিত শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার শেষ অস্ত্র ধর্মঘট। সর্বপ্রকার পারস্পরিক বোঝাপড়ার সব চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয় তখনই এ অস্ত্র প্রয়োগের কথা ওঠে, প্রযুক্ত হয়। কথা আসে, ধর্মঘট কি মালিকদের ওপর শ্রমিকদের দাবি চাপিয়ে দেবার কৌশল মাত্র নয়? সে অর্থে তালাবন্ধও কৌশল মাত্র। তবে মালিক তালাবন্ধ কৌশল বড় একটা ব্যবহার করতে পারে না। কারণ তা তার পক্ষে বড় রকম ক্ষতির কারণ। ধর্মঘট রাজনৈতিক কারণে সাধারণত ব্যর্থ যায় না। তাই ধর্মঘট অনেক বেশি ধারালো ও কার্যকর। দেশের স্বার্থের দিক দেখতে গেলে উভয়ই ক্ষতিকর।

অর্থনীতির উপর ধর্মঘটের প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যমূলক। ধর্মঘট রোধ করবার শেষ দায়িত্ব মালিকের নয়, সরকারের। ধর্মঘট ব্যাপক ও ঘনঘন হলে জাতীয় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে, সরকারকে তখন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রূপে এর মোকাবিলা করতে হয়। ব্যর্থ হলে তার রাজনৈতিক অবলুপ্তি ঘটে। ধর্মঘট-বিব্রত জনগণ তাদের জীবনধারণের মান রক্ষা করার জন্য সরকার পরিবর্তনের জন্য চাপ সৃষ্টি করে। অবস্থা ভেদে এ চাপ যে সামাজিক বিপ্লবের রূপ নিতে পারে তার একাধিক নজির ইতিহাসে আছে। অতএব ধর্মঘট রাজনৈতিক রণকৌশলও বটে।

জাতীয়তাবাদী দল বা নিছক শ্রমিকগণ যদি শ্রমিক আন্দোলনের নীতি ও কর্মসূচীর নিয়ামক হয় তাহলে এর চাপ হবে সীমিত। কারণ এক্ষেত্রে শ্রমিক আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করা নয়; শ্রমিকদের দাবীর সমর্থনে জনমত জাগ্রত করে সরকারকে শ্রমিক দাবি মেনে নেবার জন্য সক্রিয় করে তোলা। জনগণের হাতেই তারা ছেড়ে দেয় তাদের দাবিদাওয়ার ন্যায় বিচার। উন্নত দেশের গণতান্ত্রিক সরকার শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি মিটাতে সমর্থ না হলে পদত্যাগ করে অপর দলকে সুযোগ করে দেয় সে দাবির মোকাবিলা করার অথবা পুনর্বার নির্বাচিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করে তার শ্রমিক নীতি জনগণ সমর্থিত। বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে শ্রমিক ধর্মঘট সরকারের পতন ও পরিবর্তন ঘটাতে পারে কিন্তু তা দলীয় (রাজনৈতিক) স্বার্থরূপে ব্যবহৃত হয় না। কারণ এসব দেশের বলিষ্ঠ রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও নীতিতে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদে শ্রদ্ধাশীল। শ্রমিকগণও তাই।

উন্নতশীল স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে জাতীয়তাবাদের আবেদন সহজে শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। কারণ এ আবেদনে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলার মত চাপ সৃষ্টি করার মত দাবি আদায়ের কথা নেই, শ্রমিক মালিকের রক্তাক্ত শ্রেণীসংঘর্ষের উত্তেজক বক্তব্য নেই, নেই শ্রেণীহীন শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ ব্যবস্থার মনোরম স্বপ্নের সোনালী আবেশ, নেই নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশের নিরাপদ আশ্রয়পুষ্ট। অগণতান্ত্রিক ও বিজাতীয় দলগুলো জাতীয়তাবাদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, শ্রমিকদের পাহাড় প্রমাণ দারিদ্র ও অভিযোগ মূলধন করে তাদের নিজের দেশকে, ঐতিহ্যকে, জাতীয়তাবাদী জনগণকে, জাতির যা কিছু সুন্দর সব কিছুকে ঘৃণা করতে,

বর্জন করতে শেখায়। তারা ঘন ঘন ধর্মঘট ও তালাবন্ধ ঘটিয়ে জাতীয় অর্থনীতির মূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে যাতে জনগণের দারিদ্র বাড়ে, শ্রমিক অসন্তোষ ধ্বংসমুখী হয়। সংক্ষেপে, সামাজিক বিপ্লবের অবস্থা সৃষ্টি হয়। তাদের লক্ষ্য বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়ে শাসনযন্ত্র হস্তগত করে শক্ত একনায়কতান্ত্রিক পথে ব্যক্তি বিশেষের চিন্তাধারা ক্রমে সমাজ ও ব্যক্তির জীবনকে রূপান্তরিত করা। শ্রমিক ও শোষিতদের অভিযোগ দূর করা তাদের কাম্য নয়। হোতেও পারে না। সে ক্ষেত্রে অভিযোগ ও শোষণ মুক্ত শ্রমিক তার সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গী হারিয়ে ফেলবে যে! গণতন্ত্রের প্রতি তাদের দরদ যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তেমনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত তাদের শ্রমিক দরদ। সোসিয়ালিষ্ট কম্যুনিষ্টদের এ রাজনৈতিক রণকৌশলটি সঠিকভাবে ধরা পড়ে এডলফ্ হিটলারের বিশ্লেষণী মনে।

জাতীয়তাবাদী নেতা এডলফ্ হিটলার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর রূপে অভিনন্দিত (বা নিন্দিত) হবার বহু পূর্বে ১৯২৪ সালে যখন তিনি ফ্রান্সের জার্মানীকে খণ্ড বিখণ্ড করার হীন চক্রান্তের বিরুদ্ধে গণ মিছিলে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে ধৃত ও পাঁচ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন সে সময় তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও বিশ্ব-লাঞ্ছিত জার্মানীর অবস্থা যেমনটি দেখেছিলেন ও বুঝেছিলেন তার পরিচয় রেখে গেছেন তার Mein Kampf নামক আত্মজীবনীতে। অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে উপবাসী শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের সঙ্গে ভবঘুরে জীবনের অনেকটা কাটিয়ে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন কে বা কারা দায়ী তাদের দারিদ্রের জন্য। তার দরদী মন শ্রমিক সংস্থার সমর্থনে স্পষ্ট জানালো, "It is superfluous to us whether the Trades Union is indispensable." (পৃঃ ৫২ এ, বি, সি, পাবলিসিং হাউজ, নিউ দিল্লী, ১৯৬৮)। মালিক শ্রেণীর সমাজ চেতনার অভাব ও শ্রমিক শোষণ নীতি থেকেই শ্রমিক সংস্থার জন্ম। এ শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না ঘটা পর্যন্ত শ্রমিকদের নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হবার অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে। তাঁর ব্যক্ত মত: "So long as there are employers who lack social understanding and have wrong ideas of justice and fair play it is not only the right but also the duty of their employees —who. after all. an integral part of our people—to protect the general interests against the greed and unreason of the individual." (পৃঃ ৫২)।

শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষ শক্তির সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষে ন্যায়ের প্রশ্ন জড়িত নয়। ন্যায় নির্ধারণ যদি প্রশ্ন হোত তবে সংঘর্ষের স্থান থাকে না। বিষয়টি বিচার-বিবেচনার বস্তু হয়ে পড়ে। শক্তির পরিচয়ে ব্যক্তি হিসাবে দুর্বল শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ হোতেই হয়: "Therefore it is evident that if the individual workman is to have any chance at all of wining through in the struggle he must be grouped with his fellow workmen and present a united front before the individual employer, who incorporates in his own person the massed strength of the vested interests in the industrial or commercial undertaking which he conducts." (পৃঃ ৫২)।

শ্রমিকদের এ ভূমিকা ধ্বংসাত্মক নয়। বরঞ্চ তারা "can help to inculcate and strengthen a sense of social responsibility." (পৃঃ ৫২—৫৩)। শ্রমিকদের সামাজিক দায়িত্বের উপর জাতির উন্নতি নির্ভর করে। কিন্তু তাদের এ দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার কারণ তারা—যারা শ্রমিক কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করে বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে এ সম্পর্কীয় আইন কানুন হোতে দেয় না। রাজনৈতিক বুর্জোয়াগণ শ্রমিক আন্দোলনের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না বা চান না। ফলে শ্রমিকগণ সোসিয়ালিষ্ট তথা কম্যুনিষ্টদের রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে পড়ে। তারা তাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে। যা "originally fashioned for the defence of buman rights" ও রূপান্তরিত হয় "into an instrument for the destruction of the national economic structure." (পৃঃ ৫৩)। নিজেদের লক্ষ্যের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে বিজাতীয় দল জাতির আর্থিক কাঠামো ধ্বংস করার জন্য শ্রমিকদের অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে নিয়োগ করে। এডলফ্ হিটলারের নির্ভুল অভিজ্ঞতা বলছে, "From year to year it fell more and more under the political control of Social Democrats, until it finally came to be used as a batteringram in the class struggle. The plan was to shatter, by means of constantly repeated blows, the economic edifice in the building of which so much time and care had

been expended." (পৃঃ ৫৩), এরা জানে এর ফলে "The destruction of the state would become a matter of course, because the state would already have been deprived of its economic foundations." (পৃঃ ৫৩)।

যথাসময় সার্থক শক্তিতে এদের মোকাবেলা করতে না পারলে প্রচণ্ড জাতীয় বিপদ রূপে এরা দেখা দেয়। সব গণতান্ত্রিক দেশেই — যেখানেই তারা হাত রেখেছে—তারা "Turned democracy into a ridiculous and scorned phrase, insulted the ideal of liberty and stigmatized that of fraternity with the slogan 'If you will not become our comrade we shall crack your skull'." (পৃঃ৫৪)। গণতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চরম পর্যায়ে নিয়ে যাবার জন্য গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে "গণতন্ত্র বিপন্ন" ধুয়া তুলে গণ আন্দোলন পরিচালনায় কী অপূর্ব অভিনয় তাদের! "গণতন্ত্র" সম্পর্কে কমুনিষ্টদের সুচিন্তিত অভিমত, এ-হচ্ছে "A machine for the suppression of the working class by the bourgeoisie, for the suppression of the working people by a handful of capitatists" (From First Communist International).

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি-বিশ্লেষের চিন্তাধারার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রশংসনীয়। কার্ল মার্কসের মতে শ্রমিক সংস্থা হবে সংগঠনকেন্দ্র। উদ্দেশ্য হবে সম্পূর্ণ বন্ধন-মুক্তি। একে প্রত্যেক সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সামিল হতে হবে: "They must now learn to act deliberately as organising centres of the working class in the broad interest of its complete emancipation. They must aid every social and political movement tending in that direction." (Marx and Engels, Selected Works, Vol. 2 page 83). বিশ্বের শ্রমিকদের কাছ থেকে মার্কস যা আশা করেছিলেন তা না পাওয়ার কারণ তাঁর সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণের ভুল-ত্রুটি। মার্কসের চিন্তাধারার ভাষ্যকার ভি, আই, লেনিন শ্রমিক সংস্থাকে বলেছেন, "transmission belt." কারখানা অচল হয়ে পড়বে যদি মোটর থেকে মেসিনে যুক্ত transmission belts তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তাঁর ব্যাখ্যায় কম্যুনিষ্ট পার্টি হচ্ছে মোটর আর জনগণ মেসিন। শ্রমিকগণ transmission belts. "Just as the very best factory. with the very best motors and first class machines, will be forced to remain idle if the transmission belts from the motors to the machines are damaged, so our work of the socialist construction must meet with inevitable disaster its the trade unions the transmission belts from the Communist Party to the masses – are badly fitted or function badly" (Lenin Selected Works, vol. 3, pag 658).

পার্টি মোটর, জনগণ মেশিন আর শ্রমিকগণের কাজ পার্টির নির্দেশ জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া—এ উক্তি মানবতায় আস্থাহীন ব্যক্তির পক্ষেই শোভা পায়; প্রতিষ্ঠা করে পার্টির স্থান ব্যক্তির উপরে। [বলা বাহুল্য, পার্টি মানে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা।]।

কিন্তু পার্টি যদি এক না হয়ে একাধিক হয়? দুর্বল হয়? অসমর্থ হয় নির্ভুলভাবে বুঝতে জনগণের "Mood, the real aspirations, needs and thoughts"? তবে?

এর সুন্দর উত্তর আমাদের দেশের চলতি শ্রমিক আন্দোলন দিচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বতোভাবে জাতীয়তাবাদের আন্দোলন। একমাত্র সাম্প্রদায়িক দল ও কম্যুনিষ্ট ছাড়া সব দল ও সমাজের সর্বস্তরের জনগণ এ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র সংস্থা রূপ গণ-সংস্থাগুলো কংগ্রেস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোত। জনগণের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ। গণ সংস্থাগুলো transmission belts এর কাজ করত না, প্রয়োজনও হোত না। কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ছাড়াও তখন সবার স্বতস্ফূর্ত লক্ষ্য ছিল একটি মাত্র —জাতীয় স্বাধীনতা। এ দ্বারা এই সূচিত হয়, লক্ষ্য যদি এক হয় তবে জনগণের সমর্থন পাবার জন্য কোন transmission belt বা force প্রয়োগ প্রয়োজন পড়ে না। সমর্থন আপনিই আসে।

প্রত্যেক গণসংস্থার নিজস্ব অনেক অভাবঅভিযোগ আশা-আকাঙ্খা থাকে। সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি দ্বারা তা মিটান যায় না। কংগ্রেস ও পরবর্তী কোন জাতীয়তাবাদী দলই যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ দিকটি পর্যালোচনা করে দেখেনি। বরঞ্চ গণসংস্থাগুলোকে উপেক্ষা করে তারা সরাসরি জনগণের (বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর) কাছে তাদের বক্তব্য রেখেছে। ফলে তাদের জনসংযোগ সংগ্রামী হয়ে উঠতে পারেনি। এ সুযোগে মস্কো-ট্রেনড ভারতের কম্যুনিষ্টগণ গণ-সংস্থাগুলোতে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুপ্রবেশ শুরু করে। তাঁদের শ্রম ব্যর্থ যায়নি। মোটামুটি ভাবে আজ তাঁরাই শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। অল ইণ্ডিয়া

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (১৯২০) যা একদা সম্পূর্ণভাবে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীনে ছিল আজ তা কম্যুনিষ্টদের হাতে।

স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের কম্যুনিষ্টগণ স্বাধীন ভারতের প্রতিটি কাজকর্মের বিরোধিতা করতে শুরু করে যাতে জাতীয় উন্নয়ন প্রতি পদে পদে ব্যাহত হয়। তাঁদের হাতিয়ার হয় শ্রমিক ও কৃষক সংস্থা। ভুল পথে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের (সেভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আনা হয় পরিকল্পনার মডেল !) চেষ্টার ফলে ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ লোক উপবাসী। এরা গণ-সংস্থাভুক্ত। অভাবে ও প্রবঞ্চনায় সহজেই তারা কমুনিষ্টদের হাতের ক্রীড়নক হয়ে পড়ে। অপর দিকে আধুনিক কল-কারখানায় যারা কাজ করে বা অফিসে আদালতে—পাবলিক সেকটর সহ—তারাও তাঁদের শিকার হয়। গণ-সংস্থাগুলোর দাবি হয়ে দাঁড়ায় বেতন-মজুরি, ও মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধি। বোনাস বা বোনাসের হার সম্পর্কেও তাদের দাবি প্রখর হয়ে ওঠে। সরকারের দুর্বল শ্রমিক নীতি ও প্রীতির ফলে শ্রমিক তথা গণ-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিক্ষেত্রে তাদের দাবি পূরণ হওয়ার ফলে শ্রমিক নেতাগণ বুঝতে পারেন, ভোট-লোলুপ দুর্বল সরকার তাঁদের আন্দোলন রুখতে পারবে না। যে কোন কারণেই হোক জাতীয় মজুরের নীতি গ্রহণ করার মত ইচ্ছা বা সামর্থ তার নেই। গণসংস্থা-গুলোকে দলের হাতিয়ার করে এ সুযোগে তাঁরা দলের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। এর ফলে কয়েকটি জিনিসের উদ্ভব হয়। প্রথমত,মুদ্রাস্ফীতি তথা জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে ; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন শিল্পের শ্রমিকগণ ও একই শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শ্রমিকগণ বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সুখ-সুবিধার অধিকারী হয়। ফলে শ্রমিক-দের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি হয় এবং এক শ্রেণীর শ্রমিক বুর্জোয়া (তাদের নেতাদের মত) হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, ভারতের কম্যুনিষ্টগণ "সাধারণ নির্বাচন একটি রাজনৈতিক রণকৌশল" রূপে গ্রহণ করতে গিয়ে "শাসনতান্ত্রিক" হয়ে ওঠে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় বিধান সভা ও সংসদে ঢোকা, সুযোগ পেলে শাসন ক্ষমতায় আসীন হওয়া। চতুর্থত, তাঁদের কমাণ্ড নিতে হয় বিদেশ থেকে। পঞ্চমত, (সম্ভবত) তাঁদের "রেড আর্মি" বা "লিবারেসন আর্মি" নেই যা দ্বারা "গণতান্ত্রিক বিপ্লব" ত্বরান্বিত ও সম্পন্ন করা চলে।

যাদের নেতৃত্ব দেওয়া হোল তারা দেখলো তাদের দাবির পূরণ হচ্ছে বটে কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির জন্য অভাব না মিটে অভাব বেড়েই যাচ্ছে। যে আন্দোলন অভাব বাড়িয়ে তোলে সে আন্দোলনের মূল্য সম্পর্কে, নেতাদের সততা সম্পর্কে তাদের প্রশ্ন জাগে। আর এর সঙ্গে জেগে ওঠে তাদের জাতীয়তাবোধ। দেশকে তারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? কিসের উদ্দেশ্য, কার প্ররোচনায় ? কার স্বার্থে ?

কম্যুনিষ্ট ষ্ট্র্যাটিজি অনুযায়ী জনগণের মনে এ "প্রতিক্রিয়াশীল" প্রশ্ন জাগার আগে এগিয়ে আসতে হবে "মুক্তি ফৌজ"-কে কমাণ্ড দিতে। আর তাকে "পলিটি-ক্যাল কমাণ্ড" দেবে পার্টি। উভয়েরই অভাব। জনগণের প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে আজ তাঁরা নিদারুণ পরা-জয়কেও (রেল ধর্মঘট) জয়মাল্যে সজ্জিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করে। এটা ট্রাজেডী হলেও তাঁদের কাছে ষ্ট্র্যাটেজি। এডলফ্ হিটলার সোস্যাল-ডিমোক্র্যাট্স্দের লক্ষ্য করে যথার্থই কটাক্ষ করে গেছেন : "In this way they established for themselves a solid bulwark behind which they could safely retire whenever the struggle assumed a critical aspect." (পৃঃ ৫৩)

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েদ কর্তৃক ১২/সি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ স্থিত নিউ বিশ্বনাথ প্রেস হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

1st June 1974

NISHANA
Phone : 44-1460

Regd. No. RN—24618/73
Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from :

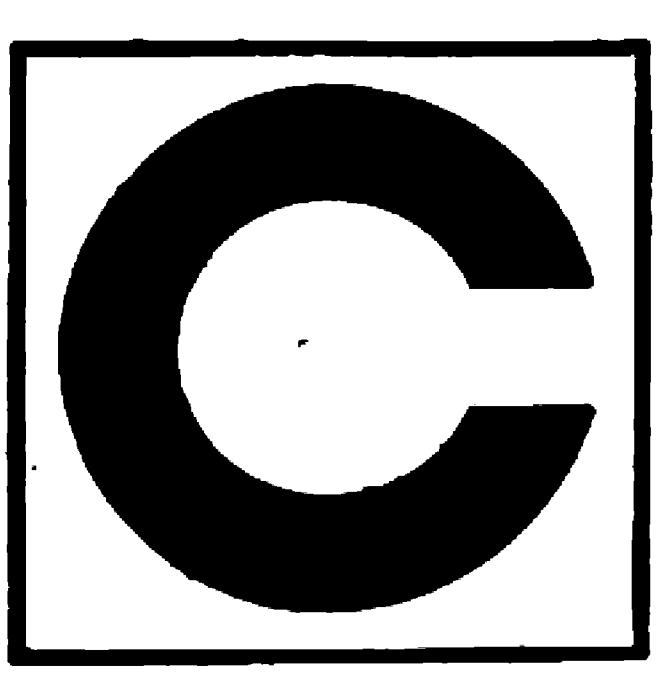

Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

3H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, SILK & HANDICRAFTS

CENTRAL LIBRARY

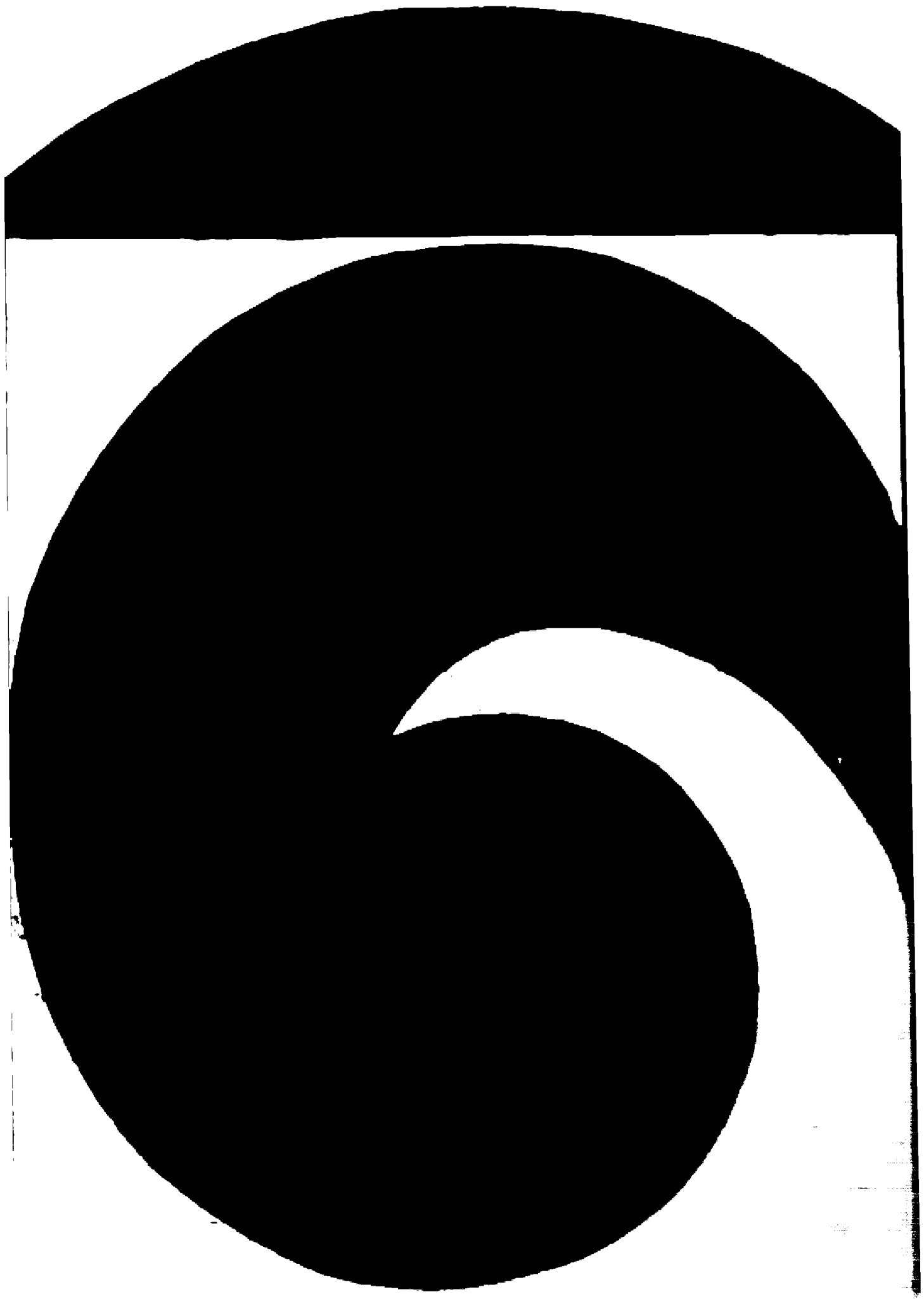

১২শ (দ্বাদশ) সংখ্যা ১৫ই জুন ১৯৭৪

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

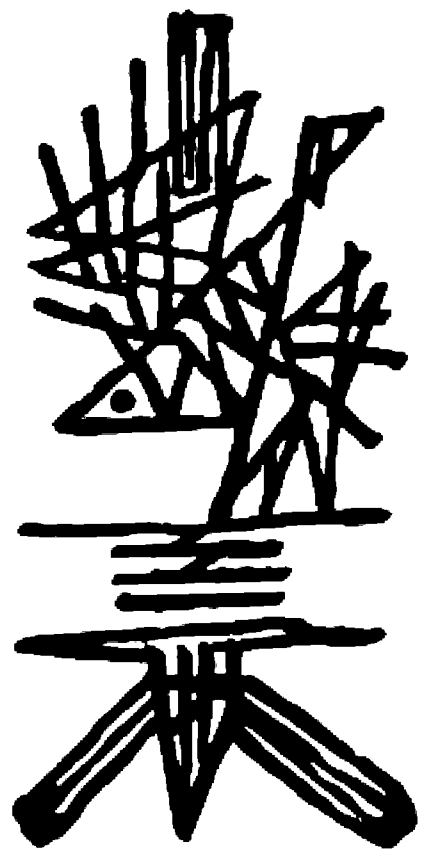

ARTS & PRINTS PVT. LTD.
31 PARK MANSION
CALCUTTA-16

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১। প্রত্যাশা	...	সম্পাদকীয়	...	৩৩৭
২। রেলওয়ে ধর্মঘট ও কমিউনিষ্টদের ভূমিকা	...	সুবিনয় মুস্তফী	...	৩৩৮
৩। স্মৃতিকথা	...	উপেন্দ্র কুমার ধর	...	৩৪২
৪। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতীয় আর্থিক বৃত্তি	...	অধ্যাপক জগদীশ গংচৌধুরী	...	৩৪৩
৫। দিল্লীর কড়চা	...	কিংকর	...	৩৪৭
৬। অগ্নিবীণার ছিন্নতারে (কবিতা)	...	ধীরেন বসু	...	৩৫০
৭। কোন পথে	...	সন্তোষ সেনগুপ্ত	...	৩৫১
৮। দেখেশুনে	...	চক্রপাণি	...	৩৫৩
৯। মুক্তভবা	...	কালীকিংকর চট্টোপাধ্যায়	...	৩৫৫
১০। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	...	নিকুঞ্জ সেন	...	৩৫৬
১১। নানা রঙের দিনগুলি	...	রসময় শূর	...	৩৫৭
১২। মালোভ হত্যাকাণ্ড ও তারপর	...	রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক	...	৩৫৯
১৩। ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র	...	দীপেন সাহা	...	৩৬৫

সম্পাদকমণ্ডলী:

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ স্মৃতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী

"মৃত্যু ডেক করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।"

—রবীন্দ্রনাথ

'নিশানার' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যগণকে প্রতিমাসে দুটি পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৌল ও সময়োচিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হবে। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ECONOMIC AFFAIRS

INDIA'S PREMIER ENGLISH ECONOMIC MONTHLY

Now on its 19th year of continuous publication

Editor HIMANSU ROY

Deals with advanced economic theory and topical economic problems. Discussion of India's planned economy is its primary objective. Read throughout the world.

Subscription :

Annual : Inland Rs. 27·00

Foreign US $ 8·00

For further information

Manager

ECONOMIC AFFAIRS

10, Galiff Street, Block-5,

Suite-64 Calcutta-700003

নিশানা

৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১ : ১৫ই জুন, ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

প্রত্যাশা

চতুর্থ পরিকল্পনার শোচনীয় পরিণতি দেখে পরিকল্পনা কমিশন অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে পঞ্চম পরিকল্পনার খসড়া রচনায় হাত দেন। চতুর্থ পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৫.৭ শতাংশ। সত্যিকার দাঁড়াল ৩.৭ শতাংশে। পঞ্চম পরিকল্পনার প্রথম খসড়ায় এর লক্ষ্য ধরা হয়েছিল ৬.২ শতাংশ। দেখেশুনে এক্ষেত্রে কলমের এক খোঁচায় তা নাবিয়ে আনা হোল ৫.৫ শতাংশে। জনগণকে জানিয়ে দেওয়া হোল, সব কিছু পরিকল্পনা মাফিক চললেও জনসংখ্যার ৩০ শতাংশকে অর্ধাহারে থাকতে হবে ১৯৮৪-৮৫ সাল অব্দি। অর্থাৎ সব কিছু ঠিক থাকবে না এবং অধিকতর সংখ্যক জনগণকে অনাহারে থাকার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অনাগত কাল পর্যন্ত। পরিকল্পনা কমিশন আরও জানিয়ে দিয়েছেন জনগণকে, গুণগতভাবে জাতীয় সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও আয় আপেক্ষিক ভাবে কমছে। বিশ্বের পরিকল্পনের ইতিহাসে পরিকল্পনার এ প্রকার বিপরীত কর্মের নজির একমাত্র ভারতই সৃষ্টি করে প্রসিদ্ধি লাভ করছে।

একদা জনগণ পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আজ তা তাদের কাছে নিছক ভাঁওতাস্বরূপ। পণ্ডিতগণের পাঠশালা! তাই তাঁদের সটান জিজ্ঞাসা ভাত-কাপড় কই? মাথা গোঁজার স্থানটুকু? খাটতে চাই, চাকুরী কই?

এর জবাব নেই। থাকতে পারে না। সরকার জানে পরিকল্পনার আদর্শ ও কাঠামোর মধ্যেই রয়েছে জাতির মৃত্যুবীজ রোপিত। মিশ্র অর্থনীতিতে অধিকতর মিশ্রণ চলে, পরিকল্পনা নয়—সর্বাত্মক পরিকল্পনাতো নয়ই। সর্বাত্মক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক মানবিক মর্যাদার সমাধি—যেমনটি ঘটেছে কমিউনিষ্ট দেশে—এ ধারণা শুধু ভুল নয়, সর্বনাশাও। মিশ্র অর্থনীতি দুর্বল, গতিহীন। বৃটেন তাই এ পথ পরিহার করছে। ফ্রান্স উগ্রতার সঙ্গে তা বর্জন করে সরকারের উপর দায়িত্ব চাপিয়ে চলেছে সমগ্র অর্থনীতির গতিপথ ও গতির নির্দেশ দেবার। পশ্চিম জার্মানীর ভূমিকা: সতর্কতার সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া। অপর দিকে কমিউনিষ্ট দেশগুলোর কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা আজ দিশেহারা, বাজার ও মুনাফা-মুখী হয়ে তা জাতীয় অর্থনীতিকে গতিহীনতার প্রবণতা থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে। ঐতিহাসিক কারণে ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর বুনিয়াদের সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু ভারতের ঐতিহ্য এবং তার সামাজিক, মানবিক ও আত্মিক আদর্শের সঙ্গে এর রয়েছে আকাশ-প্রমাণ প্রভেদ। কমিউনিষ্ট দেশগুলো থেকে তো নিশ্চয়ই। পাশ্চাত্য দেশগুলো স্থির হয়ে নেই। নতুন সমতার অন্বেষণে তারা তাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে গড়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। অথচ ভারত তার পুরানো বুনিয়াদই আঁকড়ে ধরে আছে। আদর্শ যদি চলার লক্ষ্য হয় তবে বলতেই হবে ভারতের সামাজিক বুনিয়াদ হবে সর্বাংশে ভারতীয়। চলতি সামাজিক বুনিয়াদ ও আদর্শের পরস্পর বিরোধিতা ও সংঘর্ষ ভারতের সামগ্রিক জীবনের মৌলিক সমস্যা। ভাত-কাপড়ের দাবির মধ্য দিয়ে ভারতের জনগণ বারবার সে-কথাই জানাচ্ছেন। সহজভাবে বলছেন, অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমরা চাই জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ; রাজনীতি ক্ষেত্রে এমন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা যা প্রতিনিধিত্ব করবে জনগণের; এবং সমাজ ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্থান হবে মর্যাদাপূর্ণ। এ চাওয়ার পথের বৃহত্তম বাধা দেশের সামাজিক বুনিয়াদ। তাই তাদের বিক্ষুব্ধ চাপ, একে নতুন করে গড়ার জন্য ভাঙতে হবে। সংস্কার দ্বারা পুরানোকে নতুন করে গড়া যায় না। আঘাতে আঘাতে তাকে ভাঙতে হয়। ভাঙার থাকবে বিশেষ পদ্ধতি, গড়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সামঞ্জস্য। এটা বিপ্লব। গড়ার জন্য ভাঙার মহোৎসব। ভারতের মত বিশাল দেশের পক্ষে দু শতাব্দীর পরাধীনতার দীনতা ও গত সাতাশ বছরের কর্মবিমুখতা ঝড়ের বেগে পেরিয়ে চলতি দুনিয়ার

শ্রেষ্ঠতম দেশগুলোর অন্যতম হয়ে বাঁচার মত বাঁচতে হোলে এ বৈপ্লবিক পথ ছাড়া উপায় নেই। কালোবাজার বা দুর্নীতি, বেকারত্ব বা অনাহার, মুদ্রাস্ফীতি বা পরিকল্পনার ব্যর্থ অনুশীলন সমস্যা নয়; মূল সমস্যার প্রতিফলন, সমস্যার সমস্যা মাত্র। জনগণ মূল সমস্যার সমাধান চায়, উপ-সমস্যার নয়। চায় বিপ্লব। বিপ্লবোৎসব।

কিন্তু কোথায়, ভবিষ্যতের কোন গহ্বরে, সমাজের কোন্ কোণে সেই বৈপ্লবিক দল যে শ্রেণী সংগ্রামমূলক ইতিহাসের ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে গ্রাম দিয়ে শহর তথা দরিদ্র দিয়ে ধনীকে ঘেরাও করার পদ্ধতি বা আজ শুশ্রূষাকের বৃত্তিতে অবনমিত। যার ধমনীতে প্রবাহিত ভারতের মহান ঐতিহ্যের ধারা, স্বীকৃতিতে শক্তির উৎস জনগণ, কর্মের উৎসাহ মানবিক মর্যাদা, ধর্মের বাণী সাম্য ও মৈত্রী, ইতিহাসের শিক্ষা কর্মগত শ্রেণী সমন্বয়, দর্শনের জ্ঞান সংঘাতের মধ্যে মিলন, কোথায় সেই দল যার আদর্শ রচিত, কর্মপন্থা নির্দিষ্ট এ মানবিক চেতনায় বৈজ্ঞানিক পরিপূর্ণতায়?

ভারতের বুদ্ধিজীবী ও যুবশক্তির কাছে জনগণ এর জবাব প্রত্যাশা করেন।

রেলওয়ে ধর্মঘট ও কমিউনিষ্টদের ভূমিকা

সুবিনয় মুস্তফী

ঘটনা বহুল ১৯৭৪ এর মে। ঐতিহাসিক ইন্দো-বাংলাদেশ চুক্তি। ভারতের প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ, দেশে বিদেশে নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। ভারত পারমাণবিক শক্তিরূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচরণের প্রয়াসী। এই সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে চাপা দিয়ে প্রধান সংবাদ ছিল রেলপথের ধর্মঘট, যা জনজীবনকে উদ্বেলিত করে তুলে ছিল। শহর বন্দরের জীবন স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছিল। প্রশাসক ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার রক্ষাকারীদের কাটাতে হয়েছে উদ্বিগ্নচিত্তে নিদ্রাহীন রাত। দিল্লীতে সর্বোচ্চ স্তরের নায়কদের বসতে হয়েছে ঘনঘন সলা-পরামর্শের জন্যে। তারা অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তায় সদা চিন্তিত। সকল রকমের পুলিশ বাহিনীকে দিনরাত শহরে বন্দরে গ্রামে নালা ডোবার কিনারে ছড়িয়ে দিয়ে নিরস্ত্র মানুষগুলির সাথে চালাতে হয়েছে সমর অভিযান। এমনিভাবে কেটেছে একদিন দু'দিন নয়। মাসাধিক কাল। আর প্রচার বিশারদের রাত জেগে জেগে সংবাদগুলিকে গলা টিপে টিপে হত্যা করে—সংবাদের জন্ম দিতে হয়েছে চার দেওয়ালের অন্ধ-কামরায়। অন্যদিকে গাড়ীর চাকার চলা বন্ধ করে দিয়ে মানুষগুলি ঘরে বসে থাকতে পারে নাই। তাদের দিন কেটেছে ভয়ে আতঙ্কে, ঘর ছেড়ে ছেড়ে পালিয়ে, বনে জঙ্গলে; কারাগারে। স্ত্রী পুত্র অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায় নাই। সারা দেশের সকল অঞ্চলে এলাকায় একই চিত্র। একই রূপ। ইতিহাসে গণতন্ত্রের আবরণের ভেতরে একনায়কত্বসুলভ নিপীড়নের এক নয়া সংযোজন।

এ ধর্মঘটে সাধারণ শ্রমিক মালিক বিরোধ ছিল না। দাবিদাওয়া আদায়ের জন্যে ধর্মঘট হলেও এর আসল চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। ধর্মঘটি শ্রমিকদের দাবি দাওয়াগুলি মেনে নিয়ে কাজ-বাহিত করতে হলেই—বর্তমান প্রশাসন ও নীতি পদ্ধতিগত পরিবর্তন ছিল অপরিহার্য। বহু দাবি ছিল শুধু নীতি-গতভাবে মেনে নেওয়ার জন্যে। সরকারের নীতির মৌলিক পরিবর্তন এ দাবিগুলির সাথে জড়িত ছিল। বর্তমান প্রশাসকগণ রেলপথের পরিচালনা ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন চান না। মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া রেলের অচল অবস্থার অবসান সম্ভব নয়। বর্তমান পরিচালন ব্যবস্থাটাই জনসাধারণ ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী। আর শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন মানে শাসকদের বদল। এই প্রশ্নের মীমাংসা রাজনৈতিক স্তরে সম্ভব।

ছোট বড় বাম দক্ষিণ মধ্যপন্থী সকল রাজনৈতিক দল ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ধর্মঘটে জড়িত ছিলেন। কেহ পক্ষে, কেহ বিপক্ষে আবার কেহ এদিক ওদিকে, দুদিকে। আন্দোলনের গতিধারা পরিণতির বিষয়ে দলগুলির ভেতর মতভেদ ছিল। যারা পক্ষে ছিলেন তাদের ভেতরেও ক্ষণেক্ষণে নানা মতভেদ দেখা দিয়েছে। নিজ নিজ দলীয় দৃষ্টিতে এর বর্তমান ভবিষ্যত ভেবেছেন। টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। সরকার ও সরকারী

দল, তাদের সমর্থক গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে মোকাবিলা করে তারা এর পরিণতি ঘটিয়েছেন। এ ধর্মঘট তাদের গোটা প্রশাসন ও নীতি পদ্ধতির মূলে সজোরে আঘাত বলে ধরে নিয়ে সরকার শক্ত হাতে নির্মমভাবে ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। তারা গোটা প্রশাসন, প্রচার যন্ত্র, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে পালিত রক্ষীবাহিনীগুলিকে অত্যন্ত শক্ত ও দৃঢ় ভাবে পরিচালনা করে অস্তিত্ব রক্ষা করেছেন।

তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন গোটা ধনিক বণিক ও বিত্তবান শ্রেণী, শাসক দল ও সমর্থকদের ভেতর স্বার্থের টানা পোড়েনের কলহ-বিবাদ ধর্মঘটের সময়ে মুলতুবী রেখে সবাই এক হয়ে মোকাবিলা করেছে। দীক্ষিত, চ্যবন, মালব্য, ধার, জগজীবন, মিশ্রজী, রেড্ডীজী সকলে সমবেতভাবে সলা-পরামর্শ করে ইন্দিরাজীর পেছনে দাঁড়িয়ে ধর্মঘটের অবসান ঘটিয়েছেন। সবাই বিজয়সুলভ আত্মতৃপ্তি অনুভব করেছেন। তারা ভাবছেন এই ধর্মঘট ভেঙ্গে বানচাল করে দেওয়ার ফলে আগামী কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে সরকারী বেসরকারী সকল শিল্প উদ্যোগে ধর্মঘট জিনিষটাকে বিদায় করে নিরাপদ হওয়া গেল। এই চিন্তার অনুসারী হয়েই বেসরকারী শিল্প মালিক বণিকরাও সারাদেশব্যাপী ধর্মঘটের সময় অর্থাৎ লাইফ-লাইন সম্পূর্ণ অচল হয়ে থাকা সত্ত্বেও কোন অংশেই জিনিষ পত্রের অভাব ও দরবৃদ্ধি ঘটিয়ে শাসকদের সামনে নূতন কোন সমস্যার সৃষ্টি করেন নাই। এঁরা সরকারের সাথে সহযোগিতা না করলে দীর্ঘদিন বাজারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। সারাদেশ জুড়ে এমনভাবে রেলপথে অচলাবস্থা আর কোন দিন হয় নাই। নির্দিষ্ট ৮ই মে'র আগেই বহু অঞ্চলে ধর্মঘট আরম্ভ হয়ে যায়। আর তার জের আজও চলছে। আহত অপমানিত শ্রমিক কাজে ফিরে এলেও কর্মদক্ষতা সে হারিয়ে এসেছে। ধর্মঘট আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবন ও আগামী কাল সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন যেমন উঠিয়েছে, তেমনি, আগামী কালের রাজনীতি গণ-আন্দোলন ও সরকারের চরিত্র সম্পর্কে নূতন ভাবে ভাবতে ইঙ্গিত দিয়ে গেল। সাথে সাথে বর্ত্তমান রাজনৈতিক দল-গুলির সম্বন্ধে মূল্যায়ণের প্রয়োজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। স্বাধীনোত্তর ভারতে এধরণের রাজনৈতিক শ্রমিক ধর্মঘট এই প্রথম। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ ভারতে এতবেশী শ্রমজীবি মানুষ এক সাথে এর আগে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে নাই। দক্ষিণ বাম মধ্য সকল পন্থীদের একযোগে শাসক দলকে লড়াইর ময়দানে মোকাবিলাও এই প্রথম। ভারত-বন্ধ ডাকার মত সাহসও এই প্রথম। সার্বিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক তীব্র সংকটের মুখে শাসক শক্তির সামনে এত বড় চ্যালেঞ্জও এই প্রথম। অন্যদিকে শাসকগণ ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে সকল বিরোধী শক্তির সফল মোকাবিলায় জয়ী হয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করল। আর সারাদেশ জুড়ে একই কায়দায় ধর্মঘট ভাঙ্গার জন্য অমানবিক ভাবে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ভদ্র সন্তান সন্ততির উপর এত নির্য্যাতন নিপীড়ন দমনও এইবারের মত আর কোনদিন সংঘটিত হয় নাই। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে শাসক দলের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে হাত মিলিয়ে সাহায্য করেছে ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল। এই ঘটনাটি প্রথম নয়। কমিউনিষ্ট নাম ধারণ করে তারা বরাবরই এইভাবে শাসক দলকে সাহায্য করে এসেছেন। পুঁজিবাদীদের বেঁচে থাকতে বা শক্ত হাতে শ্রমিক আন্দোলন দমনে সাহায্য করে ভারতীয় পুঁজিবাদীদের আস্থা অর্জন করে কমিউনিষ্ট-পুঁজিবাদের বন্ধুত্বের বুনিয়াদ আরও শক্ত করে তোলা হল। যদ্দো দিল্লী ঐক্য রক্ষায় তারা যে কত খাঁটি, কমিউনিষ্টগণ নূতন করে তা প্রমাণ করলেন। আজকে কমিউনিষ্টদের আচার-আচরণ, চলাফেরা, চিন্তাভাবনা, কার্যকলাপ-সারাদেশের পত্র পত্রিকার মাঠে ময়দানে শ্রমিক এলাকায় সবচেয়ে বেশী আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ধর্মঘটে শাসকদের চরিত্র যেমন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তেমনি কমিউনিষ্টদের চরিত্রটিও পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। আমরা প্রবন্ধের এই স্বল্প পরিসরে, ধর্মঘটের সময়ে কমিউনিষ্টদের ভূমিকাটি বুঝতে তার আসল কারণটির দিকে দৃষ্টি ফেরাতে চেষ্টা করবো। আমাদের আলোচনা শুধু যদ্দো পন্থীদের সম্পর্কেই সীমিত থাকবে।

কমিউনিষ্ট দল ভারতে জন্ম নিয়ে সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতির সঠিক মূল্যায়ন করে কোন দিন নীতি নির্ধারণ করতে পারে নাই। জন্মলগ্ন থেকেই এরা রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির লেজুড় বৃত্তি করে এদেশের রাজনীতিতে বিচরণ করছে। স্বাধীনভাবে স্বদেশের অবস্থার বিচারে কোন সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করে নাই! প্রত্যেক দেশের বৈদেশিক নীতি সেই দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ জাতীয় স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই অন্য দেশের সাথে চলার নীতি অবলম্বন করা হয়। আন্তর্জাতিক সমাজের স্বার্থে, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে কোন দেশেরই বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত নয়, মুখে যতই আন্তর্জাতিকতার কথা উচ্চারণ করা হউক না কেন। শুধু ভারতের কমিউনিষ্ট কেন, দুনিয়াভর কমিউনিষ্ট আন্দোলন বরাবরই রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির লেজুরবৃত্তি করে এসেছে। চায়না উদয়ের ফলে, রাশিয়া-চায়না বিবাদকে কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট আন্দোলন ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে। আজকে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন রাশিয়ার একার নেতৃত্বাধীন নয়,

বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কমিউনিষ্ট আন্দোলন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ও যাচ্ছে। আমাদের দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলন এককালে শৃঙ্খলিত দলীয় সংগঠনে আবদ্ধ ছিল। আজ বহু দলে ভেঙে পড়েছে। কেরালার নব গঠিত কমিউনিষ্ট দলের জন্মের ভেতর দিয়ে দেখা যায় ৬টি দল তৈরী হয়েছে। তারপর নাম ছাড়া বহু দল উপদল রয়েছে। বার বার নীতি গ্রহণে ভুল স্বীকার করা, আঁকা বাঁকা পথে চলে দেশের জনগণকে বিভ্রান্ত করা; কোন আন্দোলনের পরম মুহূর্তে ভুল করে বা বৈদেশিক শক্তির স্বার্থে জনস্বার্থ বিরোধী আওয়াজ তুলে সেই মুহূর্তটি নষ্ট করে দেওয়া; এরা আদি-কাল থেকে করে আসছে। এদের কার্যকলাপ বারবারই জনজীবনে হতাশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। এইভাবে তারা শাসক শক্তিরই সুবিধা করে দিয়েছে। এইসব ঘটনার সাক্ষী হয়ে রয়েছে আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস। স্মরণ করুন যুদ্ধ-কালীন এদের কার্য্যকলাপ। সেদিন এরা ফ্যাসি-বাদ বিরোধী সংগ্রামের নামে যে কলঙ্কময় কাজ করেছিল—সেইসব কাজে কাদের সুবিধা হয়েছে? সুবিধা হয়েছিল মৃত্যুপথযাত্রী বৃটিশ সাম্রাজবাদের, আজকের সর্ববৃহৎ শক্তি আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদের। সেদিন যদি সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা মত যুদ্ধোত্তর বিপ্লব সফল করা হত তাহলে ভারতের রূপ আজকের মত দাঁড়াত কি? নিশ্চয় করে বলা যায়—না। আর সুবিধা করে দেওয়া হয়েছিল আজকের ভারতের শাসক শ্রেণীর। পলায়নরত জরাগ্রস্ত সাম্রাজ্যবাদ তাদের ঔরসজাত এবং তাদের অনুগত স্বগোষ্ঠীর সাথে আপোষে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। শাসনটি দেশীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে—শোষনটাকে রক্ষা করল। কমনওয়েলথের ভেতরে থেকে দেশী বিদেশী মিলে আজও তারা শোষন করে চলেছে। এই মহাদেশের রাজনীতির আশেপাশে ছায়ার মত আজও বৃটিশ সক্রিয় ভাবে ঘুরছে। সেদিন এরা যদি সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য না করে নেতাজীর যুদ্ধোত্তর বিপ্লবের পরি-কল্পনাকে সফল করার চেষ্টা করত তাহলে আজকে দেশের এমন অবস্থা হত না।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এতসব সত্ত্বেও এদের পেছনে আজও মানুষ আছে কেন? দেশে আজও এরা পক্ষ বিস্তার করে কিভাবে বিচরণ করছে? তার কারণ নিশ্চয়ই আছে—সে অন্য কাহিনী। তবু সংক্ষেপে বলা যায় আন্তর্জাতিক নামের প্রভাব, তার প্রচার। প্রচারের জন্যে ব্যাপক ব্যয়ের ক্ষমতা। এদের কাগজ পত্রে মুখে সর্বসময় সংগ্রাম বিপ্লবের মত মুখরোচক ও আকর্ষক কথাবার্ত্তার প্রচার। প্রচারে আচরণে নেতা থেকে কর্মী পর্যন্ত এমন ভাবে চলে যেন জনগণের কল্যাণের ঠিকেদারী নিয়েই তারা ভারতে এসেছে। এইভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মোহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। অথচ নীতি নিয়ে চলেছে জাতীয় গণতন্ত্র ও জনগণতন্ত্র। এই তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষ খুব গভীর ভাবে বিচার করে না, অন্যদিকে এই সব তত্ত্বের গোলক ধাঁধাঁয় সমাজের একদল বিত্তশালীকেও টেনে সাথে জড় করতে সক্ষম হয়। বিদেশ ভ্রমণ বা অন্যান্য সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমেও তরুণ যুবকদের এরা আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। বিশেষ বিত্তবান ঘরের ছেলেরাও এদের দিকে আকর্ষণ বোধ করে। আজকের কমিউনিষ্ট আন্দোলনে কয়জন সাধারণ মেহনতী মানুষের ঘরের? অন্যান্য দলের নীতি সঠিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এদের চাকচিক্যময় প্রচারের সামনে ম্লান হয়ে যায়। আজকে রেলধর্মঘটে এদের ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ করে আগামী কালের কথা ভাবতে হবে—এই কথাগুলি স্মরণ রেখে ভাবতে হবে। তাহলে বুঝা যাবে যে এদের আচার আচরণ নূতন নয়। এদের এই সব কাজ নীতি বহির্গত নয়। জন্ম লগ্ন থেকেই এরা এভাবে বার বার বিদেশী শক্তির স্বার্থে নিজের দেশের জনসাধারনের সর্বনাশ করে শাসক শক্তির সাথে হাত মিলি-য়েছে। নূতন কোন কিছু করে নাই। যতদিন মস্কো দিল্লী মিস বজন থাকবে ততদিন তারা নানা অজুহাতে যুক্তিজাল সৃষ্টি করে প্রগতির লক্ষণ খুঁজে বের করে শাসকদের সাহায্য করবেই। স্বৈরচারী ফ্যাসিবাদী কায়দায় জনগণকে পিষে মারলেও প্রগতির চিহ্ন দেখ্‌বে। আজকে দিল্লীর শাসকদের চেহারা ছবিতে চরিত্রে প্রগতির কোন চিহ্ন আছে কি? তবু তারা বলবে কংগ্রেসের ভেতর প্রগতিশীল মানুষ গিজ গিজ করছে। দক্ষিণপন্থী উত্থানের রোধ-কল্পে এই প্রগতিশীল কংগ্রেসকে সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। সুতরাং রেলধর্মঘটের সময় তারা তাদের বিশ্বাসমতে ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তমতে ঠিক কাজই করেছে। এই ধর্মঘটের নেতৃত্বের ভেতর ঢুকে কিভাবে ধর্মঘটকে বানচাল করতে শাসক শক্তিকে সাহায্য করেছে, তা পাঠক প্রকাশিত টুকরো টুকরো সংবাদগুলি বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই আন্দাজ করেছেন। তার বিস্তারিত আলোচনার এখানে অবকাশ নেই।

সি, পি, আই শাসক দলকে ব্যতি-ব্যস্ত করে সমস্যায় ফেলা বা তার পতন ঘটানো তাদের বর্তমান নীতি নয়। তাদের নীতি হল এই সরকারকে গণরোষ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। তাদের আন্দোলনের ধরণ থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সরকারের নীতির কল্যাণেই আজকে সমাজ সংকটাপন্ন ও

দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। চোরা-বাজারী ও মজুতদারী জন্ম নিয়ে গোটা অর্থব্যবস্থাকে পঙ্গু করে ফেলেছে। এই সরকারী নীতির বিরুদ্ধে তাদের কোন কথা নেই। তারা এখানে সেখানে মজুত উদ্ধারকারী আন্দোলন করছেন।

আজ ভারতীয় শাসক দল গণতন্ত্রের মুখোস খুলে ফেলে দিয়ে মানবতার সমস্ত আচরন বিসর্জ্জন দিয়ে মুষ্টিমেয় ধনবান ও কালোটাকার মালিক-দের কল্যাণে রাষ্ট্র চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকে শাসক-কুলের স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সি, পি, আইকে আপনারা প্রশ্ন করুন তথা কথিত প্রগতিশীল কংগ্রেসীরা রেলওয়ে ধর্মঘটে মানবতা বিরোধী দমন পীড়নে, গণতন্ত্র বিরোধী কাজের প্রতিবাদে একটি সাওয়াজও কেন করেন নাই? তাদের প্রগতিশীল শ্রমমন্ত্রী রঘুনাথ রেড্ডী নিজে শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন থেকে বঞ্চনার ফরমান জারী করেছেন। আজকে শাসককুল গণতন্ত্রের মুখোস খুলে এক-নায়কত্ব-সুলভ কাজ করে সে দিকে দ্রুত এগিয়ে চলছে না কি? তাদের প্রচার, সংবাদ হত্যা, প্রেসের উপর খবরদারী কিসের ইঙ্গিত? তবু এরা বলবে কংগ্রেসের ভেতর প্রগতি-শীলতার নানা লক্ষণ আছে। এত কষ্ট চিন্তা, ও বিভ্রান্তি প্রচার সবই মস্কোর স্বার্থে। নিজেদের দেশের জনগণের সর্বনাশ করে এরা আজীবন মস্কোর স্বার্থই দেখে এসেছেন। রেল ধর্মঘটে এদের স্বরূপ আরও খুলে গেছে।

সি, পি, আই জন্ম লগ্ন থেকে শ্রমিক আন্দোলনে আছে। শ্রমিক শ্রেণীতে এদের সমর্থক আছে। যদিও নূতন ভাবে আর জন্ম নিচ্ছে না। এদের বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বা আঞ্চলিক ভিত্তিতে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে পারে না, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় কর্মচারী ও রেলওয়ে শ্রমিকদের ভেতর। সম্প্রতি আন্দোলনগুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যায় যে সি, পি, আই সি, পি, এম বিরোধ শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনকে বিনষ্ট করে দিয়ে অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এদের জন্মসূত্র এক। স্বভাব চরিত্র মোটামুটি একই, আচার আচরণে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। নীতিগত ভাবেও এদের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বা জাতীয় স্তরে চলার পথে কিছু কিছু পার্থক্য আছে মাত্র। এখানে এদের বিরোধ ও কর্ম কৌশল শ্রমিক শ্রেণীর কি ধরণের ক্ষতি করে তার একটি প্রমাণ তুলে ধরছি। সি, পি, আই কবলিত সরকারী কর্মচারীদের সংগ-ঠনের অংশটির সাথে কথাবার্তা না বলে এবং অন্যান্যদের সাথে আলোচনা না করেই সি, পি, এম পন্থীগণ ১০ই মে থেকে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল। নিজেদের দাবি দাওয়ার কোন কথা প্রচার হল না। কোন প্রস্তুতি নেই। হঠাৎ বাজীমাৎ করে নিজেদের প্রভাব-বৃদ্ধি বেশী বিপ্লবী প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে রেল শ্রমিকদের সমর্থনে ধর্মঘটের ডাক দিল। ফল যা হল সবাই জানেন—কোথাও কোন সাড়া মেলে নাই। পূর্বাঞ্চলে আংশিকভাবে কোন কোন জায়গায় হয়ত কিছু কর্মচারী ধর্মঘট করেছিল। ২দিন পরই আবার ধর্মঘট তুলে নেওয়া হল, বহু জায়গায় ধর্মঘট আরম্ভ হওয়ার আগেই তুলে নিয়েছিল। সি, পি, এম পন্থীরা নিজেদের রাজনৈতিক হঠকারী চালবাজী করে শ্রমিকদের অপরিসীম ক্ষতি করল। সরকারী কর্মচারীদের আন্দোলনে আঘাত হানল, হতাশার জন্ম দিল। হতাশার সৃষ্টি করল ধর্ম-ঘটি রেল শ্রমিকদের ভেতর। সি, পি, এম ভেবেছিল এবার ডাক দিলেই ধর্মঘট হয়ে যাবে, প্রমাণ করে দেব যে সি, পি, আই ও অন্যান্যদের চেয়ে আমরা বেশী বিপ্লবী; সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। সি, পি, এম-এর আচার আচ-রণের ফলে শ্রমিক ঐক্যে ভাঙ্গন, বিভ্রান্তি, হতাশা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আজকে রেল ধর্মঘটের পর সি, পি, এম বন্ধুদের প্রধান কাজই হচ্ছে শুধু সি, পি, আইকে গালিগালাজ করা।

সি, পি, আই সম্পর্কে যত প্রশ্ন দেখা দিয়েছে অন্য কোন দল সম্পর্কে তত প্রশ্ন জনমনে উত্থাপিত হয় নাই। মানুষের মধ্যে এদের চরিত্র যত বেশী করে ধরা পড়বে, ততই দেশের পক্ষে কল্যাণকর।

সি, পি, আই এর সাধারণ সম্পাদক ও সদ্য মস্কো থেকে পুরস্কৃত রাজেশ্বর রাও এর মতে সরকারের সাথে সংঘর্ষের কোন প্রশ্নই উঠেনা। সুতরাং সংঘর্ষ করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয় তাও তারা চায় না, এই সব সত্ত্বেও কেন এরা রেল ধর্মঘটের মত গুরুত্বপূর্ণ আন্দো-লনে থাকল? কেন এরা লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে গেল। এ সব প্রশ্নগুলি খতিয়ে দেখতে হবে। নিজেদের বামপন্থীগিরি বজায় রাখা ছাড়াও আন্দোলনকে পেছন থেকে টেনে রাখার মনোভাব তাদের এ আন্দোলনের ভেতরে থাকায় প্রণোদিত করেছিল। রেল ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সারা দেশে তীব্র কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন জেগে উঠতে পারে, ডাঙ্গের মত পাকা নেতার নাজানার কথা নয়। এর ভেতর থাকলে আপোষের মাধ্যমে শেষ করা বা গতি বুঝে একে যে কোন স্তরে শেষ করে দেওয়া যাতে সীমার বাইরে না যায়। 'লোকো রানিং' শ্রমিকদের আন্দোলনে এরা যেমন আন্দোলনকে তালিম দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে নিজেরা এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেছে, তেমনি মন্ত্রীদের সাথে যোগাযোগ রেখে দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে শেষ করার চেষ্টা

করেছে। তাছাড়া বিহারের রাজনীতিও এর ভেতর কাজ করেছে। যদিও বিহারে মিশ্র-গফুর উপদলের মন্ত্রীসভা রক্ষায় এরা আন্দোলনে নেমেছে। তবুও কিছু কিছু সি, পি, আই নেতাদের সাথে মিশ্র গ্রুপের বিশেষ বনিবনা হচ্ছে না। এই ধর্মঘটের মাধ্যমে চাপ দিয়ে আরও কাছে নিয়ে আসার চেষ্টাও ছিল। বিহার এলাকায় রেলওয়ে প্রশাসনের সাথে এদের সম্পর্ক খুব ভাল যাচ্ছে না। বিহার এলাকার রেল শ্রমিকদের ভেতর এদের নিজস্ব কিছু কিছু সংগঠন আছে।

এ ছাড়া সি, পি, আইর নিজস্ব দলীয় সমস্যাও আছে। এই দলের সমর্থক ও কর্মীরা রেল শ্রমিকদের ভেতর সাধারণ ভাবে বামপন্থী বলেই সাধারণ্যে পরিচিত।

এরা লড়াই ও আন্দোলনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি হওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস ও সেই মতে প্রচার করে। বর্তমানে লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরী বলে মনে করে। উচ্চতর নেতৃত্ব এদের নিয়ে পড়েছে মুস্কিলে। সোজা এদের লড়াইয়ের ময়দান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। বিরোধিতাও করাতে পারে না। সোজা ভাবে ইন্দিরাজীদের মত একনায়কতন্ত্রীদের দমন-পীড়নের নীতি পদ্ধতির সমর্থনেও দাঁড় করাতে পারছে না। এদের আন্দোলনের নামে চাঙ্গা না রাখলে এরা হয়ত বিদ্রোহ করেই বসবে। শ্রমিকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাই নানা কৌশলে কথার ফুলঝুরি বা নানা কাল্পনিক যুক্তিজাল সৃষ্টি করে আন্দোলনের অভিনয় করে এই সব কর্মীদের দলে টেনে রাখতে হয়। ধর্মঘটে যোগদান না করা বা সমর্থন না জানানো মানে ধর্মঘট ভাঙার দলে এদেরকে ঠেলে ফেলে দিতে হয়। তাই এদের নানা পথে কৌশলে যাতায়াত করতে হয়। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বামপন্থী সাজ ধারণ করে দক্ষিণপন্থীদের ভয়ের লোহাই দিয়ে নানা ভাবে চরম দক্ষিণপন্থীদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করতে হয়। দেশের অবস্থা যাই ঘটুক, শাসকদের চরিত্র যাই হোক, জনগণ দমন পীড়নে মরে গেলেও, আর্থিক ব্যবস্থা যে স্তরেই পৌঁছাক—তাদের নীতিতে আচার আচরণে তার কোন বাস্তব প্রতিফলন নেই। জনগণের কল্যাণের দিকে চেয়ে এই দলের নীতি নির্দ্ধারিত হয় না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও পবিত্র দায়িত্ব মস্কো দিল্লী মৈত্রী বন্ধন জীইয়ে রাখা। ইন্দিরা সরকার দুর্ব্বল হয়ে গেলে বা অপসারিত হলে মৈত্রী বন্ধন শিথিল হয়ে যাবে। এই ভয়ে তাদেরকে সব সময়-ই বিশেষ সজাগ থাকতে হয়। তাই বর্তমান সরকার দক্ষিণ পন্থী হওয়া সত্বেও "প্রগতিশীল" বলতে হয়। দক্ষিণ পন্থীরা ক্ষমতায় চলে আসার ধোয়া তুলতে হয়।

[ক্রমশঃ]

স্মৃতি কথা

উপেন্দ্র কুমার ধর

দেশের সেবা করতে গিয়ে যে সব বিপ্লবী ও গান্ধী-পন্থী দেশসেবকদের সাথে যে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদা সূর্য্য সেন ও গান্ধীপন্থী কবি নিবারণ দাসগুপ্ত অন্যতম।

সে আজ ১৯২২ ইংরাজীর কথা বলছি। ১৯২১ ইং গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর হাইলাকান্দির খেলার মাঠে রেলওয়ে কর্মচারী ৺রাজেন্দ্র দাসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে।

সেই সূত্রে অনেক বিপ্লবী আন্দোলনের পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়। নানারূপ আলোচনার মাধ্যমে আমি ও ৺রাজেন্দ্র ভাদুড়ী এই দুই ছাত্র বিপ্লবী আন্দোলনে গোড়াতে অনুপ্রাণিত হই। এবং সেইভাবে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলবার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করি। কাছাড় ও শ্রীহট্টে বিপ্লবী দল গড়ে তোলার মূলে ৺রাজেন্দ্র দাসের দান ছিল।

১৯২৩ ইংরাজীতে ৺রাজেন্দ্র দাসের পিতৃ বিয়োগ উপলক্ষে চট্টগ্রামের কুয়োপাড়া গ্রামে তাঁর বাড়ীতে যাই। সেখানে অনেক বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ৺অম্বিকা চক্রবর্ত্তী শহীদ নির্ম্মল সেন প্রমুখ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে দেশের বিবিধ সমস্যা নিয়ে সে সময় আলোচনা করি, এবং তাহাদের নিকট হইতে অনেক শিক্ষা-লাভ করি।

সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করে চট্টগ্রাম শহরে মাষ্টারদা সূর্য্যসেনের বাড়ীতে যাই এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করি। আমি যতদিন মাষ্টারদার বাড়ীতে ছিলাম ততদিন তাঁর সহধর্মিনীর সেবা ও যত্নে পুষ্ট হই। তিনি (মাষ্টারদার সহধর্মিনী) বলতেন,

(৩৬৩ পৃষ্ঠার ১ম কলমে)

ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতীয় আর্থিক বৃত্তি

অধ্যাপক জগদীশ গণচৌধুরী

আদিম আর্থিক-বৃত্তিসমূহকে শ্রেণী-বিন্যাস করার জন্য খাদ্যদ্রব্যের আহরণ-পদ্ধতি ও পরিমাণ এ দুটো বিষয়কে মুখ্য মাপকাঠি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, কেননা এর উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে লোকসংখ্যার ঘনত্ব; সামাজিক কাঠামোর সরলতা বা জটিলতা; শ্রম-বিভাগ; বিশেষীকরণ; সম্পত্তির মালিকানা, বিনিময় ও উত্তরাধিকার; অবকাশ; মূল্যবোধ; শিল্পকলা, উৎসব, পূজাপার্বণ। এই মানদণ্ডানুসারে পৃথিবীর যাবতীয় আদিম আর্থিক-বৃত্তি সমূহকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন—

১। পশুশিকার, মাছধরা ও ফল-মূল আহরণ—

(ক) সরল, অমিশ্র খাদ্য সংগ্রহের বৃত্তি: সংগ্রহে অনিশ্চয়তা, বিনিময়যোগ্য উদ্বৃত্তের অভাব ও যাযাবর জীবন এর বৈশিষ্ট্য;

(খ) উন্নত খাদ্য-আহরণী বৃত্তি: সংগ্রহে কিছুটা ভরসা ও বিনিময়যোগ্য যৎসামান্য উদ্বৃত্ত—এ স্তরের বৈশিষ্ট্য;

২। আদিম কৃষি-উৎপাদন—

(ক) সরল, অনুন্নত হাতে-চাষ: খাদ্যের নিশ্চয়তা, সামান্য উদ্বৃত্ত ও বসতিস্থাপন—এসব এর লক্ষণ;

(খ) উন্নত ও মিশ্র চাষ: খাদ্যের নিশ্চয়তা, প্রচুর উদ্বৃত্ত, চাষে পশুর ব্যবহার ও ভূমির ব্যক্তিক মালিকানা এর বৈশিষ্ট্য।

বলাবাহুল্য, এ শ্রেণীকরণ কঠোর ও সূক্ষ্ম নয়; এবং এসব শ্রেণীতে যাঁরা পড়েন, তাঁরা অনুন্নত স্তর ডিঙিয়ে ক্রমে উন্নত স্তরে উঠেন; চিরকাল একই স্তরে পড়ে থাকেন না, বিভিন্ন শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁদের জীবনে পরিবর্ত্তন আসে। আন্দামান-নিকোবরের আদিবাসী, শ্রীলঙ্কার 'বেদ্দা' নামক উপজাতি, ফিলিপাইন ও মালয়ের পিগমীরা ও আফ্রিকার বুশমেন—এঁরা সকলেই ১ (ক) স্তরে। আমেরিকার সমুদ্রোপকূলবাসী আদিম ইণ্ডিয়ানরা পড়েন খানিকটা উন্নত খাদ্যাহরণী স্তরে। উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের আদিম অধিবাসী, ব্রাজিল, মাইক্রোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও সেলানেশিয়ার কতিপয় উপজাতি, ত্রিপুরার ও উত্তরপূর্ব্ব ভারতের জুম-চাষীদের ২। (ক) স্তরে ফেলা যায়; এবং এঁদের অধিকাংশই পরবর্তী মিশ্র ও অধিক ফসলী চাষবাসের স্তরে (২খ) অধুনা উন্নীত হয়েছেন।

ত্রিপুরার উপজাতীয় প্রাচীন আর্থিক-বৃত্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য:

বনের পশু, পাখী, গাছ-গাছড়া, পাহাড়, টিলা, নদনদী—প্রকৃতির মুক্ত হাতের এসব দানই ছিল ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রধান উৎস। তাঁদের অর্থনীতি ছিল মন্থর, সরল, আদি কৃষিভিত্তিক কিন্তু অনেকটা স্বয়ংনির্ভর। স্বয়ংনির্ভর অর্থনীতির একক ছিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাহাড়ের চূড়ায় ছোট ছোট গ্রাম: প্রতিগ্রামের লোকসংখ্যা বড়জোর ৫০০ জন। প্রধান খাদ্য ভাত, শাকশব্জী, মাছ ও মাংস। চাল উৎপাদন করতেন জুমচাষ করে। শাকশব্জীর কিয়দংশ জুমক্ষেত থেকে, বাকীটা বন থেকে; বনের পশু ও পাখী শিকার করে এবং বাড়ীতে মোরগ ও শূকর পুষে মাংস পেতেন; মাছের জন্য নদীনালা ডোবার উপর নির্ভর করতেন। উৎপন্ন ফসলের পরিমান যথেষ্ট ছিল না এবং যোগান অনবরত ছিল না; তাই শিকার, মাছধরা ও বনের ফলমূল খাদ্য আহরণ করতে হত। পোষাকের জন্য তাঁরা পরমুখাপেক্ষী ছিলেন না। জুম ক্ষেতে উৎপন্ন তুলা ভাঁজিয়ে প্রতিঘরের মহিলারাই নিজেদের চলবার কাপড় বুনতেন। গৃহপালিত পশুপক্ষী ছিল খুব কম; শুধুমাত্র কুকুর শূকর ও মোরগ। ঘরবাড়ী খুব পাকা মজবুত করে তৈরী করা হত না; মেটে গুদাম বা পাক্কা বাড়ী ছিল না; মাটি থেকে ৭/৮ ফুট উপরে ঘর তৈরী করা হত; এজন্য প্রয়োজনীয় বাঁশ, বেত, ছন, পালা নিকটের বনেই পাওয়া যেত। তখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষের কোন বিশেষ কারিগরী দক্ষতা ছিল না; জুমের কাজ ও অন্যান্য বারোয়ারী কাজ পাড়ার লোকরা মিলেমিশে করত; এভাবে একে অপরের কাজে হাত মেলানোকে বলা হত 'ইয়াওল খিলায়-অ'; পেশাগত বর্ণভেদ ছিল না; ধনবৈষম্য প্রকট ছিল না; জনসংখ্যাবৃদ্ধিজনিত সমস্যা তখনও দেখা দেয় নি; মাটি যে সম্পত্তি হতে পারে এ ধারণা তখনও জন্মায় নি; জমির কেনা বেচা, বন্ধক ইত্যাদি ছিল না। বন জঙ্গলের মাঝে দূরে দূরে অবস্থিত প্রতিটি পাড়ার আশেপাশে চারিদিকের বনজ সম্পদ ও টিলার মৌখিক মালিক ছিলেন সেই পাড়ার সকলে; কয়েক বছরের মধ্যে আশে-পাশের বনজ সম্পদ কমে গেলে গোটা গ্রাম আরও বেশী বনজ সম্পদে পূর্ণ জঙ্গল বেছে বসে পড়তেন. সে এলাকাও কয়েক বছর বাদে ছেড়ে যেতেন। এভাবে তাদের প্রাচীন জীবনযাত্রা ছিল প্রায়-যাযাবরীয়।

তাঁদের প্রাচীন আর্থিক বৃত্তির মধ্যে পড়েছে; বন্য ফলমূল আহরণ, মাছধরা, পশুপাখী শিকার, জুমচাষ, বস্ত্রবয়ন, বাঁশবেতের ঝুড়ি বুনন ও পশুপালন। এসব বৃত্তিগুলো ছিল পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এদের কোনটার পেছনে ব্যবসায়িক মনোভাব

ছিল না। এসবের মধ্যমণি ছিল জুমচাষ ; জুমকে কেন্দ্র করে এবং জুমের আনুষঙ্গিক হিসেবেই এদের অস্তিত্ব। অর্থাৎ কেবল ফলমূল আহরণ করে, বা মাছ ধরে, বা শিকার করে, অথবা শুধু কাপড় বুনেই জীবিকা নির্বাহ করার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। পারিবারিক চাহিদা মেটানোর জন্য এসব করা হত ; বাজারে বেচার জন্য ব্যাপকহারে কাপড় বুনা, মাছধরা বা শিকার করা হত না। এক্ষণে, প্রতিটি বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে :

ফলমূল আহরণ :—বনজ ফলমূল শাকশব্জী ও অন্যান্য দ্রব্য আহরণের উপর প্রাচীনকালে অনেকটা নির্ভর করতে হত। পাড়ার কাছেপিঠের বনজঙ্গল ছিল সেই পাড়ারই আয়ত্তাধীনে ; অন্যান্য পাড়ার লোকজন আর্থিক কাজে পাড়ার সীমানার অভ্যন্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রায়শঃ করত না। বন থেকে সংগৃহীত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মোটামুটি পড়ে কচু, লতি, বাঁশকরল, তারা, কাটিস, ঢেঁকিরশাক, বনবেগুন বা সীতাবেগুন, রামকলা, থানকুনি পাতা, বেতাগা, বন্য মেটে আলু, গাছের মূল, ফল, কলাপাতা, বেত, লাকড়ী, বাঁশ, ছন, পাতা—ইত্যাদি। কমবেশী সারা বছরই তাঁরা এসব আহরণ করেন ; তবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চার মাস এসব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং জুমের ফসল তখনও আসতে দেরী ; কাজেই এই কয়মাস বাধ্য হয়েই আহরণে বের হতে হত। শাকশব্জী আহরণ যদিও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই করতে পারেন, তবে মহিলারাই করতেন বেশী। আহরণের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমেই কমে আসছে।

মাছধরা :—মাছধরা তাঁদের পেশা নহে, নেশা। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নদীনালা ও ডোবায় মাছ ধরেন। পুঁটি, মরলা, লাটি বা টাকি, বাইলা, মাগুর, সিঙ্গি, কাছিম, সইল, মোরাল, মেনী, কই, বাইম, বেতরঙ্গি বা গুতুম, গেঁড়ি, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ—এসব এলাকায় পাওয়া যায়। পুকুর বা দীঘি খনন করে মাছের চাষ আগে তাঁরা করতেন না ; ইদানীং তা দেখা যাচ্ছে। জলে বিষ ফেলে মাছধরা অতি প্রাচীন পদ্ধতি। মাছধরার জন্য তাঁদের ব্যবহৃত ফাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (=জাকই), চিচিং (=চাই), চকা (=জুরখা), পেলেম, বচই (=বর্ষি), কইল, চইল (=কোঁচ), ডুলা, পলো, বারাই, হেঁওং, এবং বিভিন্ন প্রকার জাল। জাল, পলো, বারাই ও হেঁওং-এর ব্যবহার বাঙ্গালীদের অনুকরণে করা হয়েছে।

শিকার :—শিকার করার কাজ পুরুষদের। একাকী, দলবেঁধে বা কয়েকজন মিলে শিকারে বের হতেন। হরিণ, বন্যশূকর, খরগোস, শজারু, গরু, বানর, হাতী, বাঘ, ভল্লুক, কাকাতুয়া, বনমোরগ, চড়াই, তকবুলু, তকবুরু, পিয়ারা প্রভৃতি পশু পাখী শিকার করা হত। শিকারে যেসব যন্ত্র, ফাঁদ ও অস্ত্র ব্যবহার করতেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'খুই', 'বুরা', 'নীল', বাঁছুখুং (=তীর ধনুক), দা, 'ডুক', 'ওয়ারাই', জাম্বিনী ও বন্দুক। শিকারের সময় কুকুরকে কাজে লাগানো হত। বন্দুকের ব্যবহার খুব প্রাচীন নহে। শিকারে যদি বড় প্রাণী পাওয়া যেত তাহলে পাড়ার সকলকে ভাগ দেওয়া হত। বন্দুকের জন্য মালিক একটা বাড়তি অংশ পেতেন ; লক্ষ্যভেদ করার জন্য পলোয়ানও একটা বাড়তি অংশ পেতেন। শিকার করে পশুটা যখন পলোয়ানের ঘরের সামনে উঠানে রাখা হত তখন পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা খুসীতে এগিয়ে আসত। আর, পলোয়ানের স্ত্রীকে বলা হত—পাক করার হাতা দিয়ে পশুটিকে ছুঁয়ে দিতে। এর পেছনে বিশ্বাস হল এই—পলোয়ানের স্ত্রী হাতা দিয়ে স্পর্শ করলে পশুটির আরো যত জ্ঞাতিগোষ্ঠি আছে সব পলোয়ানের বন্দুকে সহজে মারা পড়বে। শিকারের গুরুত্ব এখন অনেকটা কমে গেছে।

জুমচাষ :—প্রাচীনকালে টিলার উপর জুমচাষই ছিল প্রধান জীবিকা। জুমচাষের উপর নির্ভরশীলতা কমে আসছে ; খুব ভেতরের গ্রামাঞ্চলে জুম চাষ আজও করা হয়। জুম চাষের কাজ শুরু হয় শীতকালে, শেষ হয় পরের বছর শরৎকালে। জুমচাষে মুখ্য কাজ হল স্থান নির্বাচন, জঙ্গল কাটা, শুকনো বন পোড়া দেওয়া, আধপোড়া গাছ সরানো, বীজ বোয়া, টংঘর তৈরী করা, নিড়ানী ও পাহারা দেওয়া, অপদেবতার কুদৃষ্টি দূরীকরণ ও ফসল কাটা। স্থান নির্বাচনের কাজটিতে কয়েকটি মজার প্রথা প্রচলিত ছিল। গভীর জংলা টিলায় জুমক্ষেত ভাল হয়। যে টিলাটি আপাততঃ পছন্দ হল, তার খানিকটা বন কেটে, পরিষ্কার করে, সেখানে মঙ্গল অমঙ্গল পরীক্ষা করা হয়। এতে মোরগছানা বলি দেওয়া হত এবং দুফালি বাঁশের টুকরা উপরে হাত থেকে ছাড়া হয় ; যদি একফালি চিৎ হয়ে ও অন্য ফালি উপুড় হয়ে পড়ে, তবে মনে করা হয়—ঐস্থানে জুম করলে ভালই হবে। প্রথম বারে ঈপ্সিত ভঙ্গিতে না পড়লে আরও দুবার ফেলা হয়। তৃতীয়বারেও যদি ঈপ্সিত ভঙ্গিতে না পড়ে, তবে ঐস্থানে জুম করা হয় না। কিন্তু পরীক্ষা এখানেই শেষ নয়। ঐস্থান থেকে একদলা মাটি এনে রাত্রে বালিশের তলায় স্বপ্নদেখার আশা নিয়ে গৃহস্বামী শুদ্ধ পবিত্রভাবে একাকী ঘুমান। স্বপ্নে যদি বিবাহের, শিশুর জন্মের, মাছধরার দৃশ্য দেখেন তবে ভালই ; যদি ভিখারী দেখেন তবে

খুব খারাপ এবং ঐস্থানে জুম করেন না ; গরু-বাছুর, ছাগল, হাতী, মহিষ দেখলে মনে করা হয় ফসল ভাল হবে, কিন্তু ঘাস উঠবে অত্যধিক ; ঘনঘন নিড়ানী দিতে হবে। স্বপ্নে কিছুই না দেখাটা মন্দ নয়। শীতকালে (অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে) স্থান নির্বাচন ও বনকাটা শুরু হয় ; মাসখানেক লাগে ; মাঘ-ফাল্গুন মাস কাটা বন রৌদ্রে শুকায় ; চৈত্রের প্রথম ভাগে শুকনো বন পোড়া দিয়ে, বেছে বীজ বোয়া শুরু করা হয় এবং চৈত্রের মধ্যে বোয়ার কাজ সমাধা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়। বৈশাখের বৃষ্টিতে বীজের অঙ্কুর উদ্গম দ্রুত হয়; কিছুদিন পরেই নিড়ানী দিয়ে আগাছা, লতা ও ঘাস পরিষ্কার করতে হয়। পাহারা দেওয়ার জন্য ক্ষেতের পাশেই একখানা ছোট চালাঘর বানানো হয়। এটাকে বলে 'গাইরিং'। চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের প্রথমভাগ জুমিয়াদের খুব অভাব অনটনে কাটে। আষাঢ়ে শেষভাগ থেকে যখন ফসল আসতে থাকে, তখন তাঁদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। জুমিয়া চাষী তখন টংঘরে বসে খুসীতে গল্প জুড়ে, পান খায়, মদে মত্ত হয়, ডাবা টানে আর ঝিমায়। বৃষ্টি মুখর বর্ষার 'এমন দিনে যদি তারে মনে পড়ে' টংঘর থেকে যুবক যুবতীরা গান জুড়ে বসে। জুমে উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—ধান, বেগুন, কুমড়া, ভুট্টা, চিন্দ্রা, মার্খা, তুলা, তিল, মেস্তা, খাকলু (শাদা লাউ), শশা, লঙ্কা, আদা, হলুদ, কাওনধান, ইত্যাদি।

বস্ত্রবয়ন :—জুমে উৎপন্ন কার্পাসকে ধুনে, ভাজ করে, নিজেদের পরিবারের প্রয়োজনীয় কাপড় প্রতিঘরের মহিলারা নিজেরাই টানা-চরখায় বুনতেন। সাধারণতঃ আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে পাকা কার্পাস তোলা এবং কাপড় তৈরী করা হত। বন্য গাছের ছাল ও পাতা কয়েক দিন জলে ভিজিয়ে শাদা সুতোকে রাংগিয়ে নেওয়া হত। তাঁদের তৈরী কয়েকটি কাপড়ের নাম রিগনাই, রিসা, বাঁসি, রিকুতু, রিতারাগ, কামচলই। নাগরসভ্যতার সংস্পর্শে এসে প্রাচীন কাপড়ের ব্যবহার কমছে। এসবের বদলে আধুনিক ধুতি, জামা, শাড়ি, ব্লাউজ, পেন্ট, কোট, পায়জামা, গেঞ্জী, জুতা-মোজা প্রভৃতির ব্যবহার বাড়ছে।

বাঁশবেতের কাজ :—পুরুষেরাই বাঁশবেতের কাজ করেন। বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন নমুনার ও নামের ঝুড়ি তৈরী করা হয়। এজন্য কাঁচামাল হল বাঁশ ও বেত, যা বন্য পরিবেশে সহজলভ্য। তাঁদের তৈরী কয়েকটি ঝুড়ির নাম :—তিসিং, নাখাই খুতরুক, তপং, জাপা, জাংগিনী, লাংগা, দিংরা, খপতেক, কাইচলেং, বালিং, তককুক, ইরাংকুক, বাংলাই, চাকিকক্।

পশুপালন :—কুকুর, শূকর, ও মোরগ—শুধু এই কয়েকটিই ছিল আগেকার দিনে গৃহপালিত পশুপাখী। বাড়ীঘর ও জুম পাহারা এবং শিকারের কাজে কুকুর পোষা হত। পূজার বলি, ভোজ ও পারিবারিক চাহিদার জন্য শূকর ও মোরগ পোষা হত। তিনটি কারণে গরুছাগল ইত্যাদি পোষা হত না, কারণ তিনটি হল—জুম চাষের জন্য মহিষ বা বলদের প্রয়োজন হত না, দুধ তাঁদের কাছে দুর্গন্ধ মনে হত, এবং বন্য পরিবেশে বাঘ, শিয়াল ও অন্যান্য বন্য জন্তুর উৎপাতে গোবাছুর পোষা দুষ্কর ছিল। তাঁরা এখন লাঙ্গল দিয়ে সমতল নীচুভূমি চাষ করেন, দুধ খেতে আরম্ভ করেছেন এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বনজঙ্গল আবাদ হওয়ায় বন্য জন্তুর উৎপাত কমে গেছে। এখন তাঁরাও মহিষ, গরুবাছুর, ছাগল, হাঁস, কবুতর পোষেন।

জীবনধারনের জন্য আরো কয়েকটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন আগুন, তেল, মসলা ইত্যাদি খুব কষ্টে-সৃষ্টে নিজেরাই উৎপাদন করতেন। বাঁশে বাঁশে ঘষে আগুন উৎপাদন করতেন ; ভেরেণ্ডা গাছের বীচির শুকনো খোকাতে আগুন জ্বালিয়ে রাত্রে বাতির কাজ চালিয়ে দেওয়া হত ; তিলকে পিষে জলে সেদ্ধ করে তেল ছেঁকে নেওয়া হত ; কচি মূলিবাঁশ, তিল ও রাই-এর গাছ শুকিয়ে, পুড়িয়ে ছাই করা হত, সেই কাল ছাই 'চাকিকক্' নামে চুঙের আকৃতি বিশিষ্ট ঝুড়িতে রেখে জল ঢালা হত। চুয়ানো জলের স্বাদ অনেকটা নোনা, এই নোনা জল দিয়ে লবনের কাজ চলত।

বছরের প্রতিটি দিনই আর্থিক কাজে তাঁরা লিপ্ত থাকেন না ; বিশেষ কয়েকটি দিনে কাজ করা নিষিদ্ধ। এই দিন কয়টি হল—বিষু (=চৈত্র সংক্রান্তি), সেনা (=১ই বৈশাখ), আষাঢ়ে অম্বাবাচী উপলক্ষে তিন, মাঘে শ্রীপঞ্চমী ও হাঙ্গারাই (=পৌষ সংক্রান্তি)।

আর্থিক বৃত্তিতে পরিবর্তন—ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে বাংলাদেশ। বাঙ্গালীদের সাথে তাঁদের যোগাযোগের ইতিহাস দীর্ঘ কয়েকশত বছরের। এই দীর্ঘ দিনের যোগাযোগের ফলে তাঁদের আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন ধারায় পরিবর্তন এসেছে। এ প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় শুধু আর্থিক-বৃত্তিতে পরিবর্তন। স্থান-কাল ও পাত্র ভেদে পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বিশেষ লক্ষণীয় হল এই—এখানকার সাধারণ উপজাতীয় গ্রামীণ জীবনযাত্রা উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মোটামুটি চিরাচরিত ধারায় চলে আসছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত জুমচাষই প্রধান জীবিকা ছিল ; লাঙ্গল ও গরু দিয়ে সমতল ভূমি চাষের তাঁদের কোন ইচ্ছা বা আগ্রহ ছিল না। এ সম্বন্ধে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত A Statisti-

cal Account of Bengal, vol. vi (p.-502) বই-এ W. W. Hunter সাহেব লিখেছেন :—

"The hill tribes object to cultivate by the plough as being contrary to their traditions ; and so strong is their prejudice against the change from their own system, that political agent regarded it as desiring of report that a hill-man in easy circumstances had taken up some waste land in the plains near his village, and was cultivating it through Bengali Musalmans whom he employed as servants."

লাঙ্গলচাষের প্রতি অনিচ্ছা মূলতঃ কোন কুসংস্কার বশতঃ নয়। অনিচ্ছার কারণ লাঙ্গল চাষে বন্যপাতি লাগে অনেক বেশী, মহিষ, বলদ লাগে ; এসব পশুকে বাঘের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য ছিল। জুমের জন্য অঢেল টিলা পাওয়া যেত, বৃষ্টি বাদলে কঠিনাক্ত নীচুভূমিতে কাজ করা জুম অপেক্ষা অধিক কষ্টকর। কালক্রমে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ফলে লাঙ্গল চাষে তাঁরাও হাত বাড়িয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লাঙ্গলচাষ শুরু করেছিলেন ; ক্রমেই তা বাড়তে থাকে ; বর্তমানে লাঙ্গল চাষই গ্রামবাসীদের প্রধান জীবিকা। এতে মহারাজা বীর বিক্রমও চেষ্টা কম করেননি। জুমিয়াদের স্থায়ী-ভাবে পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে মহারাজ বীরবিক্রম কয়েকশত কর্গমাইল ভূমি রিজার্ভ করেন। সংরক্ষিত এলাকায় জুম নিষিদ্ধ করেন এবং লাঙ্গলে চাষ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন।

নীচু জমিতে লাঙ্গলে চাষ আরম্ভ করার পর থেকে আস্তে আস্তে তাঁদের আগের ভ্রাম্যমান প্রায়-যাযাবর জীবনে ছেদ পড়ল ; স্থায়ী আবাদী জমির পাশে বাড়ীঘর ও পুকুর কেটে স্থায়ী-ভাবে বসতি স্থাপন করলেন। মহিষ, বলদ, গরু-বাছুর, হাঁস, কবুতরের চাষ ক্রমবর্দ্ধমান হারে চালু হল। আম, কাঁঠাল, আনারস, জাম, পান, সুপারী, নারিকেল, লেবু, প্রভৃতি ফলের চাষ শুরু করলেন।

সমতলবাসীদের সাথে তাঁদের কেনা বেচার সম্পর্ক বহু আগে থেকেই চলে আসছে। নিজেদের জুমের ও সমতল খেতের উদ্বৃত্ত ফসল, যেমন—ধান,তিল, কার্পাস, মেস্তা, চিন্না, মার্থা, বেগুন, গাছ, বাঁশ, ছন প্রভৃতি সমতলবাসীদের কাছে বিক্রয় করে, সমতলবাসীদের কাছ থেকে তেল, লবণ, লঙ্কা, হাড়ি বাসন, শিদল, গুড়, মাছ, ছোটখাট বিলাসদ্রব্য ইত্যাদি কিনতেন। পণ্য-দ্রব্য বেচাকেনার সময় সমতলবাসী কিছুসংখ্যক অসাধু ব্যবসায়ী বনবাসীদের ওজনে হেরফের করে সাধারণত ঠকাতেন। এটি খতিয়ে দেখার বিষয়। অসাধু ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র বনবাসীদেরই ঠকাত না বাঙ্গালীদেরও ঠকাত। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই ওজন ঠকানোর চেষ্টা আজও অসাধু ব্যবসায়ীরা করে। এই ঘৃণ্য কাজকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া কিন্তু ঠিক হবে না। এই ধরণের অসাধু ব্যবসায়ীরা সকলেরই শত্রু, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রু নয়।

ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯টি উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। তন্মধ্যে রাজবংশী ত্রিপুরীরা সব চাইতে বেশী উন্নত। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ ত্রিপুরী সম্প্রদায়—প্রধান বঙ্গাধি-পতি কর্তৃক সমগ্র ত্রিপুরাধিপতি বলে স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে তাঁদের জীবন যাত্রায় বিভিন্নমুখী পরিবর্তন অন্যান্য উপজাতিদের চাইতে দ্রুততর গতিতে আসতে থাকে। আর্থিক বুনিয়াদে পরিবর্তনটি হল মোটামুটি এইরূপ : রাজপরিবারকে কেন্দ্র করে, রাজ-পরিবারের সাহায্যপুষ্ট হয়ে কিছু সংখ্যক ত্রিপুরী পরিণত হলেন অভিজাত গোষ্ঠিতে ; 'কর্তা ও ঠাকুরলোক' নামে তাঁরা পরিচিত। লেখাপড়া জেনে, আধুনিক সুযোগসুবিধা, চাকুরী ও যোগাযোগ সর্বাগ্রে পেয়ে, তাঁরা ত্রিপুরার সহিত বৃহত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও সমৃদ্ধি সাধনে পথিকৃৎ হয়েছেন।

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে আজও পেশাগত বর্ণভেদ গড়ে উঠেনি। কালিপ্রসন্ন সেন সম্পাদিত ত্রিপুরার ইতিহাস 'রাজমালা' বই-এর প্রথম লহরের ২১৬-২১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ত্রিপুরী জাতি ১১টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। যথা :—বাছালা, সিউক, কুয়াইয়া, নৈত্যসি হজুরিয়া, ছিলটিয়া, আপাইয়া, ছত্রতুইয়া, গালিম, সুবে নারান ও সেনা। রাজপরিবারে ও ত্রিপুরী অভি-জাত পরিবারে বিভিন্ন সেবাকার্যে নিযুক্ত সাধারণ ত্রিপুরীদের, কার্য্যানু-সারে, এসব নামে অভিহিত করা হত ; যেমন মাংস সংগ্রহকারী শিকারীকে 'সিউক', পানসুপারী বাহককে 'কুয়াতিয়া', মাছ সংগ্রহকারীকে 'আপাইয়া', পূজককে 'গালিম', ছত্রধারীকে 'ছত্রতুইয়া'—এই নামে ডাকা হত। সেবকত্বের উপাধি অনুসারে তাঁদের নিজনিজ আত্মীয় ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা সেই নামে নিজেদের পরিচয় দিতে গর্ববোধ করতেন। এদের সকলের কিন্তু জীবিকা ছিল জুমচাষ ; সুতরাং এটা গোটা সম্প্রদায়ের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ নয়। রাজ পরিবারের অবক্ষয়ের পর, এসবও প্রায় অবলুপ্ত হয়েছে।

১৯৪৯,সালে স্বাধীন ভারতের সাথে ত্রিপুরার যোগদানের পর ভারতীয় সংবিধানে প্রতিশ্রুত বিশেষ সুযোগ সুবিধা সমস্ত উপজাতি সম্প্রদায়ের

জন্যই সমভাবে খোলা। ফলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার হচ্ছে; তাঁদের নিজেদের মধ্যেও চাকুরে এবং আধুনিক পেশাদারদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। অবশ্য আজও আধুনিক পেশার দিক থেকে ত্রিপুরী 'দেববর্মন'রা অন্যান্যদের চাইতে এগিয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে ব্যবসায়ী, পিওন, কেরানী, শিক্ষক, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, খ্যাতনামা শিল্পী, অনেক আছেন।

আজকের আর্থিক রাজনৈতিক প্রশ্ন:—১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের আগে থেকেই ত্রিপুরা রাজার অধীনে বহু বাঙ্গালী প্রজা ছিলেন। তবে ১৯৪৭ সালের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বহু বাঙ্গালী-হিন্দু ত্রিপুরা রাজ্যে এসে আশ্রয় পেয়েছেন। সেই স্রোত আজও বন্ধ হয়নি। ফলে এখন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে আশ্রয়প্রার্থীর সংখ্যা আশ্রয়দাতাদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার লোকসংখ্যার প্রায় একতৃতীয়াংশ উপজাতি! বাদবাকীদের অধিকাংশই বাঙ্গালী। ত্রিপুরার সমস্ত বিস্তারতনে, অফিস-আদালতে, হাতপাতালে, ব্যবসায়ে, হাটে-মাঠে-পথে-ঘাটে ছাত্র শিক্ষক, কেরানী, পদস্থ কর্মচারী, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, ব্যবসায়ী, চাষী—এসবে বাঙ্গালীদেরই চোখে পড়ে বেশী। বর্তমানে এরাজ্যে বাঙ্গালীদের সংখ্যাগত প্রাধান্যের প্রতি উপজাতিদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব একরকম নয়। অধিকাংশের মতে—বাঙ্গালীরা এদেশে আসায় যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম হয়েছে, শিক্ষার প্রসার হওয়ায় অনেকের চোখ খুলছে, বৃহত্তর পৃথিবীর সাথে ত্রিপুরার যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। নব্যশিক্ষিত মুষ্টিমেয়ের মতে বাঙ্গালীরা এদেশে আসায় তাদের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে: আগের রামরাজ্য আজ আর নাই, উন্নততর বাঙ্গালী-সংস্কৃতির পাশে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত উপজাতীয় সংস্কৃতির অকাল-মৃত্যু হতে চলল, বাঙ্গালীরা এদেশের আফিস আদালতে, ব্যবসায়ে আধিপত্য বিস্তার করায় উপজাতিরা নিজের যায়গায় নিজেরাই উদ্বাস্তু হয়ে পড়লেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ত্রিপুরার বড় শত্রু, কারণ তাঁর সংস্পর্শে এসে ত্রিপুরার রাজারা বাংলাভাষাকে ত্রিপুরার রাষ্ট্রভাষার আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং অন্যদিকে ত্রিপুরী ককবরক ভাষাকে অবহেলা করেছেন; বাঙ্গালীরা আসায় উপজাতিদের নিজস্ব বস্ত্রবয়ণ শিল্প মার খেয়ে গেল, এবং নিজেদের মধ্যে মৃৎ শিল্প ও অন্যান্য শিল্প গড়ে উঠতে পারে নি, জুমের জন্য আগের মতো অঢেল টিলা এখন আর পাওয়া যায় না। মোটকথা, তাঁদের মতে বাঙ্গালীরা এখানকার সমস্যা ও অবাঞ্ছিত বোঝা বিশেষ। তাঁদের মতে এ সমস্যা সমাধানের উপায়: ১। বাঙ্গালী সমস্যা সমাধান কর, তাহলেই উপজাতি সমস্যা বলে কিছুই থাকবে না; ২। ত্রিপুরাকে দুভাগে ভাগ করো: একটা উপজাতি প্রধান প্রদেশ, অন্যটা বাঙ্গালীপ্রধান এলাকা হবে; বা ৩। ত্রিপুরাতে সংবিধানের ৬ষ্ঠ তপশীল বাস্তবায়িত করে উপজাতি স্বায়ত্তশাসিত ৪র্থ জিলা গঠন করা হউক, ৪। ত্রিপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে রোমান লিপিতে ভাষাটিকে লেখ্য রূপ দেওয়া হউক।

ব্যাপারটি শক্ত ও ঘোরালো। ভাবপ্রবণতা, সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, হালকা চিন্তা ও মারমুখী মনোভাব ব্যাপারটি আরো জটিল করবে। এজন্য স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি, গণতান্ত্রিক মনোভাব ও কর্তব্যবোধ নিয়ে দেশের প্রশাসক, নেতা, দার্শনিক ও শিক্ষিতদের সময় থাকতে এগিয়ে আসা উচিত। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হবে।

জুনের দিল্লী—আগুনের হুল্লী: পশ্চিম ও উত্তরপশ্চিম ভারতের জুন মাস মানে অগ্নিকুণ্ড। ক'লকাতা থেকে পশ্চিমে পাড়ি দিলে দুর্গাপুর থেকেই সুরু হ'য়ে যায়—আগুনের হল্কা। তারপর গয়া, মোগলসরাই, এলাহাবাদ, কানপুর হ'য়ে দিল্লী পৌঁছুতে পৌঁছুতে জুন মাসের গরমে প্রায় সিদ্ধ হ'য়ে যেতে হয় ট্রেণে।

দিল্লীর কড়চা

নিজস্ব সংবাদদাতা

(কিংকর্ত্তব্য)

"শুকনো গরম"

এপ্রিলের শেষ থেকে জুনের শেষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে প্রচণ্ড গরম। আগুনের হল্কা। মনে হয় একটা বড় অগ্নিকুণ্ড যেন পাশেই সব সময়। চোখে মুখে নাকে কানে একটা শুকনো গরমের তাপ লাগে,-জ্বালা করে, ঘাম একেবারেই হয় না। জামাকাপড় শুকনো খড় খড় করে। এমন কি ঠোঁট, গাল, মুখ ফাটে—যেমন শীতের হাওয়ায় ফাটে। একটা কিছু তেল্‌তেসে জিনিস—কোল্ড ক্রীম, জল মিশিয়ে মিসারিণ, ভেসেলিন এমনি কিছু ঠোঁটে মুখে হাতে মাখবার দরকার হয়।

"লূ"

আগুনের মত গরম হাওয়া—অথচ একেবারে শুকনো হাওয়া ব'লে খালি গায়ে থাকা চলে না একেবারেই—থাকা উচিতও নয়। এমনকি খুব পাতলা আদ্দির জামাও ঠিক উপযোগী নয়—কিছুটা মোটা কাপড়ের জামা গায়ে থাকার রেওয়াজ নেই। বাড়ীর ভিতরেও সব সময়েই গায়ে জামা একটা রাখে সবাই—রাত্রে শোবার সময়েও তাই। পুরুষরা এবং ছেলেমেয়েরাও। শোওয়াত বেশীর ভাগই—বাইরে খোলা জায়গায়। ছাদে-খোলা বারান্দায়—উঠানে বা বাড়ীর বাইরে গলিতে বা ফুটপাতেও। এবং মাটীতে বা মেঝেতে বা জমির উপরেই শোবারও রেওয়াজ নেই। কারণ দেওয়াল মাটী ও মেঝে সারাদিন রোদ্দুরে ও উত্তাপে খুবই গরম থাকে, রাত্রেও—তার উপর শোওয়া অস্বস্তিকর এবং অস্বাস্থ্যকর—অসুস্থ হ'য়ে পড়ার সম্ভাবনা তাতে। খালি গা বা খালি পা মানুষ প্রায় দেখাই যায় না। প্রয়োজনের তাগিদেই হয়ত কিন্তু এখন এটা রীতি ও অভ্যাসের অঙ্গ হ'য়ে প'ড়েছে।

"চারপাই"

দড়ির খাটিয়া বা "চারপাই" অপরিহার্য্য আসবাব। সব্বাইয়ের একাধিক চারপাই থাকবেই। খুব সহজে এখান ওখান করা যায়—বাইরে শোওয়া বসার জন্যে হাল্কা ও উপযোগী—জল, বিষ্টি, ঝড়ে চট্ ক'রে তুলে ফেলা যায় বলে চারপাই-এর খুব সমাদর এদেশে। তাই তার নানা পরিমাপ—নানা ডিজাইনে বোনা হয় তার দড়ি—দড়িও নানা-জাতের এবং তৈরিও হয় নানা জাতের বাঁশ ও কাঠের ফ্রেমে। অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে বাড়তি দু একখানা চারপাইও রাখেন সবাই। সহজেই তোলা ফেলা করা যায়ত' বটেই—আরও সুবিধে যেখানে সেখানে পাতা যায়—নীচে দিয়ে জলের স্রোত চ'ললেও ক্ষতি নেই—উঁচু নীচু অসমান জায়গা হ'লেও ক্ষতি নেই—এমনি খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা না হলেও কোন ক্ষতি নেই। গর্ত্তগার্ত্তা এবড়ো-খেবড়ো বা ঢালু জায়গার উপরেও একটী পায়ার বা দুটি পায়ার নীচে বেশ কয়েকখানা ক'রে ইট সাজিয়ে বা পাথর দিয়ে সমান করে নিয়ে চারপাইয়ের উপর বেশ আরামে ঘুমুতে প্রায়ই দেখা যায়। এমনকি দোকানের এ কাউণ্টার ও কাউণ্টারে চারপাই বসিয়ে তার উপরে ঘুমও হ'চ্ছে পাহারাও হচ্ছে এ দৃশ্যও বিরল নয়। আর টান্ টান্ দড়ির উপর সামান্য কিছু পেতে শোওয়া যায়—স্প্রিংয়ের গদির উপর শোওয়ার আরামে।

শোওয়া ছাড়াও চারপাইকে অনেক কাজে লাগানো হয়। এর উপর ৫।৭ জন ব'সতে পারেন—অবশ্য যদি চারপাই মজবুত হয়—এর উপর তাস খেলা চলে—এতে বসে সামনে সেলাই কল রেখে মেয়েরা সেলাই করে যান এবং আরও দুচারজন তাতেই বসে সেলাই টেলাইয়ের কাজও করেন গল্পও করেন। চারপাই পেতে বা দাঁড় করিয়ে জামাকাপড় শুকুতে দেওয়ার আলনা করা যায় বেশ—দুটী চারপাই বা তিনটী দাঁড় করিয়ে হেলিয়ে তাদের মাথাগুলি একসঙ্গে করে সেগুলির উপর কাপড় বা চাদর ফেলে তাঁবুর মত করে তার নীচে ছায়ায় এবং আড়ালে বসা, পড়াশুনা বা কাজ করা যায়। মোটের উপর চারপাই এদেশের খুবই একটা 'ভার্সেটাইল্' এবং অপরিহার্য্য সম্পত্তি।

এ সময় চলে 'লূ'—আগুনের মত একটা গনগনে গরম হাওয়ার প্রবাহ। কাশী, কানপুর, এলাহাবাদ, আগ্রার মত অত নয়—তবুও দিল্লীতে চলে 'লূ'। দিনেরাতের যে কোনও সময়েই তা' চলতে পারে—এমন কি সারারাতও। সমস্ত আকাশে যেন একটা হালকা গেরুয়া রংয়ের ধুলোর চাদর ঝুলতে থাকে—একটা দম বন্ধ হ'য়ে আসা অস্বস্তি হয়। বারে বারে স্নান করা—গায়ে মাথায় মুখে জল থাবড়ানো—ভিজে কাপড় গামছা দিয়ে গা-মাথায় জড়ানো—খুব জল খাওয়া—কিছুতেই ঠিক আরাম পাওয়া যায় না। এই লূ 'লেগে গেলে' যে কোনও বয়সের মানুষই খুব পীড়িত হয়ে পড়ে—তেড়ে জ্বর হয়—মাথায় গায়ে অসহ্য বেদনা হয়—চোখ খুব লাল হ'য়ে জল পড়ে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে হুড়হুড় করে—এবং খুব তাড়াতাড়ি ভাল চিকিৎসা না হলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হ'তে পারে। ডাক্তাররা বলেন 'হীট্‌ষ্ট্রোক'। বাইরে বেরুবার আগেই খুব পেট্ ভ'রে জল খাওয়া—মাথায় কিছু একটা ঢাকা রাখা লূ লাগা নিবারণের উপায়।

পাগড়ী

তাই মাথায় পাগড়ী এদেশীয়দের বেশবাসের অঙ্গ—শুধু শিখেরা নয়—তাঁদের পুরুষরাও কখনও মাথার চুল কাটেন না তাঁদের ধর্ম্মে বারণ—কাজেই লম্বা লম্বা চুল গুছিয়ে ঝুঁটি ক'রে বেঁধে তা' ঢেকে নানা রংয়ের পাতলা মলমল্ কাপড়ের পাগড়ী অত্যন্ত সুবিন্যস্তভাবে নানা ডিজাইনে বাঁধেনত' বটেই—যারা শিখ নন তাঁরাও অনেকে পাগড়ী বাঁধেন। আজকালকার তরুণরা অবশ্যই পাগড়ী বাঁধেন না—মাথার কোনও আবরণই নেন না—তবে ঘন ও বড় বড় চুলে তাঁরা মাথা বাঁচান। এদেশের নিষ্করুণ আবহাওয়া—গ্রীষ্ম ও শীত-মাথায় ঢাকা একটা রাখতে বাধ্য করে—তাই এই পাগড়ী এবং তা পরার অভ্যাস। কতভাবে, কত সুন্দর ক'রে এই পাগড়ী পরা যায় এবং তার কত বৈচিত্র্য দেখলে অবাক হ'তে হয়। পাগড়ীর রং ও বাঁধবার বিশেষ ধরণ থেকে একটা বিশেষ ধর্ম্মীয় বা একটা বিশেষ আঞ্চলিক সম্প্রদায়কে চেনাও যায়। শিখদের মধ্যে এক সম্প্রদায় 'নামধারী শিখ'—

এঁরা সব সময়ই সাদা রংয়ের পাগড়ী ও সাদা রংয়েরই পাজামা কুর্ত্তা পরেন। এবং এঁদের সাদা পাগড়ীও মাথার সামনের দিকটা কপালের উপর দিয়ে ডাক্তারি প্যাডেজের মত বাঁধতে বাঁধতে উপর দিকে উঁচু হ'য়ে থাকে। সাধারণতঃ এই নামধারী শিখ সম্প্রদায় খুব ধনী ব্যবসায়ী কিন্তু এরা এদের দেশভূয়া এমন কি এঁদের বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান অবিশ্বাস্য রকম অল্প খরচে সম্পন্ন করার নিয়মে বদ্ধ। তাই দেখা যায় কোন এক বিশেষ শুভদিনে—দিনের বেলায়—সকালের দিকে—কোন এক বাগানে বা পার্কে অনেক-গুলি দম্পতিযুগল গোল হ'য়ে ব'সে অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে খুব অল্প সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। প্রতিটী যুগলের এতে—এই বিবাহ অনুষ্ঠানে যে আজকের দিনেও মাত্র দু-তিন টাকা খরচা হয়—এবং সেখানে কোনও দান সামগ্রি যৌতুক বা উপহার পর্য্যন্ত থাকে না এও এক দর্শনীয় ব্যাপার।

অন্য এক ধরণের পাগড়ী থেকে তেমনি চেনা যায় "আকালী—শিখ" সম্প্রদায়কে। এঁদের পাগড়ী মোটা কাপড়ের এবং গাঢ় নীল বর্ণ। পাগড়িটি টানটান ক'রে বাঁধা এবং তার উপরে একটী চকচকে গোলাকার ইস্পাতের পাতের রিং। এঁরা ধর্ম্মীয় ব্যাপারে কঠোর নিষ্ঠাবান এবং সাধারণতঃ এঁদের ধর্ম্মস্থান গুরদোয়ারার পূজারী বা প্রহরি।

আর এক ধরণের পাগড়ী বাঁধেন আগেকার উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-বাসীরা। এঁদের পাগড়ীকে 'কুল্লা' বলে—পাগড়ীর একটী প্রান্ত মাথা থেকে প্রায় একফুট দেড়ফুট উঁচু হয়ে থাকে—খুব কড়া মাড় দেওয়া এবং পাটে পাটে ভাজ ভাজ ক'রে ইস্তিরি ক'রে দেওয়া—পাগড়ীর অন্য প্রান্ত ফেজের মত মাথার পিছন থেকে পিঠের উপর ঘাড় ঢেকে ঝুলতে থাকে। ইংরাজী কায়দায় প্যান্ট, কোট, স্যুট টাই, পরা কিন্তু মাথায় 'কুল্লা' পাগড়ী এমন অনেকেই দেখা যায় এবং তাঁদের চিনতে হয় এককালের 'ফ্রন্টিয়ার' প্রদেশের অধিবাসী বা পাঠান ব'লে। এমন কি ভারতীয় সৈন্যদলে যাঁরা পাঠান—বা' ফ্রন্টিয়ার বাহিনীর সদস্য তাঁদের অফিসিয়্যাল ইউনিফর্ম্মেও ঐ ধরণের কুল্লা পাগড়ী অনুমোদিত।

এই পাঠানদের "কুল্লা পাগড়ীর" আর একটী বৈচিত্র্যও দেখা যায়। সে: পাগড়ীর কাপড়টী দু-রংয়া। লম্বালম্বি-ভাবে পাগড়ীর কাপড়টি অর্দ্ধেক সাদা এবং অন্য অর্দ্ধেক ছাই-রংয়া—এবং জিনিষটি সিল্কের। মাথার খুলির উপর খেজুর পাতার মত কোনও পাতার বোনা একটি টুপি প্রথমে মাথার উপর রেখে তার চার পাশ দিয়ে সিল্কের দু রংয়া পাগড়ীটি বাঁধা হয়—পাতার বোনা টুপিটির মাঝখানটি অল্প খালিই থাকে এবং পাগড়ীর এক প্রান্ত অল্প উঁচু থাকে কারণ এতে মাড় দেওয়াত' যায় না যে একফুট দেড়ফুট শূন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। পিঠের উপর ঘাড় ঢেকে অন্য প্রান্তটিও পাগড়ীর ফেজের মত ঝুলতে থাকে।

হিন্দু বানিয়ারাও পাগড়ী পরেন—ব্যবসায়ী, দোকানদার, ঠিকাদার ও মাতাল প্রভৃতি শ্রেণীর লোক। এঁদের পাগড়ী সাধারণতঃ সাদা মলমল কাপড়েরই এবং যেন একটু অযত্নে বাঁধা—অত যত্নে সুন্দর ক'রে পাট ক'রে নয়। দেখলেই ব্যবসায়ী বানিয়া বোঝা যায়।

'লস্যি'

এই গরমে সুস্থ থাকতে লস্যি একটী সুন্দর পানীয়। লস্যি দৈ এরই সরবত—তবে আমাদের ঘোলের সরবতে যেমন নাম মাত্র জোল এবং নানারকম সুগন্ধ দিয়ে ও বরফ কুঁচো দিয়ে সরবত করা হয় লস্যি তার চেয়ে অনেক ঘন এবং বিশেষ কোনও সেন্ট সুগন্ধি দেওয়া হয় না। দৈ, বরফ, চিনি এবং অল্প লবণ দিয়ে একটী কাঠের ঘুরুণী দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রগড়ে লস্যি তৈরি হয়। আজকাল অবশ্য অনেক পাতলা ক'রে ইলেকট্রিক মিক্সারে কোনও ফলের গন্ধ দিয়ে আধুনিক সরবৎ বা মিল্ক-শেক করা হ'চ্ছে—এটাও এদেশীয়দের খুব প্রিয় এবং নিয়মিত খাওয়ার অভ্যাস।

'আমপোড়ার সরবৎ ও জলজীরা'

এই দুটী পানীয়ও এই গ্রীষ্মের দিনের প্রিয় এবং 'লূ' এবং হীট-ষ্ট্রোকের প্রতিরোধক। জলজীরা এখন অনেক দোকানে বিক্রী হয়-আম-পোড়ার সরবৎ বাড়ীতেই ক'রতে হয়।

অগ্নিবীণার ছিন্নতারে

(মেঘ মল্লিত সুরু)

ধীরেন বসু

শুরু-কণ্ঠ কবি নজরুল—
এ সুর রবেই চিরনির্ভুল—
অগ্নিবীণার আগের তারে
উদ্দীপনার অম্লানভারে
হেনেছ যে আঘাত চঞ্চল :
বেঁধেছ যে জাগ্রত সুর।

জীবনের স্মৃতি লুপ্ত
ঐ নিরুদ্ধ দ্বারে
অগীত রবে তো—
হবেনা বেসুর ॥
হে দুর্ব্বার বিদ্রোহী কবি !
পরাধীন জীবনের মুক্তি আন্দোলনে
জাতীয় সংগ্রামে—বিদ্রোহের হোমানলে
শিখাবহ্নি ছিল যাহা—
প্রতিজ্ঞার দৃঢ়কল্প—
কল্পনায় চিরমধুর ॥

সে সকল সংজ্ঞা তব
কেন আজ নিঃশব্দ আলাপ
কেন নিষ্প্রভ, নির্বিকার—
মনময় অনড় প্রলাপ ?
এ বদি মৃত্যুর মুখোশপরা
জীবনের অপরাধ—
মরলোকে এ কি নয় তবে
নিদ্রিতের জাগরণ অবসাদ ? ?

হে নিরস্ত্র নিঃশঙ্ক কবিতাপস !
হতচেতন অর্থহীন—কিসের এ মুখ,
মৃত—জিজ্ঞাসা তব ?

কেমনে জমাট হল
হৃদয়ের গলিত পাষাণ ;
হল নিস্পন্দিত
অন্তরের উড়ন্ত নিশান ? ?

ফলভারনত দুরাশার
যে অভিষ্ট অন্তর ইঙ্গিত
ক্ষণে ক্ষণে মর্ম্মরে হায়—
অস্ফুট বাণীমন্ত্রের অনুক্ত উচ্চারণে :
আজিকার ধূম্রধূসর জীবন সন্ধ্যায়
সবি কি বিফল হবে—
সুকঠিন অকারণে ?

হে উদাত্ত উদ্‌ভ্রান্ত পথিক !
পশ্চাতের পণ্য রেখে যাও
সম্মুখের মহাপথ পরে।
জীবনের অস্তাচলে
বিদ্রোহের বহ্নিকণা
ম্রিয়মান স্ফুলিঙ্গ হয়ে
জলুক তোমায় ঘিরে
সুগন্ধি ধূপের মতো—

ফিরে ফিরে আসা তব
জন্মলগ্নতীরে :
তাহাদের পূজা সাঙ্গ হবেনা কো
যারা রবে মাতৃক্রোড়ে—মুক্তি আঙিনায়
বিক্ষুব্ধ জনতার
পদানত পথিকৃত্ হয়ে ॥

কোন পথে ?

সান্তোষ সেনগুপ্ত

এমন একদিন ছিল যখন আমাদের এই বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের চেয়ে অধিকতর উন্নত ছিল। ভারতবর্ষের কৃষ্টি, তার সাহিত্য, তার রাজনীতিতে মানুষের মুক্তির কথাটা বাংলার মাটিতেই সর্বপ্রথমে সূচিত হয়। সে মুক্তি শুধু পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মুক্তি নয়, সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি। এই দিকে দৃষ্টি রেখেই হয়ত মহামতি গোখেল বলেছেন, "What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow."

বাঙালী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই এই যে মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিকে সে শুধু বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আগমনীই গায়নি, সে চিন্তাধারাকে নূতনের সংস্পর্শে সঞ্জীবিত করতে গিয়ে কোন বাধাকেই বাধা বলে স্বীকার করেনি—অভীষ্ট লাভের পথে ফলাফলের চিন্তায় ভীত না হয়ে সে শুধু এগিয়েই চলেছে। বাঙালী শুধু অল্পেই সন্তুষ্ট থাকেনি, শুধু খাদ্যবস্ত্র ও বাসস্থান প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে সে সন্তুষ্ট থাকেনি। মাটির পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে সে চেয়েছে দূর আকাশের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করতে। দুঃখ যেখানে মাথা উঁচু করে এসেছে, দৈন্য যখন তার যাত্রাপথ ব্যাহত করতে চেয়েছে অসীম ধৈর্য্য ও মনোবল নিয়ে সে তখন তাদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যেখানে মানুষকে শোষণ করেছে, অত্যাচার ও উৎপীড়ন যখন মানুষকে পরাভূত করতে চেয়েছে তখন তাদের কাছে মাথা নত না করে সে বিদ্রোহের ধ্বজা নিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বিদ্রোহে জয়লাভ করতে গিয়ে তাকে হয়ত সর্বস্ব বিসর্জন দিতে হয়েছে কিন্তু তবু মনুষ্যত্বের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার কথা সে কোনদিন ভাবতেই পারেনি। বাঙালী চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য বহুযুগ আগে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ত তার চরিত্রের প্রতিভাকে আচ্ছন্ন করেছে। আমরা তা দেখে হতাশ হয়েছি, বলেছি, বাঙালী রসাতলে গেল। আর সেই সঙ্গে রসাতলে গেল সমগ্র ভারতবাসী, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। দেখেছি বারে বারে, বাঙালী তার ক্ষণিকের মোহ-নিদ্রা কাটিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। পথের সন্ধান পেয়ে ধীর পদক্ষেপে জীবনের পথে, যৌবনের পথে এগিয়ে গেছে।

বাঙালীর এই চরিত্রই স্বাধীনতা অর্জনের পথে তাকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সন্ধান দিয়েছে। সেই সংগ্রামে সিদ্ধি-লাভ করতে গিয়ে কত বীরসন্তান যে বীরের মৃত্যু বরণ করেছে, কত ভারতবাসী যে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ভারতবর্ষ "স্বাধীনতা"লাভ করেছে ১৯৪৭ সালে। আজ ১৯৭৪। এই সাতাশ বছরের "স্বাধীনতা" বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে দেশের তরুণদের সামনে যে ভবিষ্যৎ তাকে ঢেকে আছেত হতাশা ও নৈরাশ্যের কালোমেঘ। দেশের অগণিত যুবক লেখাপড়া শিখেও দেখছে যে জীবন ধারণের কোন উপযুক্ত পথই তাদের সামনে খোলা নেই। তাই আজ তারা একান্ত হতাশ হয়ে বাঁচবার লড়াইতে যেন নিজেদেরকে পরাভূত সৈনিক বলে মনে করছে। এর ফল হয়েছে এই যে, বহুক্ষেত্রেই তারা সত্যিকারের মনুষ্যত্বের পথ পরিত্যাগ করে মিথ্যার পথে পা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্যই দেখি যেখানে তারুণ্য সেখানেই শুধু অর্থহীন কলকোলাহল; যেখানে যৌবন সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা। এই নৈরাশ্য ও হতাশার মধ্যে দাঁড়িয়ে, এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা দেখে মনে একটি মাত্র প্রশ্নই জাগে, এ অন্ধকার কী কাটবে না? রাত্রি কী প্রভাত হবে না? উষার আলো কী দেখা দেবে না?

আজ রাজনৈতিক দলগুলির দিকে চাইলেও আশার কোন আলোকের সন্ধান মেলে না। তার কারণ এই যে, এই দলগুলির মধ্যে যে জিনিসটা বড়ো হয়ে ওঠে সেটা শুধু দলের অহমিকা। এ কথা আজ স্পষ্ট যে, যে দলই আজ দেশের ক্ষমতায় আসুন না কেন তাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে কী করে নিজেদের দলটির হাতে শাসনযন্ত্র চিরদিনের জন্য কায়েম রাখা যায়। এমন কি যে দেশের কল্যাণ সাধনের জন্য দলটি গঠিত হয়েছে সে দেশের কল্যাণের কথাকে তুচ্ছ করে দলের প্রাধান্যের কথাই তখন একান্ত হয়ে ওঠে। মনে হয় দলের কাছে দেশও নগণ্য।

আজ সমগ্র ভারতের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিমবঙ্গের কথা যখন ভাবি তখন একথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি। যে বাংলার একদিন নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাই ছিল দলের বৈশিষ্ট্য সে বাংলারই আজ ব্যষ্টি কিংবা সমষ্টির জীবনযাত্রায় নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছে—শুধু এই কারণেই দেশের অগ্রগতি সম্ভবপর হচ্ছে না। দলের মধ্যে আছে আবার উপদল বা গোষ্ঠী। এদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ লেগেই আছে। তাই কোন দলই তার আদর্শ ও কর্মপন্থা অনুযায়ী দল হিসাবে সামগ্রিক ভূমিকা গ্রহণে সমর্থ নয়। পা বাড়াবার আগে দলের নেতৃত্বকে কখনও এ উপদল কিংবা কখনও ও-উপদলের কথা ভাবতে হয়।

এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বহাদন চলেছিল অরাজকতা। মারামারি, হানাহানি চলেছিল পথে প্রান্তরে, দিনের আলোকে। ঘাতকের অস্ত্র যে কবে কার ঘাড়ে পড়বে কেউ জানত না। কেউ পথে বের হলে বাড়ীর লোকজন উন্মুখ হয়ে তার ঘরে ফেরার পথপানে চেয়ে থাকত। আজ অবশ্য সে দিন নেই। অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উৎস কোথায় সে খোঁজ আমরা করি নি। আমরা গায়ের জোরে তাদের দমন করেছি, কিন্তু এ সমাজ-ব্যাধির মূল কারণটিকে সমূলে উৎপাটিত করার দিকে দৃষ্টি দেই নি। এর ফল হয়েছে এই যে এখনও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে আমরা আমাদের চিরপরিচিত ঘাতকদের দেখতে পাই, এখানে ওখানে শুনি ওদের সেই নিষ্ঠুর পদধ্বনি।

কেন এমন হল! হল এজন্য যে আমরা আমাদের ব্যাধিকে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে কোনদিন চাইনি—একে শুধু জোর করে চাপা দিতে চেয়েছি। তাই আমাদের সমস্যাটা সমস্যাই থেকে গেছে। সরকারের কাছে ত দেশের বহুবিধ সমস্যা। সে সমস্যার সমাধান সরকারকে করতে হবে অল্প সময়ের মধ্যে। সেজন্যই কখনও বা ছাইচাপা দিয়ে জলন্ত আগুনকে নেভাবার চেষ্টা করা হয়, কখনও বা কিছুকালের জন্য একটা সহজ সমাধানের পথ সরকারকে খুঁজে বের করতে হয়। আবার কখনও বা কেন্দ্রের উপর সব দায় দায়িত্বের ভার দিয়ে নিজেদের দায়-মুক্ত করবার চেষ্টা করতে হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার বিন্দুমাত্র উপশম হয় না। চারিদিকের অন্ধকার আরো ঘন হয়ে ওঠে।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকেছে দুর্নীতি। যে কাজ করলে আগে লোকে সমাজে নিন্দনীয় হত, যে কাজ করলে সে সমাজে নিগৃহীত হত আজ সেকাজ সকলের সামনেই সে বুক ফুলিয়ে করে যাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সে এইসব নিন্দনীয় কাজ করে সমাজের প্রশংসাও পাচ্ছে। মানুষের মর্য্যাদার কোন মূল্য নেই তার কাছে, নেই মানুষের জীবনেরও কোন মূল্য। একটা পশুপাখীকে মারা আর একটা মানুষকে খুন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই তার কাছে। সত্য, ন্যায় ও সততা প্রভৃতি শব্দগুলি আজ তার অভিধান থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

স্বাধীনতার একটি আধটি বছর নয়, এক এক করে সাতাশ বছর পার হল। কিন্তু, তবু দেশের চারদিকে নৈরাশ্য ও হতাশা, চারদিকে দুর্নীতি ও অসাম্যের রাজত্ব। সাধারণ মানুষের দুঃখ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। খাদ্যের সংস্থান তার নেই, নেই সত্যিকারের বাসস্থান। দেশের তরুণ যারা তারা মানুষ হচ্ছে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। এ অবস্থা আর কতদিন চলবে?

হয়ত চলবে অনেকদিন যদি না আমরা এখনই এ সম্পর্কে অবহিত হই। ভারতবর্ষের প্রথিতনামা বর্ত্তমান রাজনৈতিক নেতাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে আর কতদিন কাটাব। একথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বর্ত্তমান নেতৃবর্গ ক্ষমতার লড়াইয়ে যত তৎপর দেশের বৃহত্তর কল্যাণসাধনে তত তৎপর নন। যদিও তাঁরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে জনগণের কল্যাণসাধনই তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, তবু এটা জনসাধারণ বছরের পর বছর লক্ষ্য করে আসছেন যে জনগণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছেন। দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্দশায় জীবন যাদের অতীতে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেছিল আজ তা ততোধিক দুর্ব্বহ। দেশের শিক্ষিত যুবকদের অধিকাংশেরই সামনে জীবনধারণের কোন সুনিশ্চিত পথ খোলা নেই। এই কারণেই নেতাদের মুখনিঃসৃত 'সমাজতন্ত্রবাদ' কিংবা 'জনগণের কল্যাণসাধন' এসব গালভরা কথায় আর তাঁরা বিশ্বাস করেন না। বড় বড় কথা তাঁরা অনেক শুনেছেন—কিন্তু শুধু কথায় ত আর পেট ভরে না। এখন কিছু কাজ তারা দেখতে চান। কিন্তু, এ কাজ দেখাবার দায়দায়িত্ব কার?

আজ তাই প্রশ্ন জাগে মনে কোন পথে পা বাড়ালে এই দুঃখদুর্দ্দশার হাত থেকে আমরা মুক্তি পাব। যে দেশে রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মত লোক জন্মগ্রহণ করেছেন—যে দেশকে সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তির পথ দেখিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যে দেশে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও শ্রীঅরবিন্দের মত কর্ম্মবীর জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশ কি শুধু কথায় মার খেয়ে খেয়েই মরবে? বাংলা তথা সমগ্র ভারতে কি নেতৃত্বহীন অন্ধপথে আপনার মৃত্যুকে আপনি ডেকে আনবে? এ প্রশ্নের আজ জবাব দিতে হবে সমগ্র ভারতের। যদি সমগ্র-ভারত এর উত্তর দেওয়ার জন্য এগিয়ে না আসে তবে এর উত্তর দিতে হবে বাঙলাকে, দিতে হবে বাঙালীকে।

কাজ শুরু করতে হবে আজই, এখনই। একেবারে প্রথম থেকে, একেবারে নীচু থেকে। উপর থেকে নীচুতে যাওয়া নয়, নীচু থেকেই এবার উপরে উঠবার অভিযান শুরু করতে হবে। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে দেশের ছাত্রসমাজকে, কেননা তারাই পারে মিথ্যা নেতৃত্বের মোহপাশ কাটিয়ে সত্যিকারের পথে, সংগ্রামের পথে পা বাড়াতে।

এই পথে পা বাড়াতে হলে ক্ষমতার লড়াইকে ছাত্রসমাজ সর্ব্বপ্রকারে পরিহার করে চলবে, কেননা ক্ষমতার লড়াইয়ের নেশা একবার পেয়ে বসলে

দেশের কল্যাণ চিন্তাও তখন পেছনে হটে যাবে। প্রায় ৬ লক্ষ গ্রাম নিয়ে এই ভারত। তাই ভারতকে নতুন করে রূপ দিতে হলে, ভারতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে হলে শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতে মৃতপ্রায় গ্রামগুলির মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করতে হবে।

আমরা আজ শুধু মুখে মুখে গ্রামের কথা বলি—রাজধানীতে বসেই গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখি; তাই সে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থেকে যায়। মনে রাখতে হবে যে শুধু দিল্লী কিংবা কলকাতার কথা ভাবলেই সারাদেশের কথা ভাবা হয় না, ভুললে চলবে না যে কলকাতাকে বাঁচিয়ে রেখেছে যে-গ্রামগুলি, দিল্লীকে যে গ্রামগুলি দিল্লীতে পরিণত করেছে, ভারতের ৩ হাজার সহরকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে যারা, তাদের দিকে শুধু সহরে বসে দূর থেকে দৃকপাত নয়, গ্রামে ফিরে গিয়ে গ্রামবাসীর দুঃখ সুখের সাথী যদি আমরা না হতে পারি, আমাদের সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রামকে যদি ভালবাসতে না পারি তাহলে দিল্লীও বাঁচবে না, কলকাতাও বাঁচবে না, বাঁচবে না ভারতের অন্যান্য সহর আর সেই সঙ্গে বাঁচবে না সারা ভারত। তাই আজ আর একবার আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে। কাজ অত্যন্ত দুরূহ। একাজে যদি সারা ভারত এগিয়ে না আসতে চায় তবে বাঙালীকেই এ কাজের ভার নিতে হবে, কেননা, বাঙালী কোনদিন সংগ্রামে বিমুখ হয় নি। যে ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে বাঙালী একদিন অসম্ভবকে সম্ভব করেছিল সে ইচ্ছাশক্তিকে অভিনন্দন জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্য সমুদ্যত শত্রুকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুরক্তশালী শত্রুর প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কিনা এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মত তর্ক করে নি, বিচার করেনি—কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল। তার পরবর্তীকালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণের চিত্তে।"

এই ইচ্ছাশক্তিকে আর একবার জাগাতে হবে—আর একবার বাঙালীকে বাঙালী হতে হবে, প্রমাণ করতে হবে—"দুঃখের উর্দ্ধে তাহার মস্তক, মৃত্যুর উর্দ্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা।"

"দেখেশুনে"

চক্রপাণি

মনস্তাত্ত্বিকরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, আত্মপ্রচার-বিলাসীরা বিবৃতি-বিলাসী হন;—আবার বিবৃতি-বিলাসীরা অপকর্মের ঢেঁকি হন। অপকর্মের ফাঁকটুকু ভরাট করে তোলার একমাত্র উপায় শূন্যগর্ভ বাক্‌বিন্যাস। বিন্যাস-টুকু যত বেশী শূন্যগর্ভ হবে, দাপট তার ততবেশী হয়। অধুনা ছিনতাইকারীরা পর্যন্ত বিবৃতি বা বক্তৃতার দাপট দেখিয়ে ট্রেনে ছিনতাই আরম্ভ করেছে,—ভাবটা যেন এই,—বিবৃতির দাপট থাকলেই অপকর্মটা যুক্তিগ্রাহ্য সৎকর্মে রূপান্তরিত হবে। শোনা যায় 'কথায় ও কর্মে সত্য' হওয়াই নাকি মনুষ্যত্বের চরম হওয়া কিন্তু "কথায় ও কর্মে সত্য" এই বিশিষ্টার্থ কটিকে মাপকাঠি ক'রে যদি মনুষ্যত্ব খুঁজতে বাছাই-পর্ব সুরু করা যায়, তা হলে সারা দেশটা লোম-বাছাই কম্বলের মতই দাঁড়াবে। এমতাবস্থায় আত্মপ্রচারমুখী, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, বিবৃতিবিলাসীদের সবচেয়ে বড় সমাজবিরোধী বলে চিহ্নিত করলে বোধ করি অন্যায় হবে না।

উপরি-উক্ত আলোচনার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে বেশীদূর এগোতে হবে না। গুজরাট-বিহার ও সাম্প্রতিক আসামের উত্তালতরঙ্গের পেছনে দেশী-বিদেশী শত্রুর হস্তক্ষেপের কথা প্রায়ই বিবৃত হচ্ছে। বর্তমান যুগে অমনি আন্দোলনের পশ্চাতে শত্রুর হস্তক্ষেপ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়;—বিশেষ করে অস্থির জলে মৎস্য শিকার করবার মত মোকাবাজ দেশে দেশে যখন দুর্লভও নয়। কিন্তু শত্রুর দিকে শুধুমাত্র অঙ্গুলি-নির্দেশ করে বাহিত পালনের ঢোঁকা-বাজি না করে সঙ্কটের মূল কারণ অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর অভাবের তীব্রতা হ্রাস করবার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করলে কিছুটা কাজের কাজ হত। সারা পৃথিবীতে খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, এ কথা অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, আমাদের দেশের অভাব ও মূল্যবৃদ্ধির তীব্রতা তুলনায় অনেক বেশী এবং ওটা যে মনুষ্যসৃষ্ট তা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। এই অভাব-সৃষ্টিকারীরা যে শাসকদলের কলেবর বৃদ্ধি করেছে এবং বহাল তবিয়তে গুরুত্ব-পূর্ণ পদ অলংকৃত করে শোভাবর্দ্ধন করছে তা অস্বীকার করবার মত মুখ আজ আর

শাসকদলের নেই। কতজন লোভের ধান দিলে না, কতজন বেআইনী জমি দখল করে রয়েছেন, তাঁদের নামের ফর্দ শাসকদলের মুখে মুখে ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হচ্ছে। কোন মন্ত্রী সময় মত আয়কর না দিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে দেশের মানুষকে উপদেশ দিলোচ্ছেন, তা জনসাধারণ খবরের কাগজের পাতায় জানতে পারেন। জনসাধারণ আরও জেনেছেন যে, সরকারি বাজেটে প্রতিবছর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর বসিয়ে, এবং কলমের এক খোঁচায় জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে দেওয়ার কর্তৃত্বের সার্বভৌমত্ব যাদের আছে, দাম কমানের বাহাদুরী বা শক্তি তাঁদের এক কোঁটাও নেই। এমতাবস্থায় দেশী বিদেশী শত্রুর সূক্ষ্ম হাতের চেয়ে শাসকদলের অপদার্থ মোটা হাতটাই তো জনসাধারণের নজরে বেশী করে পড়ছে ;—যার পরিণতি গুজরাট, বিহার, আসাম—অর্থাৎ বিবৃতিবিলাসের অবশ্যম্ভাবী ক্রমিক পরিণতি। অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের অভাব মোচন ও মূল্যবৃদ্ধির প্রতিরোধের সম্ভাবনা যেখানে অণুমাত্র নেই, সেখানে জনসাধারণ যৌথ করতাল সহযোগে শাসকদলের নাম-সংকীর্তন করবে, না "যা কিছু একটা দাও হাতে, একবার ঘুরে বাঁচি"—বলে রাস্তায় নামবে ? সকলেই জানে একথার উত্তর মাথা খুঁড়ে মরলেও পাওয়া যাবে না।

পত্র-পত্রিকায় আলোকচিত্র ছাপানটা আর এক ধরণের প্রচার কৌশল। বিশেষ বিশেষ অর্থে ঐ সব চিত্র কখনও কখনও সংবাদ হয়ে ওঠে। যেমন গ্রামে গ্রামে বিকলাঙ্গ নলকূপের চিত্র দেখে ধরা এলাকার লোকে ভাবে যে ঠিকাদাররা কি রকম অম্লানবদনে জাতীয় তহবিল লুঠ করছে। শুধু তাই নয়, এ সব লুঠেরা ঠিকাদারদের সঙ্গে প্রশাসনের এবং শাসকদলের কারও না কারও সঙ্গে একটা গোপন আত্মীয়তার সূত্র বের করতে তারা প্রয়াস পান। অপরপক্ষে সবলাঙ্গ গভীর নলকূপের চিত্র দেখে তাদের দুষ্টবুদ্ধি বলে, "ওটা নির্বাচনী চমক"। এইরূপ বুদ্ধিকে—তা সে দুষ্টই হোক বা স্পষ্টই হোক—একেবারে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রচারের যে খেল শাসকদল দেখিয়েছেন তাতে এই মতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী তোড়জোড়ের সুরু হতেই বিশেষ বিশেষ এলাকায় বিশেষ বিশেষ ভাবে উন্নয়নমূলক কাজ করার একটা হিড়িক পড়ে যায়। তা ছাড়া, এশিয়ার যিনি মুক্তিসূর্য তিনি তো খোলাখুলি বলেছেন যে শাসক দলকে নির্বাচনের সমর্থন না করলে কেন্দ্রের সহযোগিতা পেতে অসুবিধা হবে। অর্থাৎ, "ভোট দাও, নয়ত পশ্চাদপদবর্তিতার পাকে পড়ে হাবুডুবু খাও"। জনসাধারণ জানে না যে, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের উদ্গাতাগণ কবে, কোথায় গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবকে এমনি করে হাতে কলমে বিশ্লেষণ করেছেন। সকলের উপর টেক্কা দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচারবিলাস। সকলেই জানে, উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রতিক নির্বাচনে জাতিভেদপ্রথা একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এবং শাসকদলের মহারথীরা সেখানে এই কদর্য পাক সারা গায়ে মেখেছেন।

আর এক ধরণের প্রচারকৌশলের মধ্যে কুশলতার চেয়ে সংকোচহীন নির্লজ্জতা এমন ভাবে প্রকাশিত হয় যে, ঐ সব আলোকচিত্রদৃষ্টে দেহ-মন বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয়ে ওঠে। মনে করুন, কোন প্রথম সারির নেতা শহরের কোন বাড়ীর উদ্যান সংলগ্ন জমির উপর ট্রাকটরে চড়ে "অধিক ফসল ফলাও" অভিযানের উদ্বোধন করছেন, বা রৌপ্যনির্মিত কুন্নি হাতে কোন প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন অথবা, পুষ্পালঙ্কারশোভিতা নৃত্যপটিয়সী মেক-আপ লাঞ্ছিতা রমণীকুল বৃক্ষরোপন উৎসবের অনুষ্ঠান করছেন। ঐ সব ছবির উদ্দেশ্য একটিই,—আর তা হল অপকর্মের চেহারাটা জৌলুসের ছটায় আড়াল রাখার অপচেষ্টা। কারণ, এই সব অপকর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য অপচয় ; আর অপচয় এই জন্য যে, ঐ সব অভিযানের আরম্ভেই অবসানের নোটিশ লটকানো থাকে। সকলেই জানে যে, 'স্বাধীনোত্তর' ভারতে যতটুকু অগ্রগতি হয়েছে, তা উৎসবের ছবি ছাপিয়ে হয়নি, হাতে কলমে কাজ করেই হয়েছে। এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত ঘোড়ার-গাড়ী-চড়া প্রধান মন্ত্রীর ছবিতে পেট্রলের অপচয় কিছুমাত্র হ্রাস পেয়েছে কি না, তা দেশবাসী অনুভব করতে পারেনি। উল্টো, ক্যামেরায় ধরা দেওয়ার জন্য ক্যামেরা-সচেতন দৃষ্টিতে হাস্যকরজনক প্রচারবিলাসই ধরা পড়েছে।

"দুর্দিনের মোকাবিলা করতে হবে" —অতি উত্তম কথা। কিন্তু "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও"—বলে আর একটা কথা তো পাশাপাশি রয়েছে। দুর্দিনের মোকাবিলায় কতজন প্রচারবিলাসী গায়ের চামড়ায় আঁচর লাগিয়েছেন তার হিসেব নিতে গেলে ফল পাওয়া যাবে লবডঙ্কা। অতএব···।

মুজতবা

কালীকিংকর চট্টোপাধ্যায়

হ'সে আড্ডা, গাল-গপ্পো, কিছুটা বা গালাগালি
এই ছিলেন সৈয়দ মুজতবা আলি
যেন যথেষ্ট নয় সিরিয়াস,
এলেম্ ছিল বহুৎ—ছিল বহু ভাষাও জানা
লেখা প'ড়ে মনে হ'তো খাচ্ছি ভাজা চানা
চার ইয়ারে খেলতে খেলতে তাস ॥

• • •

গভীর কথা, জ্ঞানের কথা, ইতিহাস ও ভূগোল
থাকতো খুবই—মনে হতো বুঝি আবোল তাবোল
শুধুই কথার ফুলঝুরি
আড্ডার রাজা, কুঁড়ের বাদশা, গুলের সম্রাট
ছিল দিল্‌দরিয়া মেজাজ—যেন রসুলপুরের হাট
ভাবের ঘরে চ'লতো কিন্তু চুরি ॥

• • •

ধর্ম নিয়ে পাদরী, পুরুৎ মৌলভী সব তাবৎ দুনিয়ার
দেশ বিদেশে ছাড়ছে যে হুংকার
সে সব বেবাক ধোঁকা
দাড়ি গেরুয়া, হাঁটুলম্বা এ্যাপ্রনের তলায়
তুলসীমালা সাদা কলার গলায়
কিল্‌বিলুচ্ছে কুসংস্কারের পোকা ॥

• • •

রাজাতন্ত্র গাঁজাতন্ত্র পঞ্চতন্ত্রে ঘুঁটে
চ'ড়ে তাল বেতালের ঘাড়ে কিংবা চ'ড়ে উটে
কায়রো, কাবুল, জার্মানীতে
দেশ বিদেশে বিলিয়ে গেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এনতার
গ্রীক্ পাউলুস্, মৌলা আলি, চাচা, জার্মান ডাক্তার
যার প্রেম জমলো হাঁচতে হাঁচতে সর্দিতে।

• • •

সিনিয়ার সেই এ্যাপ্রেন্টিস্, প্যারীসের মেয়ে রাস্তার
ইস্‌কুলের সেই পণ্ডিতমশাই পচাত্তর টাকার
গিল্‌ছে যাদের ধনতন্ত্রের হাড়র
তাদের ব্যথা, কান্না, অঙ্ক কখন যেন হ'তো রক্তক্ষরা
হাসতে হাসতে হঠাৎ পড়ত ধরা
তুমি দিল্ দেমাকে মানুষ ছিলে ভাস্বর ॥

• • •

ছিলে দেশ বিদেশের খানা পিনার পয়লা নম্বর গুর্মে
রসের সূক্ষ্ম কারবার বুঝতে মর্মে
ইতালিয়ান গুলাস, কলিয়াক্
হেরিং হোক্ বা পদ্মার ইলিশ শর্ষে-বাটা দিয়ে
নতুন গুড়ের সন্দেশে বা বাসী লুচি জড়িয়ে
হোক্ স্প্যাগেটি হোক্‌না কচুর শাক ॥

• • •

গুরুগম্ভীর গেরেমভারী পাণ্ডিত্যের হিমালয়
তোমার লেখা সে সব মোটেই নয়
দরদী-দিল্ মুজতবা
কলকল্লোল ঝরণার মত হাসি কান্নায় সাতরঙা
আর পাবোনা তাই আমাদের মন ভাঙা
কান্না পায় যে—তওবা তওবা।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিকুঞ্জ সেন

বোম্বাইয়ের রাজস্ব আদায়ের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ইংরেজ-শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ঐ দেশে ৮০,০০,০০০ টাকা রাজস্ব আদায় হত। কিন্তু, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে বছর ইংরেজ ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে ঠিক তার পরের বছরেই তারা রাজস্ব আদায় করে প্রায় এর দেড় গুণ। এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে প্রজার উপর অকথ্য অত্যাচার হত। এই অন্যায় অত্যাচার সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টেই দেখতে পাই :

Every effort was made – lawful and unlawful, to get the utmost out of the wretched peasantry, who were subjected to tortures—in some instances cruel and revolting beyond description if they could not or would not yield what was demanded. Numbers abandoned their homes and fled into neighbonring Native States—large tracts of lands were thrown out of cultivation, and in some districts no more than one-third of the cultured area remained in occupation.

সরকারী রিপোর্টেই যেখানে দেখা যায় যে হতভাগ্য কৃষকদের কাছ থেকে যতদূর সাধ্য অর্থ-আদায়ের জন্য সর্ব্ব-বিধ নিষ্ঠুরপন্থাই প্রযোজ্য হত—সেখানে বাস্তবে সে পীড়ন ও অত্যাচারের মাত্রা যে কত ভয়াবহ হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। তা না হলে শত শত কৃষক তাদের বাড়ীঘর, তাদের খেতখামার চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করতে যাবে কিসের জন্য !

সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এইভাবে কৃষককুলের উপর অকথ্য নির্য্যাতন করে যে অর্থ আদায় করা হত তার বেশিরভাগই পাঠিয়ে দেওয়া হত ইংলণ্ডে। এর বিস্তারিত বিবরণ আছে শ্রীদেউস্করের "দেশের কথা" নামক বিখ্যাত পুস্তকে। তিনি সেখানে বলেছেন কিভাবে ওখানকার ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারগণ, কর্ম্মচারীবৃন্দ ও বিলাতের পার্লামেণ্ট সদস্যগণ এই ভারত-লুণ্ঠিত অর্থে নিজেদের দারিদ্র্য দূর করেছিল। এক বাংলাদেশ থেকেই ১৭৫৭-১৭৬৫ এই ৮।৯ বছরে প্রায় ৫ কোটী টাকা উৎকোচ স্বরূপ আদায় করা হয়েছিল। এই উৎকোচের টাকাটা খরচ হত পার্লামেণ্টের সভ্যদের খুশি করার কাজে। কোম্পানীর কর্ম্মকর্ত্তরা এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন যে পার্লামেণ্টে তাদের এ অন্যায় অর্থ আদায়ের কাহিনী ফাঁস হয়ে গেলে, কিংবা এর বিরূপ সমালোচনা শুরু হলে ভারতবর্ষে ওদের লুণ্ঠন কার্য্য শেষ হয়ে যাবে। সেই কারণেই ভারী টাকা ঘুষ দিয়ে ওরা পার্লামেণ্টের সভ্যদের বশীভূত করত। এ প্রসঙ্গে 'দেশের কথা'র লেখক বলেছেন, "গজনীর মামুদ, নাদির শা, আহম্মদশা আবদালী বা নাগপুরের বর্গীরা ভারতের ধনী সন্তানদিগকে লুণ্ঠন করিয়া কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসগ্রন্থেও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু, কোম্পানীর আমলে ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব সহজে পাওয়া যায় না। মিঃ ডিগবী বলেন, "পলাশীর যুদ্ধের পরে প্রায় ৫০ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ৫০,০০,০০,০০০ হইতে ১০০,০০,০০,০০০ পাউণ্ড ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। মিঃ বুকস্ এডামস Law of Civilisation and Decay নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

Possibly since the world began no investment has ever yielded the profit reaped from the Indian plunder.

সে যাহা হউক, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষেরা এদেশের কৃষি-শিল্পজীবিদিগকে যেরূপ নির্ম্মমভাবে লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতবাসীর অধিকাংশ অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়; অতিরিক্ত কর দিয়া কৃষকেরা নিঃস্ব হইয়া পড়ে, শিল্পিগণ বাণিজ্য সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া অর্থ-হীন হওয়ায় কৃষিকর্ম্ম অবলম্বনে বাধ্য হয়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ে দারিদ্র্য-রাক্ষস কিরূপে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করে, তাহা বুঝিতে হইলে, রাজস্ব বৃদ্ধির এই ইতিহাস অবশ্য জ্ঞাতব্য। বৃটিশসিংহ যখনই কোন প্রদেশে পদার্পণ করিয়াছেন, তখনই সেই প্রদেশের কৃষকদিগের শোণিত এরূপ অপরিমিত-ভাবে পান করিয়াছেন যে হতভাগ্যগণ একেবারে উত্থানশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহা ঘোরতর কলঙ্কের বিষয় হইলেও ঐতিহাসিক সত্য।

ইংরেজ এদেশে এসেছিল ভারত-বর্ষের অপরিমিত অর্থ লুণ্ঠন করতে। সেইজন্যই ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত অর্থাৎ পলাশীর জয় থেকে শুরু করে ১৮৫৭ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্য্যন্ত এই একশ বছরের ইতিহাস ভারতবর্ষকে ইংরেজশক্তির লুণ্ঠন ও রক্ত-শোষণের ইতিহাস। এ ইতিহাসকে সম্পূর্ণ করতে

গিয়ে একদিকে তারা ধ্বংস করেছে ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যকে, অন্যদিকে শোষণ করেছে ভারতের কৃষককুলকে। এই সর্ব্বব্যাপী অন্যায় শোষণের ফল হয়েছে এই যে, ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মধ্যেই ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ ও ক্ষোভ সঞ্চিত হতে হতে একদিন তা বিস্ফোরণে পরিণত হয়। সে বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়েছিল ১৮৫৭ সালে, পলাশী বিজয়ের প্রায় একশ বছর পরে। আজ তাই অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানকে শুধু "সিপাহী বিদ্রোহ" বলে অভিহিত করলেই তার গুরুত্ব কমে না কিংবা তার ব্যাপকতার হ্রাস হয় না। অনেকে এমন কথা বলেছেন যে ১৮৫৭ সালে যদি ভারতবর্ষের সিপাইরা শত্রুর বিরুদ্ধে চরম আঘাত না হানত তাহলে এ গণ-অভ্যুত্থান সম্ভবপরই হত না। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে একথা সত্য তবু একথা কিছুতেই বলা চলে না যে এটা কেবল ভারতবর্ষের সিপাহীদেরই সংগ্রাম —জনসাধারণের অকুণ্ঠ যোগ এতে ছিল না। যদি তা না থাকত তবে সিপাহীদের সংগ্রাম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা এমন ব্যাপক আকারে দেখা দিত না। একথা কেউ বিশ্বাস করবে না যে সিপাহী বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই দেশব্যাপী গণবিক্ষোভের আত্মপ্রকাশের মধ্যে কোন প্রস্তুতিই ছিল না। সমগ্র ভারতবর্ষের কথা থাক, একমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে, বিহার ও পাঞ্জাবে সেদিন যে গণঅভ্যুত্থানের প্রকাশ আমরা দেখেছি তার তুলনা মেলা ভার।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই গণঅভ্যুত্থানের কারণ প্রদর্শন করে বলেছেন, সন্দেহের অবকাশ নেই যে কোন পূর্ব্বপরিকল্পনা এবং সংগঠন ছাড়াই এই বিদ্রোহ সর্ব্বস্তরের সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তিনি আরো বলেছেন, বিভিন্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট অসন্তোষ ও ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল তা-ই এ অভ্যুত্থানকে সম্ভব করেছিল, একথা সত্য। কিন্তু, ভুললে চলবে না যে সিপাহীবিদ্রোহ যদি স্থানীয় শাসন কাঠামোকে ধ্বংস না করে ফেলত তাহলে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে সাহসই পেত না। সুতরাং ডাঃ মজুমদারের মতে এই গণঅভ্যুত্থান সিপাহী বিদ্রোহের কারণ নয়, ইহার পরিণতি।

মুজাফরনগরের গণ-অভ্যুত্থান বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে স্থানীয় ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেটের ভীতিই এই অভ্যুত্থানকে ত্বরান্বিত করেছে। বিদ্রোহী সেনারা এগিয়ে আসছে এ সংবাদে ভীত হয়ে তিনি মুজাফরনগরের সরকারী অফিস তিন দিনের জন্য বন্ধ করে দেন। কিন্তু, তাতেও নিস্তার নেই, গুজব রটল যে মুজাফরনগরের জেলের কয়েদিরা রাত্রিতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালবে। এ কথা শুনে সন্ত্রস্ত বেডফোর্ড সাহেব জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একগ্রামে পালিয়ে গিয়ে রাত্রি যাপন করেন।

[ক্রমশঃ]

জীবনে একটা অভিজ্ঞতা হল। এতে খুব দুঃখ হল না। ভাবলাম সাধারণ সাংসারিক জীবনে যেমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা পলাতক জীবনেরও নানা অভিজ্ঞতা হয়। কখনও ঘৃণা অবহেলা, দুঃখ কষ্ট, আবার কোথাও সহানুভূতি, মায়া মমতা স্নেহের করুণ স্পর্শ। যে জীবনে কেবল দুঃখ বিপদ-ই পাওয়ার কথা, সেখানে যদি সহৃদয় লোকের স্নেহ-সিক্ত প্রাণের উষ্ণস্পর্শ পাওয়া যায়, সমস্ত মন প্রাণ অভিভূত হয়ে পড়ে। তখনই মনে হয়, দুঃখ বিপদ ঘৃণা অবহেলাই একমাত্র সত্য নয় এ-পলাতক জীবনে, এতে আনন্দ ও আছে, প্রাণভরে স্নেহ ভালবাসার সন্ধানও মিলে।

নানা রঙের দিনগুলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিত পর)

রসময় শূর

এ সময়ে আমার সব চেয়ে বড় কাজ ছিল বিনয় বসুর খোঁজ খবর রাখা তার নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা। সে জন্য সত্য বাবুর বাসার লোক জনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হত। প্রতিদিনের খবর পাওয়া চাই। বিপদ যে কোন মুহূর্ত্তে হয়ে যেতে পারে, সে জন্য বিশেষ হুঁসিয়ার হয়ে থাকতে হত। দুই তিন সপ্তাহ কাটল সন্দেহের কোন কারণ ঘটল না। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল পরিস্থিতি একটু গোলমেলে ঠেকেছে। দু'এক জন লোক বাসার আশে পাশে ঘোরাফেরা করছে, ওদের গতিবিধি সন্দেহের অতীত নয়। বিপ্লবীদের পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। খুব একটা নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও ঐ সন্দেহটুকুর উপরই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিলম্ব করা চলবে না মোটেই। বিনয়কে স্থানান্তরে নিরাপদ আশ্রয়ে রাখতে হবে। হরিদাস দা, নিকুঞ্জ ও সুপতির সাথে পরামর্শ করে আমি সন্ধ্যায় চলে গেলাম রাজেনদার (রাজেন্দ্র গুহ) সঙ্গে যোগাযোগ করতে। তিনি তখন সপরিবারে মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে পাহাড়পুরে বাসা

করে আছেন। রাজেনদা আমাদের মধ্যে সব চেয়ে অজানা পুলিশের চোখে। পার্টির ব্যবস্থামতই তিনি গোপনে আছেন। দলের কারো সাথেই প্রকাশ্যে মেলামেশা করতেন না। দলের উপরের স্তরের চার-পাঁচ জন ছাড়া কেউ জানতেন না তিনি আমাদের এক জন নেতৃস্থানীয় দাদা। রাজেনদা কাজ করতেন খিদিরপুর ডকে। সাধারণ গৃহস্থের ছেলেপুলে নিয়ে চাকুরীর জীবন যাপন করছিলেন রাজেনদা। এখন অমূল্য সুযোগ এসেছে দলের ও দেশের সেবা করার। বিনয়ের কথা সব জানা-লাম রাজেনদাকে, রাজেনদা এক কথায়ই রাজী। রাজেনদার এ আস্তানা বিনয়ের নিরাপত্তার পক্ষে—সব চেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। মেটিয়াব্রুজ পাহাড়-পুর অঞ্চলে বাস ছিল মুসলমানের ও কল কারখানার শ্রমিক মজদুরদের। সুতরাং এটা ছিল উপযুক্ত আশ্রয় স্থল। রাজেনদা তো সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন। কিন্তু থাকার জায়গা করবেন কোথায়? ছোট্ট বাসা। বাইরের একটা ছোট্ট ঘর ছাড়া ভিতরে দু'টো ঘর আছে। তাতে ছয়টি ছেলে মেয়ে নিয়ে দাদা বৌদির স্বচ্ছন্দ স্থান সংকুলান হয় না। এর মধ্যে একটা অসুবিধা হয়েছে। বৌদি তখন আঁতুর ঘরে, বাইরের ঐ ছোট্ট ঘরটিকে আঁতুর ঘর করা হয়েছে। ছেলে হয়েছে, তখন ও দু'সপ্তাহ পুরো হয় নি। হিন্দুর সংস্কার আছে আঁতুর ঘরে এক মাস থাকার পর স্নান করে তবে ঘরে যেতে হয়। অশৌচ কাটবার তো দেরী আছে এখনও। অথচ কালই বিনয়কে নিয়ে আসতে হবে। আমাদের সমাজে মেয়েরাই এমনি সব সংস্কারগুলিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের কাছে এগুলি ধর্ম্মের অঙ্গ। সংসারের মঙ্গল অমঙ্গল নির্ভর করছে সংস্কারগুলি মানা না-মানার উপর। বৌদি শুনলেন সব কথা। এতো পার্টির পক্ষে জীবন-মরণ সমস্যা। দলের তথা দেশের গৌরব বিনয় বসুর স্থান করে দিতে হবে বাসায়। কোন সংস্কারই বাধা হয়ে দাঁড়াল না তাঁর কাছে। তিনি বললেন আজই তিনি স্নান করে নব জাত ছেলেটিকে নিয়ে ঘরে চলে যাবেন। আর এই ঘরটিতেই থাকবে তাঁর নতুন অতিথি। এ কি তাঁর পক্ষে কম আনন্দ ও গর্ব্বের কথা! দেশসেবার এই অপূর্ব্ব সুযোগ তিনি হারাতে পারেন না। রাজার দুলাল এসেছে দুয়ারে। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে তাঁকে ঘরে তুলতে হবে।

স্থির হয়ে গেল আগামীকাল সন্ধ্যায় আমি বাসায় এসে ৩।৪ টি ছেলেমেয়েকে নিয়ে যাব। ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেয়া হল ঐ বাড়ীর এক ভদ্রলোককে দিয়ে। ছেলেমেয়েদের সাথে মিলেমিশে বিনয় উঠে পড়বে ট্যাক্সীতে, এ ভাবে রাস্তা ধরে আসতেও কোন সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। পুলিশের নজর এড়ানো খুব সহজ হবে। তাই হল বিনয়কে মাঝখানে রেখে ছেলেমেয়েরা দুইদিকে বসে হৈ হল্লা করতে করতে এগিয়ে চলল। মাঝখানে মৌলালির একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যিনি বাসা থেকে নিয়ে আসছিলেন তিনি নেমে পড়লেন। ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়া হল। এবার অন্য একটা ট্যাক্সী ধরে বিনয়কে নিয়ে আমি রওনা হয়ে পড়লাম। রাজেনদার বাসা থেকে খানিকটা দূরে ট্যাক্সী ছেড়ে দেয়া হল। তারপর অগ্রপশ্চাৎ বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা—আলাদা আলাদা ভাবে বাসায় এসে উঠলাম। রাজেনদা বৌদিসহ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। রাজেনদার আনন্দ যেন আর ধরে না। বিনয়কে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বিনয় প্রণাম করল দাদা-বৌদিকে।

(ক্রমশঃ)

"যখন আমরা একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি যে,……যে,-সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করি না; আমাদের পিতা মাতা আমাদের সুহৃৎ বন্ধু, আমাদের ভ্রাতা ভগ্নীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না; আমাদের দৈনিক জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোন স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং পৃথিবী, আমাদের নির্ম্মল প্রভাত এবং সুন্দর সন্ধ্যা, আমাদের পরিপূর্ণ শস্যক্ষেত্র এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোন সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোন স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না।……"

(—রবীন্দ্রনাথ)

মালোত হত্যাকাণ্ড ও তারপর

রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষক

লেবানন সীমান্ত হতে উত্তর ইজরায়েলের ১০ মাইল অভ্যন্তরে মালোত (Maalot) সহর। মরক্কো-আগত অনুমান ৩½ হাজার অধিবাসী ইহুদী অধ্যুষিত এ-অঞ্চল। রূপাকার এক পাহাড়ের পাদদেশে স্বভাবতই সুরক্ষিত সীমান্তের এ-নব নির্মিত সহর।

১৫ই মে ঘুমন্ত পুরী, রাত ৩টা।

তিনজন সশস্ত্র গেরিলা অতর্কিতে আক্রমণ করে মালোতের স্কুল গৃহ মুহূর্তে দখল করে নেয়। ছাত্র এবং ছাত্রীদেরকে আলাদা করে স্কুল গৃহের দুই তলে আটক করে রাখে এবং স্কুলব্যাপী মারাত্মক বিস্ফোরক রোপন করে রাখে। নিজেরা স্বয়ংক্রিয় রাইফেল ও হাতবোমা (গ্রেনেড)-সজ্জিত হয়ে পাল্টা আক্রমনের মোকাবেলা করবার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে। দুজন গেরিলা দুই তলে প্রহরারত-এবং তৃতীয় জন সর্বময় কমাণ্ড-এ নিযুক্ত থাকে। ইত্য-বসরে সকাল ৫টা নাগাদ বিরাট ইজরায়েল বাহিনী আর্মি ট্রাকে করে উপস্থিত হয় এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সর্বাধিনায়ক (চিফ-অব-ষ্টাফ্) লেফটে-নাণ্ট মোর্ডেচাই গুর-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্কুল বাড়ী অবরোধ করে। নিকটস্থ বাড়ীগুলোর ছাদে ছাদে মেসিনগান বসিয়ে সমগ্র স্কুল বাড়ীটিকে নিরন্ধ্র বেষ্টনীতে পরিণত করে।

গেরিলা কমাণ্ডো আটক ছাত্রছাত্রী-দের তদারক একজন মেয়ে অফিসারের মারফৎ হাতে লেখা চরম পত্র পাঠায়, যার মর্ম হল—

(১) ২০ জন পুরাতন যুদ্ধবন্দীকে আশু-মুক্তি দিতে হবে; এবং (২) তাদের নিরাপত্তা স্বরূপ ফরাসী ও রুমানিয়ার দূতদ্বয়কে জামীন হয়ে গ্যারান্টি দিতে হবে, যতক্ষন না ঐ কুড়িজন যুদ্ধবন্দী ও ও বর্তমান গ্যারীলা কমাণ্ডো নির্বিঘ্নে ইজরায়েলের বাইরে চলে যেতে সমর্থ হয়। (৩) ইজরায়েলী বিমানযোগে মুক্তবন্দী ও কমাণ্ডোকে দামাস্কাস পর্যন্ত পৌছে দিতে হবে। (৪) সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে সমস্ত শর্ত মেনে নিতে এবং পূর্ণ করতে হবে।

বেলা ৯টা নাগাদ এই চরমপত্রের উপর ইজরায়েলী মন্ত্রীসভার জরুরী অধিবেশন আহূত হয়। বিদায়ী প্রধান মন্ত্রী গোল্ডা মায়ার-এর নেতৃত্বে পেলে-ষ্টাইন কমাণ্ডোর দাবী মেনে নেবার পক্ষেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মিসেস মায়ার দেশবাসীর কাছে ঘোষণা করেন, "আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের শবের উপর যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারি না"। বলা বাহুল্য ১৯৭২ সালে ম্যুনিখে অবরুদ্ধ ইজরায়েলী ওলিম্পিক খেলো-য়াড়দের অবধারিত মৃত্যুর মুখে ধনুক ভাঙা পণের তুলনায় এবারকার ইজরায়েলী সিদ্ধান্ত বাস্তবনিষ্ঠ বিচক্ষণ-তার পরিচয় দেয়।

সুতরাং একদিকে ইজরায়েলী মন্ত্রী-সভার সিদ্ধান্ত, অর্থাৎ বন্দীমুক্তির সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার (!) প্রস্তুতি চলতে থাকে; এবং অপর দিকে পেলেষ্টাইন্ কমাণ্ডোদেরকেও সে সংবাদ জানিয়ে দেয়া হয়। প্রতিদানে আশু সাড়া হিসাবে দু'জন অসুস্থ ছাত্রকে পেলেষ্টাইন কমাণ্ডো মুক্তি দেয়। তারাই প্রথম ভেতরকার নির্ভরযোগ্য সংবাদ বহন করে আনে। মুক্ত দু'জনার মধ্যে একজন, ষোল বৎসর বয়স্ক রাসেল লার্কজিল্ এসে রিপোর্টারদের এ-ও বলে, আটক অবস্থায় নজর বন্দী ছাত্র-ছাত্রীদের ট্রানজিস্টার রেডিও শুনতে দেয়া হয়। যার কল্যাণে তারা নিজেদের সম্বন্ধে স্বদেশের নানা জল্পনা কল্পনা ও সরকারী বিবৃতি শুনতে পায়। তা'হলে ঐ সময় ছেলেমেয়েদেরকে লাখি গুতো মারার কাহিনীসমূহ একটু অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়। যা' হোক, একশ'জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে অন্যূন বিশজন, (সতের জন ছাত্র এবং তিনজন বয়স্ক 'শ্যাপরোন্' বা সহচর), যারা প্রথম সুযোগে প্রাণভয়ে পালাতে সমর্থ হয়, তারা যে গোলমালের খবর বার্তা বহন করে আনে তাতে কিছু বিভ্রান্তির অবকাশ থাকতেই পারে। বলাই বাহুল্য কমাণ্ডোদল পাল্টা আক্রমণের বিরুদ্ধে খুবই সতর্ক ছিল। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায়, একজন রিজার্ভিষ্ট (Reservist), যিনি অদূরে এক ছাদের ওপর থেকে ওৎ পেতে ছিলেন, মাথা তুলতেই এক কমাণ্ডোর গুলিতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভূপতিত এবং হত হন। কিন্তু এতাবৎ ছাত্রছাত্রীরা অনাহত এবং অনেকটা আশ্বস্তও থাকে; এবং বাইরের জনতা ও সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ছাত্রছাত্রীদের প্রাণের বিনিময়ে গেরিলা কমাণ্ডোর দাবীসমূহ মেনে নেবার পক্ষে বারবার করুণ আবেদন জানায়, কমাণ্ডোরাই মাইক্রোফোন আশ্রয়ে।

কিন্তু ইজরায়েল গভর্নমেণ্ট কমাণ্ডো-দের যাবতীয় দাবী মৌখিক মেনে নিলেও কার্যতঃ সক্রিয় পদক্ষেপের বেলায় গয়ংগচ্ছ করেন। তা নইলে নিজেদের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলেন কেন? তার উত্তর আজো রহস্যাবৃত।

ফরাসীর রাষ্ট্রদূত জীন্ হার্লি ও রুমানিয়ার রাষ্ট্রদূত আয়ন কোভাকি সেই সর্তে সকাল (ভোর ৩-৩০ মিঃ) এ হেলিকপ্টার যোগে উপস্থিত হয়ে মধ্যস্থতা দান করেন কমাণ্ডোর সঙ্গে-ও টেলিফোনে বারংবার কথা বলেন। কিন্তু

প্রয়োজনীয় কোড (code-word) পি-ডি-এফ-এল (পেলেস্টাইন ডেমক্রেটিক ফ্রোন্ট ফর লিবারেশন) হেডকোয়ার্টার্স থেকে এনে দিতে পারেন না। কারণ চুক্তিপত্র অনুযায়ী ২০ জন পেলেস্টাইনী মুক্তবন্দীকে দামাস্কাসে পৌঁছে না দিলে কোড্ পাবার কথা নয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইজরায়েল সরকার বিনা শর্তে এ দাবী-ও প্রত্যাহার মেনে নিয়েছিলেন। একথাও সর্বজনবিদিত যে টেল আভিভ হতে বিমান যোগে দামাস্কাস্ যেতে মাত্র ১ ঘন্টা লাগে। তাহলে সুদীর্ঘ ৯ ঘন্টার মধ্যে 'মায়ার'-সরকার প্রয়োজনীয় বিমান সংগ্রহ করতে পারলেন না; এটাও এক তাজ্জব ব্যাপার বৈ কি! অভাবটা ছিল কি বিমানের না আন্তরিকতার? ইতিহাস যথাকালে তার বিচার করবে! ক্রমে বন্ধ্যা কার্যক্রমের বৈলতে সন্ধ্যা সমাগত হল। কমাণ্ডোরা স্বভাবতই সময়োচিত হুঁশিয়ারী দিল, "আমরা সন্ধ্যা ৬ টার বেশি অপেক্ষা করতে পারি না··· স্কুলের দেয়াল ধরাবর সমাবৃত মাইন, সময় উত্তীর্ণ হওয়া মাত্র ফাটবে।" ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ উত্তর দিলেন, আমরা আপনাদের বন্ধুদের পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু টাইম টেবল মত কার্যোদ্ধার হবে কিনা বলা শক্ত। এর মধ্যে তড়িঘড়ি কিছু করে বসবেন না।·····এখানেই ইজরায়েলী শর্ত ভঙ্গের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

কমাণ্ডো মুখপাত্র বলেন : "সময় শেষ হয়ে এল! কথার বুড়ি বাড়িয়ে লাভ নেই। ২০ জন কমরেডের মুক্তি অথবা ৮৫ জন ছাত্রছাত্রীর বিস্ফোরণের মুখে উড়ে যাওয়া"—বিবেচনার বিষয় এইটুকুই।···

নিজেদের আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ ৩ জন বন্দীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও চোখ-বাঁধা অবস্থায় জেল হাজত হতে মালোতে আনা হয়।

কমাণ্ডোরা ওদের কথায় আস্থা না রাখতে পেরে অগ্রসরমান ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে এই বলে সতর্ক করে দেয় যে, "যদি (প্রয়োজনীয়) 'কোড' তিনি না এনে থাকেন তাহলে তিনি যেন আর অগ্রসর না হন।" তারা এও সন্দেহ করে এবং সোচ্চার ঘোষণা করে যে, বিরাট ইজরায়েল বাহিনীর লৌহ বেষ্টনী রাতের অন্ধকারে আক্রমণের অপেক্ষায় সরাসরি সর্বাধিনায়ক Lt. Gen. Gur এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নেতৃত্বে কাল-হরণ করছে।···কিন্তু জেনে রাখবেন, "বিকাল ৬টা হল চরম মুহূর্ত। এবং আপনারা ছেলে-মেয়েদের জীবন নিয়ে খেলা খেলছেন।" কমাণ্ডোদের সন্দেহ যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চরমপত্র পায় হবার পূর্বেই যথাকালে গোল্ডা মায়ার টেলিফোন যোগে মালোত-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী Mr. Dayan-কে জানালেন মন্ত্রীসভা আপনাদের পূর্বস্থ সামরিক কর্মসূচী অনুমোদন করেছেন। কাজেই আটক ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধারের জন্য বড়ের বেগে আক্রমণ করাই বাঞ্ছনীয়। "কিছু ছেলেমেয়ে মারা যাবে, কিন্তু কিছু রক্ষাও পাবে। আপনারা অপেক্ষা করলে কমাণ্ডোরা সবাইকে মেরে ফেলবে।" অতএব সকল প্রতিশ্রুতি বিকাল ৬ টার ঈষৎ পূর্বেই শুরু করে ইজরায়েল বাহিনী বিদ্যুৎ বেগে অতর্কিত আক্রমণ করলো। আশু ফল হল—৮৫ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ২১, আহত ৬০ এবং অনাহত ৪। কমাণ্ডো তিন জনও মারা পড়লো—তারা তো তৈরী হয়েই এসেছিল! ম্যুনিখের হত্যাকাণ্ড এবং তেল-আভিবের প্রীতিপ্রদ বিমান বন্দরের হত্যাকাণ্ড-ও মালোত-এর হত্যা-কাণ্ডের কাছে ম্রিয়মিত হয়ে গেল! ইজরায়েল বন্ধু 'নিউজ উইক' সাপ্তাহিক লিখছেন, কেউ বলতে পারবে না, "কতজন ছাত্র-ছাত্রীর মৃত্যু ঘটেছে গেরীলা বুলেটের ঘায়-এ এবং কত জনার মৃত্যু ঘটেছে ইজরায়েলের বুলেটে বিদ্ধ হয়ে।"

অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী যে ইজরায়েলী বাহিনীর হাতেই হতাহত হয়েছে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ ইজরায়েল বাহিনীর বিবৃতিতে দেখা যায়, আক্রমণের মুখেই একজন কমাণ্ডোর মৃত্যু ঘটে, স্কুল ভবনের প্রবেশ পথেই, অপর দু'জনার মৃত্যু-ও ২।১ মিঃ মধ্যেই ঘটে। কমাণ্ডোদল মাইন বিস্ফোরণ ঘটাতেও সমর্থ হয়নি। তদুপরি, যে ছজন গেরিলা ভূতলে প্রহরারত ছিল, তাদের মধ্যে একজন-ও যদি 'নিউজ উইকের,' বিবরণ মতে অতর্কিত আক্রমনে মুহূর্তের মধ্যে মারা যায় তাহলে, তার হাতে বিশেষ প্রকোষ্ঠে একজন ছাত্র-ও মারা পড়ার কথা নয়। তৃতীয় জন-ও যদি ১।২ মিনিট মধ্যেই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা পড়ে, তাহলে তার পক্ষে-ও কোন ছাত্র-ছাত্রীকে গুলিবিদ্ধ করবার অবকাশ থাকে না। বিশেষ করে মাইন প্রয়োগই যখন তাদের মুখ্য অস্ত্র ছিল। সুতরাং ছাত্র-ছাত্রী হতাহতের কাজ একা ইজরায়েল বাহিনীর হাতেই সম্পাদিত হয়েছে বলা যায়। বিশেষ করে হত্যাকাণ্ডের মিনিট কয়েক পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর ওপর জনতার হামলা থেকে-ও সে সন্দেহই বলবৎ হয়। উল্লেখ আছে, তাঁকে সামরিক বাহিনীর সাহায্যে উদ্ধার করতে হয়।

তাহলে পেলেস্টাইন গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে ফরাসী ও রুমানীয়া রাষ্ট্রদূতদ্বয়কে মধ্যস্থ রেখে, এই প্রতারণায় ইজরায়েল সরকার কি লাভ করলো? আর পেলেস্টাইন গেরিলাই বা কি হারাল? যুদ্ধে বন্দী বিনিময়ের ইতিহাস, যুদ্ধেরই মত পুরোনো। মিশরের সঙ্গে কিছুকাল পূর্বে-ও যে বন্দী বিনিময় হল এবং সিরিয়ার সঙ্গে সম্প্রতি যে বন্দীবিনিময় হচ্ছে তার প্রকৃতি মূলগত ভাবে মালোত বন্দী

বিনিময়-এর প্রস্তাব-এর প্রকৃতি থেকে—মোটেও ভিন্ন নয়। বিশেষ করে উভয়ের সম্মতিক্রমে গৃহীত বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যস্থতার অবমাননা, বিনা খেসারতে করে সারতে পারলেই, কি জগতে ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক বলে অভিনন্দিত হবে? "জোর যার মুলুক তার" নীতি সাময়িক ভাবে সুবিধাজনক হ'লেও বরাবর সুবিধাজনক থাকে না; এই যা মুশকিল!

প্রসঙ্গত বলা চলে আইরিশ রিপাব্লিকান আর্মির (I. R. A) হাতে সম্প্রতি ডারিনে বন্দী সন্ত্রীক আরল্ ডোনামোর-কে I. R. A-এর দাবী অনুযায়ী ৫ জন আইরিশ অনশনরত বন্দীর বিনিময়ে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মুক্ত করে দেয়া হয় (৯ই জুন, ১৯৭৪)। ইজরায়েলও বেকায়দায় পড়ে এবার বন্দী বিনিময় নীতিটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিল। কিন্তু সুযোগ পেতেই সে নীতি ভঙ্গ করল। লাভের মধ্যে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে নিজেদের হাতে নিঃশেষে হতাহত করতে পারল! আদর্শের দিক থেকে দেখলে পেলেষ্টাইনের মুক্তি যুদ্ধের এবং ইজরায়েলী সাম্রাজ্যবাদী জবর দখলের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান প্রনিধানযোগ্য। রাষ্ট্রগত স্বাধীনতা-কামী মানুষ মাত্রে এ ব্যবধানটা বুঝতে পারেন। ইজরায়েল বুঝতে পারে না। পররাজ্য বেদখলকারীর এটা চিরাচরিত নিয়ম।

যা হোক মালোত এর আত্মঘাতী সেমসাইড-এর কলঙ্ক অপনোদন করতে হবে। কাজেই দুর্বল লেবাননের উপর বিমান হামলা অনুষ্ঠিত হল। ইউ এন রচিত অরক্ষিত পেলেষ্টাইন বাস্তহারা ক্যাম্পগুলিই ছিল লক্ষ্য। বাস্তহারাদের যথেষ্ট ধন-প্রাণ বিনষ্ট করে ইজরায়েল একটা আত্ম-প্রসাদ লাভ করল; ইউ-এন-ও একটা আনুষ্ঠানিক নিন্দা প্রস্তাব হয়ত গ্রহণ করবেন; পেলেষ্টাইনী আরব কী এতে হতোদ্যম হবে? লক্ষণ দেখে তা মনে হয় না।

সম্প্রতি জেনেভা শান্তি বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়েও পেলেষ্টাইন নেশন্যাল কাউন্সিল (P N C) তা প্রত্যাখ্যান করেছে। এবং এ-ও জানিয়ে দিয়েছে যে, আলোচনার ভিত্তি হিসেবে-ও ১৯৬৭ সনের যুদ্ধের পরবর্তী ইউ এন নিরাপত্তা পরিষদের গৃহীত প্রস্তাব -(২৪২ নং) তারা হবহু মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। তদুপরি আরব লিবারেশন ফ্রন্ট (A L F) ইজরায়েলের সঙ্গে কোন বৈঠকে বসতে-ও রাজী নয়। ইজরায়েল সরকার মুখে যাই বলুন, মিশর-ইজরায়েল সৈন্য অপসারণ এবং সিরিয়া-ইজরায়েল সৈন্য অপসারণ যে কারণে ঘটেছে, সে-কারণেই শেষ পর্যন্ত পেলেষ্টাইন-ইজরায়েল শান্তির পথ-ও রচনা হবে। প্রথমোক্ত দুটো ফ্রন্টের ব্যাপারে মিঃ কিসিঞ্জার জগৎ জোড়া করে শেষ পর্যন্ত যে ইজরায়েল-এর পক্ষে আপোষ রফার মনোভাব সৃজন করতে পারলেন তার কারণ অনুসন্ধান-ও কঠিন নয়।

১৯৭২-এর যুদ্ধে ওয়াসিংটন ও মস্কো কৃতনিশ্চয় হয়েছেন, যে, আরব ইজরায়েলের যুদ্ধ তাদেরকে অকালে বিপজ্জনকভাবে তৃতীয় মহাযুদ্ধের অতি নিকটে টেনে নিয়েছিল। এবং আরব ইজরায়েল-এর মধ্যে 'প্রক্সি' যুদ্ধ আর নিরাপদ নয় বলেই মধ্য প্রাচ্যে শান্তি সমস্যা উভয় সুপার পাওয়ারের সম্মতিক্রমে আজ জেনেভা সম্মেলনের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। কথায় বলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। বিশেষ করে, মিঃ কিসিংগার আরব-ইজরায়েল মধ্যে সদ্ভাব আনার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। লাগলেন নিজের গরজেই। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর একাদিক্রমে পাঁচ বছর এ মধ্যস্থতার কথা ওঠেনি। কারণ মার্কিন প্রসাদ-পুষ্ট ইজরায়েল- তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিজয়ী। প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন মার্কিণ উৎসাহ এবং সমর্থন পেয়ে ইউ এন-এর ২৪২ নং প্রস্তাবের দাবী অনুসারে ইজরায়েলকে ১৯৬৭ সালের সীমান্তে ফিরে যেতে হল না। ইজরায়েল সে প্রস্তাবকে হেলায় অগ্রাহ্য করেছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের যুদ্ধে হাওয়া উল্টে গেল। তার পর থেকেই চলেছে ইজরায়েলের মানভঞ্জনের পালা। দূতী কিসিঞ্জার স্বয়ং। মহাশক্তিধরেরা যখন শান্তি চাচ্ছেন তখন বাধ্য হয়েই ইজরায়েলকেও ২৪২ নং প্রস্তাব মেনে নিতে হবে। এবং মিশর বা সিরিয়ার বেদখলী অঞ্চলের মত পেলেষ্টাইনের বেদখলী অঞ্চল-ও ফিরিয়ে দিতে হবে। পেলেষ্টাইনে স্থায়ী শান্তি আনতে হলে পেলেষ্টাইনীয় পেলেষ্টাইন বলে সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। এক কথায় আরব-ইজরায়েল-এর সংগ্রাম এবং শান্তি দুই-ই অবিভাজ্য। একথাও ঠিক যে পেলেষ্টাইন-ইজরায়েল সমস্যাটি জটিলতর। কারণ একদিনকার পেলেষ্টাইন ভূমি দখল করেই ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এ দুই জাতির কাউকে অস্বীকার করে অপরকে একচ্ছত্র অধিকারী বলে মেনে নেয়া আর সম্ভব নয়। কাজেই যুক্তি-সংগত ভাবে দুই জাতিকেই নতুন করে সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ইজরায়েল এই সত্যটাকে বরদাস্ত করতে চাচ্ছে না। আরবে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান-এর সঙ্গে বনিবনাও হলে পেলেষ্টাইনকে চিরতরে অস্বীকার করা যাবে। কিন্তু, এটা দুরাশা!

সম্প্রতি মিঃ নিকসনের কায়রো সম্বর্ধনায় প্রেসিডেন্ট সাদাত পরিষ্কার বলেছেন, "মধ্য প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের একমাত্র পথ পেলেষ্টাইন সমস্যার সমাধান। এই সমস্যার সমাধান বলতে ইজরায়েল-এর অবলুপ্তি নয়; ইহুদীরা আরবদের পাশে পাশে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিনা ভেদবিচারে এবং বিনা সমস্যায় বসবাস করেছে।.....

মিঃ নিকসন কানে আঙুল দিলেন না, বরং নানা সমরাস্ত্র সরবরাহ প্রস্তাব এবং বাণিজ্যিক চুক্তি সাক্ষরান্তে এক মিশর-মার্কিণ নিউক্লিয়ার চুক্তিতে-ও সাক্ষর দান করে এলেন। এবং দ্বিতীয় প্রস্থ আলাপ আলোচনার প্রস্তাব-ও করে এলেন। পেলেষ্টাইনের কবরের উপর, আরব ইজরায়েলের শান্তি প্রতিষ্ঠা যে সম্ভব নয় সে কথা তিনি খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছেন, মনে হয়।

পেলেষ্টাইন আরব এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েই মরণপণ লড়াই করে চলেছে। পেলেষ্টাইন রাষ্ট্রের মূলগত দাবী না মেনে নিলে সে আরব ইজরায়েল সমস্যা সাধনের কল্যাণে আহূত জেনিভা সম্মেলনে যোগদান করছে না। এ ব্যাপারে ইউ এন নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত ২৪২ নং প্রস্তাবকেও সে সূত্র হিসেবে মেনে নিতে রাজী নয়। যতক্ষণ পেলেষ্টাইন রাষ্ট্রের নীতিসম্মত দাবী মেনে নেওয়া না হয় পেলেষ্টাইন আরব তার শেষ রক্তবিন্দু পাত করেও ইজরায়েল-এ অশান্তির আগুন জালিয়ে রাখবে। এবং বৃহত্তর মুক্তিযুদ্ধের বিরামহীন সুযোগ সন্ধান করবে। জগৎ জানে দুর্ধর্ষ পেলেষ্টাইন গেরিলা যোদ্ধার তুলনা তারাই। এক যুদ্ধের রক্ত শুকাতে না শুকাতেই তারা পরবর্তী মৃত্যুপণ অভিযান চালিয়েছে; যাচ্ছে জীবন-মরণ তুচ্ছ করে।

১৫ ই মে'র মালোত—অভিযান শেষ হতে না হতেই, অপর এক গেরীলা অভিযানে ৪ জন পেলেষ্টাইনী 'ফেদাইন' গেরিলা-এর অন্তর্গত চামীর-কিব্‌বুজ-এ অনুপ্রবেশ করে (১৩ই জুন)। ৪ জন মহিলা কর্মীকে জামীনবদ্ধ করে পূর্ব বন্দীদের মুক্তি দাবী করে। এবং সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে, জামীনবদ্ধ মহিলাদের জীবন নিয়ে নিজেরাও প্রাণ বিসর্জন দেয়। ইজরায়েল সেনাবাহিনী সামরিক অবরোধ সৃষ্টি করে যখন কিব্‌বুজ-এ (Kibbutz) প্রবেশ করে তিনজন মহিলার শব সহ চারজন গেরীলার মৃত দেহ পায়। নিঃসন্দেহে বলা চলে পেলেষ্টাইন গেরীলার অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে সমগ্র ইজরায়েল সেনাবাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। কোথায় কখন আক্রমণ হবে তা এক গেরীলা বাহিনীই জানে। এক কথায় শক্তির মিতব্যয়ীতা পেলেষ্টাইনের পক্ষে।

পেলেষ্টাইনের সংগ্রাম নীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির যত মতবিভেদই থাকুক না কেন, ওদের দেশপ্রেম এবং আত্মাহুতির বাণী হৃদয়ে উপলব্ধি করেন না, এমন মানুষ জগতে বিরল। তার স্বদেশ আত্মার রক্তাক্ত আবেদন "আমার স্বাধীনতা আমাকে ফিরিয়ে দাও ; আমি তোমার শান্তি ফিরিয়ে দেব !" লিড্ডা, ম্যুনিখ, মালোট, কিব্‌বুজ···পেলেষ্টাইনী মুক্তিযোদ্ধার দুর্নিবার অভিযানের অগ্রসর—রক্তাক্ত মাইল প্রস্তর ছাড়া আর কিছু নয়।

পেলেষ্টাইনের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি না দিয়ে, প্রতিবেশী মিশর সিরিয়ার ঐকাত্মবোধ লুপ্ত করা যাবে না—নিউক্লিয়ার চুক্তি দান করে-ও না। একথা মিঃ নিকসন নিশ্চয়ই অবহিত হয়েছেন। মধ্য প্রাচ্যে নিকসন সফরের শেষ বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে যে সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি মিঃ আসাদ ব্যর্থহীন ভাবে বলেছেন পেলেষ্টাইনকে স্বীকৃতি না দিয়ে মধ্য প্রাচ্যের শান্তি প্রয়াস অবাস্তব পরিকল্পনা। এমন কি চিরবশম্বদ জর্ডান রাজ-ও মিঃ নিকসনকে এই সিদ্ধান্তই জানিয়েছেন। তার প্রত্যুত্তরে নিকসন মিঃ কিসিঞ্জারকে এইক্ষণে পেলেষ্টাইন নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদান করে পেলেষ্টাইন সমস্যার ন্যায় সঙ্গত সমাধান বার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সৌদী আরবের রাজা আমির ফৈজল আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ নিকসনকে "পেলেষ্টাইনের দাবীর ন্যায্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ করেছেন" (—আল হায়াত)। মিঃ কিসিঞ্জারকে পেলেষ্টাইন নেতাদের সঙ্গে জরুরী বৈঠকে বসবার জন্য যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এটাও তার অন্যতম কারণ। মিঃ সাদাতের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। শুধু কি তাই মিশরে নিকসন্ সম্বর্ধনায় সমারোহে মাইল মাইল ব্যাপী পেলেষ্টাইনের দাবী লিপি অসংখ্য পতাকা ও ফেষ্টুনে এমন ভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে পেলেষ্টাইন আরব-এর দাবী অবিভাজ্য—"পেলেষ্টাইন আরব"।···

আর একটি তথ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, আরব রাজ্য গুলো তাদের শিল্পোন্নয়ন, ব্যবসাবাণিজ্য, যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে একটিমাত্র সুপার পাওয়ারের মুখাপেক্ষী না থেকে দুই সুপার পাওয়ারের প্রতিযোগিতাই কামনা করছে। অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রেই আভ্যন্তরীন ও বহির্দেশ নীতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে আরব দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে।

নব জাগ্রত স্বদেশপ্রেম; পারস্পরিক অকুণ্ঠ সহযোগিতা সংগ্রামী ঐক্য, সংযুক্ত আরবের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই সূচক। সুতরাং মার্কিণের বদলে আরবকে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলে স্বীকার করেই ইজরায়েলকে শেষ পর্যন্ত শান্তিতে বসবাস করতে হবে। যত শীঘ্র এ শুভ বুদ্ধির উদয় হয় ততই শ্রেয়। পরন্তু বিরামহীন সংগ্রামে পেলেষ্টাইন মুক্তি-সংগ্রামের জয় ছাড়া ক্ষয় নাই ! কাজেই যাভৈঃ পেলেষ্টাইন।

স্মৃতিকথা

(৩৪২ পৃষ্ঠার পর)

অল্পবয়সে ঘর-ছাড়া ছেলেরা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করবেন এই ভাবনায় তাঁর কোমল মাতৃ হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, তিনি আমাকে তাঁর ছোট ভাইএর মত স্নেহ করতেন।

মাষ্টারদা স্বল্পভাষী ছিলেন। দেখলে তাকে নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির লোক বলে মনে হত। তাঁর বাসাতেও তৎকালীন দেশের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি। চট্টগ্রাম থেকে আসবার সময় শহীদ প্রেমানন্দ দত্ত আমাকে ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন। চট্টগ্রাম থেকে হাইলাকান্দি প্রত্যাবর্ত্তন করে নূতন উদ্যমে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলবার জন্য ব্রতী হই। অবশ্য এই প্রচেষ্টার মূলে প্রধান অগ্রণী ছিলেন মাষ্টারদা সূর্য্য সেন।

১৯২৪ ইংরাজীতে মেট্রিক পাশ করে চট্টগ্রামে ডাক্তারী পড়তে যাই। সেখানে মাষ্টারদার উপস্থিতিতে অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, সুখেন্দু দস্তু প্রভৃতি বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় হয়। সে সময় মাষ্টারদা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত না হয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে পলাতক অবস্থায় কিছুদিন বাস করেন। পরে পুলিশ জানতে পারাতে আমাকে নিয়ে কাছাড়ের বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য প্রচেষ্টা করেন।

সে সময় করিমগঞ্জে 'নারায়ণ ঔষধালয়ে' নামে একটি আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান ছিল। উক্ত ঔষধালয়ের মালিক ছিলেন অকৃতদার অবনী লাহিড়ী। মাষ্টারদা যখন কাছাড়ে প্রথম আসেন, তখন এই অবনী বাবু তাঁহার ঔষধালয়ে এবং আমি মাষ্টারদাকে আমাদের গৃহে স্থান দেই।

মাষ্টারদা কাছাড়ে অবস্থানকালে আমি তাঁর সাথে শিলচরে হাইলাকান্দি ও শ্রীহট্টের বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য যাতায়াত করি। আর ঠিক সে সময় মাষ্টারদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় গড়ে ওঠে।

মাষ্টারদার জীবন ছিল সহজ সরল, স্বল্পভাষী এবং বিনয়ী। ভগবানের প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষী, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে?... ভুলিও না তুমি—সে বিরাট মহামায়ার চায়ামাত্র,—ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।...ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" লোকমান্য তিলকের বাণী—

"Liberty is the birth right of everybody. The privilege of being free is not required to be granted by somebody else. Make up your mind, ready for any sacrifice that may be demanded of you. If you can stick to this grim resolve no power either on this earth or in Heaven can come between you and your object".

ম্যাটসিনীর বাণী "Ideas ripen quickly when nourished by the blood of martyrs. Actions are the book of masses"

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের বাণী "আমার ঘর নাই, পুত্র কলত্র কেহই নাই। আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। অবশেষে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া মনে করিয়াছিলাম, ঐ নর্মদাতীরে আশ্রম নির্মাণ করিয়া ধ্যান ধারণায় জীবন অতিবাহিত করিব। কিন্তু প্রাণে প্রাণে একি কথা অনুভব করিলাম। কতবার চেষ্টা করিলাম কথাটি ভুলিয়া যাইতে! কিন্তু যতই ভুলিতে চাই ততই কথাটি প্রাণে প্রাণে ধ্বনিয়া উঠিতে লাগিল। কথাটি কি? ভারত আবার স্বাধীন হইবে। এখন নির্জ্জন ধ্যান ধারণার সময় নয়। আবার সংসারের রণক্ষেত্রে যাইতে হইবে। নির্জ্জন হইতে সজ্জনে ফিরিয়া আসিলাম; আসিয়া দেখিলাম, আমারই মত ভবঘুরে আরও দুই চারিজন লোক ঐ মুক্তির বাণী শুনিয়াছে। বড় বিস্ময়ের কথা, এত বড় বড় লোক থাকিতে আমার ন্যায় ধনজনবিহীনেরা কেন এই খেয়ালে মজিল, জানিনা, ভগবানের কি উদ্দেশ্য।.....মন আমার উধাও হইয়া যেতেছে। আর গোলাম থাকিতে চাহিনা। এই স্বরাজ গড়ে তুলতে স্বরাজতন্ত্রের প্রশ্ন হইতে প্রাণ সবাই আনচান"। এই সমস্ত বাণী আপনমনে অনেক সময় আবৃত্তি করতেন। এই সমস্ত বাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করত। এবং মন্ত্রের মত দেশ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। প্রায়ই আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লব কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত হলে দেশ স্বাধীন করা যাবে, সে সম্পর্কে গভীর আলোচনা হত। বিভিন্ন দেশ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে বিশেষ করে আয়ারল্যাণ্ড, ইটালী, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, বলশেভিক আন্দোলনের বিষয় পর্যালোচনা করা হতো। এসব দৃষ্টান্ত হতে আমাদের দেশমাতাকে স্বাধীন করবার জন্য তাদের কার্য্যাবলী হতে যাহা আমাদের পক্ষে গ্রহণীয় তাহা গ্রহণ করতে বলতেন। যথা অত্যাচারী ইংরেজ শাসককে নিধন করা,

গরিলাযুদ্ধ, ভারতে অবস্থিত ভারতীয় সেনাদের বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করা ইত্যাদি কর্মপন্থার কথা আলোচনা করা হত। আত্মবলিদানের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দিতেন।

শ্রীঅরবিন্দের "spirit and form of Indian polity"—এর ওপর ভিত্তি করে নূতন ভারত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন অর্থাৎ—Indirect voting, Decentralisation of power এবং গ্রামের পুনর্গঠন ইত্যাদির সাহায্যে নূতন ভারত গড়ে তোলা।

গান্ধীজীর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। গান্ধীজীর সততা ও নিষ্ঠার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। কিন্তু অহিংসায় কোন দেশ স্বাধীন হওয়ার নজীর নেই বলে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি।

১৯২৪ ইংরাজীতে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে অনেক বিপ্লবী ধৃত হন। তাছাড়া ১৯২৬ সালে উত্তরপ্রদেশ কাকোরী (kakori) ষড়যন্ত্র ও দক্ষিণেশ্বর বোম কেসে (case) এ আরো বিপ্লবী কর্মী ধৃত হন। এই-ভাবে বিপ্লবীগণ ধৃত হওয়াতে বিপ্লবী-দের বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে পড়ে। তখন যেসব বিপ্লবী কর্মী পলাতক অবস্থায় ছিলেন, তাহারা নিরাশ না হয়ে কি ভাবে আবার আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সেই চেষ্টাই করতে থাকেন।

১৯২৬ ইংরাজীর শেষের দিকে সেইজন্য নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের এক গোপনসভা এলাহাবাদে হয়। এবং সেই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। সেখানে শহীদ ভাগৎ সিং তার ভাষণে বলেন, 'আমাদের অনেক কর্মী ধৃত হওয়াতে বিরাট আকারে বিপ্লব করা এখন সম্ভব নয়।" সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ও স্বার্থপর হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে, পাঞ্জাবের জালিওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর পাঞ্জাবীরা সাহেবদের তুষ্ট করবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট। এমন কি অপরিচিত ইংরেজ দেখলে তাদের আপ্যায়িত করবার জন্য নত হয়ে অভিবাদন করছে।

দেশকে এই নৈতিক, মানসিক দৈন্য ও পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার করবার জন্য আমাদের বলি প্রয়োজন। আত্মিক বলে বলীয়ান হয়ে অত্যাচারী ইংরেজ শাসক ও বিশ্বাসঘাতক দেশ-দ্রোহীদের নিধন করতে হবে। আমাদের আত্মবিসর্জনের ভিতর দিয়া নূতন ভারত গড়িয়া উঠিবে।'

উপরোক্ত প্রস্তাব উক্ত সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এবং সেই অনুযায়ী আমি কানপুরের রেলওয়ের চাকরী ছেড়ে কুমিল্লা অভয়াশ্রমে দেশ-সেবার জন্য যোগদান করি।

তারপরে সেখানে পলাতক দেশ-কর্মীদের বাসের জন্য একটি গৃহ-নির্মাণ আরম্ভ করা হয়। সেখানের 'তৃপ্তি হোটেলে বোমা, রিভলবার, cypher list ও victim list সহ বিপ্লবী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রী তেজেশ ঘোষ ধৃত হন। cypher decypher করে সমগ্র উত্তর ভারতে ৮০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং এই ষড়যন্ত্র মামলায় আমার ৭ বছর কারাদণ্ড হয়।

এর পরবর্তী ঘটনা হলো পাঞ্জাবের দেশবরেণ্য নেতা লাজপত রায়ের হত্যাকারী (এস, পি) মিঃ স্যাণ্ডারসনকে নিধন ও ভগৎ সিং ও বটুকিশোর দত্ত কর্তৃক পার্লামেন্টে বোমা নিক্ষেপ এবং বিপ্লবী পুস্তিকা বিতরণ প্রভৃতি চমকপ্রদ বৈপ্লবিক ঘটনাবলী ঘটে যাহা "লাহোর ষড়যন্ত্র" নামে পরিচিত। লাহোর জেলে শহীদ যতীন্দ্র দাস অত্যাচারের বিরুদ্ধে অনশনে প্রাণত্যাগ করেন।

যে সময় এলাহাবাদ শহরের কোম্পানীবাগ পার্কে দ্বিপ্রহরে বিপ্লবী শহীদ চন্দ্রশেখর বীরের মত সম্মুখ সমরে প্রাণদান করেন। সেই পার্ক বর্তমানে 'চন্দ্রশেখর-আজাদ-হিন্দ পার্ক নামে অভিহিত।

তার পরবর্তী অধ্যায়ে বিপ্লবীরা যখন জেল হতে মুক্ত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখনই আবার নূতনভাবে বিপ্লবী সংগঠন দানা বেঁধে উঠলো।

১৯২৯ ইংরাজীতে মেছুয়াবাজার বোম case-এ এবং ১৯৩০-এ ইংরাজীর এপ্রিলে চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়। এছাড়া অনেক দেশদ্রোহী ও অত্যাচারী ইংরেজকে হত্যা ও নানা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে।

মাষ্টারদা সূর্য্য সেন চট্টগ্রাম অস্ত্রা-গার লুণ্ঠনের সর্বাধিনায়ক ছিলেন। শ্রীঅরবিন্দ গীতায় ক্ষত্রিয়ের যে আদর্শের বর্ণনা করেছেন এবং 'ভবাণী মন্দির' প্রতিষ্ঠা করে যে দেশসেবক গড়ে তুলবার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, ঠিক সেইভাবেই মাষ্টারদা স্বাধীনতা আন্দো-লন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এবং তার শেষ পরিণতি হল চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব।

এখন আসা যাক শহীদ নির্মল সেন প্রসঙ্গে। ধলঘাটে captain ক্যামো-রিণকে সম্মুখ সমরে হত্যা করা হয়। এই সময়ে নির্মল সেন শহীদ হয়ে-ছিলেন, তিনি নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ, নীরব দেশকর্মী ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় রেঙ্গুনে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে ওঠে। সেইজন্য তাঁকে অনেক অত্যাচার ও ত্যাগ বরণ করতে হয়।

১৯৩২ ইংরাজীতে হাইলাকান্দির ও সনৎ দত্তের ও শ্রীহট্টের তরুণ সংঘের নেতৃত্বে অনেক বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে। শহীদ অমিত ভট্টাচার্য্যের ফাঁসি হয়। সনৎ দত্ত পদব্রজে মণিপুর হয়ে রেঙ্গুনে গিয়ে false visa করে সাংহাই যান। সেখানে বিপ্লবী নেতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও জাপানে বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর সাথে পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করেন। পরে দেশে

নানারূপ অস্ত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ও উমাশঙ্কর পাটুয়া হাজারীবাগ জেলে গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এবং আমাকে জেল হইতে বাহির করার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু পুলিশের সতর্কতার জন্য তাহা ব্যর্থ হয়।

আমার মনে পড়ে, চট্টগ্রামে আমি যখন ডাক্তারী পড়ি তখন ৺নির্মলদা আমাকে নয়া পাড়ায় ৺তারানাথ সাধুর আশ্রমে নিয়ে যান এবং সাধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। কয়েকদিন ধর্ম সম্বন্ধে অনেক উপদেশ তাঁর নিকট হইতে শুনি।

১৯৩৪ ইংরাজীতে যখন হাজারীবাগে জেলে ছিলাম, তখন খবর আসল মাষ্টারদা সূর্য্য সেনের ফাঁসি হয়েছে। তাহাতে জেলে দেশকর্মীদের মধ্যে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। মাষ্টারদার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করার জন্য আমি জেলে শোকসভার আয়োজন করি। বিপ্লবীরা কোন সভা ডাকলে তখন গান্ধীপন্থীরা বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেরণা পাবে এই ভয়ে বিপ্লবীদের সভায় যোগদান করতে দ্বিধাবোধ করতেন। কিন্তু সেদিন জেলে এর বিপরীত দৃশ্য দেখলাম। আমার আবেদন পত্রে সাড়া দিয়ে সর্বভারতীয় নেতা ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য্য কৃপালনী, আবদুল গফুর খাঁ প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতারা যোগদান করেন।

এই সভায় সভাপতির ভাষণে সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খাঁ বলেন "বঙ্গাল কা নওজোয়ান আদমি দেশকোয়াস্তে কোরবাণী ভারতকো শিখলায়া।"

আজ এই প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে বিপ্লবী জীবনের অনেক কথাই মনে পড়ছে। আমাদের অনেক সহকর্মী আর ইহধামে নাই। কেহ ফাঁসিকাষ্ঠে, কেহ রোগে শোকে, অচিকিৎসায় ও কুচিকিৎসা এবং অনাহারে মৃত্যুবরণ করেছেন। কেহবা সন্ন্যাস নিয়েছেন। দেশ স্বাধীন হবার পরও আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেস সরকার দেশসেবার কোন সুযোগ আমাদের বিপ্লবীকর্মী ও I. N. A. দের দেন নাই। বরং ইংরাজ-ভক্ত ও তথাকথিত ধনী ও সুবিধাবাদীদের নিয়ে কংগ্রেস সরকার দেশ শাসন ও পরিচালনা করছেন। যাহার পরিণতি হল দেশের চরম দুর্দ্দশা—দেশের নৈতিক ও আর্থিক অবনতি। এই সমস্ত দেশকর্মী হইতে আমরা এই শিক্ষাই পাই, মহৎ আদর্শের জন্য বিশেষ করে স্বাধীনতা লাভ ও মনুষ্যত্ব লাভের জন্য সর্বস্ব পণ করিতে হয়; প্রয়োজন হইলে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে হয়। আদর্শহীন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। তাদের আদর্শও স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

উপসংহারে শুধু এই কথা বলতে চাই, যাদের রক্তদানে লব্ধ স্বাধীনতা অযোগ্য নেতৃত্বে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে চলেছে, তাঁদের অন্যতম বিপ্লবী নেতা বীর মাষ্টার ৺সূর্য্যসেনের পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে জনগণের অন্তরাখানের জন্য এই প্রবন্ধ অর্পিত হলো।

•সূর্যসেন স্মৃতিরক্ষা কমিটির সৌজন্যে প্রাপ্ত।

ছাত্র বঙ্কিম চন্দ্র

দীপেন রায়

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন, রাত্রি ন'টা। নৈহাটীর কাঁটালপাড়া গ্রামের যাদব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি সুরু হল। নিস্তব্ধ পল্লীর স্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ ছুটে এল। ব্যাপার কী?

আনন্দ সংবাদটা সানন্দে প্রকাশ করল বাড়ীর একজন।

একটি ফুটফুটে সুন্দর শিশু দুর্গাসুন্দরীর কোলে এসেছে। সদ্য ফোটা ফুলের মত এমন সুলক্ষণযুক্ত শিশু বড় একটা দেখা যায় না।

সুসংবাদটা পেয়ে শিশুর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্মস্থল মেদিনীপুর থেকে বাড়ী এলেন। দৈবজ্ঞ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শিশুর লক্ষণাবলী দেখে বললেন, এই শিশু দেশ ও বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে। উত্তরকালে তাদের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু কাঁটাল পাড়ার নয়, বাংলার নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা মন্ত্রের রচয়িতা ও বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ হিসাবে তিনি আমাদের কাছে অমর হয়ে রইলেন।

বয়সের সঙ্গে তাঁর অপূর্ব বুদ্ধি ও মেধার বিকাশ হতে লাগল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে কুল পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে তাঁর হাতে খড়ি হল। রামপ্রাণ সরকারের পাঠশালায় শিশু বঙ্কিম ভর্ত্তি হয়। গুরুমশাই বঙ্কিমকে পেয়ে বর্তে যান। কিন্তু তাঁর মেধা শক্তির পরিচয় পেয়ে তা'র উৎসাহে ভাটা পড়ে। বর্ণমালা পরিচয় বঙ্কিম একদিনেই পড়ে শেষকরে ফেললেন। অন্যান্য শিশুরা একমাসের আগে শেষ করতে পারে না। রামপ্রাণ সরকারের বিদ্যার দৌড় বেশী নয়। কাজেই তা'র আশংকা বঙ্কিম এমন তাড়াতাড়ি করে বই শেষ করে ফেললে তা'র পাঠশালায় বেশী-

দিন ধরে রাখা যাবে না। কিছুদিন পর গুরুমশাইর আশংকা সত্যে পরিণত হল। "শিশুবোধ'ও বঙ্কিম অল্প কয়েকদিনের মধ্যে আয়ত্ব করে ফেললেন। অপূর্ব মেধা শক্তির পরিচয় পেয়ে গুরু মশাইর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। একদিন দুঃখের নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবা বঙ্কিম এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে আর কতদিন তোমায় পড়াইব।"

আট ন'মাসের মধ্যেই বঙ্কিমের কাঁটাল পাড়ার পর্ব শেষ হয়ে গেল।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরের ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। এখানেও শিক্ষক ও সহপাঠী-গণ তা'র পড়ার নিষ্ঠা ও মেধার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যান। মাষ্টার মশাইদের বক্তৃতা একবার শুনেই তাঁর প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়। এক ধরণের অঙ্ক দুবার তাকে কষতে হত না। শিক্ষকগণ তা'র প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যান। বলেন, "এ রকম প্রতিভাবান ছাত্র আর কখনও দেখিনি।"

বঙ্কিম শুধু স্কুলের পড়া বই এর মধ্যে নিবদ্ধ থাকতেন না। বাইরের বই পড়ার ঝোঁক তাঁর প্রবল। তথ্যপূর্ণ বই পড়তে তিনি খুব ভালবাসতেন। তাই জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর দিতে কখনও তিনি বিব্রত বোধ করতেন না। তা'ছাড়া ক্লাশের রোজকার পড়াও তিনি তৈরি করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তবে তিনি পড়ার কোন ধরা বাঁধা নিয়ম মানতেন না। তিনি সুবোধ বালক বলতে যা' বুঝায় ঠিক তাই ছিলেন কিন্তু খুব সুস্থির ছিলেন না। বেশীক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে পারতেন না। মাষ্টারগণ বলতেন, "এ চঞ্চলতা চপলতা নয়, প্রতিভার চাঞ্চল্য।"

লিখতে লিখতে তিনি উঠে পড়তেন। পায়চারি করতেন। কিন্তু এর-জন্য পড়ায় তা'র এতটুকু অমনোযোগ ঘটেনি। বরাবর প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন তিনি। তিনি বলতেন, "পুস্তক পাঠে যত আনন্দ পাই, তত আনন্দ আর কিছুতেই পাই না।" ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুর থেকে এসে হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৪ খৃঃ জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও মাসিক ৮ টাকা বৃত্তি পান। আবার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলার-শিপ পরীক্ষায় প্রথমস্থান অধিকার করে কুড়ি টাকা বৃত্তিলাভ করেন। হুগলী কলেজ ছেড়ে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গোড়ার দিকে বি, এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্থির করেন আইন পরীক্ষা আপাততঃ স্থগিত রেখে বি, এ, পরীক্ষা দেবেন। কিন্তু হাতে মাত্র কয়েক মাস সময়। পাঁচই এপ্রিল বি, এ, পরীক্ষা। পরীক্ষা ও পরীক্ষকগণ উভয়ই শক্ত। ইংরেজী ও ইতিহাসের পরীক্ষক, গ্র্যাপেল সাহেব, সংস্কৃতের পরীক্ষক তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। যথাসময়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা দিলেন।

কিছুদিন পর পরীক্ষার ফল বার হল। দু'জন মাত্র—দ্বিতীয় বিভাগে স্নাতক হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। এবারও বঙ্কিম প্রথম হলেন। প্রথম প্রবর্ত্তিত এনট্রান্স পরীক্ষায় বঙ্কিম প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমের পরীক্ষার ফলাফল জানতেন। তিনি খুশী হয়ে একদিন বঙ্কিমকে ডেকে পাঠালেন। জিগগেস্ করলেন, "ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ নেবে?"

পিতৃভক্ত বঙ্কিম উত্তর দিলেন। "পিতাকে জিগগেস্ না করে বলতে পারছিনে।

ছোটলাট বললেন, "এর চাইতে বড় চাকুরি আর কি আশা কর?" তখনকার দিনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরি খুবই উঁচু পদের চাকুরি। সরাসরি পাওয়া কঠিন।

তবুও বঙ্কিম বললেন, "যত বড় চাকুরি আমায় দিন না কেন, পিতার অভিপ্রায় না জেনে ও অনুমতি না নিয়ে আমি কোন কাজ গ্রহণ করতে পারব না।

উত্তরটা শুনে হ্যালিডে সাহেব সত্যি অবাক হয়ে যান কিন্তু মনে মনে খুশী হন বঙ্কিমের পিতৃভক্তির পরিচয় পেয়ে। পরে ১৮৫৮ খৃঃ ২৩শে আগষ্ট বঙ্কিমচন্দ্র পিতার অনুমতিক্রমে কাজে যোগদান করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বি, এল পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁর সুদীর্ঘ ছাত্র জীবনে কোথাও ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করেছেন।

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েন কর্তৃক ৮, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ স্থিত প্রেস এণ্ড লিটারেচার (ইণ্ডিয়া) হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

15th June 1974

NISHANA
Phone : 44-1460

Regd. No. RN—24618/73
Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from :

C

Gram : GOLEATHERS

Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

20H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, SILK & HANDICRAFTS

CENTRAL LIBRARY

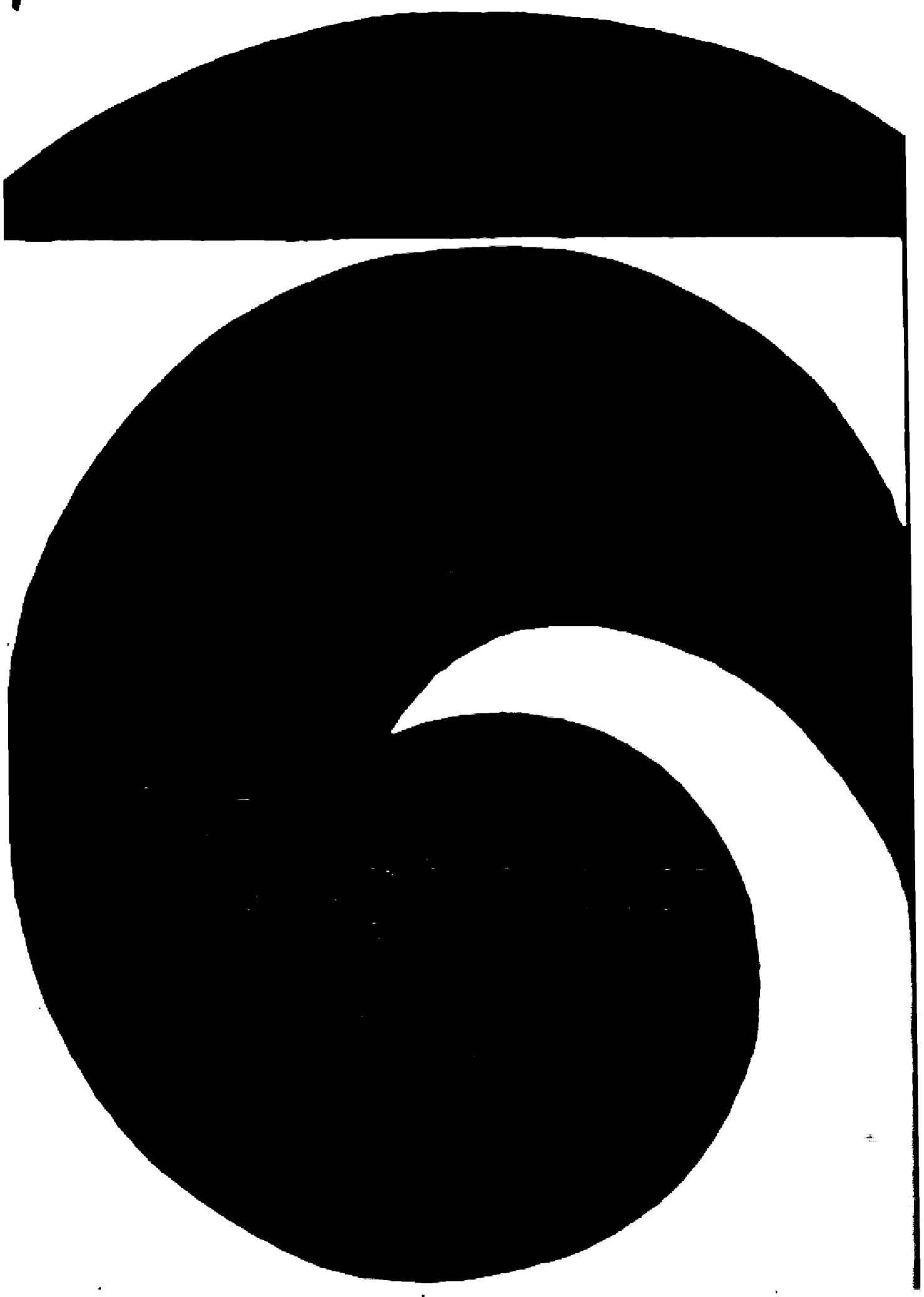

১৫শ (পঞ্চদশ) সংখ্যা ১লা আগষ্ট ১৯৭৪

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

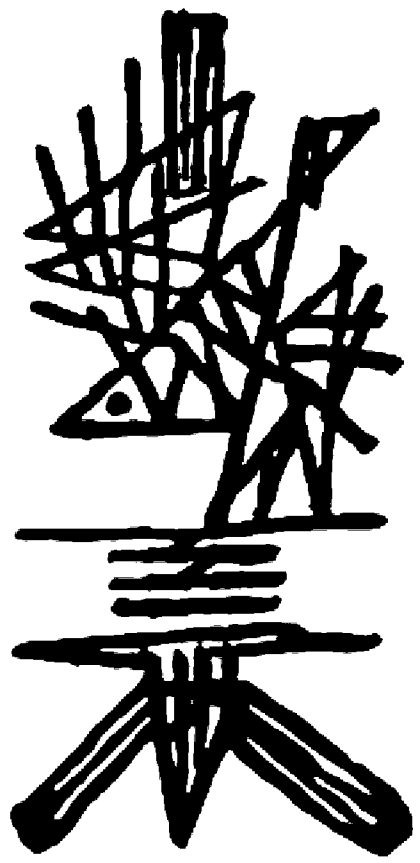

ARTS & PRINTS PVT. LTD.
31 PARK MANSION
CALCUTTA-16

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১। নিকসন বিদায়	...	সম্পাদকীয়	...	৪২৫
২। ৭৮-তম জন্মদিনে	...	শ্রদ্ধাধ্য	...	৪২৭
৩। প্রসঙ্গক্রমে	...	শ্রীচাঁদ	...	৪২৮
৪। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	...	নিকুঞ্জ সেন	...	৪৩০
৫। ভাষার রাজনীতি বন্ধ হউক	...	করুণাময় চক্রবর্ত্তী	...	৪৩১
৬। সমাজশিক্ষায় অবকাশ বিনোদনমূলক কাজ	...	অমল কুমার মিত্র	...	৪৩৪
৭। নানা রঙের দিনগুলি	...	রসময় শূর	...	৪৩৭
৮। স্মরণীয় রাজনৈতিক দলিল	...	শহিদ ভগৎ সিং-এর চিঠি	...	৪২৯
৯। পুস্তক সমালোচনাঃ—'নমামি'	...		...	৪৪০
১০। নরখাদকের মৃত্যু	...	অতুল চক্রবর্ত্তী	...	৪৪২
১১। মহানগরী কলিকাতা	...	অমিত রায়	...	৪৪৬

সম্পাদকমণ্ডলীঃ

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ স্মৃতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী
৮। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

'নবজীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবেনা থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার
রেখে যাবে নব নব,
দুর্গম মাঝে পথ করি দিবে,—
জীবনের ব্রত তব।'

—রবীন্দ্রনাথ।

'নিশানার' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যপদকে প্রতিমাসে দুটি পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ যৌক্তিক ও সময়োচিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হবে। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্ত্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ECONOMIC AFFAIRS

INDIA'S PREMIER ENGLISH ECONOMIC MONTHLY

Now on its 19th year of continuous publication

Editor HIMANSU ROY

Deals with advanced economic theory and topical economic problems. Discussion of India's planned economy is its primary objective. Read throughout the world.

Subscription :

Annual : Inland Rs. 27·00

Foreign US $ 8·00

For further information

Manager

ECONOMIC AFFAIRS

10, Galiff Street, Block-5,

Suite-64 Calcutta-700003

It is this simple but great principle which enables man to live justly and in decency in free society.....Our judgement is not concerned with an individual but with a system of constitutional Government..... Let us have the constitution as unimpaired for our children as our predecessors left it to us."

(Statesman, Aug 11)

চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি বলেছেন :—একটি সাধারণ নীতি, যার মর্মকথা হল যে, আইনের প্রয়োগে প্রতি মানুষ যাতে ন্যায্য ব্যবহার পেতে পারে সেই নীতি অনুসরণই তাঁর আশ্রয়।

তাঁর দৃষ্টিতে এটাই গণতন্ত্রের প্রাচীনতম নীতি। সামান্য হলেও এই নীতিরই আশ্রয়ে মানুষ স্বাধীন সমাজে ন্যায় সঙ্গত এবং সুশোভন জীবন-যাপনের সুযোগ পায়। উপস্থিত বিচারে সংবিধান-অনুযায়ী ব্যক্তিনিরপেক্ষ শাসন ব্যবস্থাই বিচার্য বিষয়।.....আমরা যেন সংবিধানকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য তেমনই অটুট রাখতে পারি, যেমনটি আমাদের পূর্বগামীরা রেখে গেছেন।"

রোডিনোর এই মহান দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুগভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে সর্বমানবিক আবেদন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, তা শুধু মার্কিণ রাষ্ট্রের গণ্ডীর মধ্যেই প্রযুক্ত এবং সীমাবদ্ধ নয়। গণতন্ত্রে শ্রদ্ধাশীল মানব গোষ্ঠির কাছে-ও এ আবেদন দুর্বার এবং চিরন্তন।

এবং যেখানেই গণতন্ত্রের নামে ফ্যাসিবাদী একনায়কতান্ত্রিক শাসন, নির্বাচনে কারচুপি, অগণতান্ত্রিক ও অসদুপায় অবলম্বিত হচ্ছে নিক্সন্-এর ভাগ্য বিপর্যয় তাঁদের প্রতি অমোঘ সতর্ক বাণীই বটে !

গণতন্ত্রের জগতে ফরাসী এবং মার্কিণ রাষ্ট্র হলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। মার্কিণ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে যদি বলা যায় গণতন্ত্রের সসজ্জ মহড়া, ফরাসী রাষ্ট্র ব্যবস্থা তার পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদের তুলনায় অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নামেই গণতন্ত্র, কিন্তু কাজে নানামাত্রিক সুবিধাবাদের প্রশ্রয়মাত্র। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলিতে পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর "রাবার ষ্টাম্প"—এবং ক্ষমতায় নিযুক্ত পোষাকি লাটমাত্র। এই 'গণতন্ত্রের' আবহে, হাইকোরটে নিন্দিত লাটের পক্ষে-ও উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন পেতে বেগ পেতে হয় না, ক্ষমতাসীন দলের কৃপাদৃষ্টি থাকলেই হল !

এ অবাস্তব ব্যবস্থায় বিচার বিভাগীয় ও শাসক গোষ্ঠির পারস্পরিক স্বাধীনতা-ও কৃত্রিম। বিচার পছন্দ না হলেই বিচারপতি বদলের রীতি দেখা যায়।...এক কথায় এ ধারায় গণতন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রের ক্রীড়নক মাত্রেরই নামান্তর হতে হয়।

যাঁরা মরার 'পরে খাড়া চালাতে সিদ্ধহস্ত তাঁদের কাছে নিক্সন্—পতন তথা যথার্থ গণতন্ত্রের শক্তি বা শিক্ষা বৃথা। যাঁরা প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী—তাঁরা স্বদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কল্যাণ-সাধনায় কষ্ট বরণের দীক্ষা নেবেন, আমেরিকার সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক শিক্ষা হতে। ফরাসীয় গণতন্ত্রের "প্রোপোরশনেল প্রতিনিধি নির্বাচন এবং গণভোট বা প্লেবিসিট্ (Plebescite) প্রথার মর্মোদ্ঘাটন করতে না পারলে পূর্ণাবয়ব গণতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধি অবান্তর। বৃটেনের অনুকরণে স্ববিরোধী সাংবিধানিক রাজতন্ত্রকে গণতন্ত্রের আসনে বসাতে গেলে, এরও ক্রমের মর্যাদা লাভের ভান করতে পারে ; কিন্তু যথার্থ গণতন্ত্র নাগালের বাইরে-ই থেকে যাবে—'যথা পূর্বম্ তথা পরম্।'

এ'তো গেল মেকি বা আধা গণতন্ত্রের কথা। দুর্দণ্ড-প্রতাপ ডিক্টেটরতন্ত্র শাসিত রাষ্ট্রে কি আদৌ কল্পনাও করা যায় যে ন্যায় বিচারের দাবী বা গণদাবীর কাছে কোন ডিক্টেটর স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ক্ষমতার আসন শূন্য করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করবেন ? ডিক্টেটরতন্ত্র বিপন্ন হলে বরং "সাংস্কৃতিক—বিপ্লব" বা "রক্তাক্ত জোলাপ" (Blood purging)-এর প্রাবল্য ডেকে নিগৃহীত মানবাত্মার শ্বাসরোধ করে নারকীয় আবাহনেরই রীতি প্রচলিত। "জোর যার মুলুক তার" নীতি সে স্থলে শ্রেষ্ঠ নীতি। বিশ্ব কম্যুনিজম্-এর ধ্বজাধারী রুশ-চীন আজ পরস্পর বিবাদমান দুটো রাষ্ট্রের চরম অভিব্যক্তি। এবং একটা বিশ্বযুদ্ধের সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কম্যুনিজম এর নামে "সোশ্যাল—ইমপিরিয়েলিজম" এবং লাল কলোনিয়েলিজম মানবতা-সুলভ সোশ্যালিজমের ভিত্তিভূমিকে কলঙ্কিত করছে। এখন আর কম্যুনিজম্ বা সোশ্যালিজম প্রবর্তনার উদ্দেশ্যে "অস্থায়ী ডিক্টেটরশিপ" নয়, চিরস্থায়ী ডিক্টেটরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যই কম্যুমিজম্-এর বুলি।

সোবিয়েট রাশিয়ার লৌহবেষ্টনী ভেদ করে নিপীড়িত মানবাত্মার যে আর্তি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক পরিত্রাণের পথ খুঁজে মরছে, "ডক্টর জিভাগো," "ফার্ষ্ট সার্কল" এবং সর্বোপরি "গুলাগ আর্কিপেলেগো" তারই জলন্ত বহিঃ প্রকাশ।

নিক্সন্-এর অপসারণ-যজ্ঞে প্রতিভাত গণতন্ত্রের অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে ডিক্টেটর—অধ্যুষিত রাষ্ট্র সমূহের মানুষ-ও আপন নিরাশার নিরন্ধ্র পুরীতে একটা ক্ষীণ আশার আলো-ও দেখতে পেল কি ?

৭৮-তম জন্মদিনে

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও খ্যাতনামা সাংবাদিক শ্রীসত্যরঞ্জন বকসীর জন্মদিবস ১৬ই জুলাই। এই উপলক্ষে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে তাঁরই সতীর্থ শ্রীশান্তিময় গাঙ্গুলীর বাড়ীতে গত ২১শে জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত বকসীর জন্মদিবস উদ্‌যাপন করেন সতীর্থ সংহতির সভ্যবৃন্দ। ভাবগম্ভীর এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐ দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়।

সর্ব্বপ্রথমে সতীর্থ সংহতির পক্ষে শ্রীকামাখ্যা রায় একান্ত ঘরোয়াভাবে এই দিনটি পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুনীল দাস তাঁহাদের ভাষণে শ্রীযুক্ত বকসীর বিপ্লবী জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর উল্লেখ করেন। একদিকে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও অপরদিকে তাঁর বিরাট সংগঠনী প্রতিভা সে দিনের বৃটিশ সরকারকে কত ভীত ও বিহ্বল করেছিল তার পরিচয় আছে সে যুগের ইংরেজদের পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে। মনে আছে Statesman পত্রিকা একদিন সাংবাদিকতার সমগ্র রীতিনীতি, শিষ্টাচার বিসর্জন দিয়ে শ্রীযুক্ত বকসীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলেছিল, Lest we forget Sri Satyaranjan Baksi of.....

নেতাজীর সারাজীবনের সংগ্রামী সাথী শ্রীসত্যরঞ্জন বকসী বিভিন্ন জেলে, বন্দীশিবিরে ও সামরিক দুর্গে তাঁর জীবনের বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। দারিদ্র্য ও অসুস্বাস্থ্য তাঁর ছিল চিরস্থায়ী, সরকারের নির্য্যাতন তাঁর জন্মতিলক। আজ ৭৮ বৎসর বয়সেও তিনি এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন—অপেক্ষা করে আছেন অনাগত সেই প্রভাতের জন্য যে প্রভাতে এই স্বাধীনতা পরিপূর্ণ জ্যোতিতে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

ভাষণের উত্তরে শ্রীযুক্ত বকসী বলেন, যে দেশে ক্ষুদিরাম-কানাইলালের মত শহিদ, যতীন্দ্রনাথ-মনোরঞ্জনের মত যোদ্ধা, বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বীর, প্রদ্যোৎ-অনাথ- মৃগেনের মত মৃত্যুঞ্জয়ী সৈনিক জন্মগ্রহণ করেছেন সে দেশে জন্মগ্রহণ করে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। তিনি আজীবন আশাবাদী, তাই দেশব্যাপী এই অন্ধকারের মধ্যেও তিনি আলোকের রেখা দেখতে পাচ্ছেন। সমবেত বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন তাদের আবার এগিয়ে আসতে হবে দেশকে সুগঠিত করবার কাজে। শুধু আলোচনা নয়, শুধু সমালোচনা নয়, আত্ম-জিজ্ঞাসার দিন আজ সমাগত। দেশের এই অধোগতির জন্য কারা কতখানি দায়ী এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে—দিতে হবে আজই, এখনই। অন্তহীন তাঁর আশা। সে আশা ত অপূর্ণ থাকতে পারেনা। স্বাধীন ভারতের ভূমির উপর দাঁড়িয়ে ভূমার স্পর্শলাভ, হউক তা ক্ষণিকের তবু তার মূল্য অপরিসীম্। এ শুধু কবির কল্পনা নয়—বাস্তব সত্য। এই সত্যের জন্যই তাঁর ব্যাকুল প্রতীক্ষা।

এরপরে সভার সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে গভীর রাত্রে সভার কাজ শেষ হয়। এই উপলক্ষে সতীর্থ সংহতির তরফ থেকে সম্পাদক শ্রীসুবোধ রায় শ্রীযুক্ত বকসীর হাতে পাঁচ হাজার টাকার একটি তোড়া উপহার দেন।

এই সঙ্গে শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নিশানা তাঁর শতায়ু কামনা করছে।

প্রসঙ্গক্রমে

শ্রীচাঁদ

সেখ আবদুল্লার সমর্থনে সি পি আই এম সোচ্চার। সি পি আই তো রয়েছেই। অন্য সব কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠীও। কারণ এ তো মার্কস-লেনিনের কথা, বুর্জোয়া দেশ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে (তথা টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে) নেশনের ভিত্তিতে। ওগুলোই আবার এক ও অভিন্ন হয়ে যাবে সোসালিষ্ট দেশে! সোভিয়েত দেশের ইহুদীরা কেন মাতৃভূমি ছেড়ে পালাচ্ছে? [সে কথা থাক] সেখ সাহেবের স্বাধীন কাশ্মীরের আব্দারে ক্রেমলিনের আপত্তি থাকতে পারে না। অতএব দেবীরই বা আপত্তি হবে কেন? তদুপরি ভি এম কে রয়েছে। জাতীয় দাবির রঙ চাপিয়ে সেখ সাহেবের দাবি পরিশুদ্ধ করে নেওয়া চলবে। সংখ্যালঘুদের ভোট সম্পর্কেও নিশ্চিত থাকতে পারবেন দেবী।

দেবী জনগণের তোয়াক্কা রাখেন না। কিন্তু বুদ্ধিমান সেখ সাহেব তোয়াক্কা করেন। তাই গতি তার ধীর। জনগণ, সতর্ক!

• • •

আই-এন-এস হুগলীর নতুন নামকরণ হয়েছে "নেতাজী সুভাষ"। এ অনুষ্ঠানে দেবী এক প্রেরিত বাণীতে বলেন, "নেতাজীর সাহস ও এ্যাডভেনচারের স্পৃহা ভবিষ্যত বংশধরদের প্রেরণা হয়ে থাকবে।"

নেহরু দুহিতার কাছে নেতাজী এ্যাডভেনচারিষ্টই বটে!

• • •

পুরো চার বছর খেটে, বারো লক্ষ টাকায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে, পাঁচশত পাতায় খোসলা সাহেব নেতাজীর অন্তর্ধান সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা শাহ নাওয়াজ খাঁ কমিটির প্রতিধ্বনি মাত্র। ভালোমন্দ বলছি না। ভাবছি, কী সর্বনাশই করে গেলেন তিনি প্রাক্তন বিচারপতিদের। তদন্ত কমিটির প্রধান হোয়ে দুপয়সা করে খেতেন এঁরা। এখন দেখা যাচ্ছে, ধানে আর তুঁষে ফাড়াক নেই কিছু!

কী মহান, কী গণতান্ত্রিক, কী পরম নেতাজী বন্ধুই না ছিলেন জওহরলাল নেহরু! খোসলা সাহেব প্রশ্ন প্রশ্ন প্রশস্তি গেয়ে গেছেন নেহরুর জন্য। ধান বানতে এ শিবের গীত কেন? কার সন্তোষ বিধানের জন্য? অনেক কটা রাজ্যপালের পদ খালি হোতে যাচ্ছে!

• • •

প্রেসিডেন্ট নিক্সন পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার ও সত্যানুশাসনে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

কমুনিষ্ট দেশে এমনটি হবার জো নেই। কারণ সে-দেশে "সর্বহারাদের ডিক্টেটরই স্বয়ং আইন।"

জনগণতন্ত্র কিনা!

• • •

দেবীকে বিদ্রোহাতঙ্কে পেয়েছে। চিলির বিদ্রোহ শ্রবণে একদফা চীৎকার শেষ হোতে না হোতেই সাইপ্রাসে বিদ্রোহ। আবার চীৎকার! চীৎকারের একটা বিশেষ সুর আছে। বিদেশী শক্তির সহযোগিতায় প্রতিক্রিয়াশীলদের নিয়মতান্ত্রিক সরকারের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে তাঁর চীৎকার-প্রতিবাদ। চিকিৎসকগণের পক্ষে এ রোগের নিরাময় খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়।

জনসঙ্ঘ, আর এস এস ও শিব সেনা তার সাক্ষাৎ বিদ্রোহাতঙ্কের কারণ। এর সঙ্গে প্রকাশমান জয়প্রকাশ মিলিত হওয়াতে আতঙ্ক তীব্রতর হয়েছে। জয়প্রকাশ দাবি করেন, তিনি কোন দলভুক্ত নন, জনগণ তার দল। কায়েমী স্বার্থে আঘাত! ফলে, দেবী নারী লজ্জা বিবর্জিতা হোয়ে ক্রমাগত হাত-পা ও কথা ছুঁড়তে সুরু করেছেন। বলছেন, আমরা চোর জোচ্চর! আমি তার প্রধান! থাক থাক, জানা গেছে! পৃথিবীতে এমন কোনও দল নেই যে দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। তুলনায় আমরা ঢের ঢের সৎ!

দেবীকে থামান মুস্কিল।

আবার: বলি, বোম্বের "সেই" ব্যবসায়ীর টাকায় চলছে না জয়প্রকাশের আন্দোলন? লোকটি আসেনি আমার কাছে তার বিরুদ্ধে তদন্ত উঠিয়ে নেবার জন্য? বলিনি আমি, ও হবেনা? কি বলে গেছে সে? সমুচিত শাস্তি দেবে আমাকে! ভয় করি? আদৌ নয়। জনগণ আমার সঙ্গে!

দেবী, শান্ত হন! আপনি তবে তদন্ত উঠিয়ে নেবার জন্য উপস্থিত দর্শনপ্রার্থীকেও দর্শন দান করেন!

• • •

দেবীর চাইদের প্রশ্ন: জয়প্রকাশের আন্দোলন মজুতদার, কালোবাজারী-মুখী না হোয়ে কংগ্রেসমুখী কেন।

দেবী, এ দ্বারা কি এই স্বীকৃত হচ্ছেনা যে, মজুতদার ও কালোবাজারী আপনারই সৃষ্টি? আপনার সৃষ্টি রক্ষার্থে আপনি এদের ধারণ করে আছেন? অতএব যুক্তিযুক্ত ভাবেই জয়প্রকাশ তথা জনগণের লক্ষ্য স্রষ্টার ধ্বংস সাধন?

• • •

দেবী জ্ঞান দিচ্ছেন, ভারত অহিংসা ও শান্তির পথে স্বাধীনতা লাভ করেছে। চল্লিশ সালে বাংলা দেশে চল্লিশ লক্ষ লোক অনাহারে মরেছে তবু হিংসার আশ্রয় নেয়নি।

দেবী, দয়া করে আপনার ইতিহাস বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দেবেন না। বাংলার লক্ষ লক্ষ লোক

আপনার হাতে না খেতে পেয়ে মরবে তবু হিংসার আশ্রয় নেবে না, এ রসিকতায় আপনি অপার আনন্দ উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু বাংলা বিপরীত অবস্থার জন্যই আপনাকে প্রস্তুত থাকতে বলছে। মরার জন্য বাংলা জন্মায়নি।

• • •

দেবী প্রশ্ন তুলেছেন : চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র যখন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় তখন তো পৃথিবীর কোন কোণ থেকেই প্রতিবাদ ওঠে না। ভারতের বেলায় এ ব্যতিক্রম কেন ?

দেবী, এ তালিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম উল্লেখ করলেন না কেন ? সরমে ?

• • •

দেবী বলেন, আমি ডিক্টেটর নই। ঠিক। আপনার তর্জনী উত্থানের সঙ্গে যদি কারও উত্থান ঘটে, তর্জনী নিম্নমুখী হবার সঙ্গে পতন—তাতে আপনার কি করার আছে ?

দেবী, কেন এমনটি ঘটে ?

অনুমতি করুন। বলি।

১৯৬৯। কংগ্রেসের ফরিদাবাদ ও তারপর ব্যাঙ্গালোর অধিবেশনের কথা স্মরণ করুন। স্মরণ করুন মোরারজী দেশাইকে বিতাড়ন। রাষ্ট্রপতি পদের জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সঞ্জীব রেড্ডির মনোনয়ন। আপনার "বিবেকপ্রসূত ভোট" রাজনীতির খেলা। আরও স্মরণ করুন, কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির নির্দেশ সরাসরি অমান্য। দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গের অপরূপ ইতিহাস সৃষ্টি। তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতির আপোসের চেষ্টায় আপনার বক্তব্য জানার জন্য পত্র প্রেরণ। আপনার নীরবতা। পার্টি থেকে আপনার বহিষ্কার। তার পর "ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতি" গ্রহণ। আপনি তখন প্রধান মন্ত্রী। সরকারী যন্ত্র আপনার হাতের আঙুল মাত্র। কংগ্রেসকে আনুষ্ঠানিকভাবে দুভাগে খণ্ডিত করণ। আপনি হলেন নব কংগ্রেসের এক ও অদ্বিতীয়ম ! ডিক্টেটর !

• • •

দেবী, আপনি কি গণতান্ত্রিক ?

অনুমতি করুন। বলি।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্থার দুটো স্তম্ভ : বিচার বিভাগ ও সংসদ। "গরীবী হটাও" ও সমাজতন্ত্রের উত্তেজক বাণী প্রচারের আবরণে আপনি বিচার বিভাগকে আপনার দাসানুদাস করে নিয়েছেন এবং সংসদকে উপেক্ষা করে অডিনান্স জারীর সাহায্যে দেশ শাসনের অপূর্ব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সংখ্যালঘু দলের প্রধানমন্ত্রী রূপে আপনি যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন এ তার অন্যতম প্রতিক্রিয়া হোলেও গণতন্ত্র-বিরোধী। অন্তত জনগণ তাই মনে করেন। আপনার অপর কৌশল, যে রাজ্য আপনার হাতছাড়া হবার আশঙ্কা সে রাজ্যে "রাষ্ট্রপতির শাসন" প্রয়োগ করে তাকে সরাসরি আপনার শাসনে নিয়ে আসা। ইহা গণতান্ত্রিক পথ নয়। জনগণ ইহাও লক্ষ্য করছেন।

চোগিয়ালকে আপনি উপদেশ দিয়েছেন, "জনগণের সামিল হবার চেষ্টা করুন, তাঁদের আশা আকাঙ্খা সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল হন এবং আইনবিহিত ও সম্মানজনকভাবে সিকিমের গণতান্ত্রিক ধারার অংশীদার হন।"

সুন্দর উক্তি। দেবী, অতীতে গণতন্ত্রবিরোধী কাজকর্ম করে আপনি জাতির ও বিশ্বের গণতন্ত্রের ইতিহাসকে যে কলুষিত করেছেন তা ভুলে গিয়ে যতদিন প্রধান মন্ত্রী রয়েছেন এ বাণী নিজের জীবনে পালন করুন। জনগণকে বুঝতে দিন, মস্কো নয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, মানবতায় উদ্বুদ্ধ জনগণই ভারতের সম্পদ ও শাসক।

• • •

"দশ দফা" (এগারো দফা নয় কারণ দেবীর শিলান্যাস করে বেড়াবার দফা এতেধরা হয়নি) নিয়ে দেবী অবতীর্ণ হয়েছেন মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে। কালোবাজারীর দল খুব খুশি। এবার আর তাদের ঘরের আনাচে কানাচে সোনাদানা ও টাকা গুজে রাখতে হবে না। তারা মিছিল করে ঢক্কা বাজিয়ে কালো টাকা তুলে দিয়ে আসবে সরকারের ঘরে। ফোকটে সুদ মিলবে ১১ শতাংশ ! জিনিস-পত্রের দাম সহসা কমলে আসবে মন্দা। সামলাবার দায় সরকারের। অতএব আবার টাঁকশাল থেকে জলের মত প্রবাহিত হবে টাকা। আবার এক টাকায় চার টাকা মুনাফা। আবার মিছিল করে ঢক্কা বাজিয়ে কালো টাকার কিছুটা নিয়ে আসবে সরকারের ঘরে। সুদে আসলে জমবে। কোটি কোটি টাকার কত মাল যাবে ভোটলগ্নির কাজে !

• • •

সংবাদে প্রকাশ দেবীর দেহের নিরাপত্তার জন্য জনগণকে এ বছরের প্রথম ছ-মাসে দু'লক্ষ আটার হাজার সত্তর টাকা প্রণামী বাবদ দিতে হয়েছে। তাঁর পার্ষদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর জন্য প্রণামী গুনতে হোয়েছে যথাক্রমে উনআশী হাজার পাঁচশত আঠারো এবং পয়ষট্টি হাজার পাঁচশত বারো।

দেবী, জানেন কি এ টাকা জিনিস-পত্রের দাম বাড়িয়ে চলবে ? আপনার জানার কথা নয় তবু বলি, একজন সাধারণ ভারতীয়ের আয় বছরে মাত্র তিনশত উনিশ টাকা তিরিশ পয়সা।

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিকুঞ্জ সেন

এদের মধ্যে বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু চরণ বিশ্বাস ও শ্রীদিগম্বর বিশ্বাসের নাম সবিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে এরা ছিলেন নীলকুঠিওয়ালাদেরই দেওয়ান। এরা চক্ষে দেখেছেন কি ভীষণ অন্যায় উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হত নীল-চাষীদের উপর। দিনের পর দিন এদের কাণ্ডকারখানা দেখে এরা স্থির করেন যে নীলকরদের পক্ষ পরিত্যাগ করে নীল চাষীদের পক্ষ তারা অবলম্বন করবেন এবং নীলকরদের সর্ব্ববিধ বেপরোয়া নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। সর্ব্ববিধ পরিণামের কথা ভেবেই এরা নির্ভয়ে ও নির্ভাবনায় আসন্ন নীল বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। নীলকরগণ জোর জবরদস্তি করে ধানের জমিতেও চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করতেন। চাষীদের ইচ্ছার কোন মূল্যই ছিলনা নীলকরদের কাছে। তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অর্থ। ঠিক এই সময়ে বারাসতের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক পরোয়ানায় ঘোষণা করেন যে নিজ জমিতে নীল চাষ করা না করা কৃষকের ইচ্ছাধীন। যদি কোন কৃষক তার জমিতে নীল চাষ না করতে চায় তবে তার উপর জোর জবরদস্তি করা চলবে না। এই পরোয়ানার বলে ১৮৫৯ সালে নির্য্যাতিত প্রায় ৫০ লক্ষ চাষী ধর্ম্মঘট সুরু করে দেয়। এই ধর্ম্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়। তা ছাড়া অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ এই বিদ্রোহে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাদের আপ্রাণ চেষ্টায় এই কৃষক বিদ্রোহ বিরাট আকার ধারণ করে। সে-অঞ্চলে এমন গ্রাম ছিলনা যেখানকার কৃষকরা এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেনি। এই বিদ্রোহ কত ব্যাপক কত সঙ্ঘবদ্ধ ও কত দুঃসাহসিক আকার ধারণ করেছিল তা তদানীন্তন বাংলার লেফ্‌ট্যানেন্ট গভর্ণরের এক বিবৃতি থেকে আমরা বিশদভাবে জানতে পারি। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেছেন যে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি নদী পথে ঢাকা থেকে ফিরছেন এমন সময় দেখতে পেলেন হাজার হাজার লোক নদীর তীর ধরে তার ষ্টীমারের পেছন পেছন ছুটছে আর বলছে তিনি যেন তাদেরকে নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। কিন্তু, বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য শুনবার জন্য ষ্টীমার যখন থামল না তখন তারা বাংলার লেফ্‌ট্যানেন্ট গভর্ণরকে তাঁদের দুঃখের কথা সবিস্তারে জানাবার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার গভর্ণরের ষ্টীমার থামল। তিনি ষ্টীমারের বাইরে এসে তাদের দুঃখের কথা শুনলেন। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে গভর্ণর বাহাদুরের মনে কোন সন্দেহ রইল না যে অবিলম্বে এর প্রতিকার করা দরকার।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ঘটনাটি ঘটেছিল ঐ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী। এর কয়েকদিন আগে নীলকরের চরেরা কয়েকজন চাষীদের ধরে নদীয়া জেলার আওয়াজাবাদ কুঠিতে বন্দী করে রাখে। ঘটনার দিন কয়েকশত লোক লেঠীয়ল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ঐ নীলকুঠি আক্রমণ করে এবং ধৃত ব্যক্তিদের মুক্ত করে নিয়ে যায়।

এই সব ঘটনার অব্যবহিত পরেই বসল বহু বিজ্ঞাপিত নীল কমিশন। কিন্তু, এই কমিশন প্রথমে যত আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল, কমিশনের সুপারিশগুলি কিন্তু দেশবাসীকে ততটাই হতাশ করল। কেননা, তাতে আর যাই থাকুক না কেন নীলকরদের নির্য্যাতন বন্ধের কোন বিধিব্যবস্থার সুপারিশ ছিল না। এর ফল হল এই যে নীল কমিশনের সুপারিশ বের হবার পর নীলকরদের অত্যাচার কিছুটা প্রশমিত হলেও তা একেবারে বন্ধ হল না। কিছুদিনের মধ্যেই তা আবার পূর্ব্বের আকার ধারণ করল।

এই বেপরোয়া অন্যায় আচরণের সংবাদ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল হিন্দুপেট্রিয়ট, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রিকায়। এই পত্র পত্রিকাগুলিতে যারা ঐ সব নীল চাষীদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণনগরের মনোমোহন ঘোষ, রাধাপ্রসাদ মুখার্জি, গিরীশ চন্দ্র বোস প্রমুখ স্বদেশ সেবকের দল। তা ছাড়া দীনবন্ধু মিত্র লিখলেন "নীলদর্পণ"। এই নাটকটি সে-যুগে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে ইংরেজদের মধ্যে বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে রেভারেণ্ড জন লঙ এর ইংরেজী অনুবাদ করতে বদ্ধপরিকর হন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এর ইংরেজী অনুবাদ করেন। নাটকটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন জেমস লঙ্। নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় শুধু নীলকরদের মধ্যেই নয় সমস্ত ইংরেজ সমাজেই এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে তারা পাদ্রী জনলঙের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনলেন। বিচারে লঙ দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁর একমাসের কারাদণ্ড ও

(৪৪১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাষার রাজনীতি বন্ধ হউক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

করুণাময় চক্রবর্ত্তী

স্বাধীন ভারতের ছাব্বিশ বছর বয়সেও দেশের ভাষা সমস্যার কোন সুরাহা হ'লনা। বরং আরো জটিল হয়ে উঠেছে বল্লে মিথ্যে হবে না। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণও আজ এ সমস্যায় বিভক্ত। রাজকীয় অন্দর-মহলের ঝগড়া আজ তাদের পেয়ে বসেছে! দক্ষিণ ভারতের নেতৃবৃন্দ আজ উত্তর ভারত থেকে নিজেদের হটিয়ে নিচ্ছে প্রাদেশিক তথা নিজস্ব ভাষার স্বকীয়তা বজায় রাখার তাগিদে। 'আংরেজী হঠাও' আন্দোলনের হঠ-কারিতায় 'আংরেজী' ভূতের মতই আজ ঘাড়ে চেপে বসেছে হিন্দী ওয়া-লাদের। আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় আজ অহিন্দীভাষীরাও নিজেদের সুরক্ষার চেয়ে 'আংরেজী হঠাও' বাদী-দের সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করলো —'আংরেজীকে'ই সামনে রেখে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ সুযোগের অপব্যবহার না করে ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টি করলো জনমতের বিভ্রান্তি। শাসকযন্ত্রের অক্টোপাশে আবদ্ধ কোটী কোটী ভারতবাসী রাজনৈতিক শাসনে নির্য্যা-তীত হলেও এক প্রদেশের সাথে অন্য প্রদেশের মানসিক আদান প্রদান করলো বন্ধ। গরীবের ভাষা তার মুখ থেকে খসে পড়া নয়—রাজ্যের ভাষা নিয়ে মাতামাতি শুরু করলো তারা। বাংগালী গৃহহারা আর অন্নহীন মাদ্রাজীর সাথে বিহার উত্তরপ্রদেশের গৃহহীন অন্নহীনের কোন তফাৎ কার্য্যতঃ না থাকলেও মানসিক ভেদে আজ সবাই আহত, পর্য্যুদস্ত। ভাষার ভেদজ্ঞানই আজ এ সুযোগ এনে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল-দের। তাই প্রতিক্রিয়াবাদীর দল আজ মঠাধীশের মত নিজেদের রাজনৈতিক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির সুযোগে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অপণ্ডিত দেশ-বাসীকে Sentiment-এর অপচয়ে। সমস্যাকে বাঁচিয়ে রাখাতেই প্রতি-ক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের আত্মবৃদ্ধি। একমাত্র সেজন্যই ভাষা সমস্যার সমা-ধানে একটা সুস্থ নেতৃত্ব দিতে চায়নি কেউ। সারা দেশ একভাষার কথা বল্লে, এক অক্ষরে লিপিবিনিময় করলে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত ভারতবাসী যদি একটা সমস্যায় একই সাথে তুলে তাদের আওয়াজ, তাহলে সে আওয়াজের তীব্রতার কাছে হার মানতে বাধ্য হবে ভারতের প্রতিক্রিয়া-শীল নেতৃত্ব। তাই সমস্যাকে জীইয়ে রাখাতেই তাদের আনন্দ! সুভাষচন্দ্রের পর অনেক নেতার আবির্ভাব হয়েছে এ-দেশে, দেশের—জাতির সমস্যা নিয়ে গঙ্গার অনেক জল ঘোলা হয়েছে স্বাধীন ভারতে, কিন্তু আজো কোন আদর্শবাদী নেতা দেখা গেল না যিনি নির্দ্দিষ্ট কর্ম-সূচী দিয়ে নেতৃত্ব দিতে চাইলেন জাতীয় সমস্যার সমাধান করে! একটা বৃহৎ জাতির এর চেয়ে দুঃখের কী আছে? দেশহিতৈষীর 'কণ্ঠীমালা' গলায় ঝুলিয়ে প্রবচন দিয়ে যাচ্ছে অনেকেই,— কিন্তু দেশকে বাঁচার পথে কেউ দিতে পারলো না একটা সুস্থ পন্থা। ঐক্যের নামে জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে নিজ নিজ স্বার্থের আড়ালে গোষ্ঠীস্বার্থের নেশায় মশগুল হয়ে আছে ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব। সমস্যাবহুল দেশের সমস্যায় জর্জ্জরিত জনতা আজো যেন অন্ধকারেই হামা-গুড়ি দিয়ে চলছে! অবশ্য সর্ব্বক্ষেত্রেই একটা নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম হয়েছে, যারা বিভ্রান্তির মধ্যে Racial Supremacy থেকে শুরু করে নানা জঘন্য মতবাদের প্রচারে প্রদেশে প্রদেশে জাগিয়ে চলেছে বৈষম্যের ভাব। রাজনৈতিক এবং তথাকথিত দেশপ্রেমিক মস্তান (!) দের কাজই হল বিভেদ সৃষ্টি করা, এবং বিভেদের মধ্যেই নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা। এ ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব জাতীয় সংহতির একটা মহান সূত্রকেই আঁকড়ে ধরে সহজ পন্থার মাধ্যমে ভারতের ভাষা সমস্যার সমাধান করে ভাবাত্মক ঐক্যের সাধনায় ব্রতী হয়েছিল। অবশ্য আজ তাঁর পথটাই যে গ্রহণ করতে হবে এমন কোন কথা নেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বও দেখা গেলনা যিনি মনেপ্রাণে সর্ব্বভারতের ঐক্যের সাধনায় ভারতবাসীকে 'এক' করতে চেয়েছেন বা চেষ্টা করেছেন। ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ অনেক শোনা গেছে, কিন্তু গুলির তীব্রতা কোথায়? যদি চেষ্টা হত, তাহলে ভারতে আজ ভাষা সমস্যার নামগন্ধও থাকতো কিনা সন্দেহ! তাই সুভাষচন্দ্রের পথটা ভারতবর্ষের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাবলীর মূলে কুঠারাঘাত করেই স্থায়ী সমাধানের চেষ্টায় ছিল ব্যস্ত। সে পথটা কণ্টকা-কীর্ণ হলেও শান্তির। সহজ কথায় বৈপ্লবিক আদর্শের পথ, আর এপথেই চলতে ফিরতে ভীত বিহ্বল আধুনিক ভারতের গণতান্ত্রিক (!) নেতৃত্ব। বিরোধের মাঝেই ঐক্যের সাধক ছিলেন নেতাজী। তাই বহুভাষাভাষীর সম্ভাব্য বিরোধের কল্পনা করেই এক ঐক্য সমন্বয় চেয়েছিলেন জাতীয় ভাষার মাধ্যমে। ভারতবর্ষের ভাষা সমস্যার, জাতীয় সংহতির সৃষ্টি সাধনার পথে এটাই হচ্ছে একটি বিপ্লবী পথ। আজকের ভাষাভিত্তিক রাজনীতির যূপকাষ্ঠে 'দমবন্ধ' হয়ে প্রাণ দিচ্ছে ভারতবাসী। উপায়হীন তারা, রাজ-

নৈতিক চালের জেলখানায় আজ আটক দেশের ঐক্য তথা প্রগতি। এর মুক্তিকল্পেই চাই জাতীয় ভাষার প্রবর্তন। আজকের পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র 'আংরেজী হটাও' আন্দোলনেই তার সমাধান নয়, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভব ছুঁবি নিয়ে 'লিপি পরিবর্তনের' মাধ্যমে তৈরি করতে হবে জাতীয় ভাষার 'ভাবমূর্ত্তি'। নতুবা ঐক্য বা জাতীয় সংহতির কথা বলিতে বিভ্রান্ত হয়ে আরো দুঃখের বোঝা বইতে হবে রাজনৈতিক ফুৎকারের কারসাজিতে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে আজকের পরিস্থিতিতে লিপি পরিবর্তন মাধ্যমে জাতীয় ভাষা প্রবর্তনের জন্যে যে 'যোজনাবদ্ধ' প্রচেষ্টার প্রয়োজন তা কার্যান্বিত করা সময় সাপেক্ষ। অতএব Centre of National Education & training স্থাপনে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির গবেষণা এবং সংগে সংগে জাতীয় সংহতিকে শক্তহাতে সহজ করে গড়ে নেবার সরল পদ্ধতিকেও ক্রিয়াশীল করার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্বীকৃতি দিতে হবে সমগ্রদেশে! অর্থাৎ, প্রাদেশিক ভাষার অবশ্য পাঠেও, বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাকে শিক্ষার্থী এবং কর্মচারীবর্গের সুবিধার্থে সর্ব্বভারতে সম্পূর্ণ মর্য্যাদা দিতে হবে। আজকের ভারতবর্ষে নিজ নিজ প্রদেশে মাতৃভাষার মর্য্যাদা থাকলেও একজন ভিন্ন প্রদেশবাসীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়।

রাষ্ট্রের কল্যাণে হিন্দীভাষীদের সুবিধা সর্ব্বত্র থাকলেও একজন অহিন্দীভাষীকে হিন্দী প্রদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এমনকি চাকুরীক্ষেত্রেও বিপর্য্যস্ত হতে হয় নানা প্রতিকূল পরিবেশে। অতএব প্রত্যেক প্রদেশের স্কুল কলেজের বিভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য মাতৃভাষার শিক্ষা ব্যবস্থা রাখাই শ্রেয়। এটা শ্রম ও ব্যয়সাধ্য হলেও এতে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। এছাড়াও আজ ইংরেজী হটাও আন্দোলনের সেখানে কোন মহত্বই নেই, সেখানে অতি সহজভাবেই ইংরেজীকে ভারতীয় ভাষার মধ্যে একটী বলে মেনে নেওয়াতে কোন বাধা নেই। ইংরেজী ভাষা যদি সাম্রাজ্যবাদী ভাষা বলে পরিত্যক্ত হয় তবে দেখা যাবে যে অনেক ভাষাই সাম্রাজ্যলোভী সম্প্রদায়ের দৌলতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আজকের হিন্দী-গোষ্ঠির প্রতি দক্ষিণ ভারতেরও ত এটাই বিক্ষোভ! প্রকৃত পক্ষে ভাষার সম্পদশীলতাই তার মূলধন। সম্পদশীলতার জন্যই কোন একটী বিশেষ ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয় বিশেষ শ্রদ্ধা। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে ইংরেজী ভাষা, ভারতীয় জাতীয় সংহতির প্রতি শুধু সহায়কই হয়নি, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষাকে সম্পদশালীও করে তুলেছে। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ভারত ঐক্য-কে বজায় রাখার ক্ষেত্রে আজো ইংরেজী ভাষাই শ্রেষ্ঠ সহায়ক। হিন্দী বা অন্য কোন ভাষীরা এর বিরোধীতা করলে তাদের একগুঁয়েমী চরিত্রটাই প্রকাশ হবে এবং ভবিষ্যৎ সংশোধনরা হয়ত এটাকেই সাম্রাজ্যবাদী রুচি পর্য্যায়ে ফেলবে! অতএব ইংরেজীকে প্রাদেশিক ভাষার সংগে অর্থাৎ মাতৃভাষার সমমর্য্যাদা দেওয়াই উচিৎ। অবশ্য এটা একটা অন্তবর্তীকালীন ব্যবস্থামাত্র! যতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বভারতে এক লিপি সহ Common Language সৃষ্টি না হচ্ছে ততদিন প্রদেশে-প্রদেশে নিজস্ব ভাষার সংগে মাতৃভাষা এবং ইংরেজী-কে সম মর্য্যাদায় স্থান দিয়ে চল্লে প্রাদেশিকতার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যেতে পারে। রাজনৈতিক কৌশলের উর্দ্ধে থেকে যদি সহিষ্ণু মানসিকতা দ্বারা সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা চালু রাখা যায় তবে নৈতিক কারণেই জাতীয় ভাষার প্রয়োজনীয়তার মূল্যবোধটা আকর্ষণ করবে দেশবাসীকে। অন্তবর্তীকালীন একটা ব্যবস্থাকে মেনে যদি Planned process অনুযায়ী সার্থক ভাবে জাতীয় ভাষা সৃষ্টির গবেষণা চালানো হয় তবে সময় সাপেক্ষ হলেও সার্থকতা পেতে একটা যুগ পার হবার কোন যুক্তি সংগত কারণ দেখা যায় না। একটা Generation যদি কষ্ট সহিষ্ণু মানসিকতার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে পারে তবে ভারতের জাতীয় সংহতি বা ঐক্যবোধ ভাষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে দৃঢ়তর হয়ে। চাকুরী ক্ষেত্রে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমভারতের সাথে উত্তর ভারতের যে প্রতিযোগীতা তারও মূল কারণ ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিকতা। হিন্দী ভাষার জন্মগত সুবিধাভোগী উত্তর ভারতের শিক্ষিত যুব সমাজের কাছে শক্ত হাতে মার খেয়ে চলছে অন্য ভাষাভাষী রাজ্যের যুব সম্প্রদায় —যারা সর্ব্ব ভারতীয় চাকুরী ক্ষেত্রে হিন্দী ভাষীদের সম প্রতিযোগী। এ ক্ষেত্রে জাতীয় ভাষার মাধ্যমে যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভব হত তবে বিক্ষোভের কোন সুযোগই থাকতো না সাফল্য-অসাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে।

এ ছাড়াও জাতীয় ভাষাকে জনসমক্ষে লোকপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীসহ বিশ্বসাহিত্যের স্বর্ণ সম্ভারকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করতে পারলে সকল প্রদেশের শিক্ষিত সমাজই তা লুফে নেবে বিনা দ্বিধায়। দুঃখের বিষয় আজকের ভারতবর্ষে একমাত্র বাংলা-ভাষা ছাড়া অনুবাদ সাহিত্যের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণই নেই অন্য-ভাষাভাষীদের মধ্যে। এটা জাতীয় দুর্ব্বলতা হলেও এর মধ্যেই রয়েছে একটা বিরাট সুযোগ।

নতুনভাবে দেশ গড়ার কাজে ভাষা মাধ্যমে নিষ্ঠার সাথে যদি দেশপ্রীতির

আদর্শে জাতি গড়াই যদি কাম্য হয় তবে ভাষার বন্ধনে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করার এখনো রয়েছে অপর্য্যাপ্ত সুযোগ! একথা ভুললে চলবে না যে, ভারতে এখনো শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২০ জনের বেশী নয়,—যদিও আক্ষরিক জ্ঞান বা শব্দ পরিচয়ের হিসেবে শতকরা আরো দু এক ভাগ বেশী হতে পারে। কাজেই নতুন করে আক্ষরিক জ্ঞান শুরু করার এখনও আছে প্রচুর সুযোগ। দেশের কর্ণধারদের কী সেদিকে নজর আছে?

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে দেশের সরকার আজ নানা গঠন-মূলক কাজের প্রোগ্রাম দিয়ে চলছেন ক্রমান্বয়ে। কিন্তু সরকারী প্রচার যতই বেড়ে চলছে—শ্রমিক-মালিক, শ্রমিক-সরকার বিরোধ যেন ততই দানা বেঁধে উঠছে। দেশের বামপন্থী দলসমূহ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলোর Militancy ধর্মী আন্দোলনও দিন দিন বেড়ে চলছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। সরকার বা মালিক পক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিরুদ্ধে না হলেও শ্রমিক সমাজের দাবীগুলো নস্যাৎ করার কৌশলে প্রায় ক্ষেত্রেই বামপন্থী দেশপ্রেমের বিরোধীতার পঞ্চমুখ হয়ে বিষোদ্গার করে চলছে। বহুক্ষেত্রেই সরকার বা মালিক পক্ষের প্রচার যে সত্য নয় তারও প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। সরকারী যন্ত্র বা মালিক পক্ষের জবরদস্ত শয়তান সদৃশ দেশপ্রেমের মিথ্যা আবরণে দেশের বঞ্চিত সমাজ আরো বঞ্চনার পথেই এগুচ্ছে। দেশের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এইসব দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে যে আন্দোলনেই দাঁড় করাক না কেন, তা যত যুক্তিসঙ্গতই হোক না কেন, বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের কৌশলে তা মার খেয়ে চলছে এবং চলবে অতি নিরাপদে। সর্ব্ব ক্ষেত্রেই অপর পক্ষ দেশপ্রেমের প্রবচন বাক্যে সব Issue টাকেই প্রথমত political Issue এবং শেষ পর্য্যন্ত regional Issue তে রূপান্তরিত করে নিজের স্বার্থোদ্ধার করে চলছে বিনা সজ্জায়। অথচ উত্তরপ্রদেশ, বিহার আর বাংলা, মাদ্রাজের গরীবের জাত একই কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নেহাৎ একটা ভাবাত্মক ঐক্যের অভাবেই বঞ্চিত সমাজেও নিজেদের জীবন সংগ্রামে এক হতে পারছেনা। এর মূল কারণও ভাষা বিভ্রাট। এ বিভ্রাটের সুযোগ নিয়েই সুনিপুণ শিল্পীর মতই দেশের কায়েমী স্বার্থ নিজেদের স্বার্থোদ্ধার করে চলছে রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক মুনাফা লাভের রাজত্বে। অতএব ঐকাবদ্ধ সংগ্রামকে সার্থক করে অগ্রগতির পথে চলতে হলে, ভাষা বিভেদের সমাধানে যেমনি এগিয়ে আসতে হবে দেশের বিদ্বান-বুদ্ধিমান প্রগতিশীল নাগরিকদের, তেমনি জাতীয় সংহতিকে শক্ত কাঠামোতে দাঁড় করিয়ে ভাষার বিভিন্নতাকে দূর করে দেশের বুনিয়াদকে মজবুত করার দায়িত্বও নিতে হবে দেশের আদর্শ জাতীয়তাবাদী সরকারকে। এটা মনে রাখতে হবে যে চালাকী দিয়ে মহৎ কাজ উদ্ধার হয়না। ভাষার রাজনীতিতে যে দুর্গন্ধপূর্ত চালাকী আজ দেখা দিয়েছে তা দূর করতে না পারলে জাতীয় সংহতির নামে আজ যে প্রচার চলছে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের মৌলিক আদর্শকে সম্মান করে ভাষার ক্ষেত্রেও সমান অধিকারের দাবীকে ন্যায় সংগত স্থান দিতে হবে সমাজতান্ত্রিক জীবন বোধের বাস্তব ব্যবস্থা প্রকরণে। সেই জন্যেই বলা হচ্ছে সমাজতন্ত্রকে সার্থক করার পথে বিশেষ ভাষার কৌলিন্যকে বজায় না রেখে সকল মানুষের সমান অধিকারের বৃহৎ দাবীকে স্বীকার করে, সর্ব্ব ভারতে এক ভাষা প্রবর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে বিবেচিত হউক দেশের কল্যাণে। দেশবাসীর চিন্তারাজ্যে আজ আলোড়ন এনেছে, কিন্তু নিশানার ব্যর্থতায় যদি তা বিপথগামী হয় তবেই সর্ব্বনাশের শেষ অধ্যায় রচিত হবে ভারতবর্ষের ইতিহাসে। "There are many ways to mass sucide but only one way to human Survival. It is the road to faith which inspires us with the strong hope of things to come." দার্শনিকের উক্তিকে আদর্শ মেনে আজ দেশব্যাপী জনসমাজের সামনে রাখতে হবে বিশ্বাসের ছবি। প্রকাশ্য দিবালোকে আজ সত্যের পথ, ঐক্যের আদর্শকে তুলে ধরতে হবে দেশের আপামর জনতার মাঝখানে। নতুবা পরস্পর ঘৃণা বিদ্বেষ আর অবিশ্বাসের নগ্নরূপ বেভাবে দেখা দিচ্ছে দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি তথা সামাজিক ক্ষেত্রে, তার ভয়ানক প্রতিক্রিয়াতেই নেমে আসবে জাতীয় জীবনে ভয়াবহ অন্ধকার! এ অন্ধকারের হাতছানিতেই একটা মহান দেশের মহান জাতির অতি সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে যাবে প্রতিক্রিয়াশীল দানবের তাণ্ডবনৃত্যে। অতএব ভাষা নিয়ে ভাববার সময় আজো আছে বৈ কি। ভাষার রাজনীতি বন্ধ হউক; ভাষার মাধ্যমে ঐক্য বন্ধনে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হউক, এ সহজ সরল দাবীকে সার্থক করার পথে এগিয়ে আসুক বাস্তববাদী বুদ্ধিজীবির দল। আজকের পরিস্থিতিতে এটা সর্ব্ববাদী সম্মত দাবী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

(সমাপ্ত)

সমাজ শিক্ষায় অবকাশ বিনোদনমূলক কাজ

অমল কুমার মিত্র

(১)

অবকাশ বিনোদনমূলক কার্য্যাবলী হচ্ছে সে সব কাজ যেগুলি শিক্ষার্থীকে শারীরিক, মানসিক এবং আনুভূতিক আনন্দ দান করে থাকে। সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলী হচ্ছে সে সব যেগুলি মনকে করে সমৃদ্ধশালী, ব্যক্তিত্বকে করে বিকশিত। সমাজ শিক্ষার প্রোগ্রামে পৃথক পৃথক ভাবে অবকাশ বিনোদন মূলক কাজ এবং সাংস্কৃতিক কাজের যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনই যুক্তভাবে আবার এই দুটি কাজেরই প্রয়োজনীয়তা কম নয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত এ ধরণের কিছু কিছু কাজের পরিচয় এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার কথা নিম্নে তুলে ধরা হল :—

ক) নাট্যানুষ্ঠান :

সমাজ-শিক্ষার কার্য্যসূচীতে নাট্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার কথা এক কথায় শেষ করা যায় না। জনগণের আনন্দ দানের এটি হচ্ছে অন্যতম মাধ্যম। দর্শকরা বিভিন্ন চরিত্রের সাথে নিজেদের একাত্ম করে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করতে পারেন। সমসাময়িক সমস্যাদির ছবিও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা যায়। নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে শিল্পীরাও পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারেন, গড়ে তুলতে পারেন একটা নিবিড় বন্ধন। সহযোগিতার মধ্য দিয়ে কোন কিছুকে কি ভাবে সংগঠন করতে হয়—নাটক দেয় সে শিক্ষাও। নানাদিকে আগ্রহ জাগে, সৃষ্টি করার ঝোঁক পড়ে।

নানারকমের নাট্যাভিনয়

অপেরা : নাট্যানুষ্ঠানের সাথে সাথে সংগীত ও বাজনার যেখানে আধিক্য বেশী, 'অপেরা' নামে তাকে অভিহিত করা হয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে এগুলির প্রচলন খুব বেশী।

সমাজ-শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও কয়েক প্রকার নাট্যাভিনয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে, যথা :—

একাঙ্কিকা, মূকনাট্য (টেবলো), মূকাভিনয় (প্যানটোমাইম), প্রহসন (ফার্স), ব্যঙ্গাত্মক রচনা (ক্যারিকেচার), স্বগতোক্তি (soliloquy) প্রভৃতি।

বিভিন্ন অঞ্চলে এরা ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। কতগুলি নামের তালিকা (আঞ্চলিক ভিত্তিতে) নিম্নে দেওয়া হল :—

রামলীলা	...	উত্তর ভারত।
রাসলীলা	...	গুজরাট।
কথাকলি	...	মালাবার।
তামাসা	...	মহারাষ্ট্র।
নৌতানকী	...	বিহার, উত্তর-প্রদেশ, মধ্যভারত।
সোয়াঙ	...	পাঞ্জাব।
যাত্রা	...	বাংলা।

খ) কথা, কীর্ত্তন :

সমাজ-উন্নয়নমূলক সমস্যা নিয়ে যদি রচিত হয়, কথা কীর্ত্তনাদির সামাজিক মূল্য নিতান্ত কম নয়। এগুলিরও এক এক অঞ্চলে এক এক নাম :—

বাউলগান, কবিগান···বিহার, পঃ বঙ্গ।
চন্ডিরার কথা এবং ওগায় খুল্লাল·····
মালাবার, কোচীন।
আল্লাহ্-উদাল···উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মধ্য ভারত, বিহার।
বিহগা ... বিহার।
কারাগুয়ার ... আদিবাসী।
ভাক্কর ... মহারাষ্ট্র।

গ) ভজন :

কোন না কোন আকারে ভজনের প্রচলন ভারতের সর্বত্র। মীরার ভজন, কবীরের ভজন, সুরদাসের ভজন প্রভৃতি ভক্তি-সঙ্গীতগুলির জনপ্রিয়তা এ দেশে খুবই বেশী।

ঘ) সঙ্গীত—পল্লীগীতি, জনপ্রিয় গাথা (Ballad), বুড়া-কথা ইত্যাদি :

সমাজ শিক্ষার কার্য্যসূচীতে বরচিত পল্লীগীতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীন সুরে একক বা সমবেত সুরে গীত পল্লীসঙ্গীতগুলি শ্রোতাদের হাসায়, কাঁদায়, মাতায়, ভাবায়। এখন সময় এসেছে—এসব গানগুলির মধ্যে নব নব ভাব ও ভাষা ঢোকান। কেবল ধর্ম কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচনা না করে সমাজ-কল্যাণমূলক বিষয়াদিও এসব সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

ঙ) নৃত্য—লোক-নৃত্য :

আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন অধিবাসীদের মধ্যে নানারকম লোক-নৃত্যের অভাব নেই। এখানে কয়েকটি জনপ্রিয় লোক-নৃত্যের একটি তালিকা দেওয়া গেল :—

মাহাই, বাসু, হায় রাঙা, এবং
ভাংড়া ... পাঞ্জাব
ঝুমুর, তুষা, তর্জা ... পশ্চিমবাংলা
গরবা এবং রাস ... গুজরাট
তিগ্রী, ফুগদি, লেজিম ... মহারাষ্ট্র

ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের পর্য্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে মণিপুরী, কথক এবং ভরত নাট্যমকে।

সমাজ-শিক্ষায় লোক নৃত্যের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় ; যেহেতু অনেকে একসাথে এতে অংশ নিতে পারেন এবং এর আবেদন সার্বজনীন।

চ) পুতুল নাচ (Puppet shows), **তারের সাহায্যে পুতুল নাচ** (Marionettes) **ছায়ার খেলা** (shadow plays) **এবং** Flannel graphs

পুতুল নাচ দিয়ে কেবল যে 'শো' হয় তা নয়, চিত্তাকর্ষক ভাবে দর্শকদের সামনে কোন কিছু তুলে ধরতেও এর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরী। অতি সাধারণ জিনিষ দিয়ে দেশীয় পোষাকে এগুলিকে সজ্জিত করা যেতে পারে। পুতুলগুলি হাল্কা; এক স্থান থেকে আর এক স্থানে নিয়ে যেতেও তেমন বেগ পেতে হয় না। তবে যিনি পুতুলদের নাচাতে নাচাতে কথা বলাবেন; তাঁর নানা রকমের কণ্ঠস্বর থাকা বাঞ্ছনীয়।

যাঁরা একটু লাজুক, পর্দার সামনে আসতে সাহস পান না, তাঁরা 'ছায়া-খেলার' মধ্য দিয়ে পর্দার আড়ালে থেকে নানা ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। 'shadow play' বা 'ছায়া-খেলায়' সাজ সরঞ্জামের খুব একটা প্রয়োজন হয় না এবং সমাজ-শিক্ষায় খুব ঘন ঘন ব্যবহার করা যেতে পারে।

রাজস্থান, অন্ধ্র এবং মহীশূরে তারের সাহায্যে পুতুল নাচ (marionette) অতি উন্নত একটি কলা। কোথাও বা কাঠের পুতুল ব্যবহৃত হয়, আবার কোথাও বা পর্দার গায়ে প্রতিফলিত করার জন্য স্বচ্ছ চামড়ার মূর্তি তৈরী করা হয়।

কোন পাঠ বা ভাষণকে আকর্ষণীয় করার জন্য ফ্ল্যানেলোগ্রাফস্ এর সাহায্যে নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে পশমের বদলে খাদিও ব্যবহার করা চলে। তবে ছোট ছোট দলের মধ্যেই এগুলির প্রয়োগ ভাল ভাবে সম্ভব।

ছ) বিতর্ক-সভা এবং কবি সম্মেলন

সমস্যা সম্পর্কে খানিকটা ওয়াকিবহাল হলে পর বিতর্ক সভার আয়োজন করা যেতে পারে। কবি সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে তখন, যখন এ সম্পর্কে যোগদানকারীদের মনে একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় এবং কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে সবাই যখন আনন্দ লাভ করতে পারেন।

এ ছাড়াও ধর্মীয়, সামাজিক, জাতীয়, বিভিন্ন ঋতু সংক্রান্ত এবং কৃষি উৎসবের আয়োজন করা যেতে পারে। সমবেত সঙ্গীত, লোক নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে পারে, ভাবের আদান প্রদান ঘটতে পারে। এগুলি ভজন, বিতর্ক, নাট্যাভিনয় অপেক্ষাও অনেক শক্তিশালী মাধ্যম। মানুষের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্খা, তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে এ সব জিনিষের সুন্দর সংগঠন হতে পারে।

সমাজ শিক্ষায় অবকাশ বিনোদনমূলক কাজ

(আরও কয়েক প্রকারের অবকাশ-বিনোদনমূলক এবং সাংস্কৃতিক কার্য্যাবলী)

(২)

ক) খেলাধূলা:

দেশীয় খেলাধূলোর আয়োজন করা যেতে পারে। এসব খেলার জন্য পয়সা খরচ করতে হয় না তেমন। অথচ আনন্দ পাওয়া যায় প্রচুর। খুব কম খরচে, প্রায় বিনা সরঞ্জামে, এসব খেলার ব্যবস্থা করা যায়।

খেলা নির্বাচনের সময় বয়স, আগ্রহ এবং শারীরিক দক্ষতার দিকে লক্ষ্য রেখে খেলা বাছাই করা দরকার।

মেয়েদের জন্য তেমন খেলাধূলোর ব্যবস্থা না থাকলেও খো খো এবং স্কিপিং খুব জনপ্রিয় এবং সস্তা দুটি খেলা। মহারাষ্ট্রে ফুগকি এবং ঝিম্মা নামে মেয়েদের দুটি জনপ্রিয় দেশীয় খেলা রয়েছে। অন্যান্য রাজ্যেও অনুরূপ খেলা আছে। এসব খেলা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করে মেয়েদের মধ্যে চালু করা দরকার।

মেয়েদের জন্য কিছু নতুন নতুন খেলারও ব্যবস্থা করতে হবে। বিদেশী কিছু খেলা বয়স্কা মহিলাদের জন্য চালু করতে পারলে খুব ভাল হয়। যে সব খেলার অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম হয়, সে সব খেলা বালিকাদের না দেওয়াই ভাল।

দেশীয় খেলাগুলোকে ভাল ভাবে সংগঠন করার পর ভলিবল, ফুটবল, হকি, ব্যাডমিন্টন খেলা প্রভৃতি চালু করা যেতে পারে। এগুলোতে খরচ আছে; চাঁদা তুলে, জিনিষ কিনে, খেলা আরম্ভ করে দেওয়া যায়।

গ্রামের ছেলেদের বসবন্তভাবে যে সব মাঠে এ সব খেলা হয় সেসব মাঠে নিয়ে যেতে পারলে ওরা অনেক নতুন নতুন খেলা শিখতে পারে।

শারীরিক ব্যায়ামের পক্ষে যোগাসন, সূর্য্য নমস্কার, ডন, বৈঠক, কুস্তি, মাল্লখাম্ব, নোজিম, ড্রিল প্রভৃতি খুব ভাল।

পুরুষদের জন্য দর্শনীয় খেলা:— খো খো, কবাডি, আতাপাত্যা, ছাড়ুগড়ু।

মেয়েদের জন্য বহির্গৃহ খেলা :—

খো-খো, কবাডি, ঝিম্বা, লুকোচুরি নেকড়ে মেষ, প্রভৃতি।

অন্তর্গৃহ খেলা :—

ক্যারম, লুডো, সাপ লুডো, দাবা তাস, চেকার্স প্রভৃতি।

খ) পাঠাগার, যাদুঘর, মেলা, প্রদর্শনী, ভ্রমণ, ক্যাম্পিং, বনভোজন।

পাঠাগার :

সমাজ শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ হচ্ছে পাঠাগার। সেজন্য ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার, পাঠ কক্ষ, স্থানীয় পাঠাগার প্রভৃতির আয়োজন করা দরকার। সদ্য স্বাক্ষরতা কেন্দ্র যাতে নিরক্ষরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না হন, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার, এবং এদিক দিয়ে গ্রন্থাগারের মূল্য খুবই বেশী। সদ্য স্বাক্ষরদের পাঠের জন্য 'রিডিং সার্কেল' গঠন করা ভাল।

অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে ইতিহাস, জীবনী, ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ক ভাল ভাল পুস্তক নির্বাচন করা দরকার। পাঠকদের বয়স, রুচি এবং পড়ার ক্ষমতানুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করা উচিত। সদ্য স্বাক্ষরদের বই হবে সহজ, সরল। এবং সে রকম বই পাঠাগারে স্থান পাবে বেশী।

অনেক সময় প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক গ্রন্থাগারের কাজ করে থাকেন। এতে অনেক সময় খুব ভাল ফল পাওয়া যায় না। গ্রাম পঞ্চায়েৎ লাইব্রেরী সার্ভিস দেখাশোনা করবেন।

স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা ঘরে ঘরে গিয়ে পাঠকদের মনে পাঠের আগ্রহ জাগাতে পারেন। এজন্য অবশ্য শিক্ষণের প্রয়োজন আছে।

দেয়াল পত্রিকা, দেয়াল নিউজ বোর্ড প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে খুব উপকারী মাধ্যম। অনেক লোক একত্রে এগুলির দিকে আকৃষ্ট হয়ে পাঠে আগ্রহ লাভ করতে পারেন।

সমাজ-শিক্ষায় ভ্রাম্যমান পাঠাগার বেশ জনপ্রিয়, তবে একটি গ্রন্থাগার থাকা দরকার, যার কাজ হবে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত পুস্তক সরবরাহ করা।

স্বেচ্ছাসেবকেরা সহরাঞ্চলে গিয়ে বই সংগ্রহ করে আনতে পারেন এবং এই বই দ্বারা গ্রামীণ পাঠাগারকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন।

যাদুঘর :

সমাজ শিক্ষায় যাদুঘরগুলিকে এখনও ঠিক তেমনভাবে কাজে লাগান হচ্ছে না। গ্রামবাসীদের যদি মাঝে মাঝে সহরে নিয়ে গিয়ে যাদুঘরগুলি দেখিয়ে আনা যায়—একটা কাজের কাজ হবে। ওদের দলবদ্ধ ভাবে যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। একজন অভিজ্ঞ গাইড থাকবেন। তিনি সবাইকে সবকিছু বেশ সহজ সরল ভাষায় বুঝিয়ে দেবেন। কেবল চোখে দেখে সব শেখা যায় না, যা দেখেছি—তার সম্পর্কে একটা ধারণাও থাকা চাই।

যাদুঘরে গ্রামের কিছু কিছু নিদর্শনও থাকবে। সহরবাসীরা এ সব দেখে গ্রাম সম্বন্ধে ভাল ধারণা করতে পারবেন।

যাদুঘর ছাড়া একটি করে কেন্দ্রীয় তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র থাকা দরকার। যার কাজ হবে কয়েকটি গ্রামকে একত্রে তথ্য সরবরাহ করা।

মেলা :

গ্রামের লোকেরা কোন একটি বিশেষ উৎসব বা তিথি উপলক্ষে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হওয়াকে মেলা বলে। মেলায় শিশু প্রদর্শনী, গরু প্রদর্শনী, আন্তঃগ্রাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন জিনিষের প্রদর্শনী, উন্নত কৃষি যন্ত্রের প্রদর্শনী, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রভৃতির আয়োজন করা যেতে পারে। সে সাথে থাকবে গান বাজনার ব্যবস্থা। ভাল ভাবে সংগঠিত হলে মেলাকে সমাজ শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট মাধ্যম রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

প্রদর্শনী :

কোন একটি কেন্দ্রীয় স্থানে প্রদর্শনীর আয়োজন করা যেতে পারে। এসব প্রদর্শনীকে কার্যকরী করতে হলে অভিজ্ঞ গাইড থাকা দরকার; সহজ সরল ভাষায় সবকিছু যাতে গ্রামবাসীকে বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। দিল্লীতে আছে ভ্রাম্যমান 'শিক্ষা ক্যারাভান'। ভ্রাম্যমান এ প্রদর্শনী গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়—সবাইকে আনন্দ দান করে। গ্রামেও যাতে ছোটখাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়—সেদিকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। স্থানীয় শিল্পীদের শিল্পজাত দ্রব্যের ও হাতের কাজের প্রদর্শনী করা যেতে পারে। এতে 'স্বীকৃতি' লাভের আনন্দে তাঁরা উৎফুল্ল হবেন—আরও ভাল কিছু করতে অনুপ্রেরণা লাভ করবেন।

ভ্রমণ, বনভোজন, ইত্যাদি :

বয়স্করা বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতির মাধ্যমে একস্থানে সবাই একত্র হতে পারেন। সখ্য, প্রীতি ও বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন।

ক্যাম্পিংএর মধ্য দিয়ে দল পরিচালনা, নেতৃত্ব, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণের বিকাশ সাধন হয়। রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা, গ্রামের সংস্কার করা নতুন রাস্তা নির্মাণ করা, কচুরিপানা নাশ করা, প্রভৃতি কল্যাণমূলক কাজ ক্যাম্প থেকে হাতে নেওয়া যায়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে—ক্যাম্পে যেন সবাই মিলেমিশে, বন্ধুর মত থাকেন। জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে একটা ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পক্ষে ক্যাম্পের অবদান খুবই বেশী।

ক্যাম্পের আবাসিকরা মোট ব্যয়ের খানিকটা অংশ নিজেরা বহন করবেন—এটি অতি উত্তম পন্থা।

ব্যক্তিগত কয়েকটি আনন্দ অনুষ্ঠান :

বয়স্করা ছবি এঁকে, আল্পনা এঁকে, গান গেয়ে, বই পড়ে, হাতের কাজ করে অবসর সময়গুলো অতি সুন্দর ভাবে কাটিয়ে দিতে পারেন। অবকাশের মুহূর্তগুলো এ ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

হবি :

সহরাঞ্চলে নানা রকমের হবি নিয়ে চর্চা করার সুযোগ থাকলেও (যেমন ডাক টিকিট সংগ্রহ, মুদ্রা সংগ্রহ, ছবি সংগ্রহ) গ্রামাঞ্চলে সে সুযোগ সীমিত। গ্রামাঞ্চলেও কি কি হবি চালু করা যায় সে নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করার সময় এসেছে। গবেষণা করে দেখা গেছে উদ্যান রচনা, মধু মক্ষিকা পালন, মুর্গী পালন, খেলনা তৈরি, মৎস্য চাষ, হাতের কাজ, যন্ত্র সঙ্গীত, কাঠের কাজ, মাটির কাজ প্রভৃতি হবিতে গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করা যেতে পারে।

গৃহকে সুন্দর করা :

'হাউস ডেকোরেশন'—সাংস্কৃতিক দিক থেকে এর অবদান খুবই বেশী। অনেক অঞ্চলেই এটা প্রচলিত, তবে কোথাও কোথাও আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। নবপ্রাণ সঞ্চারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফোর ডেকোরেসনের ক্ষেত্রে আল্পনা, রাঙ্গোলী, মণ্ডণ এবং কোলাসের উল্লেখ করা যেতে পারে। যে সব গ্রামে এ সবের চল নেই, সে সব গ্রামে এগুলোকে চালু করার সময় এসেছে।

আর্ট ও ক্র্যাপ্‌ট :

অবকাশ বিনোদনের ক্ষেত্রে হয় ব্যক্তিগত নয় দলগত ভাবে আর্ট ও ক্র্যাপ্‌টকে চালু করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীত, সেলাই বোনা, এম্ব্রয়ডারী, চিত্রাঙ্কন, তাঁত বোনা, বাঁশ ও বেতের কাজ, মাটির ওপর রঙের কাজ, পুতুল তৈরী প্রভৃতির নাম সর্বাগ্রে মনে আসে।

নানা রঙের দিনগুলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রসময় শূর

পাইপ রোডে নেমে পড়তেই দেখি নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সির টাকা মিটিয়ে দিচ্ছেন। অদূরে দাঁড়িয়ে পীনেশ ও বাবল। প্রায় একই সময়ে তিনজন মিলিত হয়ে গেছে। এবার তারা নিজেরাই চলবে। আমাদের কাজ এইখানেই শেষ।

একখানা ট্যাক্সি ধরে ছুটে চলল তিন দুর্দ্ধর্ষ যুবক রাইটার্স বিল্ডিং-এর দিকে। পৌঁছেই ধীর স্থির ভাবে সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠে পড়ল দোতলায়। পূর্ব্ব পরিকল্পনামত আক্রমণ সুরু করল তারা Col. Simpsonকে দিয়ে। Col. Simpson ছিলেন I. G. of Prisons. তাকে প্রথম বলি রূপে চিহ্নিত করার কারণও ছিল। তৎকালে জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলত। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে অনেক সত্যাগ্রহী তখন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। জে, এম, সেনগুপ্ত, কিরণশংকর, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ অনেক নেতৃবৃন্দ ও আছেন উক্ত জেলে। জেলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড লাঠিচার্জ হয়। সুভাষচন্দ্রের আঘাত ছিল গুরুতর। এই নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিশোধ যে বাকী রয়ে গেছে। এই তার উত্তম সুযোগ।

Col. Simpson-এর ঘরে ঢুকে পড়ল তিনজন। পর পর গুলি ছুটল তাদের রিভলবার থেকে। Simpsonকে নিহত করেই তারা বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়। পাশের ঘরগুলিতে তারা আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল। প্রাণে বেঁচে গেলেন কেউ কেউ, কিন্তু আহত হলেন Judicial Secretary Nelson, মিঃ টরেন হাম, Finance member Marr, আরো অনেকে। প্রাণের ভয়ে কী ছোটাছুটি তখন এসব ইংরেজ বীর পুরুষদের। কেউ আশ্রয় নিচ্ছে আলমারির পিছনে, কেউ টেবিলের নীচে ঢুকে পড়ছে। আমেরিকান এক পাদ্রী তো লোহার পাইপ বেয়ে সুর সুর করে নীচে নেমে পড়ে প্রাণ বাঁচাল। তখন চলেছে তিন মৃত্যুঞ্জয়হীন দুঃসাহসী বিপ্লবীর তাণ্ডব লীলা।

এই মারণযজ্ঞের সামনে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। ভয় সন্ত্রাসের প্রমাণ পাওয়া গেল প্রেস অফিসার Tufnel Barret-এর মুখ থেকে। ঘটনার পরে তিনি ফরওয়ার্ড পত্রিকার এডিটার শ্রীযুত ইন্দ্রজিৎ বসুকীকে তখনকার অবস্থার কথা জানাতে গিয়ে বলছিলেন, "My tongue stuck to the roof. I could not utter a single word"

রিভলবারের গুলি নূতন করে ভরে নেবার জন্য তারা ঢুকে পড়ল Passport আপিসে। ওখান থেকে

বেরিয়েই চলল তাদের বিজয় উল্লাস, ও মুহু মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। নিকটেই লালবাজার পুলিশের প্রধান ঘাঁটি। জরুরী খবর পেয়ে পুলিশী সৈন্য সামন্ত এসে পড়ল দোতলার বারান্দার দিকে। প্রচণ্ড সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল দুই পক্ষের। একদিকে বহু সংখ্যক রাইফেলধারী পুলিশবাহিনী টেগার্টের নেতৃত্বে। অপর দিকে রক্তপাগল বিপ্লবী ত্রয়ী। বিনয়-বাদল-দীনেশ সাময়িক কায়দায় সম্মুখ সমরে দুর্জয় বিক্রমের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে। সীমিত গুলি ওদের ফুরিয়ে এল। তারা D. P. I-এর ঘরে প্রবেশ করে স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণ করার জন্য সঙ্গে আনীত পটেসিয়াম্ সায়নেড মুখে পুরে দিল। বাদল অনতিবিলম্বে ঢলে পড়ল। বীর সৈনিকের আত্মাহুতির গৌরব লাভ করল সে সর্ব্বপ্রথম। বিনয় দিনেশ পটেসিয়াম মুখে রেখেই বাঞ্ছিত মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার আগ্রহে আপন আপন রিভলবারের গুলি চালিয়ে দিল নিজেদের মুখে মাথায়। পটেসিয়ামের বিষক্রিয়া ব্যর্থ হয়ে গেল এর ফলে। গুরুতর আহত অবস্থায় দু'জনেই ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে। দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকল ডাক্তারদের পক্ষ থেকে সরকারের নির্দ্দেশে। সরকার যে এই দুইজনকে বাঁচিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে ইংরেজ জীবনহানির প্রতিশোধ নিতে আগ্রহী, বিনয় সরকারকে এই সুযোগ দিতে নারাজ। মাথার জখমের ব্যাণ্ডেজ খুলে নিজের হাত চালিয়ে ক্ষতকে সেপটিক করে দিল। সে এখন নিশ্চিন্ত। বীরের মৃত্যু, দেশ জননীর পায়ে চরম আত্মদানের স্বপ্নে সে বিভোর। ঘটনার পঞ্চম দিনে ১৩ই ডিসেম্বর সার্থক বিপ্লবী বিনয় আপন প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি দিল।

এদিকে জোর চিকিৎসা চলল দীনেশের। দীনেশকে যে সুস্থ করে তুলতেই হবে—এযেন ইংরেজ সরকারের পণ। দীনেশের বিচার হবে। চরম শাস্তি দিতে হবে। প্রতিশোধ চাই ইংরেজ হত্যার।

দীনেশ প্রাণোচ্ছল শক্তিমান যুবক। অপারেশনের ফলে শরীর থেকে গুলি বের করা হলে সে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। এবার বিচারের পালা। Special Tribunal গঠন করা হল মিঃ গার্লিককে সভাপতি করে। চরম শাস্তির ব্যবস্থা হয়ে গেল। ট্রাই ব্যুনাল দীনেশকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে বাইরে প্রচার হতেই তুমুল আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। দেশ মাতৃকার এই বীর সন্তানকে যে বাঁচাতেই হবে। বিমল প্রতিভা দেবীর নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করা হল। কমিটির পক্ষ থেকে ফাঁসির হুকুম রদের চেষ্টা শুরু হয়ে গেল। কোন ফল হল না। ফাঁসির হুকুমই বহাল রয়ে গেল। ৭ই জুলাই, ১৯৩১ সনে আলিপুর জেলে দীনেশ হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করেন, মুখে তাঁর মাতৃমন্ত্র "বন্দেমাতরম্"। বন্দেমাতরম্-এর প্রতিধ্বনি উঠল সারা জেলে।

দীনেশ চলে গেলেন। মহান মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সার্থক আত্মাহুতি। তিনি যা রেখে গেলেন তা জাতির অমূল্য সম্পদ। জেলখানা থেকে তিনি যে সব চিঠি দিয়েছিলেন আত্মীয় স্বজনের কাছে, তাতে রয়েছে তাঁর উপলব্ধ সত্য। কনডেমণ্ড সেলে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি যে সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন অন্তরে, তা অক্ষর হয়ে থাকবে মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীদের ইতিহাসে।

মাকে তিনি লিখেছিলেন—"মৃত্যু-টাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোটছেলের মিথ্যা জুজু বুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলেরই বরণ করিয়া লইতে হইবে সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য ?

যে খবর না দিয়া আসিত সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাকে পরম শত্রু মনে করিব ? ভুল ভুল—মৃত্যু মিত্র রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়াছে"।

মণিদিকে তিনি লিখেছিলেন—"ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ সম্পদ দেন ধূলায় লুটিয়ে। করেন তাকে পথের ভিখিরী, রিক্ত, কাঙাল।.....

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে কিন্তু দুঃখ পাওয়া—তার চেয়েও বড। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই ; কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা নিতে পারে ক'জন ?'

(ক্রমশঃ)

স্মরণীয় রাজনৈতিক দলিল

শহিদ ভগৎ সিংহের চিঠি

[তৎকালিক পাঞ্জাব প্রদেশের গভর্ণরকে পাঞ্জাব জেল হতে ফাঁসীর তিনদিন পূর্ব্বে ৩রা মার্চ্চ, ১৯৩১ইং লিখিত]

আমরা (ভগৎ সিংহ, সুখদেও এবং রাজগুরু) এই স্মারকলিপি আপনার অবগতি ও বিবেচনার জন্য পাঠাচ্ছি।

১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর বৃটীশ বিচারালয়ের ট্রাইবুনাল (এ এল সি সি) আমাদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। বৃটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরয়ের অর্ডিনান্স অনুসারে ঐ ট্রাইবুনাল গঠিত হয়। আমাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ আমরা ইংলণ্ডের অধীশ্বর রাজা জর্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলাম।

বিচারক আমাদের শাস্তি দেওয়ার সময় দু'টি জিনিস স্থির নিশ্চয় করে নিয়েছিলেন। এক: তাহারা স্বীকার করেছেন বৃটীশ জাতি এবং ভারত (জাতি) পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। দুই: এই যুদ্ধে আমরা ভারতের পক্ষে পড়েছি এবং যুদ্ধবন্দী (pows)।

দ্বিতীয় অনুমান আমাদের পক্ষে আত্মশ্লাঘা পূর্ণ হলেও, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

প্রথম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। বাহ্যতঃ যে যুদ্ধ চলছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তা কোথাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য স্বীকার করে নিয়ে আমরা মেনে নিচ্ছি যুদ্ধ ঘোষণা করাই হয়েছে। এ যুদ্ধের সম্বন্ধে আমরা ধারণা স্পষ্ট করে বলছি। আমরাই ঘোষণা করছি আপনাদের বিরুদ্ধে (বৃটীশ শাসনের) যুদ্ধঘোষণা করা হয়েছে, এবং এ যুদ্ধ চলতে থাকবে যতদিন মেহনতী সমাজের উপর এবং দেশের সম্পদের উপর মুষ্টিমেয় পরভোজীদের শোষণ শাসন বিদ্যমান থাকবে। এই পরভোজীদের শ্রেণী বৃটীশ পুঁজিপতি বা বৃটিশ ও ভারতীয় পুঁজিপতির মিশ্রণ বা কেবল ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণীও হতে পারে। হতে পারে ঐ শ্রেণী ভারতীয় বা মিশ্রিত আমলাতন্ত্রের সহায়তায় তাদের শোষণ অব্যাহত রাখে। পরিণামের দিক হতে ইহাতে কোন পার্থক্য নেই।

আপনার সরকার খেতাব, ধন দৌলত বা সম্মান বিতরণ করে ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্গের কিছু লোককে স্বপক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হতে পারেন। তাদের আমরা তৃণবৎ মনে করি। আপনারা প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নৈতিক শক্তি খর্ব্ব করার যতই চেষ্টা করুন না কেন আমরা অকম্প চিত্তে অগ্রসর হবই। প্রবীন নেতৃবৃন্দ আপোষ মনোভাব প্রদর্শন করার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা বিপ্লবী দল সাময়িকভাবে এ সংগ্রাম বিচ্ছিন্ন হলেও আমরা বিরত হবনা। যে সব নেতৃবৃন্দ আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল আমরা ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা ভুলতে পারিনা যে সব নেতাদের যারা চরম তাচ্ছিল্যভরে তাদের শাস্তি আলোচনায় আমাদের যে সমস্ত মহিলা কর্মী অগ্রণী বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসে নিজেদের প্রিয় ঘরবাড়ী আত্মীয় স্বজন হারাতে বাধ্য হয়েছেন তাদের কথা উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই। আমরা ভাল ভাবেই জানি ঐ নেতৃবৃন্দ আমাদের অগ্রগামী বিপ্লবী বাহিনীকে তাদের দীর্ঘকালের যত্নাপচা কাল্পনিক অহিংস মতবাদের চরম শত্রু বলে মনে করেন। আমাদের সেনাবাহিনীর ঐ বীরাঙ্গনারা দেশের জন্য অসাধ্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নি। তাঁহারা চরম স্বার্থত্যাগ করেছেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে তাঁহারা স্বামী, ভ্রাতা এমন কি নিজেকেও কোরবানী করিতে বদ্ধপরিকর।

সুতরাং আপনার দালালরা চরম হীনবৃত্তি বশতঃ ঐ সিংহীনীদের চরিত্রে কালিমা লেপন করে তাদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনয়ন করাতে আমরা মোটেই চিন্তিত নই। আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকবে।

আমাদের এ সংগ্রাম ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করবে। কোন এক মুহূর্তে এ সংগ্রামে আপনার সরকারের সাথে অস্ত্রের বিনিময় হবে, পর মুহূর্তে এ সংগ্রাম গরিলা কৌশল অবলম্বন করবে। কখনো এ যুদ্ধ দেখা দিবে জাতীয় আন্দোলন রূপে আবার কখনো "শত্রুকে হত্যা করে মৃত্যুবরণ করো" এই মনোভাব নিয়ে খণ্ড যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করবে। আমাদের সংগ্রাম রক্তস্নাত হবে বা শান্তিপূর্ণ হবে তা নির্ভর করে আপনাদের আমাদের সম্পর্কে পলিসির উপরে। আপনাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন ধরণের সংগ্রাম আপনারা আমাদের সঙ্গে করতে চান। কিন্তু মনে রাখবেন এ যুদ্ধ অবিরাম চলতে থাকবে, সঞ্চারিত হবে নতুন প্রাণ নতুন শক্তি। এর পরে এ যুদ্ধ আপনাদের বিশাল শক্তি উপেক্ষা করেই পরিচালিত হবে, অর্থহীন জাতি তত্ত্ব (race theory) প্রচার সত্ত্বেও। এই যুদ্ধ চলবে নতুন উদ্দীপনা, সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। এ যুদ্ধ থামবে না যতদিন না সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র Socialist Re-

public) প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদিন আজকের প্রচলিত সর্ব্বপ্রকার শোষণের অবসান করে কল্যাণভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন হয়। যতদিন না বিশ্বের সমগ্র মানব সমাজে শান্তির যুগের সূচনা হয়। অতি শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধানের জন্য শেষ সংগ্রাম শুরু হবে।

পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণের দিন শেষ হয়েছে। সংগ্রামে আমাদের যোগদানের অনেক আগে এ যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমাদের মৃত্যুর পরেও এ সংগ্রাম চলতে থাকবে। আমাদের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত, আপনারা এ সংগ্রাম স্তিমিত করতে পারবেন না। ঐতিহাসিক ও বর্ত্তমান অবস্থার অনিবার্য ও যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এ যুদ্ধ। অতুলনীয় আত্মোৎসর্গের যে মহতী দৃষ্টান্ত শ্রীদাস (যতীন দাস) রেখে গেছেন, কমরেড ভগবতি চরণের করুণ কিন্তু মহান আত্মোৎসর্গের ঘটনা এবং আমাদের মহান নেতা আজাদের (চন্দ্রশেখর আজাদ) বীরোচিত মৃত্যুবরণের যে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আমাদের ফাঁসীর ঘটনা সেই ঐতিহ্যকে কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ করবে মাত্র।

আমরা সুনিশ্চিত আপনি আমাদের ফাঁসী দেওয়ার সিদ্ধান্ত অবশ্যই কার্যকরী করবেন কারণ আপনারা শোষকশ্রেণী এবং উহাই আপনাদের একমাত্র শক্তি। 'দৈহিক শক্তিই যে সর্ব্বদা ন্যায়'-ইহাই আপনাদের আদর্শ। আমাদের বিচার কাহিনীই আপনাদের আদর্শের প্রমাণ। কিন্তু আমরা প্রাণভিক্ষা চাহি না। আমরা আপনার কাছেও দয়া ভিক্ষা করি না। আমরা কেবল একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—আপনাদের বিচারালয়ের রায় অনুসারে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি, সুতরাং আমরা যুদ্ধবন্দী। আমরা অনুরূপ ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী। তাই আমরা জানাতে চাই যে আমাদের আপনারা ফায়ারিং স্কোয়াড দিয়ে হত্যা করুন। অন্যায় ফাঁসীকাঠে ঝুলাবেন না। অবশ্য আপনাদের বিচারকের রায় মান্য আপনি করবেন বা করবেন না তা দুনিয়াকে জানাবার দায় দায়িত্ব আপনার।

সুতরাং আমরা আশাকরি এবং আপনাকে অনুরোধ জানাই আপনার সামরিক বাহিনীকে আদেশ দিন তারা যেন ফায়ারিং স্কোয়াড পাঠিয়ে আমাদের গুলি করে হত্যা করেন।

ইতি

আপনাদেরই

ভগৎ সিং

৩রা মার্চ্চ, ১৯৩১,

(Young India special Independence Number, 1972 হতে অনূদিত)

পুস্তক সমালোচনা

নমামি, মূল্য-১২০০

জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ী

প্রাচী পাবলিকেশনস

৩-৪, হেয়ার ষ্ট্রীট কলিকাতা-১

আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চা সরকারী বয়ান তথা শাসকদলের ইপ্সিত দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়িয়ে সত্যিকারের গবেষনার পর্য্যায়ে উত্তরণ করতে পারেনি। দলীয় বা বিশেষ গোষ্ঠীর মনোমত ব্যাখ্যার আধারে সত্য ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে, একথা বেশী করে প্রযোজ্য বাংলার তথা ভারতবর্ষের সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে ক্ষমতার রাজনীতিতে বিপ্লবীদের কোণঠাসা অবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় যোগদান করা থেকে বিরত থাকা ফলে বিপ্লবী আন্দোলনের তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা সরকারী তরফ থেকে কোন পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। জনা কয়েক বিপ্লবী নেতার আত্মজীবনীমূলক রচনা এবং কিছু কিছু কাহিনীর আকারে লেখা স্মৃতিচিত্রনই একমাত্র ভরসা। সেদিক থেকে জিতেশ চন্দ্র লাহিড়ীর "নমামি" প্রকাশ করে প্রাচী পাবলীকেশনস্ একটা উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। নতুন যুগের ছেলেমেয়েরা যাদের জীবনে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছোঁয়াচ লাগেনি, তাদের কাছে এই বই এক দিশারীস্বরূপ হবে। আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা এবং জাতীয় চেতনাবোধের ক্ষীয়মান পরিস্থিতির বর্ত্তমান পরিপ্রেক্ষিতে নমামির তথ্যনিষ্ঠ অথচ গল্পের মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার ষ্টাইল আধুনিক মননেও সাড়া তুলবে। বিপ্লবী বাংলার ঐতিহ্য, স্বাধীনতা যোদ্ধাদের ঘরোয়া কাহিনী ও শৃঙ্খল মোচনে তার অপূর্ব আত্মত্যাগের ঘটনাগুলি পড়লে যে মুক্তি পাগল, আবেগপ্রবণ বাঙ্গালীর বিপ্লবী চরিত্র চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তার রূপ আজও বাংলার শহর গ্রামের অনুরূপই মনে হয় কেবল প্রেক্ষাপট পালটিয়ে গেছে।

সমিধ ও নমামির একত্র সংকলনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অনুশীলন পার্টীর কার্য্যকলাপ, বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত আচরণবাদের দৃষ্টান্তসমূহ এবং আদর্শ-নিষ্ঠার অসংখ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ত্রৈলোক্য মহারাজ, যোগেন চক্রবর্ত্তী, সুবোধ রায়, নরেন সেন, পূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত, রমেশ আচার্য্য, যোগেশ রায়, শ্রীশ ঘোষ, কেশু রায়, সুরপতি চক্রবর্ত্তী, অমূল্য সেন সহ বড় বিপ্লবীর আত্মত্যাগ ও আত্মদানের

রোমহর্ষক ঘটনাবলীর বিবরণ রয়েছে এই সব দপ্তরীর কর্মপন্থায় মতানৈক্য এবং প্রকাশ্য বিরোধ থাকা সত্ত্বেও দেশবন্ধুর উক্তিই এঁদের যথার্থ পরিচয়-বহনকারী……"ওদের বেশ করে জানি। ওরা নদীচি ও সব্যসাচীর combination……ওরা জনে জনে নিকলুষ খাঁটি সোনা। যারা প্রাণটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে—নিজেদের ভুল ভ্রান্তি ছাড়া ওদের পিছে মারতে কেউ পারেনা। আমরা ওদের নীতির সাথে একমত না হতে পারি। কিন্তু ওদের অশ্রদ্ধা করতে পারিনা।" শালগ্রামের আত্মদান, "মাসীমা" "সিঁড়ি" "প্রায়শ্চিত্ত" "বহুরূপী" 'নীরব সাধক' সহ প্রতিটি খণ্ড কাহিনীর ছত্রে ছত্রে দেশবন্ধুর এই কথার যথার্থতা প্রমাণ হয়। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার আসার পর বিপ্লবী গোষ্ঠী তথা তাদের মত ও পথ সম্বন্ধে যেসব সন্দেহ এবং গান্ধীজির পথের সাথে মতানৈক্যের ব্যাপারের শেষ কয়টি পরিচ্ছেদে উল্লেখ ও আলোচনা আছে, তবে বিভিন্ন খণ্ড কাহিনীর সময়কাল নির্ধারণে পাঠককে বেশ অসুবিধায় পড়তে হয়। কারণ বহু জায়গায়ই কাল উল্লেখ করা হয়নি। বিপ্লবীদের কাহিনী ও কার্যকলাপ তুলে ধরতে লেখকের ব্যক্তি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নমামিকে ইতিহাসের নব উদঘাটনের ভূমিকায় এনে দিয়েছে। কারণ ব্যক্তিগতভাবে ঘটনাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেও এমন স্বনিরপেক্ষ লেখনী ধারণে অনেকেই ইতিমধ্যে ব্যর্থ হয়েছেন। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ভূমিকা ও খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদপট পুস্তকখানির আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

(৪৩০ পৃষ্ঠার পর)

এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। স্বনামধন্য শ্রীকালিপ্রসন্ন ঘোষ সে জরিমানার এক হাজার টাকা তৎক্ষণাৎ দিয়ে দেন।

দেশের শুভানুধ্যায়ী যারা তারা এইভাবে দেশের মধ্যে বিরাট এক গণ-চেতনা সৃষ্টির প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করেন। অস্বীকার করবার উপায় নেই যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের এই নিঃশেষ নির্য্যাতন ও উৎকট উৎপীড়ন বাঙালী তথা সমগ্র দেশের অধিবাসী-দের মধ্যে এক নূতন প্রেরণা ও উদ্দী-পনার সৃষ্টি করেছে। এই নবজাগরণের ফলেই তারা আবার তাদের হৃতচৈতন্য-কে উদ্ধার করতে পেরেছে। এই কারণেই বৃটিশ বিরোধী এই সব খণ্ড, ছিন্ন, বিদ্রোহের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহ

মারাঠা জাতি কোনদিনই ইংরে-জের অধীনতা সহজে মেনে নিতে পারে নি। উপরে উপরে ইংরেজের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিলেও মনেপ্রাণে তারা কোন দিনই তাকে স্বীকার করে নি। এ প্রসঙ্গে শ্রীভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায় "ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব" গ্রন্থে লিখেছেন, "সেখানকার (মহারাষ্ট্রের) জনসাধারণ তখনও অতীতের গৌরব স্পর্শ করে স্বাধীনতার স্বাদ স্মরণে রেখেছিল। তারা তখনো ভুলে যায় নি তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা নানাসাহেব ও তাঁতিয়া-তোপীকে। তাছাড়া পর্ব্বতে, গিরি-বন্দরে, অরণ্যে ও বন্ধুর প্রান্তরে সশস্ত্র মারাঠা তরুণদের অশান্ত জীবনযাত্রায় রোমাঞ্চ লেগে থাকত।" মারাঠাজাতির এই বৈশিষ্ট্যকে দেশ ও জাতির কল্যাণের কাজে লাগাতে এগিয়ে এলেন মারাঠারই এক তরুণ—বাসুদেব বলবন্ত ফড়্‌কে। মারহাট্টার তরুণদের সংঘবদ্ধ করে তাদেরকে শিবাজীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে লেগে গেলেন তিনি। দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা, তাদের অসহায় অক্ষমতা তাঁকে এত বিচলিত করল যে অবিলম্বে এর প্রতিকারের জন্য তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। একমাত্র সশস্ত্র বিদ্রোহের পথেই এর প্রতিকার সম্ভব! একথা চিন্তা করে তিনি প্রথম আহ্বান জানালেন শিক্ষিত যুবকদের। কিন্তু, সেখানে তিনি আশানুরূপ সাড়া পেলেন না। তাতে বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে তিনি এবার আহ্বান জানালেন মারাঠার সাধারণ মানুষদের। শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর এই তরুণের দল তাঁর ডাকে এগিয়ে আসতে লাগল। তিনি তাঁদের সাহায্যে গড়ে তুললেন এক দুঃসাহসিক সৈন্যদল। এদের থেকে বেছে বেছে কিছু সুশৃঙ্খল, অসম-সাহসিক যুবকদের নিয়ে স্থাপন করলেন একটি গোপনশাখা। তারা কাজ করে যাবে সকলের অলক্ষ্যে। তাদের অভিনব শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থাও হবে সকলের অগোচরে। সরকারের দৃষ্টিতে শুধু তার সৈন্যদলই চোখে পড়বে, কিন্তু, এই গোপনশাখার অস্তিত্ব সম্পর্কে সরকার কিংবা পুলিশ কিছুই জানতে পারবে না। এদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল দুর্গম পাহা-ড়ের বুকে, গভীর জঙ্গলে। রাত্রির অন্ধকারেও এই শিক্ষাকার্য্য চলত নিয়-মিতভাবে। এইভাবে গড়ে উঠল তাঁর উভয় প্রকারের সৈন্যদল—একদলের কাজ চলল একান্ত সঙ্গোপনে, আর একদলের প্রকাশ্যে। সৈন্যদল ত পাওয়া গেল—এবার ভাবতে হয় অর্থের কথা।

(ক্রমশ)

নরখাদকের মৃত্যু

অতুল চক্রবর্ত্তী

এক সময়ে শিবালিক পর্বতমালার এই অঞ্চল বিস্তর নরখাদক ব্যাঘ্রের অবাসভূমি ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুখ্যাত চম্পাবত বাঘিনীর কথা ধরা যেতে পারে। প্রথমে সে ছিল নেপাল রাজ্যের বাসিন্দা, সেখানে সে প্রায় দুইশত জন মানুষ হত্যা করে। অবশেষে নেপাল রাজের নির্দেশক্রমে একদল সশস্ত্র নেপালী সিপাহী তাকে অনুসরণ করলে সে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় এই কুমায়ুন অরণ্যে। আমার হাতে নিহত হবার পূর্ব পর্য্যন্ত সে আরও ২৩৪ জন মানুষের জীবন সংহার করে। অতএব তার নরহত্যার সংখ্যা মোট ৪৩৪ জন।

নরখাদক চৌগড় বাঘিনীকে বধ করতেও আমাকে কম বেগ পেতে হয়নি। দীর্ঘকাল অপলক আগ্রহে অনুসরণ করবার পর কী করে পরিশেষে তাকে শিকার করতে সমর্থ হয়েছিলাম তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি।

প্রথম যখন আমি খবর পেলাম, শুনলাম 'কালা-অগর' ফরেষ্ট্ বাংলোর আশে পাশে তার অবাধ দৌরাত্ম্য চলছে। স্থির করে ফেললাম অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। চারদিনের হাঁটাপথ ধরে এবং চার হাজার ফুট উঁচু এক গিরিশৃঙ্গ পার হয়ে এপ্রিল মাসের এক সকাল বেলায় উদ্দিষ্ট গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। গ্রামের মোড়লদের নিকট জানলাম চৌগড় বাঘিনীর শেষ সংবাদ পাওয়া গেছে প্রায় দিন দশেক আগে। এখান থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে এক কৃষক দম্পতিকে সে হত্যা করে ভক্ষণ করেছে। এতো দিনের পুরোনো খবর বিশেষ কোন কাজে আসবে না, তাই আর তেমন আগ্রহ দেখালাম না।

কিন্তু অচিরেই আবার খবর পাওয়া গেল, এখান থেকে দশ মাইল দূরে যখন কৃষক রমনীরা মাঠে শস্য-কর্ত্তনে নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে প্রকাশ্য দিবালোকে বাঘ মেয়েদের আক্রমণের চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মেয়েরা হঠাৎ বাঘটাকে দেখে ফেলায় এবং শোরগোলের সৃষ্টি হওয়ায় আতঙ্কিত ব্যাঘ্র মুখের শিকার পরিত্যাগ করে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে।

আমি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলাম এবং আরও শুনতে পেলাম নরখাদক বাঘিনী যখন জঙ্গলে আশ্রয় নেয় ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় একটি ব্যাঘ্র এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়। ক্রুদ্ধ আক্রোশে দু'টো বাঘ সারারাত ধরে জঙ্গলের মধ্যে গর্জ্জরাতে থাকে। এর ফলে গ্রামবাসীরা আতঙ্কে ঘুমোতে পারেনি। এমন কি দিনের বেলাতেও বাইরে যেতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রামবাসীদের অনুরোধে আমাকে দুদিন গ্রামেই থেকে যেতে হলো তাদের পাহারা দেবার জন্য। ফসল কাটা যেটুকু বাকি ছিল, সেটুকু তারা শেষ করল।

তারপর আবার আমি বেরিয়ে পড়লাম একা একা জঙ্গলের মধ্যে বাঘের অনুসন্ধানে, যেদিক থেকে শেষ বাঘের ডাক শোনা গিয়েছিল সেই দিক লক্ষ্য করে। বনের মধ্যে একা একা বাঘের সন্ধানে বেরোতে গেলে শিকারীকে কতগুলো বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে চলতে হয়। প্রথমতঃ পশু-পক্ষীর ভাষা সম্বন্ধে তার কিঞ্চিৎ জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক, অর্থাৎ হনুমান, সম্বর অথবা হরিণের চীৎকার কিম্বা পাখীদের ভয়ার্ত্ত কলরবের মধ্য থেকে অনেক সময়ে অরণ্যে ব্যাঘ্রের অবস্থান বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ সকল সময়ে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বাঘ সাধারণতঃ জঙ্গলের মধ্যে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করে এবং সচরাচর আসে বায়ুপ্রবাহের বিপরীত দিক থেকে। কারণ বাঘের উগ্র গন্ধ পেয়ে মানুষ যাতে পূর্ব্বেই সতর্ক হতে না পারে সেই জন্য এই কৌশল। অতএব শিকারীকে সর্বদা চেষ্টা করতে হবে একটানা বেশিক্ষণ যেন বায়ুপ্রবাহের মুখোমুখি তাকে অগ্রসর হতে না হয়, এই কথাগুলো মনে রেখে অতি সন্তর্পণে আমি বনের মধ্যে এগোতে লাগলাম।

চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল, উপত্যকার প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌছেছি। কিন্তু কোথাও বাঘের চিহ্ন দেখতে পেলাম না, এক গাছের ওপরে রাত কাটাতে হলো। ভোর হতেই আবার বেরিয়ে পড়লাম বাঘের সন্ধানে, খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে গেল কিন্তু বাঘের কোন হদিশ করতে পারলাম না। প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, এমন সময়ে হঠাৎ শুনতে পেলাম পাহাড়ের উঁচু কাঁধার ওপরে দাঁড়িয়ে কে যেন একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—ডাকছে—হো সাহেব হো! হো সাহেব হো!

ফিরে চাইতেই সে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি সেই সাহেব যে এখানে বাঘ শিকার করতে এসেছে? —আমি সম্মতি জানাতেই সে আবার বল্ল,—উপত্যকার দক্ষিণপ্রান্তে বেলা দুপুরের দিকে এক গিরিখাদের ধারে তার গরুর পাল চরতে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে তারা ছুটে এসেছে, একটা সাদা গরু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না,—এই সংবাদ পেয়ে আমি অবিলম্বে রওনা হলাম গিরিখাদের উদ্দেশ্যে।

ব্যাঘ্র ভয়সঙ্কুল এই অরণ্য অঞ্চলের এইটাই রীতি। বাঘের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেই গ্রামবাসিরা বৃক্ষ শাখা, টিলা অথবা কোন উঁচু স্থান থেকে চীৎকার করে পথিক ও সন্নিহিত গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দেয়। এই উপায়ে বিস্ময়কর ক্ষিপ্র গতিতে ব্যাঘ্রের উপস্থিতি সংবাদ সন্নিহিত সকল গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে।

যাই হোক নির্দিষ্ট গিরিখাদের পাশে উপস্থিত হয়েই অনুভব করলাম অভীষ্ট লক্ষ্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি। মাটিতে টানা লাঙ্গের নিদর্শন থেকে বুঝলাম বাঘ একটি গরু শিকার করে পাহাড়ের ঢালুর দিকে খানিকটা নেমে গেছে। সোজা পথে চলা নিরাপদ নয় মনে করে আমি একটা বাঁকা পথ ধরে ছোট এক টিলার ওপরে উঠলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল প্রায় ত্রিশ গজ দূরে সহসা একটি গরুর ঠ্যাং উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং সেই সঙ্গে কানে এলো দু'টো বাঘের গোঙানির শব্দ। বুঝলাম মাংসের ভাগ নিয়ে দুটো বাঘের মধ্যে বচসা হচ্ছে, কিন্তু পাথরের আড়ালে পড়াতে ব্যাপারটা তখনও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তাই হামাগুড়ি দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম। এইবার বাঘের থেকে আমার দূরত্ব প্রায় বিশ গজ। এবার পরিষ্কার দেখা গেল দু'টো বাঘ, একটার রং গাঢ় হলুদ অপরটি ফিকে হলুদ।

আমি আগেই খবর পেয়েছিলাম চৌগড় বাঘিনীর সঙ্গে তার এক পরিণত বয়স্ক শাবক সদা সর্বদা বিচরণ করে। কারণ বাঘিনী প্রথমে শিকার আক্রমণ করলেও তার দাঁত এবং নখের ধার বার্দ্ধক্য বশতঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ার ফলে শিকারকে হত্যা করবার ভার প্রকৃত প্রস্তাবে শাবকের ওপরেই ন্যস্ত হয়। শিকার নিহত হলে তখন উভয়েই পরিতোষপূর্ব্বক ভক্ষণ করে। কাজেই দুটি বাঘের মধ্যে একটি মাতা ও অপরটি শাবক তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু কোন্‌টি মাতা এ সমস্যার সমাধান দুরূহ হয়ে উঠল।

দুটি বাঘের মধ্যে একটিকে দেখলাম খুবলে খুবলে মাংস খাচ্ছে এবং অপরটি শিকারের পাশে শুয়ে শুয়ে থাবা চাটছে। যেটি থাবা চাটছে তার রং ফিকে হলুদ। অনুমান করলাম বয়স বেশি হয়ে যাওয়ার জন্যই রং ফিকে হয়ে গেছে, অতএব শায়িত ব্যাঘ্র অবশ্যই মাতা। তৎক্ষণাৎ রাইফেল তাক করে ঘোড়া টিপলাম। শায়িত ব্যাঘ্র একবার প্রবল বেগে লাফিয়ে উঠে ধরাশায়ী হলো। দ্বিতীয়টি চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হলো গিরিখাদের মধ্য দিয়ে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অপেক্ষা করবার পর সতর্কভাবে নিহত ব্যাঘ্রের দিকে অগ্রসর হতে লাগলাম। দূর থেকে এক টুকরো পাথর ছুড়ে দিয়ে যখন দেখলাম বাঘটি একেবারে অনড় তখন খুব কাছাকাছি উপস্থিত হলাম। কিন্তু হতাশ হলাম নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারিনি। যে-বাঘটি হত্যা করেছি সেটা নরখাদক চৌগড় বাঘিনী নয়, তার শাবক। আসল শয়তান পালিয়েছে। শিকার স্কন্ধে বাঘার পর পরবর্ত্তী বারো মাস এই নর হন্তারকের আর কোন সন্ধান করতে পারিনি। ইতি-মধ্যে সে আরও প্রায় পনেরো-বিশ জন মানুষ হত্যা করেছে।

অরণ্যের নানা অঞ্চল ঘুরে পরবর্ত্তী ফেব্রুয়ারী মাসে আবার ফিরে এলাম পূর্বস্থানে। গ্রামবাসীদের নিকট থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বাঘের গতিবিধি সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করলাম। শুনলাম, অল্প কিছুদিন পূর্বে অনতিদূর এক গিরিখাদের পাশেই বাঘ একটি বলদ হত্যা করেছে। স্থির করলাম ঐ খাদের পাশেই বাঘের মুকাবিলা করতে হবে। স্থানটি ভাল করে পরীক্ষা করলাম। এক ধারে দেখলাম একটা পুরোনো গাছ ঝড়ে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে পড়ে রয়েছে। তার সঙ্গে একটা জোয়ান বয়সের ষোষ বেঁধে রেখে প্রায় পঁচিশ গজ দূরে এক অনুচ্চ পাহাড়ের কাঁধায় রাইফেলে গুলি পুরে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। সূর্য্য তখন পাহাড়ের আড়ালে হেলে পড়েছে দিনের আলো কিঞ্চিৎ ঝাপসা হয়ে এসেছে।

হঠাৎ বেঁধে ষোষটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমি যেখানে বসে আছি সেই-দিকে ঘন তাকাচ্ছে। বুঝলাম সে ভয় পেয়েছে, কিন্তু চারদিকে তো ভয় পাবার মত কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না। তবে আমি যেখানে বসে রয়েছি ঠিক তারই নীচে পাহাড়ের ফাঁকে কি কিছু গন্ধ পেতে রয়েছে। সত্যিই তাই। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। অকস্মাৎ প্রকাণ্ড একটা বাঘের মাথা বেরিয়ে এলো আমার নাসির তলা থেকে। নিশ্চয়ই সে আমাকে দেখতে পায়নি। তার একাগ্র দৃষ্টি বদ্ধ ষাঁড় মহিষের ওপর। যদিও বাঘটা ছিল আমার রাইফেলের অতি নিকট পাল্লার মধ্যে, তবু আমি তাকে গুলি করলাম না। কারণ তাতে নিজের অবস্থান প্রকাশ হয়ে পড়তো এবং ভাল করে রাইফেল তাক করবার সুযোগ পেতাম না।

পরক্ষণেই দেখি বাঘটা ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ষোষের ওপর। এইবার সুযোগ এসেছে। বাঘের দক্ষিণ খুলি লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে তৎক্ষণাৎ গুলি চালালাম। শিকার ছেড়ে দিয়ে বাঘটা নিমেষে উধাও হয়ে গেল বনে মধ্যে। বুঝলাম গুলি ব্যর্থ হয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এভাবে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কোন কারণ ছিল না! আমার নিশানা কি এতোই ভুল হয়ে গেছে! ষোষটা কিন্তু মরে পড়ে আছে নিশ্চল নিথর। তবে কি গুলিটা, বাঘের বদলে ষোষের গায়েই লেগেছে!

সূর্য্য ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে। অন্ধকার ছেয়ে আসছে ধীরে ধীরে। নিজের চৌকি আগলেই বসে থাকলাম। অন্ধকারে বনের মধ্যে যাবোই বা কোথায়! আর

যাওয়াও তো নিরাপদ নয়। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময়ে দেখা গেছে, গুলি খেয়ে যাওয়া বাঘ যদি রাইফেলের অগ্নিশিখা দেখতে না পেয়ে থাকে তবে নিহত শিকারের কাছে আবার ফিরে আসে। আমি সেই ক্ষীণ সম্ভাবনার আশা মনের মধ্যে লালন করতে লাগলাম।

সত্যিই অবাক কাণ্ড! প্রায় দশ মিনিট পরে দেখলাম আবার একটা বাঘের মাথা বেরিয়ে এসেছে আমার ঘাঁটির ঠিক নীচ থেকে। আমি নিঃশব্দে লক্ষ্য করতে লাগলাম। বাঘটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল মৃত মহিষের কাছে। আবার সুযোগ এসেছে। এবার যাতে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সেজন্য বহুক্ষণ ধরে তাক করে বন্দুকের ঘোড়া টিপলাম। কিন্তু এবারেও ঘটল পূর্বেই সেই পুনরাবৃত্তি। বাঘটা ছুটে গিয়ে পাশের এক নালার মধ্য দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুটো গুলিই ব্যর্থ। ক্ষোভে নিরাশায় নিজের চুলটেনে ছিঁড়তে ইচ্ছে করতে লাগল। যাই হোক ঘাঁটি ছেড়ে আর নামলাম না সারারাত কেটে গেল পাহাড়ের কাঁধায় বসে। শীতে দেহের রক্ত প্রায় জমে যাবার মত।

ভোরের আলো ফুটতেই গ্রামবাসীরা কলরব করতে করতে এসে উপস্থিত হলো আমার সামনে। দুটো গুলির আওয়াজ তারা শুনেছে, উত্তেজনা ও উদ্বেগে রাত্রিতে তাদেরও ঘুম হয়নি। আমার নিকটে এসে যখন রাত্রির নিষ্ফল প্রচেষ্টার সংবাদ শুনতে পেলো নৈরাশ্যে ম্রিয়মান হলো তাদের মুখের চেহারা কিন্তু তবু যেন ঠিকমত বিশ্বাস হচ্ছিল না ওদের। এদিক ওদিক খুঁজে দেখতে লাগল বনের মধ্যে। সহসা একজন চেঁচিয়ে উঠল—সাহেব, সাহেব, ইহ্ দেখো!—ছুটে গিয়ে দেখলাম সত্যি একটা বাঘ মরে পড়ে রয়েছে বনের মধ্যে। গুলি লেগেছিল কানের পিঠে। যাক্ তবু কিঞ্চিত মুখ রক্ষা হলো। তাহলে দুটো গুলিই ফাঁকা যায়নি।

সামান্য একটু পরেই আবার আর একদল চেঁচিয়ে উঠল—সাহেব, ইহ দেখো দুসরা বাঘ! সত্যিই তো! বিস্ময়ের ওপরে বিস্ময়! নালার মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে একটি বাঘিনী, এরও গুলি লেগেছিল মাথায়। বাঘিনী দেখতে পেয়েই গ্রামবাসীরা আনন্দে দুহাত তুলে নাচতে আরম্ভ করলো। তারা ভাবল, নিশ্চয়ই এটা সেই কুখ্যাত নরখাদক চৌগড় বাঘিনী। আমি কিন্তু নিঃসন্দেহে জানতাম, এটা চৌগড় বাঘিনী নয়। "কালা অগর" বাংলোর দশ মাইল দূরে চৌগড় বাঘিনীর যে থাবার ছাপ আমি মাটিতে দেখেছিলাম সেটা চিরকাল আমার মনে থাকবে। এক হাজার বাঘের থাবা থেকেও সে থাবা আমি অনায়াসে চিনে বের করতে পারবো। অতএব চওড়া থাবা আর আমি দেখিনি। তা ছাড়া বার্দ্ধক্যহেতু নখগুলো সব ছড়ানো এবং তালুর মধ্যভাগে একটা গভীর দাগ আছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা কিছুতেই আমার কথা শুনতে চায়না তারা আনন্দে আত্মহারা।

তবুও গ্রাম ত্যাগ করবার আগে আমি ওদের সতর্ক করে দিয়ে গেলাম ওরা যেন হুশিয়ার হয়ে চলাফেরা করে, কারণ প্রকৃত শয়তান এখনও মরেনি। কিন্তু আমার উপদেশ তারা মান্য করেছিল বলে মনে হয়না। আবার যখন পরবর্তী এপ্রিল মাসে ফিরে এলাম 'কালা-অগর' জঙ্গলে তার মধ্যে আরও সাত আট জন মানুষ চৌগড় বাঘিনীর পেটে গেছে।

বহুদিন ধরে এই ভয়ঙ্কর বাঘের পেছনে ব্যর্থ মনোরথে ঘুরে ঘুরে আমার মনের মধ্যেও খানিকটা ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটেছিল। তাই এবার মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম, যে করেই হোক এবার চৌগড় বাঘিনীর মুকাবিলা করতে হবে। জঙ্গলের মধ্যে যে সকল স্থানে বাঘের আনাগোনা বেশি শিকারীরা সহজেই সে স্থান চিনতে পারে। তাই উপযুক্ত একটি স্থান নির্বাচন করে সঙ্গে নিলাম দু'জন লোক—একজন আমার বিশ্বস্ত অনুচর মাধো সিং দ্বিতীয় জন গ্রামের একটি সাহসী যুবক। উপরন্তু একটি তেজী মহিষও নিলাম সঙ্গে।

জঙ্গলের মধ্যে অল্প পরিসর একটা খোলা জায়গায় মোষটাকে বেঁধে যুবকটিকে তাকে ঘাস কেটে খাওয়াতে বল্লাম। আর আমার নির্দেশে মাধো সিং পাশের একটি শুক্ গাছে চড়ে গ্রাম্য ভঙ্গিতে গান গেয়ে গেয়ে কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটবার ভাণ করতে লাগল। আমি একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে ধূমপান করতে লাগলাম। আমার ডান হাতে গুলি ভরা ২৭৫ ক্যালিবারের হাল্কা রাইফেল।

বেলা তখন ঠিক দুপুর। হঠাৎ অনুভব করলাম বাঘ এসে উপস্থিত হয়েছে আমাদের আশেপাশে। কারণ মোষটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাঘের অবস্থান ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারলাম না। সামনের তিনদিকে বেশ খানিকটা দৃষ্টি চলে কিন্তু সেদিকে বাঘের কোন অস্তিত্ব নজরে পড়ল না। তাহলে কি সে লুকিয়ে আছে আমাদেরই পেছনে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে? আমার ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ খুঁজছে?

শিস বাজিয়ে মাধো সিংকে ইঙ্গিত করলাম। সে কাঠ কাটা বন্ধ করে নীচে নেমে এলো। আর যে ছেলেটি ঘাস কাটছিল তাকেও ইশারা করে ডাকলাম আমার পাশে। কিন্তু বাঘ কোথায়? পেছনে ছোট ছোট ঝোপের মধ্যে দৃষ্টি ভাল চলে না। সামনে শুক একটি ছোট পাহাড়ি নালা, ওপাড়ে খানিকটা উঁচু জমি। ভাবলাম, নালা পার হয়ে উঁচু জমির ওপরে

উঠলে শিকার সন্ধানের সুবিধা হবে।

তিনজনেই নেমে পড়লাম নালার মধ্যে। নামতেই চমকে উঠে দুটি পাহাড়ি পাখী পাথরের খোড়লে তাদের দুটি ডিম ফেলে রেখে উড়ে গেল ভয় পেয়ে। ডিম দুটির রং গাঢ় নীল, তাদের আকারও বিচিত্র। একটি সুডৌল গোল, দ্বিতীয়টি লম্বাটে ধরণের। পাখীর ডিম সংগ্রহ করা আমার আবার সৌখিন খেয়াল। ডিম দুটো তুলে নিলাম বাঁ হাতের মুঠোয় আর ডান হাতে রাইফেল নিয়ে সেফটি ক্যাচ খুলে এগিয়ে চল্লাম সামনে। আমার ঠিক পেছনেই মাধো সিং তারপর সেই ছেলেটি। ওদিকে বাঘও যে আমাদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে তা আগে বুঝতে পারিনি।

নালার মধ্যে নেমে দেখি পার হবার মত ঢালু কিনার কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা এগিয়ে চলতে হলো আরও সামনের দিকে। প্রায় চল্লিশ গজ এগোবার পর সম্মুখে এক ক্ষিপ্র বাঁক। দৃষ্টি সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। বাঁকের মোড়ে কী আছে কিছুই নজরে পড়ে না।

বাঁক ঘুরতেই দেখি সাক্ষাৎ যম। বিরাট একটা বাঘ সামনের দুই থাবা পেতে কুনুই-এর ওপর ভর দিয়ে পেছনের দুই পা ভাঁজ করে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আমাদের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছে। বুঝলাম জীবনের এক চরম মুহূর্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়েছি। হয় নিজেকে নতুবা বাঘকে আজ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

আমার অবস্থা দেখে আমার পশ্চাদ্বর্তী অনুচর দু'জন পাথরের মত দাঁড়িয়ে গেছে। বাঘের মুখে যেন একটা হাসি হাসি ভাব। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর গৃহপালিত কুকুর যেমন প্রত্যাগত প্রভুকে দেখে পুলকিত হয়ে ওঠে, বাঘের দৃষ্টিতেও তেমনি একটা পরম পরিতোষ। আমার বাঁ হাত পাখীর ডিম এবং ডান হাতে রাইফেল আড়াআড়ি ভাবে বুকের কাছে ধরা।

অপলক দৃষ্টিতে বাঘের চোখে চোখ রেখে অতি সন্তর্পণে একহাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাইফেলের নল বাঘের সঙ্গে নিশানা করলাম। বাঘ যেন চিত্রার্পিত ও সম্মোহিত। হঠাৎ এক সময়ে খোড়া টিপলাম। গুড়ুম করে এক গগনবিদারী আওয়াজ হলো এবং তার তীব্র প্রতিধ্বনি কম্পিত হতে লাগল বন থেকে বনান্তরে। অবরুদ্ধ গিরি কন্দরে প্রতিধ্বনি স্বভাবতই উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হয়।

মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক তখনও ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে ছিল। হয়তো বা শেষ মুহূর্তে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাবে, নতুবা বন্দুক ছুটবে না এবং আমার জীবনান্ত হবে ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মরণালিঙ্গনে, যেমন মাঝে মাঝে গল্পে শোনা যায়। না তেমন কিছু হয়নি। মোক্ষম আঘাত লেগেছিল বাঘের। বুলেট তার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে চূর্ণ করে দিয়েছিল ফেফরও। ক্ষতস্থান থেকে ফোয়ারার মত রক্ত ছুটলো ফিনকি দিয়ে। বাঘের আর সাধ্য ছিল না ধীরে ধীরে কাত হয়ে শুইয়ে পড়ল অন্তিম ভূমি-শয্যায়। আমি নিজেও যেন ঘুরিয়ে গিয়েছিলাম। সর্ব্বাঙ্গ ঘর্মসিক্ত এবং পা দুটি অবশ। মনে হলো এক্ষুনি পড়ে যাবো মাটিতে, মাধো সিং পেছন থেকে ছুটে এসে আমাকে ধরে ফেল্ল এবং রাইফেলটা ছাড়িয়ে নিল নিজের হাতে।

মৃত্যুর পর থাবা পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হলাম—এই-ই সেই দুর্দ্ধর্ষ চৌগড় বাঘিনী যার নরহত্যার সংখ্যা সরকারি হিসেবে চৌষট্টি কিন্তু বেসরকারী হিসেবে তার দ্বিগুন। প্রায় এক বৎসরের ওপর এই নরখাদককে ছায়ার মত অনুসরণ করে বেরিয়েছি। অবশেষে নিজের একাগ্র প্রচেষ্টা সার্থক হওয়াতে অবশ্যই আনন্দিত হয়েছিলাম, কিন্তু এর জন্য যে বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলাম, ঈশ্বরের অপরিসীম করুণা ভিন্ন তার কবল থেকে নিস্তার পাওয়া একান্ত আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। পরে মেপে দেখেছি যখন আমি গুলি চালাই তখন বাঘের সঙ্গে আমার দূরত্ব ছিল মোটেই আড়াই গজ।

এই ঘটনার পর ভেবে দেখেছি, আমার জীবন রক্ষার জন্য কয়েকটি আকস্মিক বিষয় বিশেষ ভাবে দায়ী। প্রথমতঃ আমার হাতে যদি হাল্কা রাইফেল না থাকতো, তা হলে বোটাকে কিছুতেই একহাতে আয়ত্ত করতে পারতাম না। দ্বিতীয়তঃ নির্নিমেষে চোখে চোখে চেয়ে থাকায় ফলে বাঘও খানিকটা বিমূঢ়াহত হয়ে পড়েছিল তার ফলে আমি ধীরে ধীরে বন্দুক তাক করবার সুযোগ পেয়েছি। তৃতীয়তঃ বাঁ হাতে পাখীর ডিম থাকাতে আমি দু'হাতে বন্দুক ধরতে পারিনি। দুহাতে বন্দুক ধরলে তার ফল মারাত্মক হতে পারতো। বাঘ হয়তো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তো আমার ওপর। চতুর্থতঃ বাঘটি মানুষখেকো হবার ফলে হঠাৎ ভড়কে গিয়ে পালাবার চেষ্টা করেনি। সাধারণ বাঘ হলে হয়তে থাবা মেরে পালাবার চেষ্টা করতো। পুরো ওজনের বাঘের থাবা খেলে খুব কম শিকারীই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারে। সর্বোপরি আমার মনে হলো পাখীর ডিম দুটিই আমার জীবন রক্ষা করেছে। অন্যান্য শিকারীর মত আমারও অনেক কুসংস্কার আছে। ধীরে ধীরে গিয়ে পাথরের যে কোটর থেকে ডিম দুটি সংগ্রহ করেছিলাম সেখানেই রেখে এলাম।

(কর্ণেল জিম করবেট-এর রচনা থেকে সংকলিত)

মহানগরী কলিকাতা

শ্রীঅমিত রায়

হে মহানগরী কলিকাতা তোমার আজ একি রূপ,
দুঃশাসনের হাতে পড়ে একি হয়েছে তোমার হাল।
যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি তোমার অঙ্গহানি,
সুন্দরী কলিকাতা তোমার আনাচে-কানাচে আজ কেন এত জঞ্জাল ?
পথে পথে, মাঠে-ঘাটে, অলিতে গলিতে যেদিকে তাকাই
শুধু স্তূপীকৃত-জঞ্জাল। চতুর্দিকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ।
স্বাস্থ্য হানিকর পরিবেশে বাস করছি মোরা।
তুমি কি দেখছ না ? তোমার দৃষ্টির পথ কে করিল রুদ্ধ ?

তুমি না কলিকাতা, প্রাচীন ভারতের রাজধানী
তোমার সর্ব্বাঙ্গে আজ কেন এত ধূলিকণা ?
বড় বড় নেতারা কোন কর্মে লীন ?
কেন তুমি হয়ে আছো আজি আনমনা ?

তোমার বুকের উপর দিয়ে চলে যায় কত শত গাড়ী-ঘোড়া,
চলে যায় মানব কঙ্কালের মিছিল, কণ্ঠে ওদের স্লোগান।
অবসন্নতার দিশেহারা মদমত্ত যুবক ওরা ;
পথে পথে উহল দিয়ে ফেরে সন্ত্রাসবাদীরা হাতে পাইপগান।

রিক্ত হয়েছে আজ তোমার খাদ্য ভাণ্ডার।
দোকানে দোকানে চাল নেই, ডাল নেই, নেই কেরোসিন।
তাই বের করছ আজ সন্তানেরে দিয়া ভিক্ষা ভাণ্ড।
নাই নাই কিছু নাইরে—আছে বিরক্তিকর লোড শেডিং।

কলিকাতা, বাংলার রাজধানী তুমি কি হতে চলেছো
মুর্শিদাবাদ ? যেদিকে তাকাই আজ নেই, নেই, নেই।
কালোবাজারী, মুনাফাখোর খল ব্যবসায়ী ধরতে
সরকার আজ হারিয়ে ফেলেছেন খেই।

জাগো, জাগো কলিকাতা, প্রাসাদ-নগরী।
উঠে-পড়ে লাগো লয়ে যৌবন শক্তি।
ভাঙো আর গড়ো পুরাতনেরে দাও ফেলিয়া,
ভেঙে ফেল, খলতা, ভেঙে ফেল জড়তা
'গরিবী হঠাও' বলে গরীব হঠানো ওরা তুমি না রুখিলে
জাগো জাগো কলিকাতা, চেয়ে দেখ দুচক্ষু মেলিয়া।

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েদ কর্তৃক ৮, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ স্থিত প্রেস এণ্ড লিটারেচার (ইণ্ডিয়া) হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

1st August 1974

NISHANA
Phone : 44-1460

Regd. No. RN—24618/73
Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from :

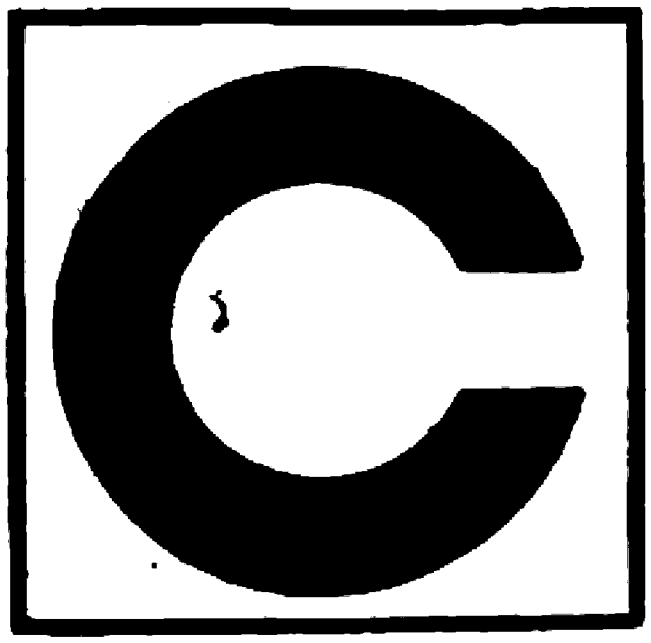

Gram : GOLEATHERS

Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

20H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, SILK & HANDICRAFTS

CENTRAL LIBRARY

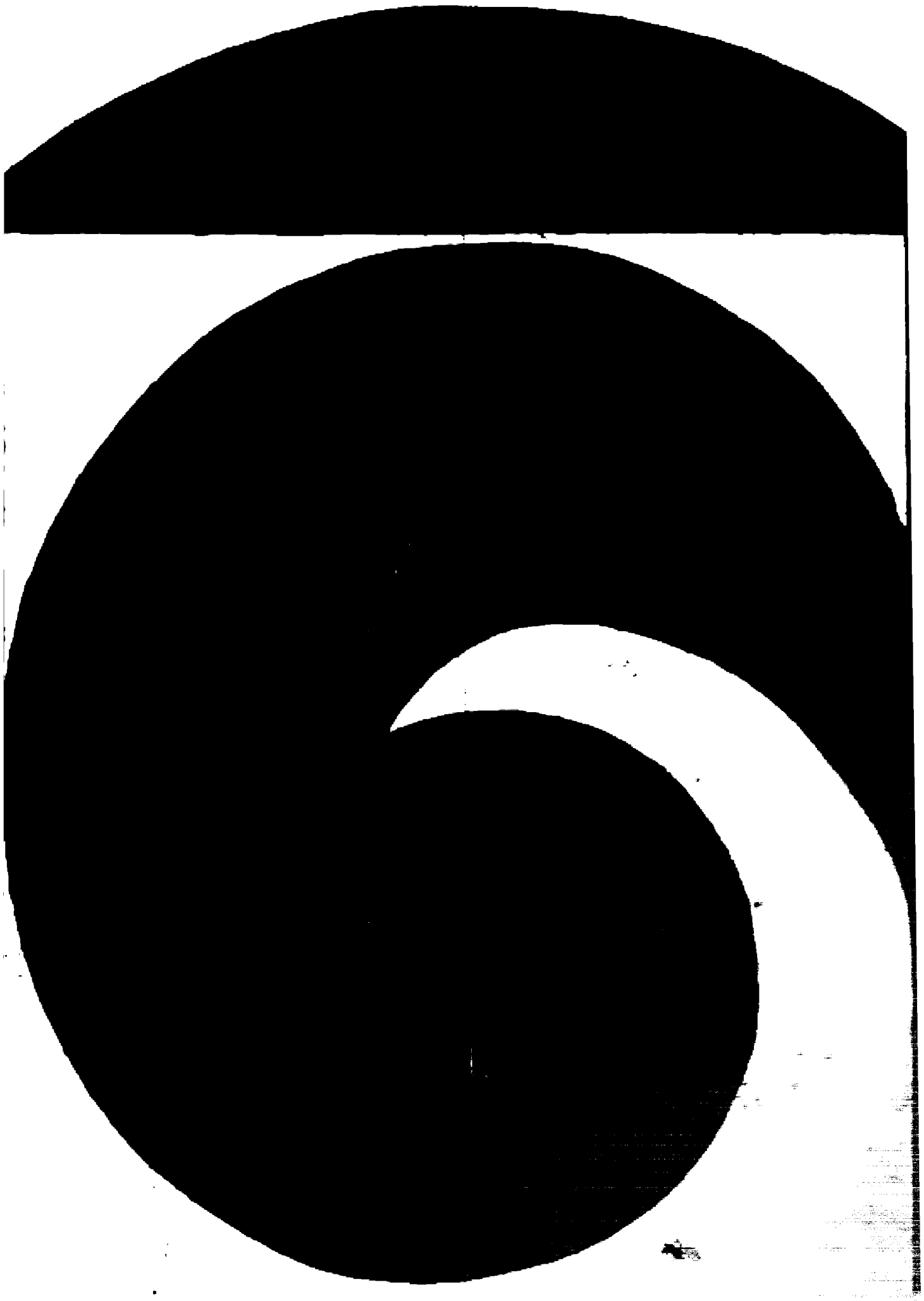

১৬শ (ষোড়শ) সংখ্যা ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৪

দি রেডিয়েন্ট প্রসেস্
৬এ, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০১৩

Progress and Prosperity

goes with hard work

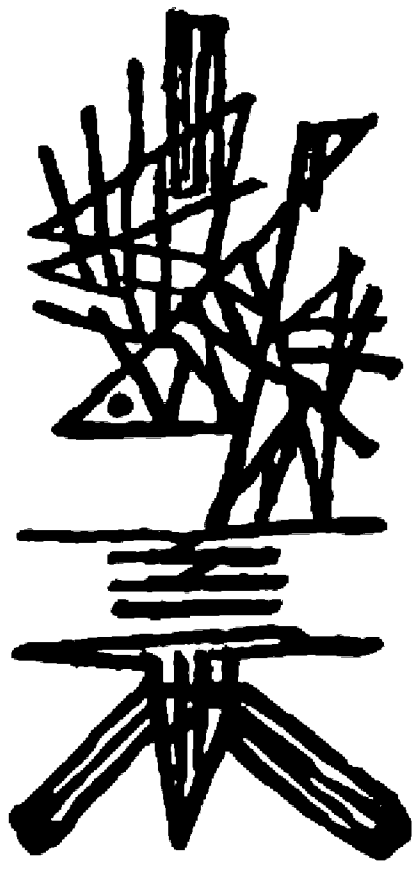

ARTS & PRINTS PVT. LTD.

31 PARK MANSION

CALCUTTA-16

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১। শোক প্রস্তাব	...		...	৪৭৮
২। ডমিনিয়ন ষ্টেটাস কি পূর্ণ স্বাধীনতা	...	সম্পাদকীয়	...	৪৪৯
৩। কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্র (উদ্ধৃতি)	...	শরৎ চন্দ্র বসু	...	৪৫১
৪। ১৫ই আগষ্টের ভাবনা	...	ধীরেন মুখার্জী	...	৪৫৩
৫। স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার কথা	...	নিকুঞ্জ সেন	...	৪৫৫
৬। মুন্তফীর ডায়েরী	...	সুবিনয় মুন্তফী	...	৪৬৩
৭। দিল্লীর কড়চা	...	কালিকিংকর চট্টোপাধ্যায়	...	৪৬৫
৮। ওরা কাজ করে (কবিতা)	...	অশোক সাহা	...	৪৬৬
৯। স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম	...	নিকুঞ্জ সেন	...	৪৬৭
১০। নানা রঙের দিনগুলি	...	রসময় সূর	...	৪৬৮

সম্পাদকমণ্ডলীঃ

১। শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র জোয়ারদার
২। অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩। অধ্যক্ষ ডঃ হিমাংশু রায়
৪। ডঃ কল্যাণ বসু
৫। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়
৬। ডাঃ স্মৃতিরঞ্জন গুহ
৭। শ্রীমতী প্রতিভা নিয়োগী
৮। শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীত হারা,
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে,
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—

—শোক প্রস্তাব—

নিশানার সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সভ্য অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তের পরলোকগমনে, স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণের সভায় গৃহীত প্রস্তাব :

"স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও নিশানার সভ্যবৃন্দ নিশানার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম সভ্য এবং স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিশিষ্ট সদস্য অধ্যাপক ক্ষিতিপ্রসন্ন সেনগুপ্তের পরলোকগমনে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করিতেছে। এই সভা তাঁহার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করিতেছে।"

নিশানা

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৮১ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৭৪

সম্পাদকীয়

ডমিনিয়ন-ষ্টেটাস কি পূর্ণ স্বাধীনতা ?

তথাকথিত স্বাধীনতার আজ ২৭তম বৎসর পূর্ণ হল। যাঁরা ডমিনিয়ন ষ্টেটাসের সুবিধেমত মোহনীয় ব্যাখ্যা করে একাধারে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ও আত্মস্বার্থের বনিবনাও করে নিয়েছিলেন, তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে।

তাঁরা আপন অকর্মন্য পেটোয়া লোকদের সহযোগে বিবেকহীন এক দুঃশাসনের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। এবং ভারতীয় শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্যিক বিপুল সম্ভাবনাকে সাম্রাজ্যিক শিল্প-বাণিজ্যের কাছে মর্গেজ করে ব্যাপক দালালির সম্পদে নিজেরা সম্পৎশালী হয়েছেন। স্বদেশী-বিদেশী মুষ্টীমেয়র স্বার্থে জনসাধারণের স্বার্থ বলি দিয়েছেন।

এই ঐতিহাসিক ভোজবাজীর-ই অপর নাম ডমিনিয়ন-রাজ (Dominion Status)। রক্তাক্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামী আমেরিকা এই ডমিনিয়ন-রাজকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছিল। রক্তে—বর্ণে—ধর্মে—ভাষায় এক হয়েও সে স্বদেশের স্বাধীনতাকে ডমিনিয়নরাজের বিনিময়ে বিসর্জন দিতে রাজী হল না। জর্জ ওয়াশিংটন রণক্ষেত্রে বৃটনের ডমিনিয়নরাজের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন ; এবং শুক্র-লিখিত শান্তির প্রস্তাব না পড়ে ফেরৎ দিয়েছিলেন। অথচ স্বাধীনতা লাভের মাত্র একশত বছরের মধ্যে শিল্পোৎপাদনে, বাণিজ্য সম্প্রসারণে, ক্ষাত্রশক্তি অর্জনে ও শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠের আসন আমেরিকা দখল করল। অপর দিকে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যও বৃটনকে আমেরিকার দ্বারস্থ হতে হয়, পঁচিশ বছরের মধ্যে দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভ্যন্তরে (১৯১৪—১৮) এবং (১৯৩৯—৪৫) সনের ব্যবধানে। দেশদ্রোহী যে-সব সন্ত আমেরিকা-ত্যাগী ডমিনিয়ন-ষ্টেটাস ভক্তদের শেষ আশ্রয় হিসেবে কেনাডা ডমিনিয়ন রচিত হয়েছিল ; তারও রক্ষা ভার কালক্রমে আমেরিকার দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে দাঁড়াল।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আয়ারল্যাণ্ড সাত শত বছর বৃটিশ আধি-পত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করল। প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৮) সুযোগে মোক্ষম আঘাত হেনে ডমিনিয়নরাজ-এর প্রস্তাব পেল। যাঁরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আজ ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে। সংগ্রামী আয়ার ডমিনিয়নরাজের জাবিজুরি ব্যর্থ করে পরবর্তী ২৬ বছরের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করল (১৯৪৯)। লুটেরা বৃটিশ শোষণে শোষিত দরিদ্র আয়ার (Eire) আজ তাঁর সারা দেশের প্রতিটি গ্রামে নগরে শিল্পোৎপাদনের গুরুত্বে ভরপুর। তার প্রিয়তম সংগ্রামী নেতা বলতেন আমার আকাঙ্ক্ষা নব নব শিল্পোৎপাদনের দাক্ষিণ্যে আয়ারের প্রতিটি নগর গ্রাম্যকুটীরকে সমৃদ্ধ করে এমন একটি আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যার ফলে, ভরাপেটে মুক্ত মনে প্রতিটি নাগরিক গোধূলি লগনে করজোড়ে ভগবানের নাম কীর্তন করতে পারে ! বলা বাহুল্য, তার সে আকাঙ্ক্ষা ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আজ ৯২ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তিহীন দেবতুল্য মহামানব। প্রতি গৃহ তার প্রথম সন্তানকে ডি ভ্যালেরার কাছে এনে আশীর্বাদ কামনা করে। দৃষ্টির আলোকে না হলেও অন্তরের আলোকে দেশের তরুণ তরুণীর সন্তানকে তিনি দেখতে পান এবং তাদের হৃদয়স্থল স্পর্শ করে উচ্চারণ করেন "দেশ" আর শিরস্পর্শ করে উচ্চারণ করেন "ভগবান"—এই তার শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ।

হিংস্র সাম্রাজ্যবাদ আয়ারের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক অংশ (৩২ ভাগের ৬ ভাগ)-কে থাবা মেরে আলগা করে নিয়েছিল, যার নাম উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। উত্তর আয়ার-ল্যাণ্ডের ঘরের আগুন আজো দাউ দাউ করে জ্বলছে। যাঁরা আইরিশ ফ্রি ষ্টেট (Dominion) ও দেশ-বিভাগকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁরা আজো বৃটিশ আর্মির প্রহরাধীন বিপুল সংখ্যালঘিষ্ঠ ক্যাথোলিক সম্প্রদায়ের উপর একটানা নির্যাতন

ও বঞ্চনার অধিকার ভোগ করে আসছেন। যদিও প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় নামে মাত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠ।···আইরিশ এবং ক্যাথোলিক হয়েও শত ইচ্ছা সত্ত্বেও এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আয়ারের (Eire) সঙ্গে সংযুক্ত হতে পেলেন না। ···মৃত্যুঞ্জয়ী আইরিশ রিপাব্লিক আর্মি (I.R.A.)-ও প্রটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায়কে শান্তিতে আহার-নিদ্রা ভোগ করতে দিচ্ছে না। আজ আই. আর. এ.-এর মারণাস্ত্রের দীর্ঘ হস্ত ইংল্যাণ্ড পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত এবং সদা উদ্যত।···একাধিক্রমে বিগত ৫ বৎসর বৃটিশ বাহিনীর সামরিক শাসন চালিয়ে এক 'পাওয়ার শ্যারিং' (Power Sharing) গভর্ণমেণ্ট রচনা হয়েছিল; তারও অকালমৃত্যু হওয়াতে আবার সামরিক শাসন চালু হয়েছে। নতুন ফর্মূলা এখনও আবিষ্কার হয়নি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় দক্ষিণে Eire-এর সঙ্গে যোগদানের ভয় দেখাচ্ছে। স্মরণ থাকে ৩২ কাউণ্টি (County) যুক্ত আয়ারল্যাণ্ডের ৬টি মাত্র কাউণ্টি (৩টি প্রটেষ্টাণ্ট এবং ৩টি ক্যাথলিক) জোর করে আসগা করে নিয়ে এই আলষ্টার বা উঃ আয়ারল্যাণ্ডের সৃষ্টি, সাম্রাজ্যিক স্বার্থে।···শেষ সমাধান আর বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে বলে মনে হয় না। আয়ারের সংবিধান আদর্শ-গতভাবে সমগ্র আয়ারল্যাণ্ডের-ই সংবিধান।···

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোড়াতে জর্মান অভিযানে পর্য্যুদস্ত ফরাসীর কাছে দুর্লোভী ডানকার্ক প্রত্যাগত ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী সরকার ফরাসী দেশকে ডমিনিয়নরাজ্য হিসেবে (বৃটু)কমনওয়েলথ-এ যোগ দিতে আমন্ত্রণ দিয়েছিল। ফরাসী সামরিকভাবে ডুবে গেল! তবু একটি ফরাসী নাগরিককে পাওয়া গেল না, যিনি এই রাজকীয় অবমাননাকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় শিরোধার্য করবেন। দেশ-প্রেমের মূর্ত্ত প্রতীক ফরাসী জাতি মিত্র শক্তিরই সাহায্যে মরণপণ লড়াই করে স্বদেশের পুনরুদ্ধার সাধন করল, দু'গলের অবিসংবাদী নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও (বৃটু)ডমিনিয়ন মর্যাদায় নিজেকে কলঙ্কিত করল না। তবু উভয়ের প্রয়োজনে পারস্পরিক সাহায্য সুলভ হল।·····

অথচ সব জেনে বুঝে ভারতীয় আভ্যন্তরীন নেতৃত্ব, আপন পবিত্র স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নেতাজীর যুগান্তকারী স্বাধীনতা সংগ্রামকে আশু ব্যর্থ করল; এবং ভারতবর্ষকে খণ্ডিত এবং ডমিনিয়ন-রাজের নরকে নিমজ্জিত করল! অবাক লাগে, ভারতে এই কুখ্যাত ডমিনিয়ন-রাজ কায়েম হবার দু'বৎসরের মধ্যে আয়ারের অবিসংবাদী নেতা ডি, ভেলেরা, অক্লান্ত সংগ্রামে ডমিনিয়ন-রাজের শ্মশানের উপর আবার রিপাব্লিক-এর কমনওয়েলথ বহির্ভূত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করলেন (১৯৪৯)!

তবু ইতিহাসের সকল শিক্ষা ব্যর্থ করে, অশুভ মুহূর্ত্তে সমগ্র জাতির চোখে ধুলো নিক্ষেপ করে পর্দার আড়ালে আপোষে ভারতীয় ক্ষমতার মালা বদল হয়ে গেল (১৯৪৭)! বিভ্রান্তকারী জারি-জুরি, জাক-জমক, মিথ্যা সভা শোভাযাত্রা ঢাক ঢোল পিটিয়ে অসহায় দেশের বুকে ডামনিয়ন-রাজের জগদ্দল পাথরটা চাপিয়ে দেখা হল। স্মরণ থাকে যুদ্ধোত্তর বিপ্লব-বাহী ভারতীয় নৌ বিদ্রোহকে-ও অল্পকাল মাত্র পূর্বে বিভ্রান্ত করা হয়েছিল। এক কথায় ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম মধ্যাহ্নগগনে অস্ত গেল!

১৪ই আগষ্ট (১৯৪৭) মধ্য রাত্রি বারোটার পর গভর্ণর জেনারেল মাউণ্ট ব্যাটেনের পৌরহিত্যে ঘটা করে পণ্ডিত প্রবর নাটকীয় ভাবাবেগে ভারতীয় ডমিনিয়ন ষ্টেটাস-কে স্বাধীনতা বলে ঘোষণা করলেন। ডমিনিয়ন-কনষ্টিটিউয়েণ্ট এসেম্বি (গণ পরিষদ)-এ মনোনীত গভর্ণর জেনারেল হিসেবে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেন উক্ত ডমিনিয়নের আনুষ্ঠানিক জন্ম লগ্নে, রাজকীয় শুভেচ্ছাবাণী পড়ে শোনালেন। সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রত্যুত্তরে ভাবা-বেগের আতিশয্যে বলে বসলেন,···বৃটিশ জাতির ইতিহাস-গত গণতান্ত্রিক আদর্শের ও ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ বিকাশই এর মধ্যে লক্ষনীয় (···"It is the consumation and fulfilment of the historic tradition and democratic ideals of the British race বৃটিশ সাম্রাজ্যের পৌনে দু'শ বছরের লুটতরাজ ও নৃসংশ অত্যাচারের ইতিহাস কর্পূর হয়ে গেল! তথাকথিত ক্ষমতার লোভে, আজীবন এমনি বুঝি, স্বাধীনতা সংগ্রামীর জিভ-ও আড়ষ্ট হয়ে গেল!··· বরং এ কৃত্রিম অনুষ্ঠানের কিছুকাল পর, এক গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তিতে পণ্ডিতজী সত্যের ধার ঘেঁষে বলেছিলেন:

"The truth is that we were tired men and we were getting on in years too. Few of us could stand the prospect of going to prison again—and if we had stood

(৪৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কমনওয়েলথ্-এর অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্র

(১৮ই এপ্রিল, ১৯৪৯-এর "দি নেশন" পত্রিকায় স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়ের পূর্ণ বয়ান)

(উদ্ধৃতি)

শরৎ চন্দ্র বসু

লণ্ডনের 'ডেইলি মেল' পত্রিকায় নূতন দিল্লীস্থ সংবাদদাতার সাথে এক সাক্ষাৎকারের সময়ে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী, যিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি মৌলিক আনুগত্য প্রদর্শনে ক্লান্তিহীন, অবশেষে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্-এর মাস্তুলে গেঁথে দেবার এক ব্যবস্থা পত্র খুঁজে পেয়েছেন —এই বিষয় সম্পর্কিত সাংবিধানিক আইন, তথ্য এবং নজির সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে। গত অক্টোবরের ডোমিনিয়নগুলির প্রধানমন্ত্রীসমূহের কন্ফারেন্স-এর পর থেকে কমনওয়েল্থ্ ও প্রজাতন্ত্র—এই দুটি ধারণার ভিতরের সামঞ্জস্যহীনতা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দেহে কাঁটার মতন বিঁধে রয়েছে, বিশেষতঃ এর পিছনে ক্রমবর্দ্ধমান জনমত থাকায়। যাই হোক, এতে বিচলিত না হয়ে তিনি সন্দেহ দূর ও অবিশ্বাসকে শান্ত করার জন্য রাশি রাশি অনিশ্চিত আশ্বাস ও অর্থহীন অঙ্গীকার ছড়িয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু 'ডেইলি মেল'-এর সাথে নেহরুর সাক্ষাৎকারের ভিতর যদি কোন তাৎপর্য্য থাকে, তা হল এই যে বিগত ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে যে দূরভিসন্ধির সূচনা হয়েছিল, আগামীতে তারই চরম পরিসমাপ্তি ঘটবে, সম্ভবতঃ এখন পর্য্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার প্রবল সমর্থকের ঐচ্ছিক সহযোগিতাতেই।

পণ্ডিতজীর আড়ম্বর পূর্ণ ঘোষণা ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল সূচনা নয়। এটি দেখিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতা একটি মিথ্, যে ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ থেকে ভারতবর্ষের বন্ধনছেদন একটি প্রাচীন বিস্মৃত প্রায় স্বপ্ন, যে এসিয়া—যা এখন আর 'প্রান্ত' নয় (পণ্ডিতজীর কথায়) কিন্তু কেন্দ্র—ভারতীয় রক্তভূমিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বাসঘাতক পুনঃপ্রবেশের পথ আরও একবার অতি অবশ্যই প্রস্তুত করবে। "এমন হতে পারে ভারতবর্ষের স্বার্থে তার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন হবে", বলছেন পণ্ডিতজী। কিন্তু জনগণের তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার অধিকার আছে যে, কোন ভীষণ প্রয়োজন ভারতবর্ষের নিজের স্বার্থে যুদ্ধ তার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য ক'রে তুলেছে এবং সেই স্বার্থগুলিই বা কী কী যা যুদ্ধই কেবল এগিয়ে দিতে পারে এবং শান্তি যার প্রতিবন্ধকতা করে। না, এটি শুধু এই-ই নয়; এটি এর চেয়েও অধিক। এটি একটি বিপথগামী কমনওয়েল্থ্ ম্যানিয়ার নির্ভুল লক্ষণ। এটি ভারতীয় দেহে ব্রিটিশ মনের ক্রিয়া। বর্ত্তমানের কমনওয়েল্থ্ যুদ্ধের সাথে সমার্থক, নিকটের অথবা দূরের। কমনওয়েল্থ্ এর সদস্যদের মধ্যে দুজন, গ্রেট বৃটেন এবং কানাডা আটলান্টিক চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী, এবং পশ্চিমা শক্তিসমূহের সাথে কমনওয়েল্থ্ দেশগুলির যোগাযোগ একটি অনস্বীকার্য্য ঘটনা। কিন্তু, পণ্ডিতজী প্রায় একই নিঃশ্বাসে বলেন যে "ভারতবর্ষের স্বার্থে তার উচিত হবেনা এমন কোন চুক্তিতে নিজেকে আবদ্ধ করা যা তাকে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যুদ্ধে জড়াবে।" চুক্তি—একটা নামের মধ্যে কী আছে, শেষ পর্য্যন্ত? এটাকে তুমি চুক্তিই বলো অথবা নাই বলো, কমনওয়েল্থ্-এর সাথে প্রস্তাবিত সংযোগটি যথেষ্ট যা ভারতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কূটচালের নিকট স্বতঃপ্রবৃত্ত সমর্পণে বাধ্য করবে এবং তাকে আনুষাঙ্গিক যুদ্ধে জড়িত করবে যা পরিহারযোগ্য।

ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে গেঁথে দেওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহেরুর নূতন সূত্র এ-শিথিল ও বিশৃঙ্খল চিন্তার এক প্রচণ্ড দৃষ্টান্ত যা অনেক কংগ্রেসী নেতার মনকেই কুয়াশাচ্ছন্ন করেছে। ব্রিটিশ কমনওয়েল্থের যাদুতে সম্মোহিত হয়ে মহান ও হাস্যকরের এক অপূর্ব্ব মিশ্রন আমাদের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন। তাঁর মতে কমনওয়েলথের সাথে ভারতের যোগ কেবলমাত্র "কর্মের ব্যাপারেই" পরিবর্ত্তনে লিপ্ত করবে তাঁকে। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে ভারতের গভর্নর-জেনারেল এবং রাষ্ট্রদূতগণের নিয়োগের জন্য রাজার আনুষ্ঠানিক সম্মতির অপেক্ষা করতেই হবে, যদিও তা অবশ্যই দেওয়া হবে। কিন্তু নিকট অথবা দূর ভবিষ্যতের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী হবে যখন সে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হবে? পণ্ডিত নেহেরু এই কথাগুলিতে ভবিষ্যতকে দেখতে পান, "ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টকে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে গভর্নর-জেনারেলের স্থলাভিষিক্তকরণ অবশ্য সেই স্বার্থের বন্ধনকে প্রভাবিত করবে না, যা কমনওয়েল্থের বিভিন্ন দেশকে তাদের পারস্পরিক সুবিধার্থে একত্র করেছে।" তিনি কী আমাদের একথা বিশ্বাস করতে বলেন যে ভারতরাষ্ট্রের

প্রজাতন্ত্রে পরিবর্তন কেবলমাত্র গভর্নর-জেনারেলের পরিবর্তে একজন প্রেসিডেন্টকে বসানকেই বোঝায়, হিজ্ ব্রিট্যানিক ম্যাজেস্টির স্বীকৃতি নিয়ে অথবা না নিয়েই? পণ্ডিত নেহেরু তাঁর রাজনৈতিক কাঠামো ক্ষণস্থায়ী বালুর ওপর গড়ে তোলবার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু মার্শাল স্মাট্স্ সম্প্রতি কমনওয়েল্থের অভ্যন্তরে প্রজাতন্ত্রকে খাপ খাওয়ানোর 'মিথ'টিকে সশব্দে চূর্ণ করেছেন। তাঁর কাছে এটা কেবল ফর্মের ব্যাপার নয়। এটা এমন একটি বিষয় যা কমন-ওয়েল্থের চরিত্র ও প্যাটার্ন, এবং তার সারবস্তুকেই গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন: "আমার মত, যোগ্যতা তার যতটুকুই হোক, এই যে হয় তুমি কমনওয়েল্থে থাক অথবা এর বাইরে থাক। যদি তুমি এর বাইরে থাক, যেমন একটি ভারতীয় অথবা অন্য কোন প্রজাতন্ত্র, তবে তুমি কমনওয়েলথের সাথে সম্বন্ধে আসতে পার কেবল মাত্র আন্তর্জাতিক আইনের গৃহীত নীতি অনুসারেই—

অর্থাৎ সন্ধি চুক্তি মাধ্যমে..... রাজমুকুট এবং প্রজাতন্ত্রের মধ্যে কোন মধ্য পথ নেই, কমনওয়েলথের বাইরে থাকা ও ভিতরে থাকার মধ্যেও। যদি কোন কুহেলিকাময় ও ঘোলাটে উপায়ে তুমি একই সাথে কমনওয়েলথের ভিতরে এবং বাইরে থাকতে পার, তবে কমন-ওয়েল্থের সম্পূর্ণ ধারণাটাই ভেঙে পড়ে, এবং অবশিষ্ট যা থাকে তা সারবস্তুহীন কেবল নাম অ্যালিস ইন্ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডের বেড়ালটি ছাড়াই তার হাসি।" কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়া কমনওয়েলথ শব্দটির অর্থদ্যোতনা বাড়িয়ে দিতে রাজীই হবে; এবং ক্রাউন সম্পর্কে, কেন, তা কেন্দ্রীয় সংযোজক হিসাবে থাকুক, অথবা অলংকারের ভাষায়, পিরামিডের চূড়া হিসাবে। কিন্তু ভারতবর্ষ কী কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার সাথে একই জায়গায় দাঁড়াতে পেরেছে কোনদিন অথবা আজই কী সে সেখানে দাঁড়িয়েছে যেখানে তারা রয়েছে? পণ্ডিত নেহরু সম্ভবতঃ নির্মম শক্তিসমূহের ক্রিয়াকে খুব দ্রুত ভুলে গিয়েছেন যা পশ্চিমকে করেছে শোষণকারী এবং পূর্বকে করেছে শোষিত। বিশ্ব ইতিহাসের লেখক এবং ভারতাত্মার আবিষ্কারক সাম্প্রতিক এশিয়া ও ভারতের ইতিহাস স্পষ্টতই বিস্মৃত হয়েছেন—ভুলেছেন সাম্রাজ্যবাদী এবং অর্থনৈতিক শাসন এবং তার তিক্ত জাতি-বিদ্বেষকে। অথবা তিনি কী ভাবেন যে ব্রিটেনের হাত যে 'কলঙ্কিত ও রক্তিত', এই সত্যের প্রতি কমন-ওয়েলথের স্বার্থের খাতিরে চোখ বুঁজে থাকাটাই প্রাজ্ঞতা, অ্যাণ্টনি ইডেনের সকল প্ররোচনা এবং ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স্-এর কৌশলও যে কলঙ্ক মুছে ফেলতে পারবে না?

মাত্র ছ' মাসের মধ্যে, অবস্থার চাপ বাধ্য করেছে ব্রিটিশকে দ্বিতীয়-বার ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের কন্ফারেন্স ডাকতে, যাতে পণ্ডিত নেহেরুও আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালের সন্ধ্যায়, পণ্ডিত নেহেরু অনুগ্রহ ক'রে সেয়ালের লিখন পড়ুন, জানুন নিয়তির নির্দয় বিধিকে, যদি তিনি তাঁর পদক্ষেপ পুনরায় অনুসরণ না করেন। কোটি কোটী ভারতীয় খাঁটি ও নিষ্কলুষ স্বাধীনতার জন্য দাবী, তাদের দাবী যে ভারতকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-ব্লকগুলির কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ত্রাস থেকে ভারতকে রক্ষা করার জন্য তাদের দাবী ইত্যাদিকে অবজ্ঞা করা যাবে না, কেবলমাত্র যারা এদের অবজ্ঞা করবে তাদের বিনাশ বিনা। ১৯২৯ থেকে ভারতের ঘোষিত লক্ষ্য হল পূর্ণ স্বাধীনতা যা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পৃথক। ১৯৪৭ থেকে ভারতের প্রকাশ্যে অঙ্গীকৃত আদর্শ হল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা। তার ঘোষিত লক্ষ্য ও অঙ্গীকৃত নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে, এসিয়ার বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বিশ্বশান্তির আরও বৃহত্তর স্বার্থের কারণে ভারতবর্ষকে অবশ্যই "ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ অফ নেশন্স" থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে।

আমরা আরও একবার পণ্ডিত নেহরুকে দেওয়ালের লিখন পড়তে বলি। আমরা তাঁকে ভারতীয় জন-গণের হৃদ্স্পন্দন অনুভব করতে বলি। আমরা তাঁকে সেইসব পবিত্র ঘোষণা ও অঙ্গীকারগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বলি যেগুলির তিনিও অংশীদার ছিলেন এবং কমনওয়েলথের কাঠামোর মধ্যে থেকেও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার বিষয়ে আশ্বাস বাণীর ধূলি ঝড় ওড়ানো থেকে তাঁকে বিরত থাকতে বলি। আমরা তাঁকে এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ জানাই যে ভারত-বর্ষের জন্য ব্রিটিশের এই ভালবাসা তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার পরিকল্পনার জন্য প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর বেষ্টনের এক 'মাষ্টার ষ্ট্র্যাটেজি'রই অংশ মাত্র। যদি পণ্ডিত নেহেরু এর ওপর হনিমুন করতে যান, তবে তিনি হয়ত পরম সুখের অধীকারী হবেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হবে বিনাশ। "গতিশীল অঙ্গুলি লেখে এবং লেখার পর এগিয়ে যায়।"

১৫ই আগষ্টের ভাবনা

ধীরেন মুখার্জী

১৫ই আগষ্ট "স্বাধীনতা দিবস"।

সেই সিপাই বিদ্রোহের সময় থেকে ভারতবর্ষ ইংরাজ শাসনের অবসান কামনা করছে। যেহেতু ইংরাজ মুসলমানদের হাত থেকে ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল তাই মুসলমানেরাই স্বভাবত ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোড়ার সব থেকে বেশী সক্রিয় ছিল। মনে রাখা দরকার ইংরাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রথম মুসলমানরাই সুরু করে ও ইংরেজ বড়লাট এবং প্রধান বিচারপতি এদের হাতেই নিহত হয়। এই বিপ্লবীদের দলভুক্ত আমীর খার বিচারের সময় তিনি যে সওয়াল জবাব করেন তা বিপিন পালের মত লব্ধিক ভক্ত লোককে সর্ব প্রথম দেশপ্রেমের দীক্ষা দেয়। শ্রীপাল তাঁর আত্মজীবনীতে এ কথা বলেছেন। এই বিপ্লবীদের ইংরাজী পাঠশালায় পড়া ঐতিহাসিকরা ওয়াহবী নাম দিয়ে প্রতিক্রিয়া পন্থী সাম্প্রদায়িক বলে নিন্দা করেছেন। কিন্তু এঁদের নেতা শ্রীওয়ালিউল্লা সুফী মতাবলম্বী ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণকে মহম্মদের মতই ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বলে মনে করতেন! তাঁর পরবর্তী নেতা আবদেল আজিজ ইংরাজ শাসনকে "দার-উল-হারব" বা শয়তানের রাজত্ব বলেও হিন্দু মারাঠাদের শাসনকে বলতেন "দারউল ইসলাম" বা যে শাসনের সহযোগীতা করা আল্লার অভিপ্রেত। বলা বাহুল্য এঁদের সঙ্গে আরবের আবদুল ওয়াহেব এবং তাঁর আন্দোলনের কোন রকম যোগ ছিল না, কিন্তু ইংরাজ শাসকরা বিশেষ করে হাণ্টার সাহেব এই আন্দোলনের কপালে ওয়াহবী নাম সেঁটে দেন এবং আমরাও ইংরেজের পাঠশালার ছাত্র হিসাবে সেটা মেনে নেই।—

ভারতের ইংরাজ সাম্রাজ্য স্থাপনের অন্যতম প্রধান স্থপতি লর্ড ক্লাইভ মন্তব্য করেন দয়ালু ব্যবহারের দ্বারা আমরা মুসলমানদের প্রভাবিত করতে পারব না, তাদের ছলে, বলে, কৌশলে হীনবল করে রাখাই বৃটিশ নীতি হওয়া উচিত। (Culcutta Review, Oct, 1887) লর্ড এলেনবরা ডিউক অফ ওয়েলিংটনকে লেখেন—মুসলমানরা আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং সত্যিকারের নীতি হওয়া উচিৎ হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগীতা (Malik. A. British policy and Muslims in Bengal)। ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে ইংরাজ শাসক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সব থেকে নির্ভরযোগ্য বইয়ের লেখক স্যার সিভিলিয়ান শ্রীহাণ্টার লেখেন—ভারতের মুসলমানরা বৃটিশ রাজশক্তির পক্ষে স্থায়ী বিপদের উৎস স্বরূপ। কারণ সাম্রাজ্যের বুকে এরা রাজদ্রোহী জন সমষ্টী (Sarvapalli, Gopal, British policy in India, p. 100)

অর্থনীতি, শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত দিক থেকে ভারতীয় মুসলমানদের দমিয়ে রাখার কূট কৌশলে ইংরাজ শাসকরা সহজেই জয়ী হল। এর ফলে যে অবস্থার উদ্ভব হয় সে সম্পর্কে হাণ্টার সাহেবই লেখেন—একশ সত্তর বছর আগে কোন ভদ্র মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। বর্তমানে তার পক্ষে ধনী থাকাই এক অসম্ভব ব্যাপার। (Hunter, Indian Musalmans) মুসলমানদের বদলে হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণ সম্পর্কে ইংরাজ সাম্রাজ্য গঠনের অন্যতম মাতব্বর আমাদের শিক্ষা নীতির আদি প্রবক্তা লর্ড মেকলে মন্তব্য করেন—শান্ত আবহাওয়ার মানুষ, শান্তিপূর্ণ কাজে অভ্যস্থ। স্বভাব ওমনের দিক থেকে বিদেশী শাসনের জোয়াল বইবার এমন উপযুক্ত সম্প্রদায় পৃথিবীতে সম্ভবত আর কোথাও নাই (মেকলের রচনাবলী দ্রষ্টব্য)। বৃটিশ শাসনের জোয়াল বইবার জন্য তাই মেকলে যে শিক্ষানীতি চালু করেন, তা হোলো--একদল মানুষ গড়া, যারা রক্তে ও রঙে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, ধারণা নীতিবোধ ও প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে ইংরাজ (Malik. A. British, policy and Muslims in Bengal, p. 198)

ভারতবর্ষে ইংরাজের এই বাড়-বাড়ন্ত রাশিয়ার গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। রাশিয়া মাত্র দশ বছরের মধ্যে বৈনিক তুর্কীস্থান, সমরকন্দ ভেদ করে আফগানীস্থান ও ভারতের উত্তর সীমান্তে এসে পৌছেছিল। এখানেই রাশিয়া থেমে থাকতে চায় নি। সম্রাট নেপোলিয়ানের সঙ্গে জার পল ঘোষণা করেন যে উৎপীড়নে ভারতীয় জনগণ কাতর, তার প্রতিবিধানের জন্য রাশিয়া ও ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। এই দুই দেশের সরকার স্থির করেছে তাদের শক্তি ঐক্যবদ্ধ করে বর্বর ও অত্যাচারী ইংরাজদের হাত থেকে ভারতকে মুক্ত করবে। (Chathar Singh Sama, India and Anglo-soviet Relation, p.5) জার পল সেনাপতিদের নির্দ্দেশ সুদ্ধ দিয়েছিলেন কিভাবে তারা ভারত থেকে ইংরাজদের উৎখাত করবে। জার পলের মৃত্যু হলে তার পরবর্তী জার আলেকজাণ্ডারও নোপোলিয়নের সঙ্গে ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। পরবর্ত্তী কালে রুশ পররাষ্ট্র বিভাগও এ বিষয়ে যথেষ্ট মনযোগ দেয়। এই রুশনীতি এবং গুপ্ত আন্দোলনের আতঙ্কই ভারতে বৃটিশ শাসন রক্ষার

দ্বিতীয় পরীক্ষা হিসাবে কংগ্রেস সংগঠনে হিউম সাহেবকে অনুপ্রাণিত করে। শ্রীহিউম ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় তিরিশ হাজার লোকের কাছ থেকে সংবাদ পান যে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষ, অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাবে। (Majumdar.R. C., British paramountcy and Indian Renaissanc pt II, P-558) সশস্ত্র বিস্ফোভ ও আন্দোলনকে আইনানুগ আন্দোলনের খাতে পরিচালনার জন্য শ্রীনর্টন ঐ যুগে মেকলের "বাবু"দের উপদেশ দেন। তিনি বলেন—

যদি কোন অন্যায় ও অসুবিধা থাকে তার প্রতিবাদ যোগ্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তা দৃঢ়তা ও মর্য্যাদার সঙ্গে করুন। যদি কোন আকাঙ্খিত রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধাথেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে মনে করেন তা'হলে আবেদন পত্র পাঠিয়ে কিংবা প্রতিনিধি মারফৎ তা দাবী করুন। প্রতিনিধি হিসাবে তাদের পাঠান যাদের সম্মান, বুদ্ধি এবং মর্য্যাদা আপনাদের দাবীকে এগিয়ে দেবে।

এই উদ্দেশ্যে হিউম সাহেবের কংগ্রেস গড়ার আগেই বিভিন্ন প্রান্তে জমীদার সভা বা ঐ ধরণের সংগঠন পরোক্ষ সরকারী পৃষ্ঠ-পোষকতায় গজিয়েওঠে। বাংলা প্রান্তে গঠিত হয় বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স সোসাইটী। এর সভ্য শ্রীটার্টন (ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ব্যবসায়ী)। সিপাই বিদ্রোহের আগেই মন্তব্য করেন—"ভারতবর্ষের চরম লক্ষ্য হোলো বৃটিশ কমন ওয়েল্থের সমান অংশীদার হওয়া। (Bengal Harkara, Dec. 14, 1809)

এই জমীদার সভা দিয়ে বেশীদিন কাজ চলল না। সুরেন্দ্রনাথ বুঝে ফেল্লেন, সাহেব নন বলেই তার সরকারের হাতে এই নিগ্রহ। বৃটিশ সরকার কর্তৃক অপমানিত সুরেন্দ্রনাথ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলেন না, আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী বৃটিশ বিরোধী সংগঠন গড়ে তুললেন এই সময়েই বড়লাট লর্ড ডাফরিণের পরামর্শে হিউম সাহেব কংগ্রেস সংগঠিত করেন। হিউম সাহেব কংগ্রেস সংগঠনে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দেবার চেষ্টা করলেও সুরেন্দ্রনাথ অচিরে কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। সুরেন্দ্রনাথ শুধু কংগ্রেসের নেতা হলেন না, তাঁর ভক্ত ব্যারিষ্টার পি, মিত্র ইতালীর কারবোনারীদের মত ভারতীয় গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের অন্যতম প্রধান সংগঠক হলেন। সুরেন্দ্রনাথ গ্যারিবলডী, ম্যাটসিনী এবং শিখ জাতির বলিদানের কাহিনী ছাত্র ও যুবকদের পাঠচক্রে বর্ণনা করতে সুরু করলেন। কংগ্রেসের প্রথম দিকের অধিবেশনে রুশ সরকার ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে প্রায় মঙ্গলাচরণের মতই থাকত কোন প্রস্তাব। আর থাকত ইংরাজ রাজার প্রতি আনুগত্যের শপথ। এই দেখেই শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেন ইন্দু প্রকাশ পত্রিকায়। সেই সমালোচনায় তিনি সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেন। সম্ভবত এর আগে "প্রলিটেরিয়েট" বা "সর্বহারা" ভারতীয় শব্দটা রাজনীতিতে কেউ ব্যবহার করেন নি।

তিলকের পরামর্শে শ্রীঅরবিন্দ কংগ্রেসে যোগ দেন কংগ্রেসকে দখল করতে।

একদা হিউম সাহেব ও ইংরাজ সরকার সশস্ত্র বিস্ফোভ ও রুশ আক্রমণ প্রতিহত করতে যে নিয়মানুগ জাতীয়তাবাদের প্রসার ও প্রসারে সাহায্য করেছিলেন পরবর্তীকালে অরবিন্দ, তিলক, লাজপতি রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের নেতৃত্বে সেই জাতীয়তাবাদ পরিণত হোল ইংরাজ জাতি বৈরীতায়। জাতীয়তাবাদের এটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

ভারত সচিব শ্রীহ্যামিলটন অনেক আগে মন্তব্য করেছিলেন যে ভারত শাসনে আমাদের আসল বিপদ এখন নয়, সেটা পঞ্চাশ বছর পরে দেখা দেবে। পশ্চিমী চিন্তাধারা, আন্দোলন ও সংগঠনের ব্যবহার এবং এই সবের ক্রম বিস্তৃতি এই বিপদ ডেকে আনবে। (Hamilton Papers.) তাই সত্য হয়ে দাঁড়াল। ইংরাজ জাতি বৈরীতার কথা ভেবে তদানীন্তন ভারতের শিল্প সচিব শ্রীট্র্যাভেলিয়ন তাঁর "এডুকেশন অফ দি পিপ্‌ল" গ্রন্থে মন্তব্য করেন--"ভারতে ইংরাজ শাসন হয় রক্ত বন্যার মধ্যে দিয়ে শেষ হবে, নয় পার্লামেন্টের আইনের দ্বারা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে।"

এই জাতি বৈরীতা যা, রক্ত বন্যায় ইংরাজ শাসনকে ডুবিয়ে দিতে চায়, তাকে ঠেকাতে ইংরাজ শাসকরা নানাবিধ কূটনীতি, অত্যাচার, প্রলোভন বিভেদ কৌশল প্রভৃতি অবলম্বন করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় বিপ্লবীরা জগৎ জোড়া ষড়যন্ত্রের জাল পেতেও জার্মানীর পরাজয়ের সঙ্গে নিজেরাও পরাজিত হয়। চরমপন্থী শ্রীঅরবিন্দ রাজনীতি থেকে সরে আসেন, তিলক মারা যান। লাজপৎ রায় দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার ফলে জন-সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। এই শূন্যতাকে পূর্ণ করেন গান্ধীজী গোখেলের অনুবর্তী সাবধানী রাজনৈতিক। শ্রীঅরবিন্দ, তিলক জাতিকে জাগাবার জন্য যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা হোলো Maximum sacrifice of the minimum number"— গান্ধীজির মন্ত্র হোলো—minimum sacrifice of the maximun number"—

গান্ধীর আগে জাতীয়তাবোধ বা

(৪৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

স্বাধীনতা সংগ্রামের গোড়ার কথা

নিকুঞ্জ সেন

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্যের ইতিহাস যদি আমরা পড়ি, তাহলে দেখা যাবে যে তাদের এই আধিপত্যের পিছনে ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার ও শঠতা যতখানি ছিল, সম্মুখ সমরে শত্রুকে পরাজিত করে ভারতবর্ষ দখলের কৃতিত্ব ততখানি ছিলনা। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে। পলাশীর কথা-ই ধরা যাক। যুদ্ধের পূর্ব্বে লর্ড ক্লাইভ উপলব্ধি করেছিলেন যে সম্মুখ সমরে সিরাজের সেনাদলকে পরাজিত করা সম্ভবপর নয়। সেই কারণে তিনি বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবতে লাগলেন। ঠিক করে ফেললেন যে সিরাজকে তারই অলক্ষ্যে পিছন থেকে আঘাত করতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন। সিরাজের সেনাপতি ছিলেন মীরজাফর। ক্লাইভ প্রস্তাব করলেন মীরজাফর যদি সিরাজকে হটিয়ে বাংলার মসনদ হস্তগত করতে চান তবে এই প্রকৃষ্ট সময়—এই স্বর্ণ সুযোগ। তিনি মীরজাফরকে বললেন, ইংরেজের সঙ্গে যখন যুদ্ধ বাঁধবে তখন মীরজাফর তার সৈন্যদলকে যদি নিষ্ক্রিয় রাখতে পারেন তবেই তারা কেল্লা ফতে করতে পারবেন। মীরজাফর রাজী হলেন, ক্লাইভের প্রস্তাব তিনি কাজে পরিণত করলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও মীরমদন ও মোহনলালের নেতৃত্বে নবাবের সেনাদল ইংরেজ সৈন্যকে কোণঠাসা করে ফেলল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে শত্রুর গুলির আঘাতে মীরমদন বীরের মৃত্যু বরণ করলেন, কিন্তু তাতেও মোহনলাল দমলেন না। তিনি তাঁর স্বল্পসংখ্যক সেনা নিয়ে অমিত বিক্রমে এগিয়ে চললেন। ইংরেজ শক্তি দেখল, পরাজয় তাদের সুনিশ্চিত। তারা শেষবারের মত আবার মীরজাফরের শরণাপন্ন হল। মীরজাফর দেখলেন ইংরেজের পরাজয় ঘটলে তাঁর নবাবীর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। এই কারণে মীরজাফর এবার দাবার শেষ চালটি চাললেন। নবাবের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, যুদ্ধ সেদিনের জন্য (২৩ জুন, ১৭৫৭) বন্ধ থাক। পরের দিন অর্থাৎ ২৪শে জুন তিনি তার সমগ্র শক্তি নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন এবং ইংরেজ শক্তিকে পরাজিত না করে ঘরে ফিরবেন না। সিরাজ অন্ধের মত মীরজাফরের ফাঁদে পা দিলেন। মোহনলালকে যুদ্ধ বিরতির আদেশ দিলেন তিনি। আদেশ শুনে তো মোহনলাল স্তম্ভিত; কেননা, যুদ্ধ জয় তখন একেবারে তাঁর হাতের মুঠোয়। তিনি নবাবকে খবর পাঠালেন, মীরজাফরের উপদেশ শুনলে পরাজয় অবধারিত কারণ মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক। এ যাবত তিনি নিষ্ক্রিয় ছিলেন। কিন্তু নবাব শুনলেন না সে কথা। তিনি মোহনলালকে পুনরায় পশ্চাদপসারণের আদেশ দিলেন। বাধ্য হয়ে এবার মোহনলাল নবাবের আদেশ পালন করলেন। যুদ্ধে ইংরেজের জয় হল। ভারতের স্বাধীনতা সূর্য্য ভাগীরথীর অতল তলে তলিয়ে গেল।

পলাশীর বিপর্য্যয় কিন্তু ইতিহাসের একটা শিক্ষা আমাদের জন্য রেখে গেল। সে-শিক্ষা হচ্ছে এই যে সত্যিকারের স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা তারা তাদের ধর্ম্ম, অর্থ, লোভ, প্রভৃতি সকল স্বার্থের উপরে স্থান দেন স্বাধীনতার জলন্ত আদর্শকে। সেই কারণেই দেখি নবাব যখন বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন তখন তাঁকে প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়ে যিনি সাহায্য করেছেন তিনি ছিলেন হিন্দু। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে সিরাজ মুসলমান আর মোহনলাল হিন্দু এ কথা তাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায়নি। আর একদিকে আবার দেখি, বিশ্বাসঘাতক যারা, তাদের জাতই আলাদা। এ প্রমাণ করেছেন মীরজাফর স্বয়ং। তিনি মুসলমান হয়েও তাই মুসলমানের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেন নি। সে দিনের পলাশীর পরাজয় এ ক্ষেত্রে এ কথাও প্রমাণকরে গেছে যে বিশ্বাসঘাতকতার বীজকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে না পারলে ভবিষ্যতে সে বিষবৃক্ষ দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হবেই হবে।

পলাশীযুদ্ধের বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার চক্রান্ত চলছিল তা সিরাজ জানতেন। তিনি একথা ও জানতেন যে, এই চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছে মীরজাফরকে কেন্দ্র করেই। সিরাজকে ছলে বলে কৌশলে গদী থেকে নামিয়ে সে-গদীতে মীরজাফরকে বসানই ছিল এই ষড়যন্ত্রের মূল কথা। এত কথা জেনে-ও সিরাজ মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের কথা—সেনাপতি পদের আসল দায়িত্ব-ই তার উপর অর্পণ করেছিলেন অথচ সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হলে তিনি অনায়াসেই মীরজাফরকে সেনাপতি পদের গুরুদায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারতেন। সেনাপতি পদের জন্য যে যোগ্য ব্যক্তির অভাব সিরাজের ছিল না, মোহনলাল একথা যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মীরজাফরের প্রতি সিরাজের এই অহেতুক

দুর্ব্বলতাই ভারতবর্ষের এতবড় সর্ব্বনাশ ডেকে আনল।

পলাশী বিপর্য্যয়ের পরে-ও কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে একযোগে সর্ব্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে ইংরেজকে সাগর-পার করবার একাধিক সুযোগ ভারত-বাসী পেয়েছিল। দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের যে তারা সে সুযোগগুলির একটিও যথাযথ কাজে লাগাতে পারেনি। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় পলাশীর শিক্ষা থেকে তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। ইংরেজের বিরুদ্ধে সেদিন সিরাজকে একাই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ভারতবর্ষের অপর কোন শক্তি সে-দিন সিরাজের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেনি। ক্লাইভের বিরুদ্ধে সিরাজ যখন প্রাণপণ লড়াই করছেন তখন যদি ভারতবর্ষের অন্য কোন শক্তি পিছন থেকে ক্লাইভকে আক্রমণ করত তা হলে মীরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতা সত্ত্বে-ও সেদিন ইংরেজ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত না।

ইতিহাসের এ শিক্ষাকে এর পরে-ও কাজে লাগাল না ভারতবর্ষ। তার ফল হল এই যে, ইংরেজ তার স্বল্পশক্তি ও সীমিত জনবল নিয়ে-ও আস্তে আস্তে সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করে ফেলল। অসহায় ভারতবাসী তাদের জনবল, সৈন্যবল ও অস্ত্রবল সত্ত্বে-ও, শুধু দূরদৃষ্টির অভাবে নিজেদের বিপর্য্যয় নিজেরাই ডেকে আনল। একথা তারা হৃদয়ঙ্গমই করতে পারল না যে ইংরেজ ভারতবর্ষে বিশেষ কোন শক্তিকে পরাভূত কিংবা বিশেষ কোন অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত হবে না। তাদের লোলুপ-দৃষ্টি সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে। এই অন্ধদৃষ্টির ফলে ভারতবাসীরা শুধু আত্মসমর্পণ-ই করে গেছে; অথচ একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, ভারতবাসী বিনা সংগ্রামে আত্ম-সমর্পণ করেছে। দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রাম যে তারা করেছে তার প্রমাণ পলাশীজয়ের পরে-ও গুণে গুণে একশ' বছর লেগেছে ইংরেজ শক্তির সমগ্র ভারতবর্ষে নিজে-দেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, এই একশত বৎসরের মধ্যে একের পর এক সংগ্রামে ইংরেজের চরিত্র ও অভিসন্ধি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠলে-ও ভারতবাসীর চোখ খুলল না। একটি সংগ্রামে-ও স্বকীয় সংকীর্ণ স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে একযোগে সমগ্র ভারতবর্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করল না ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে। অথচ ভারতবর্ষের না ছিল কি। উত্তর ভারত থেকে সুরু করে দক্ষিণ ভারত পর্য্যন্ত শিখ, মারাঠা, হায়দর, টিপুসুলতান ও নিজামের যে সমর সম্ভার, সংগঠন ও দুঃসাহসিক সেনাবল ছিল তারা এক-যোগে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে এক-বার দাঁড়ালে সাধ্য ছিল না ইংরেজ শক্তির সে সম্মিলিত বিরোধিতাকে বিধ্বস্ত করবার। কিন্তু একের পর এক পরাজয় সত্ত্বে-ও আমাদের ভুল ভাঙল না। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলী যখন তার বিরাট সেনাদল নিয়ে আর্কট জয় করেন তখন ইংরেজ শক্তির চরম বিপর্য্যয় সত্যই ঘনিয়ে এসেছিল। ঘনিয়ে এসেছিল তার কারণ হায়দর আলির সঙ্গে তখন ছিল মারাঠা শক্তি ও নিজাম। কিন্তু ইতিমধ্যে হায়দর আলির শক্তি বৃদ্ধিতে ভীত হয়ে ইংরেজের প্ররো-চনায় মারাঠা ও নিজাম হায়দরের পক্ষ পরিত্যাগ করে ইংরেজের পক্ষে যোগ দিলেন। ফল হল এই যে পরের বছর—পোর্টোনোভোর যুদ্ধে হায়দর ইংরেজ শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলেন। ভারতের দুর্ভাগ্য আর একবার চিহ্নিত হল ইতিহাসের পাতায়।

হায়দরের মৃত্যুর পরে টিপুসুলতান ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সেখানে-ও একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। মারাঠা ও নিজাম টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজ শক্তির সঙ্গে হাত মিলাল।

একশ' বছর পরে যখন সত্যি ভারত বর্ষের চোখ খুলল তখন সারা দেশে ইংরেজ তার আসন প্রায়-সুপ্রতিষ্ঠিত করে বসেছে। ১৮৫৭-৫৮ সালে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ভারতবর্ষের সশস্ত্র সিপাহীরা ও অগণিত জনসাধারণ। বিভিন্ন শিবিরে, বিভিন্ন রণক্ষেত্রে উত্তাল সে-সমরা-য়োজনের সম্মুখে তাল সামলাতে না পেরে ইংরেজ সৈন্যরা মুখ থুবড়ে পড়তে আরম্ভ করল। বুঝতে পারল এবার এ মহাহবের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া শক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজের বাহাদুরী বন্ধ হল না। এ মহা সংগ্রামকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য তাই একাধিক ইংরেজ ঐতি-হাসিক একে আখ্যা দিয়েছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ'

১৮৫৭—৫৮ সালের যে মহা-অভ্যু-খানকে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ নামে অভিহিত করেছেন ভারতবর্ষ তাকেই বলেছে "প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম"। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ সেন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন: ধর্ম্মরক্ষার সংগ্রাম হিসাবে সুরু হলে-ও এ সংগ্রাম শেষ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়েছে, কেননা বিদ্রোহীরা যে বিদেশী সরকারের হাত থেকে চিরতরে মুক্তি চেয়েছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন, ইতিহাস এ কথা স্বীকার করে যে কোন বিদ্রোহে বা বিপ্লবে দৃঢ়চেতা স্বল্পসংখ্যক লোকই অংশগ্রহণ করে। সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের পেছনে যদি জনসাধারণের বহুসংখ্যক লোকের

সমর্থন থাকে তবে তা জাতীয় সংগ্রামের মর্য্যাদা লাভ করে। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ১৮৫৭-৫৮ সালের অভ্যুত্থানকে সত্য সত্যই জাতীয় অভ্যুত্থান বলা চলে।

"ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" গ্রন্থে বীর সাভারকার ১৮৫৭-৫৮ সালের জাগরণকে 'জাতীয় জাগরণ' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও চিন্তানায়ক এই মহাবিদ্রোহকে এক সুপরিকল্পিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক অভ্যুত্থান বলে গণ্য করেছেন।

শুধু ভারতীয় চিন্তানায়কগণই নন, একাধিক ইংরেজ ঐতিহাসিক-ও এই মহাবিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলতে কসুর করেন নি। এদের মধ্যে মিঃ নর্টনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে ঘোষনা করেছেন যে এই অভ্যুত্থান ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত করবার সুপরিকল্পিত অভ্যুত্থান।

এই মতের বিরোধিতা করেছেন ভারতবর্ষের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তিনি বলেছেন, কোন অভ্যুত্থানের পেছনে যদি সারা দেশের গণসমর্থন থাকে, আর সে-সমর্থন যদি বিদেশী সরকারকে দেশের মাটি থেকে উৎখাত করবার সংকল্প নিয়ে গড়ে উঠে, আর যদি দেশের জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ধর্মগত ও সম্প্রদায়গত স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবেই তাকে স্বাধীনতা সংগ্রাম নামে অভিহিত করা চলে। ১৮৫৭ সালের পূর্ব্বে-ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বহু স্থানে সংগ্রাম করেছে ভারতবাসী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ১৮৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা ও তার পূর্ব্বে ১৮২৭ সালের সম্বলপুর বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, এই কারণেই ১৮৫৭-৫৮ সালের বিদ্রোহকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রাম বলার কোন সার্থকতা নেই। দ্বিতীয় কথা যারা সেদিন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের জনসংখ্যায় তারা সামান্যতম অংশ মাত্র। অঞ্চল হিসাবে-ও ভারতের বহু অঞ্চলই এ সংগ্রামে যোগ দেয়নি। তৃতীয়তঃ জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলে এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েনি। যারা এসেছিল তারা এক হয় এসেছিল তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে, আর না হয়, তাদের ধর্মগত কিংবা সম্প্রদায়গত স্বার্থের তাগিদে। তাই এ অভ্যুত্থানকে জাতীয় অভ্যুত্থান বললে সত্যের অপলাপ করা হয়। সেই কারণেই তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন যে ১৮৫৭-৫৮ সালের সংগ্রামকে ভারতের প্রথম জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম বলা চলে না। তাঁর নিজের ভাষায়—"On the whole it is difficult to avoid the Conclusion that the so called Fisrt Natinonal War of Independence in 1857 is neither First, nor National, nor a War of Indepndence."

এই অভ্যুত্থানকে জাতীয় প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত না করলে-ও তিনি কিন্তু একে "the first great and direct challenge to the British rule in India, on an extensive scale" বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। শ্রীযুক্ত মজুমদারের সঙ্গে অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের পার্থক্য তাহলে এই যে, অন্যেরা যে সংগ্রামকে বলেছেন প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম, তিনি তাকে বলেছেন ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করে ভারতের প্রথম প্রত্যক্ষ ব্যাপক সমর আয়োজন। তার পরেই তিনি বলেছেন—"It helped the genuine national movement for the freedom of India from British yoke which started half a centruy later. অর্থাৎ পঞ্চাশ বছর পরে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার যে জাতীয় আন্দোলন সুরু হয়েছিল এই অভ্যুত্থান তার প্রেরণা জুগিয়েছে। যে সংগ্রামকে শ্রীযুক্ত মজুমদার জাতীয় সংগ্রাম বলতে কুণ্ঠা বোধ করেছেন সে-সংগ্রাম কি করে পরবর্ত্তী যুগে জাতীয় আন্দোলনে অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা সত্যই দুঃসাধ্য।

নেতাজী কিন্তু ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত এই একশ' বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তিনি বলেছেন-পলাশী বিপর্য্যয়ের পরে প্রায় একশ' বছর ধরে ভারতবাসীরা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে প্রাণান্তকর সংগ্রাম চালিয়ে গেছে। একশ' বছরের এই ইতিহাস অতুলনীয় শৌর্য্য ও সীমাহীন আত্মত্যাগে সমুজ্জ্বল। সে যুগের ইতিহাসে বাংলার সিরাজুদ্দৌলা ও মোহনলাল, দক্ষিণ ভারতের হায়দর আলি ও টিপু সুলতান মহারাষ্ট্রের আপ্পা সাহেব ও পেশোয়া বাজীরাও, অযোধ্যার বেগম, পাঞ্জাবের সর্দার শ্যাম সিং আতারীওয়ালা, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া টোপি ও নানা সাহেবের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দুর্ভাগ্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেদিন এ কথাটা একেবারেই বুঝতে পারেন নি যে ইংরেজ শক্তির লালায়িত দৃষ্টি রয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষ গ্রাস করবার দিকে। এই ভুল ধারনার জন্যই ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যেদিন একযোগে সমগ্র ভারত অস্ত্র ধারণ করে নি। শেষ কালে যখন ভারতবাসীর কাছে ইংরেজের স্বরূপ

(৪৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

লোকটি কে—
চেনেন?
ওঁর সঙ্গ কিন্তু
মোটেও সুবিধার নয়

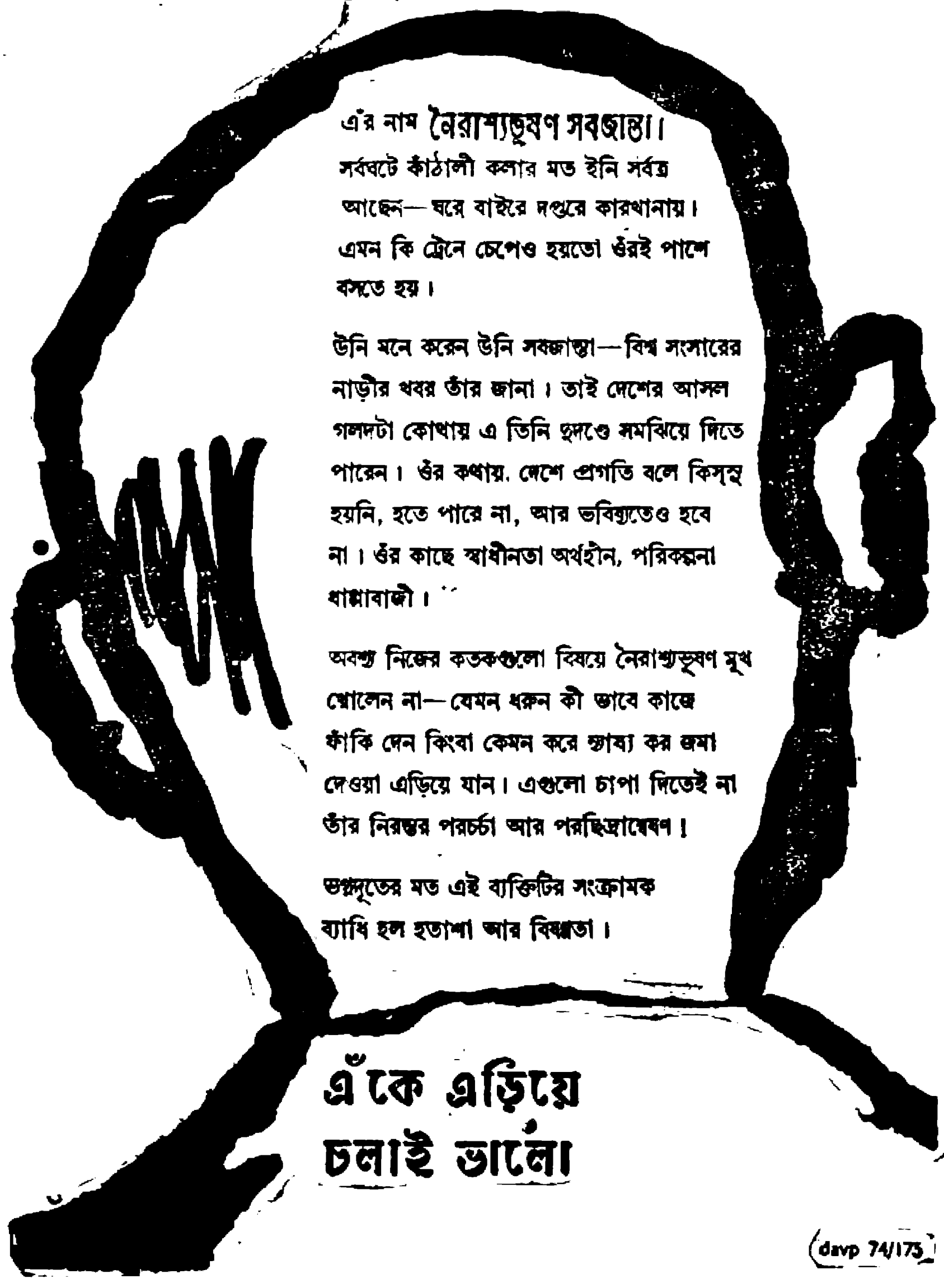

এঁর নাম নৈরাশ্যভূষণ সবজান্তা।
সর্বঘটে কাঁঠালী কলার মত ইনি সর্বত্র আছেন—ঘরে বাইরে দপ্তরে কারখানায়। এমন কি ট্রেনে চেপেও হয়তো ওঁরই পাশে বসতে হয়।

উনি মনে করেন উনি সবজান্তা—বিশ্ব সংসারের নাড়ীর খবর তাঁর জানা। তাই দেশের আসল গলদটা কোথায় এ তিনি দুদণ্ডে সমঝিয়ে দিতে পারেন। ওঁর কথায়, দেশে প্রগতি বলে কিস্সু হয়নি, হতে পারে না, আর ভবিষ্যতেও হবে না। ওঁর কাছে স্বাধীনতা অর্থহীন, পরিকল্পনা ধাপ্পাবাজী।

অবশ্য নিজের কতকগুলো বিষয়ে নৈরাশ্যভূষণ মুখ খোলেন না—যেমন ধরুন কী ভাবে কাজে ফাঁকি দেন কিংবা কেমন করে ন্যায্য কর জমা দেওয়া এড়িয়ে যান। এগুলো চাপা দিতেই না তাঁর নিরন্তর পরচর্চা আর পরছিদ্রান্বেষণ।

ভগ্নদূতের মত এই ব্যক্তিটির সংক্রামক ব্যাধি হল হতাশা আর বিষণ্ণতা।

এঁকে এড়িয়ে
চলাই ভালো

davp 74/175

আমাদের অন্বেষণের প্রতীক্ষায়...

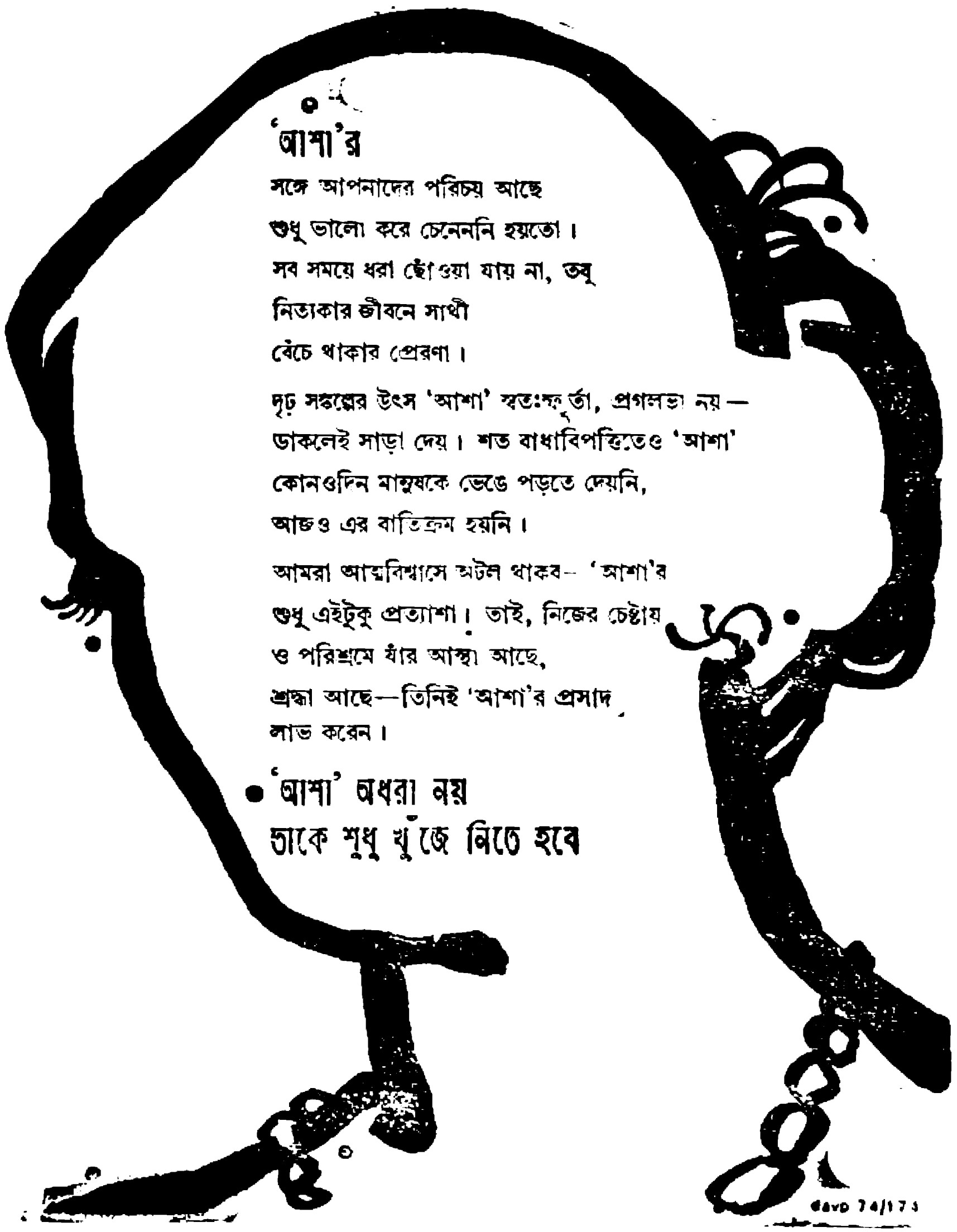

'আশা'র

সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে
শুধু ভালো করে চেনেননি হয়তো।
সব সময়ে ধরা ছোঁওয়া যায় না, তবু
নিত্যকার জীবনে সাথী
বেঁচে থাকার প্রেরণা।

দৃঢ় সঙ্কল্পের উৎস 'আশা' স্বতঃস্ফূর্তা, প্রগলভা নয়—
ডাকলেই সাড়া দেয়। শত বাধাবিপত্তিতেও 'আশা'
কোনওদিন মানুষকে ভেঙে পড়তে দেয়নি,
আজও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

আমরা আত্মবিশ্বাসে অটল থাকব— 'আশা'র
শুধু এইটুকু প্রত্যাশা। তাই, নিজের চেষ্টায়
ও পরিশ্রমে যাঁর আস্থা আছে,
শ্রদ্ধা আছে—তিনিই 'আশা'র প্রসাদ
লাভ করেন।

• 'আশা' অধরা নয়
তাকে শুধু খুঁজে নিতে হবে

CENTRAL LIBRARY

৫৮৮ 74/173

(৪৫০ পৃষ্ঠার পর)

out for a United India as we wished it, prison obviously awaited us……The plan of partition offered a way out and we took it." শুধু দেশ বিভাগ নয়, স্বাধীনতার বদলে ডমিনিয়ন-রাজ্যের কাছে আত্মসমর্পণের পশ্চাতে-ও এই অনুক্ত দুর্বলতাই সত্য।

২৬শে জানুয়ারীর পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা দিবসটি স্বভাবতই ডমিনিয়ন-রাজ-এর নব ভক্তদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। কাজেই ঐ দিনটিকে প্রজাতন্ত্র দিবস বলে ঘোষণা করা হল (১৯৪৯)। কিন্তু কার্যকারণ অনুসরণ করে, রাজকীয় কমনওয়েলথ পরিহার করতে হলে তো সবই মাটি হয়!

কাজেই সংগোপনে আর একটি ভিগ্‌বাজীর কসরৎ হল। ঐ বৎসরের কমনওয়েলথ সম্মেলনে (লণ্ডন) একটি রূঢ় প্রশ্ন উঠলো—ভারত রিপাব্লিক ঘোষণা করে কী করে রাজকীয় কমনওয়েলথ-এর সভ্য থাকবে? দক্ষিণ আফ্রিকার কমনওয়েলথ নেতা স্মিড্ট মার্শাল স্মাট্‌স্ তো সরাসরি চ্যালেঞ্জ দিলেন: ভারতকে হয় কমনওয়েলথ নয় রিপাব্লিক, একটা ছাড়তেই হবে। কেনাডার মন্ত্রী ম্যাকেঞ্জিও অনুরূপ বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাদের পেটে আর কত বুদ্ধি! ভারতের প্রধান মন্ত্রী বিনা সঙ্কোচে ফস করে বাজীমাত করে জবাব দিলেন: ভারতকে পুরোপুরি (full fledged) ডমিনিয়ন হিসেবেই গণ্য করা হোক! সভা হতভম্ব! সর্বসম্মতিক্রমে প্রেরিত সুপারিশ রাজকীয় অনুমোদন পেল। সাম্রাজ্যিক কমনওয়েলথ-এর আসল কাজ হাসিল হল। আবার উঠল বৃটিশ মুকুটকে মুকুট আখ্যা না দিয়ে ভারতকে কমনওয়েলথ শীর্ষ (Head of Commonwaolth) এই আখ্যা দেবার সুযোগ দেয়া হোক। তথাস্তু! যিনি বংশ পরম্পরায় বৃটিশ মুকুট পরিধান করবেন তাঁকে অষ্ট্রেলিয়া, কেনাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা যখন অভিবাদন করবে রাজা বা রাণী বলে ভারত তাকেই অভিবাদন করবে (বৃট্)কমনওয়েলথ শীর্ষ বলে। কাজেই এক ঢিলে দুই পাখী মারা পড়ল। রাজার রাজ্য-ও রইল প্রজার রাজকীয় প্রজাতন্ত্রও বহাল রইল। একাধারে শ্রীকৃষ্ণের শতনাম বৈ কি! এটা আর একটা সোনার পাথর বাটিই বটে!

বলা বাহুল্য, স্বাধীনতার প্রাণবায়ু সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত (limited) হয়ে গেল। রাষ্ট্রনীতি বিজ্ঞানের মতে কিন্তু সার্বভৌমত্ব হয় অখণ্ড, নয় অবাস্তব কিছু—আকাশ কুসুম। একমাত্র 'ব্রেজনেভ ডক্‌ট্রিন'-এর তুলনা মেলে। ঐ ডক্‌ট্রিনের মতে একমাত্র রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব ছাড়া 'ওয়ারস-প্যাক্ট' ভুক্ত দেশগুলোর সবারই সার্বভৌমত্ব সীমিত (Limited-Sovereignty)। এর মর্ম অবশ্য ভুক্তভোগীরাই বোঝেন। সোবিয়েত সাম্রাজ্যবাদের উপরাষ্ট্রগুলোর পুনঃ পুনঃ রক্তাক্ত বিস্ফোভের মধ্য দিয়ে তাদের বেদনার ভাষা জগজ্জনের কাছে কিছুটা মূর্ত হয়েছে।…তা যেমনই হোক, এ ব্যাপারে দ্বিমত নেই যে, গণতন্ত্রের দুনিয়ায় জনসাধারণের প্রদত্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত সার্বভৌমত্ব গোটা জাতির ঐকাত্ম্যবোধের প্রাণস্বরূপ।

অভিশপ্ত ভারতবাসী তার আভ্যন্তরীণ দুর্বল নেতৃত্বের বিপথগমনের ফলে নেতাজীর লক্ষ্য, পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম (Sovereign) রিপাব্লিক আজ বাহত হল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ছদ্মনাম (বৃট)কমনওয়েলথ-এর মুকুটকে, শীর্ষ নাম দিয়ে, সার্বভৌমত্বের প্রধান অধিকারী করে, ভারতের সার্বভৌমত্বকে খর্ব (limited) করা হল। দেশের মানুষ যখন বলল আমরা কেন পূর্ণ স্বরাজের বদলে ডমিনিয়নরাজের খণ্ডিত সার্বভৌমত্ব মেনে নেব; (বৃট্)কমনওয়েলথের-ই কি তাৎপর্য? অপব্যাখ্যার অভাব হল না। পণ্ডিতজী বলতে লাগলেন (বৃট) কমনওয়েলথ-কে ভাষায় ব্যক্ত করা যায়-না; এটা একটা অবর্ণনীয় আত্মিক (Spiritual) সত্তা। একেবারে যেন সেই অবাঙ্মানস গোচরম্। আমাদের প্রাণান্তকর স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন একটা অধ্যাসমাত্র—রজ্জুতে সর্পভ্রম। যারা ছলে বলে কৌশলে কোন দিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত হয়নি, তারা কিন্তু কমনওয়েলথ রসে বঞ্চিত। বৃটিশ সাম্রাজ্য বহির্ভূত একটি রাজ্য-ও কি বৃটিশ কমনওয়েলথ-এর আকর্ষণে কোনদিন আকৃষ্ট হল, তাতেও কি সন্দেহ জাগা উচিৎ নয় যে, কমনওয়েলথ ছাড়া জগতের সকল রাজ্য-ই ভ্রান্ত নয়! আমাদের দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবিরা কী করে খণ্ডিত সার্বভৌমত্বের অলীক কল্পনাকে স্বাধীনতা বলে মেনে নিলেন? সরল সাধারণ মানুষকে সাময়িক ধোকা দেওয়াটা কঠিন নয়। তবু ভারতীয় ডমিনিয়নে একজন মানুষ পাওয়া ভার যিনি

নেতাজীর পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে অন্তরে গৌরব বোধ করেন না। ভারতীয় জনসাধারণ দায়ে পড়ে বৃটিশের পূর্ণ আধিপত্যও তো একদিন অনিচ্ছায় মেনে চলেছিল। আবার স্বাধীনতার সহস্র সংগ্রামে অকাতরে ধন প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছ-পা হয়নি। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে (যাকে অপভ্রংশে বলা হত সিপাহী বিদ্রোহ) এবং নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বসাধারণের অজস্রধারা রক্তদানেই রক্তগঙ্গা প্লাবিত হয়েছিল। তারা মুখের ভাষায় যা ব্যক্ত করতে পারে না, হৃদয় শোণিতের ভাষায় তা অনায়াসে প্রাঞ্জল করে রেখে গেছে। এ ভাষা সমগ্র স্বদেশকে হৃদয় শোণিতে অনুভব করার ঐকাত্ম্যের ভাষা। এই ঐকাত্ম্যবোধের-ই সার্থক নাম সার্বভৌমত্ব।

এই ঐকাত্ম্যবোধের ভাবের ঘরে চুরি থাকলেই সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত করা যায়। জনসাধারণের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা যায়। নষ্টামি, আত্মীয় তোষণ, চোরাকারবারের পাপে দেশের নাভিশ্বাস ওঠে। কিছু লোক আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়, ১০তালা ২০তালা বাড়ীতে চড়ে পান ভোজনের আতিশয্যে মরে, আর দেশের অগুন্তি জনসাধারণ অনাহারে অর্দ্ধাহারে, বেকার বাস্তহারা আশ্রয়হারা, আশা হারা, ভাষা হারা হয়ে মরে ; জীবন ব্যাপী জীবন্ত মমির মত মরণ যন্ত্রণা ভোগ করে ; গণতন্ত্র ধনিক তন্ত্রের নামান্তর হয়ে নির্যাতনে জনসাধারণের কণ্ঠরোধ করে।

ঐকাত্ম্যবোধের ছিটে ফোঁটা অবশিষ্ট থাকলেও দেশব্যাপী শিল্পোৎপাদনে ব্যর্থতা, খাদ্যোৎপাদনে ব্যর্থতা, বিদ্যুৎ দুর্ভিক্ষ, অন্নের দুর্ভিক্ষ, পানীয় দুর্ভিক্ষ, সেচের দুর্ভিক্ষ আকাশমার্গী দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির মুখে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠে কালাতিপাত না করে মন্ত্রীমণ্ডলী জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে জনসমুদ্রের একফলা দুঃখের সহযাত্রী হতে পারতেন।

পাঁচশালা পরিকল্পনার মধ্যে জনস্বার্থে পেত সিংহাংশ ভাগ। চোরাকারবার, ভ্রষ্টাচার অযোগ্যতা তার তলা ফুটো করতে পারতো না।

সমগ্র জাতি একাগ্রচিত্তে শ্রম-অশ্রু-রক্ত দান করে একটি মাত্র মানুষের মত সারাদেশের মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের সংগ্রামে সর্ব্বস্ব পণ করতো। মহাজাতির উদ্দেশ্য সাধন, নয়ত শরীর পাতন হতো তার জপের মন্ত্র।

সার্বভৌমত্বহীন স্বরাজের ফল আমরা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি। বস্তুতঃপক্ষে ভারত বিভাগের চাইতেও খণ্ডিত সার্বভৌমত্ব মারাত্মক বিষয়। যাঁরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার বিনিময়ে আপোষে ডমিনিয়নরাজের ক্ষমতা হাতে নিলেন, তাঁরা সর্ব্বসাধারণের চোখে "বাচ্চা স্বরাজের" ধোকা দিয়ে বিশেষ লাভবান হয়েছেন এবং তাদের পেটোয়া লোকদেরকেও বেশ কিছু পাইয়ে দিয়েছেন।

যারা বেশ কিছু পেলেন (Haves) এবং যারা কিছুই পেলেন না (Have nots) এতদুভয়ের মধ্যে একটা অলঙ্ঘ্য ব্যবধান দ্রুত রচিত হল। মুষ্টিমেয় বিত্তবানের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আতিশয্য আর অগণিত সর্বহারার হাহাকারে দেশ ও সমাজ আজ দ্বিধা বিভক্ত, বিপর্যস্ত।

যারা দেশের ঐকাত্ম্যবোধের (Sovereignty) মূলে কুঠারাঘাত করলেন তাঁদের মুখে সর্বসাধারণের স্বার্থ উদ্ধার বা সার্বিক উন্নয়নের গালভরা কথার কি মূল্য ? বলা বাহুল্য, প্রথম দিকটায় সরল দেশবাসী স্বভাবতই এঁদের বিশ্বাস করেছে ; এবং আশা করেছে "বাচ্চা স্বরাজ" আবার করলে ফলবে সোনা! ভাল রুটি রুজি রোজগারের বন্যা বয়ে যাবে। মুখ বুঁজে আর কটা দিন সবুর সইলেই হল।...কিন্তু তাদের মোহ ভঙ্গ হতে বেশি দিন লাগলো না।

আজ দেরিতে হলেও সবাই বুঝতে পারছেন স্বদেশের উপরিতলের মানুষের সঙ্গে নীচুতলের মানুষের কী অলঙ্ঘ্য ব্যবধানটাই রচিত হয়েছে।

মনুষ্য-রচিত এ নিষ্ঠুর ব্যবধানের শান্তিপূর্ণ দীর্ঘায়ু বজায় রাখা ইতিহাসের নিয়ম নয়। হয় স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে একাত্ম হয়ে এ ব্যবধানকে নির্মূল করবো, নয়ত অনাগত বিপ্লবের রথ চক্রের তলে সার্বভৌম পূর্ণ-স্বাধীনতা গণতন্ত্র সমাজবাদ ও মানবতার দীক্ষা নেব।

(৪৫৪ পৃষ্ঠার পর)

জাতি বৈরীতা ভারতের সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নি। গান্ধীজী জাতীয়তার বাণী শুধু জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন না শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যারা শুধু অত্যাচার সয়েছে তারা শতাব্দী সঞ্চিত ভীরুতা ত্যাগ করে বলল "বন্দেমাতরম্, ইংরাজ ভারত ছাড়।" একদা বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন দেখে তরুণ গান্ধী "হিন্দ স্বরাজে" লিখেছিলেন "বাংলায় এই যে আগুন জলে উঠেছে, এ আগুন আর নিভবে না; বঙ্গ-ভঙ্গ তো রদ হয়ে যাবেই, কিন্তু ইংরেজের সাম্রাজ্য তরণীতে যে ফুটো হয়েছে তা আর বন্ধ হবে না। বাংলার এই বাতাস উত্তরে পাঞ্জাব ও দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা অবধি বয়ে যাবে।"—

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের বয়কট, নিরুপদ্রব বিক্ষোভ প্রতিরোধ, অসহযোগ গান্ধীজী গ্রহণ করে সারা ভারতে ছড়িয়ে দেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয় তার চারিত্রিক দৃঢ়তা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাংলার বিপ্লবী ও পাঞ্জাবের গদর দলের দুঃসাহসিক অভিযান। সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈন্য দলের সফল বিদ্রোহ, ইংরাজ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই পরিস্থিতিতে গোখেলের শিষ্য সাবধানী গান্ধীর নেতৃত্ব তারা ভালো চোখেই দেখেছিল। গান্ধীজীও জাতীয়তা প্রচারের দিকে যত জোর দিয়েছেন ইংরেজ জাতি বৈরীতার দিকে তত নয়।

শ্রীঅরবিন্দ, তিলক প্রভৃতির জাতি বৈরীতার ধারাটী গান্ধী নেতৃত্বের পটভূমিতেই ধীরে ধীরে সুভাষচন্দ্রকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়। এই ধারারই দাবী পূর্ণ স্বাধীনতা।

ইংরাজ শাসকরা চুপ করে বসে থাকেনি। কংগ্রেস সংগঠন হিউম ওয়েডারবার্নদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবার পর লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসের খবর রাখার জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক গোয়েন্দা বিভাগ স্থাপন করেন। যারা টাকা পয়সা দিয়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করছিল তাদের ভয় দেখান সুরু হয়। আর সুরু হয় বিভেদ নীতির খেলা। সৈয়দ আহমদ মনে করতেন হিন্দু মুসলমান ভারত মাতার দুই চক্ষু এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিরোধ বাধানোর মত পাপ আর দুটি নেই। তাকে হাত করে সাম্প্রদায়িকতার পীঠস্থান আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। যে বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কে বৃটিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি লর্ড বার্ডউডের মন্তব্য ছোলো, আলীগড় বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত না হলে পাকিস্থান পয়দা হোত না। দেওবন্দের বদলে আলীগড়ী ধারাই প্রবল হয়ে ওঠে।

সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ সংগঠন ও জাপানী আক্রমণের পটভূমিতে গান্ধীজী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক দেন। এ আহ্বান সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক আত্মত্যাগের আহবান। এই সময় মার্কিণ সংবাদপত্র নিউজ উইকে লেখা হয়—বোসের (সুভাষচন্দ্রের) বিরোধীতার একটি মাত্র পথই খোলা আছে, তা হোলো নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদ দেওয়া।"—ঐ সময় যদিও চার্চিল চাংকাইশেক ও রুজভেল্ট এর কাছ থেকে ভারতের স্বাধীনতার দাবী স্বীকারের স্বীকৃতি আদায় করেন। (Neheru, J. A bunch of old letters)—

সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ ফৌজ বর্মা সীমান্ত ভেদ করে ভারতে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারল না। জার্মানী ও জাপানের সমূহ পরাজয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হোলো। এই যুদ্ধে হিটলারের তুরুপের তাস ছিল ইংরেজ যদি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তা হলে তাকে ভারত সাম্রাজ্য হারাতে হবে। এ কথা হিটলার তার আত্মকাহিনীতে লিখেছেন। ইংরেজ এ ঝুঁকি নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই বন্দোবস্তও চালিয়ে গিয়েছল যাতে ঐ জটিল পরিস্থিতি থেকেও সে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে।

যুদ্ধের শেষে ইংরাজ সরকার প্রায় একশ বছর আগের ট্রাভেলীয়েনের মতানুযায়ী বৃটিশ পার্লামেন্টের মারফৎ ভারতকে স্বাধীন করেছিল। রক্তের বন্যা বয়েছিল। তবে তা' ভারতবাসীর, হিন্দু-মুসলমানের, শ্রীঅরবিন্দ, তিলক, লাজপৎ রায়ের ধারার উত্তরাধিকারী সুভাষচন্দ্র তখন দেশছাড়া। গান্ধীজীর অনুবর্তীরা ক্লান্ত ও ক্ষমতা লাভের জন্য উন্মত্ত। গান্ধীজী নিঃসঙ্গ। ইংরাজ সরকার জাতীয় নেতৃত্বকে বুঝিয়ে দিয়েছিল ইংরাজ সরকারের সঙ্গে আপোষ না করলে আন্দোলনের চাপে নতুন নেতৃত্বের ধাক্কায় তারা ভেসে যাবেন। অনেক আগে চিত্তরঞ্জনের সময় এ রকম একটা আপোষের বন্দোবস্ত গান্ধীজীর বিরোধীতায় ভেস্তে গিয়েছল। নিঃসঙ্গ গান্ধী রামমনোহর লোহিয়া মারফৎ বামপন্থীদের নিয়ে এক হাত খেলতে চাইলেন। তাদের হালচাল দেখে ভরসা পেলেন না। হয়ত সেই সময় ত্রিপুরীর প্রান্তরে আজ যারা তাঁকে বাদ দিয়ে মাউন্ট ব্যাটেনকে গ্রহণ করেছে তারা তার নামে "হিন্দুস্থান কো হিটলার কি জয়" বলে দেশছাড়া করেছে যাকে, তার কথাই বার বার মনে পড়ছিল। বোধহয় তাই আশাবাদী গান্ধী সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করতে চাইতেন না। পার্লামেন্টের বিধান অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের পনেরই আগষ্ট থেকে ভারতে ইংরাজ শাসন অবলুপ্ত হোলো।

ইংরাজ চলে গেলেও ম্যাকলের

(৪৭০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুস্তফীর ডায়েরী

বিমুদ্রীকরণ : কালোটাকা : হস্তিদন্তাজ

সুবিনয় মুস্তফী

Demo retisation বা বিমুদ্রীকরণ নিয়ে সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের সুরুতেই রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী চ্যবন সাহেবকে (মহারাষ্ট্রে সম্মানার্থে সাহেব কথাটিই প্রচলিত) বহু প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রশ্নবাণে একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলেন। প্রায়ই কাগজে পত্রে বিমুদ্রীকরনের সম্ভাবনা নিয়ে নানা কথা লেখা হয়। অধিবেশনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তেও দু'একটি খবর চোখে পড়েছিল। সদস্যগণ বোধহয় অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে বিমুদ্রী করণ বিষয়ে পরিস্কারভাবে সরকারী সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বা মনোভাব জানতে চেয়েছিলেন। চ্যবন সাহেবও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উত্তর দিয়েছিলেন। এর পর বিমুদ্রীকরণ নিয়ে আর কোন জল্পনা কল্পনার অবকাশ নেই। তিনি বলেছেন "It is not policy of the Government to go in for demonetisation. It is not going to lead to any results. "অর্থাৎ বিমুদ্রীকরণ করা সরকারের নীতি নয়। ইহাতে কোন রকম ফল পাওয়া যাবে না। অনেকে হয়ত ভাবছেন সরকার বিমুদ্রীকরণ করে কালো টাকা নির্মূলনের দিকে পা বাড়াবেন; ছাপাই নোট নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা করবেন। তাদের ভাবনা এখানেই সমাধিলাভ করল। কালোটাকার সাথে কংগ্রেস দলও প্রশাসকদের খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কালো টাকার গায়ে হাত পড়ে এমন কোন কাজ সরকারের নীতি হতে পারে না।

কালো টাকা আমাদের দেশে দ্বিতীয় অর্থ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। 'দুই নম্বর টাকা,' 'দুই নম্বরের টাকার সম্পত্তি,' কথাগুলি বাজারে খুবই চালু কথা।

এই দ্বিতীয় নম্বর অর্থব্যবস্থায় নোটের পরিমান সম্পর্কে কোন সঠিক পরিসংখ্যান কেহই দিতে পারেন না। হিসাব রাখা বা দেওয়ার কোন বালাই সেখানে নেই। সঠিক পরিমান নির্ণয় সম্ভবও নয়। যে সব অঙ্কের সংখ্যা আমরা বিভিন্ন কাগজ পত্রের লেখায় দেখি সবই অনুমানের উপর। কালো টাকা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিদিন বাড়ছে। বাড়া মাত্রাহীন। বাজারে ছাপাই নোট ভীষণ ভাবে ঠেলাঠেলি আরম্ভ করেছে। ভোগাপণ্য গুলিকে মাথায় করে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। বিয়ের সময় বরের বাবা কনের বাবাকে বলছে— আমার ছেলে আপনাদের আশীর্বাদে ৭০০৲ টাকা বেতন পায়। বিয়ের পর দেখছে মেয়ের সংসারে শুধু অভাব অনটনের কথা। বিয়ের সময় টাকার পরিমান শুনতে ভালই লাগে। আজকের বাজারে তার মূল্যে কি? যাক-এ অবস্থার অবসান সব মানুষই চায়। অবসানের পথ নিয়ে মতভেদ আছে। এই মতভেদ প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ সব মহলেরই আছে। শুনেছি মন্ত্রীমন্ডলেও নাকি মতভেদ আছে। যারা ধনবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চান তাঁরাও এ অবস্থায় সরকার থেকে একটু সক্রিয়তা আশা করেন। কারণ কালোধন বাজারে সবকিছু গ্রাস করে ফেলেছে; মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনকে অনিবার্য্য করে তুলছে। ধনবাদের ধারকগণ ভীত। এই অবস্থায় বাজারের নোটগুলিকে নিয়ন্ত্রনের একটি উপায় হল বিমুদ্রীকরণ। অর্থাৎ বাজারের সাদা নোট ও অন্ধকারের গহ্বরে লুকানো সব নোটগুলিকে বাতিল করে দিয়ে নতুন নোট বাজারে চালু করা। হিসাব বহির্ভূত নোটগুলিকে এভাবে অচল করে দেওয়া যায়। বেআইনী নোটগুলিকে দেশের চলাচলের করাকে বেআইনী করে দেওয়া। মূল্যহীন করে দেওয়া। এ কোন সমাজবাদী কার্যক্রম নয়। কাহারও সম্পত্তি বিনা ক্ষতিপূরণে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে না। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য অন্যান্য ধনবাদী দেশেও বিমুদ্রীকরণের পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানী এভাবেই মুদ্রাস্ফীতি রোধ করেছিল। একদিন পশ্চিম জার্মাণীতে মার্কের মূল্য অবশ্য ভাবে কমে গিয়েছিল। পাশের দেশ শ্রীলঙ্কায় কয়েক বৎসর আগে বিমুদ্রীকরণ করা হয়েছে। ওসব দেশ সমাজবাদী হয়ে যায় নাই। ধনিকদের শাসন-শোষন-ই চলছে।

পত্র পত্রিকায় সংসদে এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সভা সমিতিতে দাবি উত্থাপিত হয়। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় সেমিনারে বিমুদ্রীকরণের সমর্থনে মত প্রকাশ করা হয়। নানা ধরণের খবর মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। কিছু সংবাদ এমনভাবে—ছড়ায় শুনে মনে হয় দু'চার দিনের ভেতর বিমুদ্রীকরণ হয়ে যাচ্ছে। এ সবের বাইরে এ বিষয় আর কিছু ঘটে নাই। এই জল্পনা কল্পনার সংবাদে কালোটাকার মালিকদের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। বুঝিবা সরকার কালোটাকার বস্তু রূপান্তরের দিকে ঝুকেছেন। সরকারও কালোটাকাকে নষ্ট করে মালিকদের স্বার্থে আঘাত না করে উৎপাদনের কাজে লাগানোর কথা ভাবছেন। কালোটাকা দিয়ে সোনা হীরা রূপা ও অন্যান্য বস্তু, রূপার থালা বাটি ইত্যাদি কিনে নোটগুলিকে রূপান্তর করে ফেলছেন। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে কতদিন এভাবে টাকা

আটকে রাখবেন? তাদের জীবনে আমোদ আহ্লাদ করতে হলে বাজারে টাকা নিয়ে আসতেই হবে। টাকার ঘাড়ে চেপেই নানা দ্রব্য সামগ্রী ঘরে নিয়ে যেতে হবে! ভোগ্য পণ্যের বাজারে সোনা হীরা নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না। তাছাড়া বস্তুতে রূপান্তরের পরও বাজারে নোটগুলি সার্কুলেশানে থেকেই যাচ্ছে। জল্পনা-কল্পনা-আলোচনা বাজারে নানা খবর কালোটাকাগুলিকে সোনা রূপা হীরায় বা অন্যান্য বস্তুতে রূপান্তরিত করাকে ত্বরান্বিত করছে। তার কিছু আভাস পাওয়া যাচ্ছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে বোম্বেতে এক বাড়ীতে হানা দিয়ে কয়েক লক্ষ কালোটাকা ও অন্যান্য বস্তু পাওয়া গেছে। সেগুলি দুই ও এক টাকার নোটের আকারে পাওয়া গেছে। কয়েকদিন আগেই মালিক কোন এক ব্যাংক থেকে উচ্চমূল্যের নোটগুলিকে পাল্টিয়ে কম মূল্যের নোটে রূপান্তর করেছিলেন। সেই বাড়ীতে রূপার থালা-বাসনও প্রচুর পাওয়া গেছে। রায়পুরের খবরে দেখা যায় বিলাসপুরের একজন ইন্‌জিনিয়ার ব্যাংকে দুই লক্ষ টাকা মূল্যের নোট নিম্নস্তরের নোটে রূপান্তর করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। কাগজে বিমুদ্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা দেখে মালিকগণ উচ্চমূল্যের নোটগুলিকে কম মূল্যের নোটে রূপান্তরের দিকে ঝুকেছেন। সাধারণ ভাবে সকলের ধারণা হচ্ছে যে নোটের বিমুদ্রীকরণের আওতায় বেশী মূল্যের নোটগুলিই পড়বে। এভাবে যদি খবর ছড়ানো যায় এবং বৎসরের পর বৎসর যদি আলাপ আলোচনা করে কাটানো হয় তবে মালিকগণ নোটগুলিকে অন্যভাবে রূপান্তরিত করে নেবে। এসব সত্বেও কালোটাকা বাজার থেকে সরে যাচ্ছে না। শুধু হাত বদল হয়ে যাচ্ছে।

বিমুদ্রীকরনের ফলে ধনবাদের উচ্ছেদের কোন আশঙ্কা নেই। যদি ধনবাদ উচ্ছেদ বা বিনাশের সম্ভাবনা থাকত তবে ধনবাদী দেশগুলি এ পথে যেত না। এটা ধনবাদের সৃষ্ট অসুখেরই দাওয়াই মাত্র।

বিমুদ্রীকরণে প্রধানঃ দুটি কাজ হাসিল হবে। প্রথমতঃ কালোবাজারে যারা টাকা উপার্জন করে নোটের আকারে জমা করে রেখেছেন সেগুলি প্রকাশ হয়ে পড়বে বা অকেজো হয়ে যাবে। প্রকাশ্য বাজারে চলে এলেই তার হিসাব নিকাশ করে সাদা টাকা করতে হবে। তাতে টেক্স বসবে। প্রকাশ্যে আনতে হলে কোথা থেকে এল তার হিসাব দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কালোটাকা অকেজো হয়ে গেলে কালোটাকার মালিকদের খরিদ করার ক্ষমতা হ্রাস পাবে, সুরক্ষ পথে বাজার থেকে দ্রব্য সামগ্রী টেনে নেওয়া বন্ধ হবে। বাজারে মূল্য বৃদ্ধি ও জিনিষপত্রের অভাব দূর করতে সাহায্য করবে। বে-হিসাবী টাকা জনগণের জীবনে যে সংকট সৃষ্টি করেছে তার খানিকটা লাঘব হবে। বিমুদ্রীকরণ আজকের অবস্থায় প্রাথমিক কাজ। বাজারে জিনিষ পত্রের যে অভাব দেখা দিয়েছে তাতে কালোটাকা এক মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছে। মাল মজুত কালোটাকাতেই বেশী করা হয়। সাদা টাকায় ব্যাপক মজুত করা সম্ভব হয় না। একমাত্র বিমুদ্রীকরণেই কালোধন নির্মূলন হবে না। কালোধন নির্মূলন করতে হলে আনুসঙ্গিক আরও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে কালোটাকার যে পাহাড় গড়ে উঠেছে তার উপর খানিকটা আঘাত হানা যায়।

বাজারে ১০,০০০ টাকার মত সরকারী নোট চালু আছে, এর মধ্যে ১০০০ টাকা এবং তার উপরের মূল্যের নোট ৫% শতাংশ। ১০০ টাকার ৪০%শতাংশ এবং ২০ টাকা ও ১০ টাকার নোট ৩৫%শতাংশ। ৫ টাকা ২ টাকা এবং ১ টাকা মূল্যের নোট হচ্ছে ২০% শতাংশ। এ হিসাবগুলি আনুমানিক। হয়ত একটু এদিক ওদিক হবে। বাজারে ১০০ টাকা ও তার কম মূল্যের নোটগুলি ব্যাপকভাবে চলাফেরা করে। তার উপরের নোটগুলি বাজারে সাধারণ মানুষ দেখে নাই। বোম্বেতে সাম্প্রতিক কালে হানা দিয়ে যে ভাবে কম মূল্যের অর্থাৎ একটাকা দু'টাকার মূল্যের নোট পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে শুধু উচ্চ মূল্যের নোট গুলি বাতিল করলেই কাজ হাসিল হবে না। ১০ টাকার উপরের নোটগুলি বাতিল করলেই ৮০% শতাংশ নোট বাতিল করতে হয়। আজকে বিমুদ্রীকরণ করতে হলে সকল প্রকার নোটই বাতিল করতে হবে। কিছু দিন আগে বাতিল করলে হয়ত শুধু ১০ টাকার উপরের নোটগুলিকে বাতিল করলেই ফল পাওয়া যেত। সুতরাং আজকে সম্পূর্ণভাবে নোটের বিমুদ্রীকরণের কথাই ভাবতে হবে। ইন্দিরা-চ্যবন চক্র, সুফল পাওয়া সম্ভব জেনেও, এ পথে কেন অগ্রসর হচ্ছেন না এবং বাধা কোথায়?

(ক্রমশঃ)

দিল্লীর কড়চা

কালীকিংকর চট্টোপাধ্যায়

অসহায় ছুটফটানি-স্কুলে ছেলেমেয়ে ভর্ত্তি করা বাস-ট্রামে বাসে ওঠা মরণপণ ক'রে-যখন তখন যেখানে সেখানে গুণ্ডারা ছোরা উঁচিয়ে র'য়েছে পঞ্চাশটা টাকা আর ঠাকুদ্দার কেনা তেরো টাকার ঘড়ি, যা এখন চুনের ডিবে হ'য়ে গেছে, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম এক-গাছা দুআনা সোনার ক'রে যাওয়া ঝিকঝিকে হার কি ব্রোঞ্জের উপর চোদ্দ ক্যারেট সোনার (ও আবার সোনা নাকি) দু গাছা চুড়ির লোভে।

ঘুষ না দিলে—এখন যার ভদ্র নাম-করণ হ'য়েছে ক্যাপিটেশন ফি, মেডি-ক্যাল বা ইনজিনীরিং-এ ভর্ত্তি হওয়া যায় না; মন্দিরেও কিউ টপ্‌কানো যায় না-জলের বিল ইলেকট্রিকের বিল, টেলিফোনের বিল, জীবনবীমার চাঁদা জমা দিতে গেলেও ঘুষ লাগে। একটা আধখানা পাউরুটি, এক টিন বনস্পতি, এক কৌটা শিশুর খাদ্য, এক প্যাকেট বিস্কুট ব্ল্যাকের দামে পেতেও যেখানে বিক্রেতার বিশেষ করুণার ভিখারি হ'তে হয়। এই দিল্লীতেও বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের রাজধানী সহরেও-রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, বাঘা বাঘা সেক্রেটারী ও অজস্র বৈদেশিক রাজদূতের নাকের উপর -সেখানে, যেখানে ভাল কথা-ভাল কাজ সম্বন্ধে কে লিখবে আর শুনতেই বা চাইবে কে?

এই যে অসংখ্য অগুণতি মানুষ হীনমন্য হ'য়ে প'ড়ছে, গোটা দেশটা যে ভিখিরিতে ভ'রে যাচ্ছে, বাধ্য হ'য়ে নিজের ও সন্তানদের মুখ চেয়ে প্রতি পদে তাকে বিসর্জন দিতে হ'চ্ছে, যতটুকুই ছিটে ফোঁটা আদর্শ বাকী থেকে গিয়েছিল তার মনে প্রাণে, প্রতিক্ষণে এই যে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করার বাধ্যবাধকতা এতে মানুষের শেষ আত্মমর্য্যাদাটুকুও হারাচ্ছি আমরা। এর জ্বালা, এর যন্ত্রণা কি কম?

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এর দায়দায়িত্ব ত গভর্ন্মেন্টের উপরই চাপবে। সে সবকথা অর্থাৎ গভর্ন্মেন্টের কাজের ঢিলেমি বা দুর্নীতি কাগজের সম্পাদকেরা ত' আর তাই ব'লে ক্রমাগত ছেপে যেতে পারেন না। পারেন কি? একে ত' নানাভাবে—প্রত্যক্ষভাবেও আজকাল আর পরোক্ষ-ভাবে ত বরাবরই, গভর্ন্মেন্টের চোখ রাঙানি তাঁদের উপর র'য়েছে সর্ব্বদাই, তা' ছাড়াও গভর্ন্মেন্টের গৌরী সেনি মোটা টাকার বিজ্ঞাপন—আবার আজ-কালকার নতুনতম মাথাব্যথা নিউজ-প্রিন্টের কোটা—এসব নিয়মিত পেতে হ'লে-আর পেতে হ'লেই বা কেন না পেল ত' অবধারিত অতা—শুধু বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে গভর্ন্মেন্টকে বৈরি করা চলেনা। কাজেই ভাল কাজের খোঁজ প'ড়েছে—বা 'উপর' থেকে খোঁচা প'ড়েছে।

অবাস্তব রকমের বেশী—ভোটের জোরে এবং অভাবিত রকম সুখ সুবিধাভোগী একদল লোকের ভোটের ভোরে, গ্রামে, গঞ্জে, সহরে, বন্দরে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে মানুষগুলোর জীবনকে বেঁধে ফেলেছে একটা বিশেষ রাজনৈতিক দল; এবং তাদের এমনি একটা দুর্ব্বার একাধিপত্য সৃষ্টি ক'রেছে খুব গালভরা নাম গণতন্ত্রের মহিমা, যে তার মধ্যে কোথাও কেউ ভাল কাজ কিছু ক'রলেও কিছু এসে যায়না। দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থার উপর তার কোন প্রভাব পড়েনা। এ সেই কোন গাড়ী চালকের বিরুদ্ধ সততার মতন কোনও যাত্রীর ভুলে ফেলে যাওয়া টাকা গহনা ভরা সুট-কেশ বাড়ী ব'য়ে ফেরৎ দিয়ে যাওয়া

তা'বড় তা'বড় পত্র পত্রিকার সম্পাদকদের কাতরানি মাঝে মাঝে চড়া গলায় শোনা যাচ্ছে—কত লেখা তাঁরা পান তার বেশীর ভাগই দেশের কোন না কোন অন্যায় বা মন্দ কাজের সম্বন্ধে—তার নিন্দা বা সমালোচনা। আগুন লাগ, বা দুর্নীতি বা অত্যাচার সম্বন্ধে। কেন রে বাপু—এতো বড় দেশের কোথাও কি ভাল কিছু নেই? নিশ্চয়ই আছে। সেই সব সম্বন্ধে লিখতে পারো না। একজন সাধারণ মানুষ—তার বিশেষ একটা ভাল কাজ-সাহায্য-দয়া-নিজের স্বার্থ ভুলে নিজের-ধন-মান জীবন বিপন্ন করে অন্যের মঙ্গল করা—তা হোক্ না কোন দূর দুরান্তের নিভৃত কোণে। অথবা কোথাও কোনও সরকারি আবলা লাল ফিতের ফাঁস ফাঁসিয়ে ঝটপট কোনও অন্যায়ের প্রতিকার করে দিলে বা একটা জরুরি ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে দশের উপকার ক'রে দিলে এগুলো কিছু কিছু প্রমাণ পত্র সহ বিশ্বাসযোগ্য ক'রে লিখতে পারোনা।

সম্পাদকদের এই কাতরানির মানে অবিশ্যি সহজেই বোঝা যায়। তাঁদের প্রথম ও প্রধান এবং খুব সম্ভবত একমাত্র মাথাব্যথা তাদের পত্রিকা বা কাগজটির বিক্রী বাড়াতে হবে। একশ'র মধ্যে পঁচানব্বই জন পড়িয়ে ত' এমনিতেই জ্বলছে। একে-বারে প্রাথমিক প্রয়োজনের চাল, ডাল, তেল (এখন নূনও হ'য়েছে) সাবান, কেরাসিন, কয়লা মেলেনা -আগুন দাম ভেজাল। নিরীহ মুরোজ যা নাকি ওষুধই নয় তারই ইনজেক-শনে দু দফায় জনা ত্রিশেক মারাই পড়লো। স্বভাবতই ত্রিশ লক্ষের মনে নতুন দুর্ভাবনা আর একটা ঢুকলো। ট্রেনে যাবে টিকিট ও রিজার্ভেশন মেলেনা, হাসপাতালে ভর্ত্তি হ'তে পারেনা; মরণাপন্ন রুগী নিয়ে

বা ছোট্ট বেড়াল বাচ্ছাকে রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়া থেকে বাঁচতে গিয়ে কারুর নিজের প্রাণ দেওয়া। এ দৃষ্টান্তে গাড়ী চালক সবাই ত' নয়ই -অনেকেও নয়-হয়ত আর একজনও নয়, যে সং হয়ে গেল বা মূক প্রাণী-দের দুঃখে মানুষের হৃদয় দ্রব হ'য়ে গেল। কোনও আদর্শবাদী বুরোক্র্যাট লাফিয়ে অগ্রাহ্য ক'রে যোগ্য প্রার্থীকে সাহায্য করার আদর্শে বুরোক্র্যাসীকে উদ্বুদ্ধও করেনা কখনও। এ হয়না।

বহুকাল থেকেই এক বা একাধিক আদর্শবাদী কর্মী গ্রাম উন্নয়ন, রাস্তা তৈরি, কচুরিপানা ধ্বংস, স্কুল, হাস-পাতাল স্থাপন, স্বাস্থোন্নতি, নীতিশিক্ষা এসব কাজ দেশের বহু জায়গায় ক'রে আসছেন। দেশের সামগ্রিক বকাশ ও উন্নতি তাতে ক'রে বড় একটা কিছুই হয়নি। সেই একটি মানুষ বা সেই ক'টি মানুষ স'রে গেলেই সে সব কাজও বন্ধ হ'য়ে যায় আর সে সব প্রতিষ্ঠানও ক্ষীণ-শ্বাস হ'তে হ'তে উঠেই যায়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। অমন মহৎপ্রাণ প্রতি-ভাধর ও অক্লান্ত কর্মী গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলন যা যুবা ও কিশোরদের শরীর ও মনের উন্নতির অপূর্ব সহায়ক আন্দোলন একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হ'য়েছিল তারও আজ দু এক জায়গায় মাত্র মক প্রদর্শনী ছাড়া আর প্রায় অস্তিত্বই নেই। গান্ধীর গ্রামোন্নয়ন এবং বিনোবার সর্বোদয় ও আজ মাত্র শাসকগোষ্ঠির লাগসই প্রচার মাধ্যম এবং আমাদের দেশের অতিশয় আবেগ প্রবণ কোটি কোটি অজ্ঞান ও অশিক্ষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করার এক চমৎকার উপায় ছাড়া সত্যকার সমাজ হিতের কোনও দাম তার মোটেই আছে কিনা সন্দেহ।

তাছাড়া কোন ভাল কাজের চেষ্টাও পরিকল্পনা মাত্রেই গভর্নমেণ্টই নানাভাবে বাধা সৃষ্টি ক'রবে, তাকে সাহায্য করা ত' দূরের কথা। এই ত' দিল্লির খুব কাছেই লোকসভা ও রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে দশ বার মাইলের মধ্যেই র'য়েছেন এক ভদ্র-লোক যাঁর মাথায় সমাজ সেবার পোকা। নাম আহজা। সম্পূর্ণ একলার চেষ্টায়, নিজেরই লাখখানেক টাকা লাগিয়ে, প্রাণপাত পরিশ্রমে কত কিছু করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে র'য়েছেন তিনি। কিন্তু যহ ধরবার ক'রে বহু তালেবর নেতা ও বুরোক্র্যাটকে সরজমিনে তাঁর প্রতি-ষ্ঠান দেখিয়ে এনেও সরকারি আনুকূল্য ত' পাচ্ছেনই না বরং বাধা আসছে কতভাবে। কারণ? কারণ তাঁর প্রতিষ্ঠানটি বেসরকারি এবং তিনি তাঁর রক্ত দিয়ে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটিতে ফাঁকা মুরুব্বিয়ানা করে ডকে উঠিয়ে দিতে কোন সরকারি আধিপত্যের বেনোজল ঢোকাতে চান না। কাজেই কুড়ি বছর ইউ-এন-ও-তে উচ্চপদে কাজ করা মানুষ নিজের বিশালকায় মার্সেডিজ গাড়ী এবং এক লাখ টাকা লাগিয়েও সমাজতন্ত্রের পথে ধাবমান আমাদের গভর্নমেণ্টের ক্ষমতাকেন্দ্রের এতো কাছে থেকেও যদি সুবিধা ক'রতে না পারেন এবং তাঁর কাজের প্রভাব, কাজে কাজেই, যদি বৃহত্তর জনজীবন ও সমাজের উপর অনুভূত না হয় তা'হলে কি হবে আর কাজের ফিরিস্তি দিয়ে? এ ভাবে সাধারণের মনোরঞ্জনের চেষ্টা ত' তাহলে এই দাঁড়ায় যে অন্ধকার, দুঃখ ও প্রবঞ্চনার দিকটা আড়াল ক'রে একটা কপটতার খেলা চালানো।

ওরা কাজ করে

অশোক সাহা

এখন দারুণ গ্রীষ্মের বুকে
পঁচিশ বছরের বেকারীর জ্বালা,
বিলের রুক্ষ শুষ্ক মাটিতে
শ্বাপদের পদধ্বনি—
এখন ঝিম ধরা মধ্যাহ্নে
ক্লান্ত শকুন পাখা মেলে!
তবু অধিশ্বাস্য আশায়—
এই রোদ গলা প্রচণ্ড দুপুরেও
হাতুড়ি-ছেনির দারুণ নর্তনে
মানুষগুলো যেন পশু হয়:
সীমাহীন জীবনের
প্রসন্ন প্রশান্তির আশায়
এই দারুণ গ্রাম্যের
জ্বালাকে অস্বীকার করে
ওরা কাজ করে!!
ওরা কাজ করে—
মাঠে-প্রান্তরে-কারখানায়!

স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নিকুঞ্জ সেন

সৈন্যদল যত বড় হবে অর্থের প্রয়োজনও তত বেশি হবে। ধনীদের কাছে অর্থ চাইলে যে পাওয়া যাবেনা তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। সেই জন্যই তিনি অর্থ সংগ্রহের বিকল্প পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। সরকারের অর্থ লুণ্ঠন করে, ছলে বলে কৌশলে দেশের ধনিক শ্রেণীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করে তিনি তাঁর অর্থের চাহিদা মেটাতে বদ্ধপরিকর্ হলেন।

মারহাটা জাতির মধ্যে রমশী সম্প্রদায়ই সামরিক বিদ্যায় সমধিক পারদর্শী। বৃটিশ শক্তির অধীনে যখন তাদের কাজ করতে হত তখন ইংরেজের মারহাটা রেজিমেণ্টের মধ্যে অনেকেই ছিলেন এই রমনী সম্প্রদায়ের লোক। মারহাটা সৈন্যেরা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তখন এই রমশী সম্প্রদায়ের সৈনিকরাই সে বিদ্রোহে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বীর ফড্‌কে সে কথা ভোলেন নাই। তাই পরবর্ত্তী যুগে তিনি যে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহের আয়োজন করেন তাতে অংশ গ্রহণের জন্য আবার তিনি রমশী সম্প্রদায়ের বীর যোদ্ধাদের আহ্বান করেন।

মহারাষ্ট্রের এই বীর সন্তান, বাসুদেব বলবন্ত ফড্‌কে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করেন। মারহাটা দেশের পাহাড়-ঘেরা বনপথ, সেখানকার নদ-নদী ও উপত্যকা, ঝোপঝাড়-জঙ্গল, এক কথায় ঐ অঞ্চলের সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশই গেরিলা যুদ্ধের অনুকূল। মহাবীর ফড়কে তাই ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি সংঘর্ষে না গিয়ে গেরিলা পদ্ধতিতেই শত্রুসেনাকে ব্যতিব্যস্ত করবার পন্থা গ্রহণ করলেন। সুযোগ বুঝে গোপন ঘাঁটি থেকে সম্মিলিত শত্রুসেনাকে অতর্কিত আক্রমণ করে নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে যাওয়া, এই ছিল ফড্‌কের রণকৌশল। শিবাজীর রণনীতি যিনি আয়ত্ব করেছেন তার পক্ষে এই আচমকা আক্রমণের পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে গ্রহণ করা একটুও কষ্টসাধ্য হয় নি। এ ছাড়া তিনি আরো একটি কৌশল গ্রহণ করেছিলেন—একই সময়ে একাধিক শত্রু ঘাঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার রণকৌশল। একই সময়ে একযোগে বিভিন্ন শত্রুঘাঁটির উপরে আক্রমণের ফল হত এই যে শত্রুপক্ষ মনে করত যে বিদ্রোহীদের সৈন্য সংখ্যা অপরিমিত।

এই পদ্ধতিতে ফড্‌কের বিদ্রোহী সেনাদল শত্রুসেনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে শত্রুপক্ষকে বিহ্বল করে ফেলতে লাগল। কখনও এখানে, কখনও ওখানে, কখনও গ্রামে, কখনও সহরে, কখনও পর্ব্বত, উপত্যকায়-কখনও বা বনবাদাড়ে তার সেনাদলের অতর্কিত আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ইংরেজশক্তি মহা ভাবনায় পড়ে গেল। গ্রেপ্তার করবার সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে বীর ফড্‌কে তাঁর লুণ্ঠন ও শত্রুসেনা ধ্বংসের কাজ অপ্রতিহত গতিতে চালিয়ে যেতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরকে হত্যা করবার জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করে ফেললেন। এই সমস্ত বীরোচিত কার্যের জন্য সমগ্র মারহাটা অঞ্চলে তিনি দ্বিতীয় শিবাজী নামে অভিহিত হলেন।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি ধরা পড়লেন। তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ভারতের কোন কারাগারে রাখা বিপজ্জনক মনে করে তাঁকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সুদূর এডেনে। কিন্তু বীর ফড্‌কে কিছুদিন পরে শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই এডেনের কারাগার থেকে পালিয়ে যান। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আবার ধরা পড়েন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভারতের এই বীর সন্তান এডেনের এক অন্ধকারময় কারাকক্ষে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মণিপুর বিদ্রোহ

১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পরে ভারতবর্ষে কিছুকালের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহের যুগ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ভারত-বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের এই ধূমায়িত বহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নি। সে-বহ্নি মারাহাটা অঞ্চলে কিভাবে সেদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল তা আমরা বলেছি। এবার মনিপুর বিদ্রোহের কথা। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। বৃটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে মনিপুরের সংগ্রাম তখনও শেষ হয় নি। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিং তাঁর সীমিত সৈন্যবল নিয়ে তখনও উড়িয়ে রেখেছিলেন বিদ্রোহের পতাকা। ১৮৯১ সালের মার্চ্চ মাসে বৃটিশশক্তি মনিপুরে এসে টিকেন্দ্রজিৎকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলল। সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ তৎক্ষণাৎ সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। শুধু প্রস্তাব প্রত্যাখানই নয় তাঁর আদেশে তাঁর সৈন্যেরা তিনজন বৃটিশ জেনারেলকে হত্যা করে ফেলল। অপমানে ও ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বৃটিশ সৈন্যেরা মণিপুর দুর্গ আক্রমণ করল। টিকেন্দ্রজিৎও তার সেনাদল বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে সে-আক্রমণ প্রতিহত করল। পরা-

জিত বৃটিশশক্তি এবার যে কোন উপায়ে এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হল। স্থির হল ঐদিনই গভীর রাতে মণিপুর দুর্গ আক্রমণ করে তাকে বিধ্বস্ত করা হবে। যে কথা সেই কাজ। সেদিনই মধ্যরাত্রে আরো অনেক সৈন্য এবং প্রচুর গোলা-বারুদ নিয়ে তারা দুর্গ আক্রমণ করল। কিন্তু, এবারও টিকেন্দ্রজিতের স্বল্পসংখ্যক দুর্ধর্ষ স্বাধীনতাসংগ্রামীর কাছে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল বৃটিশশক্তি। মণিপুর দুর্গের স্বাধীনতার জয়পতাকাকে ধূলায় অবলুণ্ঠিত করার স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। এত চেষ্টা, এত লোকক্ষয়ের পরেও যখন দুবার তাদের আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হল তখন সত্যিই তারা ভাবনায় পড়ল। মণিপুরে অবস্থিত বৃটিশশক্তি একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করল যে যত সহজে তারা টিকেন্দ্রজিৎকে জয় করবে বলে ভেবেছিল কাজটা তত সহজ নয়। বুঝতে পারল তারা যে স্থানীয় বৃটিশশক্তির দ্বারা তা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। তৃতীয়বার আক্রমণের পূর্ব্বে তারা ব্রহ্মদেশ থেকে ইংরেজসৈন্য আমদানী করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করল। বর্দ্ধিত শক্তি ও সাহস নিয়ে এবার তারা প্রচণ্ড আঘাত হানল মণিপুর দুর্গে। কিন্তু, বৃটিশশক্তি সেবারেও মণিপুরের দুর্গ-প্রাকারে মাথা খুঁড়ে মরল—দুর্গজয় সেবার-ও সম্ভবপর হল না। বার বার তিনবার আক্রমণ করেও যখন মণিপুর দুর্গ ধ্বংস করা সম্ভবপর হল না, তিনবারের চেষ্টায়ও যখন পরাজিত করা গেল না সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ ও তার সেনাবাহিনীকে, তখন সত্য সত্যই ভীত হল ইংরেজশক্তি। শুধু মণিপুরে অবস্থিত ইংরেজ সেনারাই নয়, সারা ভারতের ইংরেজশক্তি, কেননা মণিপুর দুর্গজয়ের সঙ্গে শুধু একটি যুদ্ধে জয় পরাজয়ের প্রশ্নই নয় ভারতে ইংরেজদের মর্য্যাদার প্রশ্ন-ও জড়িত। এই সব কথা বিবেচনা করেই তারা এবার মণিপুর দুর্গ অধিকারের জন্য মুরপাল্লার ভারি ভারি কামান আমদানী করল। এই কামানগুলির সাহায্যে প্রথমে দূর থেকে অনেক গোলাবর্ষণ করা হল। গোলাবর্ষণের ফলে দুর্গের বাইরের প্রাচীর ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। দুর্গের ভেতরেও প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হল। টিকেন্দ্রজিৎ বুঝতে পারলেন, এবার মণিপুর দুর্গকে আর কোনক্রমেই রক্ষা করা যাবে না। কিন্তু, ইংরেজের কাছে ধরা তিনি কিছুতেই দেবেন না। তাই শত্রুর সতর্কদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে টিকেন্দ্রজিৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে মণিপুর দুর্গ থেকে পলায়ন করলেন। সন্নিহিত গভীর বনে তিনি তাঁর কিছু বিশ্বস্ত সেনা নিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করলেন এবং সেই গোপন ঘাঁটি থেকেই তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিছুকালের মধ্যে বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে মণিপুরের দুর্ভেদ্য বনে সংগ্রাম বাঁধল সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের। এবার কিন্তু বেশিদিন তিনি বাইরে থাকতে পারলেন না। শীঘ্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট, মণিপুরের এই বীরসন্তান ও সমগ্রভারতের দুঃসাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামী ফাঁসীর মঞ্চে বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

(ক্রমশঃ)

নানা রঙের দিনগুলি

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রসময় শূর

রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান অপূর্ব নৈপুন্য ও সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বাদল সেদিন রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অব্যবহিত পরেই মৃত্যুকে বরণ করল। বিনয় ও দীনেশ গুরুতর আহত, মুমূর্ষু অবস্থাতেই তাদের দু'জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই এসে পৌছলেন গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশেরা। কী কর্ম্ম তৎপরতা তাদের! কী সেবা যত্ন! যে করেই হোক এদের দু'জনকে বাঁচিয়ে তুলতেই হবে। এদের দু'জনের যে বেঁচে ওঠা দরকার। তা না হলে এত বড় একটা আস্তানার সব খবর বের করতে হবে, আর বের করতে হবে এখনও যারা পলাতক আছেন তাদের ঠিকানা। এইসব খোঁজ খবর যদি বের করা সম্ভবপর না হয় তাহলে তাদের শুধু প্রেষ্টিজ নয় একেবারে চাকরী নিয়েই টানাটানি। গোয়েন্দা বিভাগের সব চেষ্টাই কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হল। বিনয় তো তাদেরকে হতাশই করল, কেননা রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের পাঁচদিন পরেই বিনয় বীরের মৃত্যু বরণ করলেন। দীনেশ অবশ্য বেঁচে উঠল, কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের সাধ্য কি যে, দীনেশকে ঘাঁটায়। তাই দেখা গেল

গুরুতর আহত দীনেশকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পর থেকে সারাক্ষণ তার শয্যাপার্শ্বে একজন পুলিশ অফিসার বসে থাকেন। দীনেশ যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠল তখন তার কাছে আসতে লাগলেন একজন পুলিশ অফিসার। তিনি দীনেশের সঙ্গে নানা কথা বলতেন। দীনেশ তাঁকে বিশ্বাস করে ফেলল। তিনি দীনেশকে বোঝালেন যে, তাদের দলের সব খবর তারা জানে, তাদের দলের নেতা কে, কোথায় তিনি থাকেন, কোথায় তাদের অস্ত্রশস্ত্র লুকানো আছে, এসব খবর তারা জানে। তবে তারা দীনেশের মুখ থেকে এসব কথা শুনতে চায় না। তারা চায় দীনেশ তাদের সাহায্য করুক। দীনেশ যদি তাদের সাহায্য করে তবে তারা দীনেশকে মুক্তি দেবে। দীনেশ তাদের সাহায্য করতে রাজী হল। তারপর একদিন দীনেশ তার সঙ্গীদের সন্ধান দিতে বেরিয়ে পড়ল। দীনেশ তার সঙ্গীদের সন্ধান দিতে লাগল। তার সঙ্গীরা ধরা পড়তে লাগল। দীনেশ তার সঙ্গীদের সন্ধান দিতে লাগল। তার সঙ্গীরা ধরা পড়তে লাগল। দীনেশ তার সঙ্গীদের সন্ধান দিতে লাগল। তার সঙ্গীরা ধরা পড়তে লাগল।

গোয়েন্দা বিভাগ দল সম্পর্কে কোন সূত্রেরই সন্ধান পেল না।

আমরা-ও আশ্বস্ত হলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম কলিকাতা এবং তার বাইরে যে গোপন আশ্রয়গুলি আমরা তৈরী করেছিলাম তা যেমন ছিল তেমনি নিরাপদ আছে। আমরা যারা পলাতক জীবন যাপন করছিলাম তাদের কোন হদিশই পুলিশ পায়নি। বি-ভি-র এ্যাক্শান স্কোয়াডে আমরা যারা ছিলাম তাদের মধ্যে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা চলতে লাগল রাতের অন্ধকারে। আমরা ঠিক করলাম যে কিছুদিনের জন্য আমাদের কলকাতার বাইরে যাওয়া প্রয়োজন; নিজেদের নিরাপত্তার জন্য তো বটেই, দলের প্রয়োজনে-ও। স্থির হল আমি চলে যাব নোয়াখালীর দিকে দলের কাজকর্ম তদারকি করতে, আর নিকুঞ্জ সেন ও সুপতি রায় চলে যাবেন ঝরিয়ার কোলিয়ারি অঞ্চলে। ওখানে আমাদের দলের সদস্য শ্রীবিনোদ দাস একটি কোলিয়ারির প্রথম শ্রেণীর ম্যানেজার। বিনোদ দাস দলের বিশ্বস্ত কর্মী কিন্তু পুলিশের কাছে একেবারেই অপরিচিত। শুধু পুলিশের কাছেই নয় আমাদের দলের কাছেও তিনি তখন ছিলেন প্রায় অপরিচিত। দলের স্বার্থেই তাকে এমন ভাবে রাখার প্রয়োজন ছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমরা এক আধজন একান্ত সংগোপনে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছি এবং কাজ শেষ হওয়া মাত্র সেখান থেকে চলে এসেছি। একদিনের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯৩০ সালে এক রাত্রে কলকাতা থেকে আমি, ভূপেন রক্ষিত ও মনীন্দ্র রায় কয়েকটি বোমা নিয়ে তার আস্তানায় গিয়ে হাজির হই। এই বোমাগুলি ১৯৩০ সালের প্রথম ভাগে যুগান্তর দলের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীভূপেন দত্তর মারফৎ আমাদের হাতে আসে। এই বোমাগুলি ভবিষ্যতে আমাদের কাজে লাগবে এই ছিল আমাদের আশা। কিন্তু তবুও কাজে ব্যবহার করার আগে বোমাগুলি ভালভাবে পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। নিজেরা হাতেনাতে পরীক্ষা করে না দেখলে ও-গুলির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তাই বোমাগুলি হাতে পেয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য একান্ত গোপন স্থান দরকার। মনে পড়ল বিনোদ দাসের কথা। তার আস্তানা এ পরীক্ষার কাজে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। বিনোদ দাস-ও এ ব্যাপারে সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনে কার্পণ্য করবে না। হল-ও তাই। বিনোদের কোয়ার্টারে যখন আমরা গিয়ে উঠলাম ওকে যখন সব কথা জানালাম ওর আনন্দ আর ধরে না। বিনোদই সব ব্যবস্থা করে দিল। পরের দিন সন্ধ্যায় ওর কথা মত আমরা রেল লাইনের ধারে জনমানবহীন একটি স্থান বেছে নিলাম। স্থির হল রেলগাড়ী যখন লাইনের উপর দিয়ে যাবে তখন আমরা আমাদের নির্দ্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে কয়েকটি বোমা ফাটাব। রেলগাড়ীর শব্দে বোমার শব্দ আর বাইরে শোনা যাবে না। নির্দ্ধারিত সময়ে রেলগাড়ী এল, রেলগাড়ী চলে-ও গেল কিন্তু আমাদের বোমা ফাটল না। যে উদ্যম ও যে আনন্দ নিয়ে আমরা বিনোদের আস্তানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম ঠিক ততখানি নৈরাশ্য ও দুঃখ নিয়েই আমরা আবার কলকাতায় ফিরলাম। এমনি ভাবে একাধিক বার বিনোদের কাছে গিয়ে আমরা হাজির হয়েছি। সমস্ত জেনে শুনে-ও বিপদের সব ঝুঁকি হাসিমুখে সে ঘাড় পেতে নিয়েছে এই ছিল তার চরিত্র। অথচ বাইরে লোকের কাছে বিনোদ কোলিয়ারির বড় সাহেব, বিরাট তার কোয়ার্টার ও প্রচুর তার সুযোগ সুবিধা। নিকুঞ্জ ও সুপতির ওখানে কিছু দিন নিরাপদে কাটিয়ে আসার কোন অসুবিধা-ই হবে না।

নিকুঞ্জ-সুপতির কলকাতা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি-ও যাত্রা করলাম নোয়াখালীর দিকে। এ জেলার বহু অঞ্চলেই দলের বেশ কিছু কর্মী ছিল। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবার জন্যই আমার নোয়াখালী যাত্রা। আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমরা একের পর এক দুর্দ্ধর্ষ অভিযান করে যাব এবং সেই অভিযানের প্রয়োজনে টাকা কড়ি, গোপন আস্তানা ও অন্য সব সাহায্যে করবে মফঃস্বলের কর্মীবৃন্দ। এই কারণেই ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করা দরকার। আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কর্মীদের মধ্যে কে, কখন, কি ভাবে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ, তা জেনে নেওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ছদ্মবেশে বেশ সাবধানতা অবলম্বন করে আমি আমার গন্তব্য পথে চললাম। পথে কেউ ঘুনাক্ষরে-ও আমাকে সন্দেহ করল না, চিনতে পারা তো দূরের কথা। আমি যথাস্থানে পৌছে কাজ সুরু করে দিলাম।

কাজ যখন শেষ হয়ে এল ভাবলাম বাড়ী গিয়ে একবার বাবা-মাকে দেখে আসব। তখন ভেবেছিলাম এটা হয়ত জীবনের শেষ দেখা। কারণ আমরা যারা এত কাল পেছনে রয়েছি তারাই একদিন একটি পরিকল্পনা নিয়ে নিজেরাই ঝাঁপিয়ে পড়ব এবং দেশের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করব। আজ কেবলই মনে হয় যে কত বড় দুর্ভাগ্য আমাদের যে দেশমাতৃকার চরণে জীবন উৎসর্গ করার সুযোগ আমরা শেষ পর্য্যন্ত পেলাম না। নেতার কথা মনে জাগছে—তিনি একদিন বলেছিলেন দেশের কাজে মরার-ও একটা ভাগ্য চাই। চরম আত্মদানের ডাক কি সবার ভাগ্যে জোটে?

লক্ষ্য করে দেখেছি পুলিশ আমাকে খুঁজে পাবার জন্যে যা কিছু অনুসন্ধান চালাচ্ছে তা সীমাবদ্ধ রেখেছে ঢাকা ও কলকাতায়। নোয়াখালী অঞ্চলে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমি তো বরাবর ঢাকা ও কলকাতা-তেই থাকতাম তাই ঢাকা ও কলকাতার সামান্য কিছু লোকই আমাকে চিনত, নোয়াখলী জেলার বড় একটা কেউ চিনত না। সুতরাং বাড়ী যদি যাই তবে তাতে কিছু বিপদ ঘটবে বলে মনে হল না। তাই কতকটা নিশ্চিন্ত মনেই বাড়ী গিয়ে হাজির হলাম। বাবা-মার সঙ্গে দেখা হতেই মা কেঁদে ফেললেন। বাবা নীরবে আমার দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। বাবা-মাকে অনেক করে বোঝালাম আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। দূরে থাকি বলেই বাবা মার কোন খোঁজ খবর করতে পারছি না। বল-লাম আমার কোন বিপদের আশংকা নেই, আমার সম্পর্কে বৃথা চিন্তা করবার কোন কারণই নেই। এই ভাবে মা-বাবাকে শান্ত করলাম। কিছু-ক্ষণ পরে মা উঠে দাঁড়ালেন আমার খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে।

(ক্রমশঃ)

(৪৫৭ পৃষ্ঠার পর)

উদ্ঘাটিত হল তখন তারা ১৮৫৭ সালে বাহাদুর শা'র পতাকাতলে একত্র হয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবার সংকল্প গ্রহণ করল। আমরা তাই আজ বাহাদুর শা-কে স্মরণ করি, স্মরণ করি শুধু এজন্য নয় যে তিনি সব দিক থেকে শত্রুকে আঘাত হানবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমরা তাকে স্মরণ করি এই জন্য যে তাঁরই পতাকাতলে বিদ্রোহী সমগ্র ভারতবর্ষ তখন একত্র হয়েছিল। হিন্দু শিখ ও মুসলমান যেদিন পরস্পর হাত ধরাধরি করে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল স্বাধীন ভারতের শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শা-র দূরদর্শিতার জন্যই এতখানি সম্ভব পর হয়েছিল। এই কারণেই ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দের অভ্যু-খানকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করলে-ও আমরা একে বলি ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। নেতাজীর এই উক্তির পরে-ও কি বলা চলে যে ১৮৫৭-৫৮ সালের ব্যাপক গণ-অভ্যু-খান ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম নয়!

(৪৬২ পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষানীতির ফসল আমরা একশ বছর আগের জমীদার সভার সাহেব সভ্য শ্রীটার্টনের বর্ণিত কমনওয়েলথে স্বেচ্ছায় প্রবেশ করলাম। এর চিরকা-লের শিরোমণি হোলো ইংলণ্ডের রাজা এবং তার বংশধর।—

ইংরেজ জাতে বেনে। ফরাসী বা পর্তুগীজদের মত অযথা জল ঘোলা না করে সে সাম্রাজ্যের ঘুন-ধরা ঠাট ঠমক ছেড়ে বাস্তব পন্থা অনুযায়ী ভারতীয়-দের হাতে শাসনভার তুলে দিয়েছে। এর ফলে দীর্ঘকালের জাতি-বৈরীতার প্রশ-মন হয়েছে। ইংরাজের ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়েছে চতুর্গুণ। একথা বিলাতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীঅ্যাটেলী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লয়েড জর্জ ও বাঘা ক্লেমেন্সো উইলসনও মার্কিন শক্তিকে বিশ্ব রাজ-নীতি থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে সে সম্পর্কে মার্কিণ কূটনীতি বিশেষ সজাগ ছিল। মূলত মার্কিণ শক্তি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি। তাই ট্রেম্যান পোষ্টডম সম্মে-লনে যাবার প্রাক্কালে বলেন—রুশ বা কমিউনিষ্ট সম্প্রসারণের চেয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তার ভয় বেশী।

(—Hook. S., Politiical Power and personal freedom, p. 109) এই মার্কিণী চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তখন বৃটিশ সরকারের ছিল না। আর ষ্টালীন যত খারাপ লোকই হোক বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে টিকে থাকার ব্যাপারে যে সে ইংরেজের সহায় হবে না এ তো দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। তাই নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ও জন বিক্ষোভ যখন উত্তাল তখন এই আপোষই ছিল বৃটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত পন্থা।—

এই আপোষের ফলে ইংরাজ শাস-নের ও শোষণের যারা পাওা ছিল তাদের পেনসেন হিসাবে বেশ কয়েক কোটি পাউণ্ড আমরা আজও যুগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সংস্কৃতি জগতে আজো ইংরাজের একাধিপত্য। বিলাতে ভারতীয় প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত ও বিঘ্নিত হলেও এখানে তারা আজও রাজার জাত হিসাবে বাস করে। জীব-নের সর্বক্ষেত্রে তাদেরই প্রাধান্য যাদের বিধানবাবুর মন্ত্রীসভার সেই স্যার উপা-ধিধারী সদস্যটির মত যার সাহেব দৃষ্টি-গোচর হলেই কে যেন পেছন থেকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয় আর হাতটা আপনা হতেই কপালে ঠেকে।

আপোষের কথাবার্তার বিরুদ্ধে প্রথম দিকে গান্ধীজী বিরোধী হলেও কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি এই আপোষ সম্পূর্ণ সমর্থন করেন। দূরদর্শী হিসাবে তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে আপোষ বিরোধী আন্দোলন অনিবার্য ভাবে সোভিয়েট রুশের প্রভাবে গিয়ে পড়বে এবং ভারতে কায়েম হবে রুশ তাঁবেদার রাষ্ট্র, উত্তর কালে যা ব্রেজনেভ ডক্‌ট্রিণের দ্বারা পরিচালিত হবে। আমেরিকার চুপ করে বসে থাকবে না। সেই ভাগাভাগি হবেই।

ইংরাজ গোড়ায় কমনওয়েলথ-এর সংগঠন গড়েছিল। আমেরিকা, রুশ 'কমিকন' ও কমন মার্কেটের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নানা কারণে সেটা সম্ভব হয় নি। কমনওয়েলথের মালদার মক্কেল অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আমেরিকার দিকেই ঝুঁকেছে বাস্তব বুদ্ধির তাগিদে। দ্বিপায়ন ইংরেজ বাধ্য হয়েছে ইয়োরোপীয় শক্তি হিসাবে কমন মার্কেটে যোগ দিতে। বৃটিশ কমনওয়েলথ আজ এক প্রহসনের ব্যাপার। কমন ওয়েলথের সভ্য সদ্য স্বাধীন আফ্রিকান দেশগুলো থেকে ভারতীয়দের কোন ক্ষেত্রে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চলে আসতে হচ্ছে। কমনওয়েলথের সভ্য পাকিস্তান আর ভারত ত তিনবার যুদ্ধই করল। সাম্রাজ্যবাদী যুগের ইম্পীরীয়াল প্রেফারেন্স নামক ইংরাজদের বিশেষ সুবিধাকে কমনওয়েলথের নামে চালু করাই ছিল ইংরাজদের প্রধান লক্ষ্য। অন্য কোন দিকে তারা আর তাকায় নি। ভারত জোট নিরপেক্ষ। সে ক্ষেত্রে কমনওয়েলথের জোটে থাকা অনেকটা সোনার পাথর বাটি মত শোনায়। আজ খোদ বিলাতেই ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ড আলাদা হয়ে যেতে চায়। নর্থ সীতে যদি তেল পাওয়া যায়, স্কটল্যাণ্ডে তাহলে স্বতন্ত্র বিধানসভার গঠন প্রায় অনিবার্য। খোদ লণ্ডন শহরে সন্ত্রাসবাদীদের দৌরাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ছে। স্বয়ং রাণীকে লক্ষ্য করেও বোমা ছোড়া হয়েছে। (কোলকাতার খবরের কাগজে এ খবর পড়েছি বলে মনে হয় না)। এ ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ নিয়ে নতুন করে ভাবা দরকার। অবশ্য কমনওয়েলথ ছাড়লেই দেশে দুধ এবং মধুর স্রোত বইবে তা নয়। বর্মা পাকিস্তান কমনওয়েলথে বর্তমানে নেই (বর্মা কোন কালেই ছিলনা)। কিন্তু ভারতের পক্ষে ডমিনিয়ন রাজের সীমিত সার্বভৌমত্বের অমর্যাদা বহন করে মৃতকল্প কমনওয়েলথে ঝুলে থাকার কি তাৎপর্য! বস্তুত কমনওয়েলথ আজ মৃত্যুশয্যায় ধুঁকছে। ইংরেজ আজ তার ঘরের সমস্যাতেই পাগল।

ইংরাজ রাজত্বের সময় আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম ও সংগ্রাম করে ছিলাম এই বলে যে স্বাধীন ভারতে মানুষ অনাহারে মরবে না, বন্যা নিয়ন্ত্রিত হবে, প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্রের অভাব থাকবে না, থাকবেনা নিরক্ষর কেউ। আমাদের দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পর এই সাতাশ বছরেও আমরা মানুষের অনাহারে মরা রোধ করতে পারি নি। বন্যা প্রতি বছরই আমাদের অতিথি। পশ্চিমবঙ্গে ইংরাজ আমলের তুলনায় নিরক্ষতার হার বাড়ছে।

বিধানবাবুর মন্ত্রীসভার সেই সদস্যটী এবং মেকলের বাঞ্ছিত বাবুদের প্রাদুর্ভাবই এর কারণ। অথচ ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মনের ওপর পদ্ম পাতার জলের মত গড়িয়ে যায়নি। ভিক্টোরিও ইংলণ্ডে নর্মাণ নাইট ও অ্যাংলো স্যাকসন গৃহস্থের গুণের সমন্বয়ে 'জেন্টেল-ম্যান" এর যে ধারণা তার অনুকরণে এদেশে "বাবু" বা ভদ্রলোকের ধারণা তৈরী হয়েছিল। তার সঙ্গে মিশেছিল বৈদিক সদাচার বল্লাল সেনের কুলীন প্রথার নয়টি লক্ষন, ইরান তুরাণের পরিশীলিত আদব কায়দা। এরাই ভারতের সংস্কৃতি সৃষ্টিকারী এলিট। ভারতের নব জাগৃতি এদেরই দান। এক চীন ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এত পুরানো সভ্যতা টিঁকে নেই। এই দুর্মর প্রাণশক্তি শুধু একটা কথাই বলে তা হোলো ভারতবর্ষ আজ প্রতীক্ষা করছে এক নূতন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের। যেখানে ভারতীয় নেতারা নিক্সন-উইলসনকে অনুসরণ করবেন না। 'রোলস রয়েস' চড়ে ভিক্ষা করতে বেরুবেন না। নেতাজীর মত, গান্ধীর মত জনগণের দুঃখের অংশীদার হবেন। যার ফলে সাধারণ চাষী বলবে হ্যাঁ এঁদের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়। যে বিপ্লব ফিরিয়ে আনবে সাধারণ মানুষের মধ্যে শাশ্বত মূল্যবোধ। যার ফলে মানুষ বুঝবে গাড়ী-বাড়ী-মদ-মেয়েমানুষ, খবরের কাগজে নামই জীবনের সবকিছু নয়। নির্ভীক ভাবে সমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধনই তার জীবন সাধনা। এই বোধ জাগিয়ে তোলার জন্য চাই আজ একদল নতুন সন্ন্যাসী।

'নিশানার' নিয়মাবলী ঃ

১। 'নিশানা' প্রতি ইংরাজী মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৭৫ পয়সা। সডাক গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ১৮ টাকা, ষান্মাসিক ৯ টাকা। সভ্যগণকে প্রতিমাসে দুটি পত্রিকা পাঠানো হয়ে থাকে। যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়। সাধারণতঃ ভি. পি. যোগে পত্রিকা পাঠানো হয় না, সাধারণ বুকপোষ্টে পাঠানো হয়ে থাকে। পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরের মন্তব্য সহ পত্র দ্বারা কার্যালয়ে জানাতে হবে।

২। টাকাকড়ি, চিঠিপত্র, বিজ্ঞাপনের কপি প্রভৃতি কর্মসচিব, নিশানা, ১৩, সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭তে প্রেরিতব্য। ব্যক্তিগতভাবে কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজন হলে ১০-৩০টা থেকে ৫টার (শনিবার ২টা পর্যন্ত) মধ্যে উক্ত ঠিকানায় কর্মসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যায়।

৩। 'নিশানা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও মানবিক মর্যাদাবোধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ মৌল ও সময়োচিত অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হবে। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করা প্রয়োজন।

৪। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা না থাকলে ছাপা হয় না। কপি রেখে প্রবন্ধ পাঠাবেন। কারণ অমনোনীত প্রবন্ধ সাধারণতঃ ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব রক্ষা করে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জনে সম্পাদকমণ্ডলীর অধিকার থাকবে। প্রবন্ধ অমনোনীত হবার কারণ জানাতে সম্পাদকমণ্ডলী অক্ষম।

৫। নিশানায় পুস্তক সমালোচনার জন্যে দুই কপি পুস্তক পাঠাতে হবে।

৬। চিঠিপত্রে সর্বদা গ্রাহক বা সভ্য নম্বর উল্লেখ করবেন।

৭। উদার শর্তে এজেন্সী দেওয়া হয়। ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্ধন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।
ফোয়ারার রন্ধ্র হতে
উন্মুখর ঊর্ধ্বস্রোতে
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের কী অভিনন্দন।
মৃত্তিকার ভিত্তি ভেদি অঙ্কুর আকাশে দিল আনি
অসমুখ শক্তিবলে গভীর মুক্তির মন্ত্রবাণী।
মহাক্ষণে রুদ্রাণীর
কী বর লভিল বীর,
মৃত্যু দিয়ে বিরচিল অমর্ত্য নরের রাজধানী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বদেশ কল্যাণ রিসার্চ ইনস্টিট্যুটের পক্ষে শ্রীমিহিররঞ্জন মোতায়েব কর্তৃক ৮, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১ স্থিত প্রেস এণ্ড লিটারেচার (ইণ্ডিয়া) হইতে মুদ্রিত ও তৎকর্তৃক ১৩ নং সার্কাস রো, কলিকাতা-১৭ হইতে প্রকাশিত।

সম্পাদক : শ্রীজ্যোতিশ জোয়ারদার

CALCUTTA FAN WORKS PRIVATE LTD.

30, CHOWRINGHEE ROAD

CALCUTTA—700016

CENTRAL LIBRARY

15th August 1974

NISHANA
Phone : 44-1460

Regd. No. RN—24618/73
Regd. No. WB/EC-33

With best compliments from :

C

Gram : GOLEATHERS

Phone : 46-7856
46-2170

COMPLIMENTARY LEATHER PRIVATE LIMITED

20H BALLYGUNGE TERRACE CALCUTTA-19

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF LEATHER GOODS, SILK & HANDICRAFTS